সবার চেয়ে বেশি

প্রণয়নে
আবদুল হামীদ ফাইযী আল-মাদানী

প্রকাশনায়
তাওহীদ পাবলিকেশন্স
ঢাকা-বাংলাদেশ

অবতরণিকা

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

ফযীলত ও আযাব বর্ণনার জন্য ফাযায়েল ও রাযায়েলের বই অনেক আছে, তবুও এটি একটি অন্য ধরনের ফাযায়েল ও রাযায়েল বিষয়ক বই। যেহেতু এতে আছে সব বিষয়ের 'সবচেয়ে বেশি'র বর্ণনা। এমনকি ফাযায়েল ও রাযায়েল ছাড়াও যা 'সবচেয়ে বেশি' বড়, ছোট, শ্রেষ্ঠ, নিকৃষ্ট, আগে, পরে ইত্যাদি, তা উল্লেখ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, তাঁর ইবাদতের জন্য, যাতে আমরা তাঁর জন্য সবচেয়ে বেশি সুন্দর ও ভালো আমল করতে পারি। তিনি বলেছেন,

{وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً} (٧) سورة هود

অর্থাৎ, আর তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছ দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সময় তাঁর আরশ পানির উপরে ছিল; যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা ক'রে নেন, তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম কে? (হূদ ঃ ৭)

{إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا } (٧) سورة الكهف

অর্থাৎ, পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেগুলিকে ওর শোভা করেছি মানুষকে এই পরীক্ষা করবার জন্য যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে উত্তম। (কাহফ ঃ ৭)

{الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ} (٢) سورة الملك

অর্থাৎ, যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য; কে তোমাদের মধ্যে কর্মে সর্বোত্তম? আর তিনি পরাক্রমশালী, বড় ক্ষমাশীল। (মুল্ক ঃ ২)

যে উত্তম কর্ম করবে, মহান আল্লাহ তা কবুল করবেন এবং তাকে উত্তম বিনিময় ও পুরস্কার প্রদান করবেন। তিনি বলেছেন,

{أُوْلَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَنَتَجَاوَزُ عَن سَيِّئَاتِهِمْ فِي أَصْحَابِ الْجَنَّةِ وَعْدَ الصِّدْقِ الَّذِي كَانُوا يُوعَدُونَ} (١٦) سورة الأحقاف

অর্থাৎ, আমি এদেরই সর্বোৎকৃষ্ট কর্মগুলো গ্রহণ ক'রে থাকি এবং তাদের মন্দ কর্মগুলো ক্ষমা ক'রে দিই, তারা জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত। এদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল, তা সত্য প্রমাণিত হবে। (আহক্বাফ ঃ ১৬)

যেমন তিনি সর্বোত্তম আমল পছন্দ করেন, তেমনি তিনি তার সর্বোত্তম বিনিময়ও প্রদান ক'রে থাকেন। তিনি বলেছেন,

{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ} (٩٧) سورة النحل

অর্থাৎ, পুরুষ ও নারী যে কেউই বিশ্বাসী হয়ে সৎকর্ম করবে, তাকে আমি নিশ্চয়ই সুখী জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব। *(নাহল ঃ ৯৭)*

উত্তম আমল আমলকারী নিজে নষ্ট না করলে মহান আল্লাহ তা নষ্ট করেন না। তিনি বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضِيعُ أَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا} (٣٠) سورة الكهف

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস রাখে ও সৎকর্ম করে, আমি তাদেরকে পুরস্কৃত করি। যে ভালো কর্ম করে, আমি তার কর্মফল নষ্ট করি না। (কাহফ ঃ ৩০)

সুতরাং পরিমাণে সবচেয়ে বেশি নয়, বরং মানে ও গুণে সবচেয়ে বেশি সুন্দর আমল করা উচিত আমাদের। যেমন আমাদের উচিত, সবচেয়ে বেশি নিকৃষ্ট কর্ম ও গুণ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া, যাতে আমরা নিকৃষ্টতম মানুষে পরিণত না হই।

জানার তাকীদে অনেক এমন কিছু কথা উল্লেখ করেছি, যা সবচেয়ে বেশি, কিন্তু তা নিছক পার্থিব ব্যাপার। নেহাতই আমার এই বইয়ের বিষয়ীভূত বলে। আশা করি, পাঠক তাতেও উপকৃত হবেন।

মহান আল্লাহর কাছে আশা এই যে, তিনি এই বইয়ের মাধ্যমে লেখক-পাঠক সকলকেই উপকৃত করুন এবং যে মানুষেরা ইহ-পরকালে 'সবচেয়ে বেশি' সুন্দর, তাদের দলভুক্ত করুন। আমীন।

বিনীত---
আব্দুল হামীদ মাদানী
আল-মাজমাআহ, সঊদী আরব
২৪/৬/ ১৪৩৩হিঃ, ১৫/৫/২০১২খ্রিঃ

মহান আল্লাহর সবচেয়ে মহান নাম

এ কথা বিদিত যে, মহান আল্লাহর সকল নামই সুন্দর, সকল নামই মহান এবং ইস্‌মে আ'যমও সেই সকলেরই অন্তর্ভূত। অতএব মতভেদ থাকলেও সঠিক কথা এই যে, যে একক নামে তাঁর সমস্ত সুন্দর ও পরিপূর্ণ গুণাবলী সন্নিবিষ্ট আছে, সেই নামই মহানতম নাম বা ইস্‌মে আ'যম।

অথবা যাতে আছে একাধিক নামের সমষ্টি এবং তাতে প্রধান প্রধান সত্তা ও কর্মগত বহু গুণাবলীর উল্লেখ, সেই নামই হল ইস্‌মে আ'যম।

অথবা যে নামের কথা সহীহ হাদীস দ্বারা সমর্থিত, সেই নামই ইস্‌মে আ'যম।

সুতরাং (ক) ইস্‌মে আ'যম হল, 'আল্লাহ'। কারণ এ নামই হল সাত্ত্বিক আসল ও মূলনাম, অবশিষ্টগুলি গুণগত উপনাম।

(খ) ইস্‌মে আ'যম হল, 'আল্লাহুর রাহমানুর রাহীম'।

(গ) ইস্‌মে আ'যম হল, 'আর্রাহমানুর রাহীমুল হাইয়্যুল ক্বাইয়্যুম'।

যেহেতু সহীহ হাদীসে এরূপ বর্ণিত হয়েছে। *(দেখুন সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৪৬নং)*

(ঘ) ইস্‌মে আ'যম হল, 'আল-হাইয়ুল ক্বাইয়্যুম'।

এটিও একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। *(ইবনে মাজাহ, হাকেম, সিলসিলাহ সহীহাহ ৭৪৬নং)* তাছাড়া এ নাম মহান আল্লাহর প্রতিপালকত্বের মহৎ গুণাবলীর কথা ঘোষণা করে।

(ঙ) ইস্‌মে আ'যম হল, 'আল-মান্নান, বাদীউস সামাওয়াতি অল-আরযি যুল-জালালি অল-ইকরাম, ইয়া হাইয়্যু ইয়া ক্বাইয়্যুম'।

যেহেতু একটি সহীহ হাদীসে এটিকে ইস্‌মে আ'যম বলা হয়েছে। *(আবূ দাউদ ১৪৯৫, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ৩৮৫৮, আহমাদ, হাকেম, ইবনে হিব্বান)*

(চ) 'আল্লা-হু, লা ইলা-হা ইল্লা আন্তাল আহাদুস স্বামাদুল্লাযী লাম ইয়ালিদ অলাম ইউলাদ, অলাম য়্যাকুল্লাহু কুফুওয়ান আহাদ।'

এটিও ইস্‌মে আ'যম বলে সহীহ হাদীসে উল্লিখিত হয়েছে। *(আবু দাউদ ১৪৯৩, তিরমিযী ৩৪৭৫, ইবনে মাজাহ ৩৮৫৭, আহমাদ, হাকেম, ইবনে হিব্বান)*

হাফেয ইবনে হাজার (রঃ) বলেন, এ বিষয়ে উল্লিখিত হাদীসের মধ্যে সনদের দিক দিয়ে এটিই সবচেয়ে বলিষ্ঠ। *(ফাত্‌হুল বারী ১৮/২১৫, তুহফাতুল আহওয়াযী ৮/৩৭৮, বিস্তারিত দ্রঃ 'মহান আল্লাহর নাম ও গুণাবলী')*

সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা

'সৃষ্টিকর্তা' বলতে মহান আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ নয়। মহান আল্লাহই সৃষ্টি করেন। আর মানুষ সৃষ্টি করে না, করতে পারে না। মানুষ আবিষ্কার করে মাত্র। সৃষ্টি-রহস্য উদ্‌ঘাটন করে মাত্র। মানুষ কারণ ঘটায়, সৃষ্টি করেন আল্লাহ। মানুষ বীর্যের মিলন ঘটায়, মানুষ সৃষ্টি করেন তিনি। মানুষ বীজ বপন করে, অঙ্কুরিত ক'রে ফুল-ফল দান করেন তিনি। মানুষ পদার্থের ধর্ম আবিষ্কার করতে পারে, পদার্থ সৃষ্টি করেন তিনি। দর্জি কাপড় কেটে পোশাক তৈরি করে। তাঁতি সুতো দিয়ে কাপড় তৈরি করে। কেউ তুলো থেকে সুতো তৈরি করে। চাষী তুলো চাষ করে। তুলো সৃষ্টি করেন আল্লাহ।

একমাত্র সৃষ্টিকর্তা তিনিই। অদ্বিতীয় সৃজনকর্তা তিনিই। আসল উদ্ভাবনকর্তা তিনিই। তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ স্রষ্টা। তিনি বলেছেন,

{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ (١٢) ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ (١٣) ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ} (١٤) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি মৃত্তিকার উপাদান হতে। অতঃপর আমি ওকে শুক্রবিন্দু রূপে স্থাপন করি এক নিরাপদ আধারে (জরায়ুতে)। পরে আমি শুক্রবিন্দুকে পরিণত করি রক্তপিন্ডে, অতঃপর রক্তপিন্ডকে পরিণত করি মাংসপিন্ডে এবং মাংসপিন্ডকে পরিণত করি অস্থিপঞ্জরে; অতঃপর অস্থি-পঞ্জরকে ঢেকে দিই মাংস দ্বারা; অবশেষে ওকে গড়ে তুলি অন্য এক সৃষ্টিরূপে; অতএব সর্বোত্তম স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান! *(মু'মিনূন ঃ ১২-১৪)*

তিনিই মানুষকে সৃষ্টি করেছেন সুন্দর অবয়বে। তিনিই এ বিশ্ব রচনা করেছেন অপূর্ব বৈচিত্র্যে। তিনিই প্রাণী জগতের বিভিন্ন রূপ ও রঙ সৃষ্টি করেছেন। তিনিই উদ্ভিদ জগতের লক্ষ-কোটি শ্রেণীর বৃক্ষ-লতা এবং তাতে ফুল-ফল-ফসল সৃষ্টি ক'রে থাকেন। তিনিই পানি সৃষ্টি করেছেন এবং পানি থেকে সৃষ্টি করেছেন সকল প্রাণী। তিনিই সৃষ্টি করেছেন বাতাস ও অক্সিজেন। তিনিই সৃষ্টি করেছেন চন্দ্র-সূর্য, গ্রহ-নক্ষত্র। তিনিই সৃষ্টি করেছেন সকল শক্তি। তিনিই সৃষ্টি করেছেন আকর্ষণ, বিকর্ষণ, অভিকর্ষ ও মাধ্যাকর্ষণ শক্তি। তিনিই সৃষ্টি করেছেন এ বিশ্বজগতের সব কিছু। মহান আল্লাহ বলেন,

{هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ} (١١) لقمان

অর্থাৎ, এ হল আল্লাহর সৃষ্টি! তিনি ব্যতীত অন্যেরা কী সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও তো। বরং সীমালংঘনকারীরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে। (লুক্বমান ঃ ১১)

কিন্তু বিভ্রান্ত মানুষ ভুল ক'রে এমন জিনিসকে স্রষ্টা মনে করে এবং তার পূজা করে, যে নিজেই সৃষ্ট। বাতিল উপাস্যের উপাসকদের বুঝা উচিত যে, সৃষ্টি কিছু সৃষ্টি করতে পারে না। স্রষ্টার সৃষ্টিতে শরীকও হতে পারে না। মহান স্রষ্টা বলেছেন,

{قُلْ أَرَأَيْتُمْ شُرَكَاءكُمُ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَرُونِي مَاذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ أَمْ لَهُمْ شِرْكٌ فِي

السَّمَاوَاتِ أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا فَهُمْ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّنْهُ بَلْ إِن يَعِدُ الظَّالِمُونَ بَعْضُهُم بَعْضًا إِلَّا غُرُورًا}

অর্থাৎ, বল, 'তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যে সকল শরীকদের আহবান কর, তাদের কথা ভেবে দেখেছ কি? তারা পৃথিবীতে কিছু সৃষ্টি ক'রে থাকলে আমাকে দেখাও; অথবা আকাশমন্ডলীতে ওদের কোন অংশ আছে কি?' নাকি আমি তাদেরকে এমন কোন গ্রন্থ দিয়েছি, যার প্রমাণের ওপর ওরা নির্ভর করে? বরং সীমালংঘনকারীরা একে অপরকে ধোঁকামূলক প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। (ফাত্বির ঃ ৪০)

তুচ্ছ কিছুও সৃষ্টি ক'রে দেখাতে পারে না তারা, সামান্য একটি মাছিও না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَّا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ (٧٣) مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} (٧٤) سورة الحج

অর্থাৎ, হে লোক সকল! একটি উপমা দেওয়া হচ্ছে, তোমরা মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর; তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো, তারা তো কখনো একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারে না, যদিও তারা এই উদ্দেশ্যে সবাই একত্রিত হয়। আর মাছি যদি তাদের নিকট হতে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায়, তাহলে সেটাও তারা ওর নিকট হতে উদ্ধার করতে পারে না; পূজারী ও দেবতা কতই না দুর্বল। তারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না; আল্লাহ নিশ্চয়ই চরম ক্ষমতাবান, মহাপরাক্রমশালী। (হাজ্জ ঃ ৭৩-৭৪)

তিনিই সৃষ্টি করেন, উদ্ভাবন করেন, কোন পূর্ব নমুনা ছাড়াই সৃষ্টি করেন। সৃষ্টিকে বিলীন ক'রে পুনঃ সৃষ্টি করেন। সব কিছু অতি অনায়াসে সৃষ্টি করেন।

{أَوَلَمْ يَرَ الإِنسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ (٧٧) وَضَرَبَ لَنَا مَثَلاً وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ (٧٨) قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ (٧٩) الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ مِنْ الشَّجَرِ الأَخْضَرِ نَاراً فَإِذَا أَنْتُمْ مِنْهُ تُوقِدُونَ (٨٠) أَوَلَيْسَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ بَلَى وَهُوَ الْخَلاَّقُ الْعَلِيمُ (٨١) إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئاً أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ (٨٢) فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (٨٣) سورة يس

অর্থাৎ, মানুষ কি ভেবে দেখে না যে, আমি তাকে শুক্রবিন্দু হতে সৃষ্টি করেছি? অতঃপর তখনই সে প্রকাশ্য বিতন্ডাকারী হয়ে পড়ে। মানুষ আমার ব্যাপারে দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে অথচ সে নিজের সৃষ্টির কথা ভুলে যায়; এবং বলে, 'অস্থিতে প্রাণ সঞ্চার করবে কে; যখন তা পচে-গলে যাবে?' বল, তার মধ্যে প্রাণ সঞ্চার করবেন তিনিই, যিনি তা প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তিনি প্রত্যেক সৃষ্টি সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। তিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ হতে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং তোমরা তা হতে অগ্নি প্রজ্বলিত কর। যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি ওদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন? অবশ্যই, আর তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তাঁর ব্যাপার তো এই যে, তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন,

তখন তিনি কেবল বলেন, 'হও'; ফলে তা হয়ে যায়। অতএব পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। *(ইয়াসীন ঃ ৭৭-৮৩)*

মানুষ এ সৃষ্টি-বৈচিত্র দর্শন ক'রে অভিভূত ও মুগ্ধ হয়। সহসা তাঁর প্রতি বিশ্বাস ও ভক্তি আসে। মাথা নত হয় তাঁর সামনে এবং স্বতঃস্ফূর্তভাবে উচ্চারিত হয়,

اَللّٰهُمَّ لَكَ سَجَدْتُّ وَبِكَ آمَنْتُ وَ لَكَ أَسْلَمْتُ وَ أَنْتَ رَبِّى سَجَدَ وَجْهِىَ لِلَّذِيْ خَلَقَهُ وَ صَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُوَرَهُ وَ شَقَّ سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ، فَتَبَارَكَ اللّٰهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِيْنَ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য সিজদাবনত, তোমাতেই বিশ্বাসী, তোমার নিকটেই আত্মসমর্পণকারী, তুমি আমার প্রভু। আমার মুখমন্ডল তাঁর উদ্দেশ্যে সিজদাবনত হল, যিনি তা সৃষ্টি করেছেন, ওর আকৃতি দান করেছেন এবং আকৃতি সুন্দর করেছেন। ওর চক্ষু ও কর্ণকে উদ্গত করেছেন। সুতরাং সুনিপুণ স্রষ্টা আল্লাহ কত মহান! *(আহমাদ, মুসলিম ৭৭১, আবু দাউদ ৭৬০নং, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, নাসাঈ)*

সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াময়

মহান আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই সকল সৃষ্টির পালনকর্তা, রুযীদাতা। তিনি বান্দার প্রতি বড় দয়াবান, অতি করুণাময়।

উমার ইবনে খাত্ত্বাব ﵁ বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু সংখ্যক বন্দী এল। তিনি দেখলেন যে, বন্দীদের মধ্যে একজন মহিলা (তার শিশুটি হারিয়ে গেলে এবং স্তনে দুধ জমে উঠলে বাচ্চার খোঁজে অস্থির হয়ে) দৌড়াদৌড়ি করছে। হঠাৎ সে বন্দীদের মধ্যে কোন শিশু পেলে তাকে ধরে কোলে নিয়ে (দুধ পান করাতে লাগল। অতঃপর তার নিজের বাচ্চা পেয়ে গেলে তাকে বুকে-পেটে লাগিয়ে) দুধ পান করাতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা কি মনে কর যে, এই মহিলা তার সন্তানকে আগুনে ফেলতে পারে?" আমরা বললাম, 'না, আল্লাহর কসম!' তারপর তিনি বললেন,

« لَلّٰهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا ».

"এই মহিলাটি তার সন্তানের উপর যতটা দয়ালু, আল্লাহ তার বান্দাদের উপর তার চেয়ে অধিক দয়ালু।" (বুখারী ও মুসলিম)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, 'আল্লাহ যখন সৃষ্টিজগৎ রচনা সম্পন্ন করলেন, তখন একটি কিতাবে লিখে রাখলেন, যা তাঁরই কাছে তাঁর আরশের উপর রয়েছে, "অবশ্যই আমার রহমত আমার গযব অপেক্ষা অগ্রগামী।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

"আল্লাহ রহমতকে একশ ভাগে ভাগ করেছেন। তার মধ্যে নিরানব্বই ভাগ তিনি নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। আর পৃথিবীতে একভাগ অবতীর্ণ করেছেন। ঐ এক ভাগের কারণেই সৃষ্টিজগৎ একে অন্যের উপর দয়া করে। এমনকি জন্তু তার বাচ্চার উপর থেকে পা তুলে নেয় এই ভয়ে যে, সে ব্যথা পাবে।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "নিশ্চয় আল্লাহর একশটি রহমত আছে, যার মধ্য হতে একটি

মাত্র রহমত তিনি মানব-দানব, পশু ও কীটপতঙ্গের মধ্যে অবতীর্ণ করেছেন। ঐ এক ভাগের কারণেই (সৃষ্টজীব) একে অপরকে মায়া করে, তার কারণেই একে অন্যকে দয়া করে এবং তার কারণেই হিংস্র জন্তুরা তাদের সন্তানকে মায়া ক'রে থাকে। বাকী নিরানব্বইটি আল্লাহ পরকালের জন্য রেখে দিয়েছেন, যার দ্বারা তিনি কিয়ামতের দিন আপন বান্দাদের উপর রহম করবেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "আল্লাহ তাআলা আসমান-যমীন সৃষ্টি করার দিন একশটি রহমত সৃষ্টি করলেন। প্রতিটি রহমত আসমান ও যমীনের মধ্যস্থল পরিপূর্ণ (বিশাল)। অতঃপর তিনি তার মধ্য হতে একটি রহমত পৃথিবীতে অবতীর্ণ করলেন। ঐ একটির কারণেই মা তার সন্তানকে মায়া করে এবং হিংস্র প্রাণী ও পাখীরা একে অন্যের উপর দয়া ক'রে থাকে। অতঃপর যখন কিয়ামতের দিন হবে, তখন আল্লাহ এই রহমত দ্বারা সংখ্যা পূর্ণ করবেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

নবীগণ জানতেন, তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াবান। তাই তো মূসা ﷺ দুআ ক'রে বলেছিলেন,

{رَبِّ اغْفِرْ لِي وَلأَخِي وَأَدْخِلْنَا فِي رَحْمَتِكَ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} (١٥١) سورة الأعراف

অর্থাৎ, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে ও আমার ভাইকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাদেরকে তোমার করুণায় আশ্রয় দান কর। আর তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।' *(আ'রাফ ঃ ১৫১)*

ইউসুফ হারানোর শোকে আকুল ইয়াকূব ﷺ বড় আশাবাদিতার সাথে নিজ পুত্রদেরকে বলেছিলেন,

{هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلاَّ كَمَا أَمِنتُكُمْ عَلَى أَخِيهِ مِن قَبْلُ فَاللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ}

অর্থাৎ, 'আমি কি তোমাদেরকে ওর সম্বন্ধে সেইরূপই বিশ্বাস করব, যেরূপ বিশ্বাস ওর ভাই সম্বন্ধে পূর্বে তোমাদেরকে করেছিলাম? সুতরাং আল্লাহই শ্রেষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।' (ইউসুফ ঃ ৬৪)

ইউসুফ ﷺ ভাইদেরকে ক্ষমা ক'রে বলেছিলেন,

{لاَ تَثْرَيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} (٩٢) سورة يوسف

অর্থাৎ, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। (ইউসুফ ঃ ৯২)

আইয়ূব ﷺ বালাগ্রস্ত হয়ে প্রতিপালককে ডেকে বলেছিলেন,

{أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ} (٨٣) سورة الأنبياء

অর্থাৎ,'আমি দুঃখ-কষ্টে পড়েছি, আর তুমি তো দয়ালুদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু।' (আম্বিয়া ঃ ৮৩)

সর্বশ্রেষ্ঠ দয়াময়ের দয়ার আশা অবশ্যই রাখতে হবে। তবে তার সাথে এ খেয়ালও রাখতে হবে যে, তিনি কঠোর শাস্তিদাতা।

সর্বশ্রেষ্ঠ রুযীদাতা

মহান আল্লাহ 'রাযেক্ব, রায্যাক্ব ও খাইরুর রাযেক্বীন'। তিনিই রুযী সৃষ্টি ক'রে বিতরণ ক'রে থাকেন। তিনি বলেন,

{قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} (٣٩) سورة سبأ

অর্থাৎ, বল, 'আমার প্রতিপালক তাঁর দাসদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা তার জীবিকা বর্ধিত করেন অথবা সীমিত করেন। তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে, তিনি তার বিনিময় দেবেন। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।' *(সূরা সাবা' ৩৯ আয়াত)*

মানুষ তাঁর কাছে ছাড়া আর কার কাছে রুযীর আশা করে? তাঁর ফরয ইবাদত বাদ দিয়ে রুযীর অনুসন্ধান কি কোন রুযী আনয়ন করবে? মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} (١١) سورة الجمعة

অর্থাৎ, যখন তারা কোন ব্যবসা বা খেল-তামাশা দেখে, তখন তারা তোমাকে দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে তার দিকে ছুটে যায়। বল, 'আল্লাহর নিকট যা আছে তা ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যবসা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আর আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ রুযীদাতা।' *(সূরা জুমআহ ১১ আয়াত)*

সুতরাং তাঁর নিকটেই আছে রুযীর ভাণ্ডার, তাঁর হাতেই আছে রুযীর চাবিকাঠি, তাঁর নিকটেই রুযী চাইতে হবে। অন্যকে সন্তুষ্ট ক'রে রুযীর আশা করা ভুল। অন্যকে তাঁর ইবাদতে শরীক ক'রে তার কাছে রুযী প্রার্থনা ভ্রষ্টতা। তিনি বলেন,

{إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِندَ اللَّهِ الرِّزْقَ وَاعْبُدُوهُ وَاشْكُرُوا لَهُ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (١٧) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা কর, তারা তোমাদের রুযী দানে অক্ষম। সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিকটেই রুযী কামনা কর এবং তাঁর উপাসনা ও কৃতজ্ঞতা কর। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। *(সূরা আনকাবূত ১৭ আয়াত)*

পক্ষান্তরে তাঁর সবচেয়ে বড় রুযী হল বেহেশ্ত।

{وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ (٥٨) لَيُدْخِلَنَّهُم مُّدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ} (٥٩) سورة الحج

অর্থাৎ, যারা হিজরত করেছে আল্লাহর পথে এবং পরে (শত্রুর হাতে) নিহত হয়েছে অথবা মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ; তিনিই তো সর্বোৎকৃষ্ট রুযীদাতা। তিনি তাদেরকে অবশ্যই এমন স্থানে প্রবেশ করাবেন, যা তারা পছন্দ করবে এবং নিশ্চয় আল্লাহ সম্যক জ্ঞানময়, পরম সহনশীল। *(হাজ্জ ঃ ৫৮-৫৯)*

কোন সৃষ্টির দান, প্রতিদান, জীবনোপকরণ তাঁর মতো নয়। কেউ দান করলে দাতা হয়, কিন্তু আসল দাতা ও মহাদাতা তিনি। আসল রুযীদাতা তিনিই। তিনি বলেন,

{أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} (٧٢) سورة المؤمنون

অথবা তুমি কি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চাও? তোমার প্রতিপালকের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ রুযীদাতা। (মু'মিনূন ঃ ৭২)

সর্বশ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী

সর্বশ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী, একমাত্র ফায়সালাকারী মহান সৃষ্টিকর্তা। তাঁর ফায়সালা সকলের ভাগ্যে কার্যকর থাকে। তাঁর বিনা হুকুমে গাছের পাতাও নড়ে না। তাঁর বিনা অনুমতিক্রমে ভালো-মন্দ কিছুই ঘটে না। তাঁর ফায়সালাকে রদকারী কেউ নেই। মহানবী ﷺ তাঁর কাছে প্রার্থনা ক'রে বলতেন,

اَللّهُمَّ إِنِّيْ عَبْدُكَ وَابْنُ عَبْدِكَ وَابْنُ أَمَتِكَ، نَاصِيَتِيْ بِيَدِكَ، مَاضٍ فِيَّ حُكْمُكَ، عَدْلٌ فِيَّ قَضَاؤُكَ، أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ، سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنْزَلْتَهُ فِيْ كِتَابِكَ، أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَداً مِّنْ خَلْقِكَ، أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِيْ عِلْمِ الْغَيْبِ عِنْدَكَ، أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيْعَ قَلْبِيْ، وَنُوْرَ صَدْرِيْ وَجَلاَءَ حُزْنِيْ وَذَهَابَ هَمِّيْ.

অর্থ- হে আল্লাহ! নিঃসন্দেহে আমি তোমার দাস, তোমার দাসের পুত্র ও তোমার দাসীর পুত্র, আমার ললাটের কেশগুচ্ছ তোমার হাতে। তোমার ফায়সালা আমার জীবনে বহাল। তোমার মীমাংসা আমার ভাগ্যলিপিতে ন্যায়সঙ্গত। আমি তোমার নিকট তোমার প্রত্যেক সেই নামের অসীলায় প্রার্থনা করছি---যে নাম তুমি নিজে নিয়েছ। অথবা তুমি তোমার গ্রন্থে অবতীর্ণ করেছ, অথবা তোমার সৃষ্টির মধ্যে কাউকে তা শিখিয়েছ, অথবা তুমি তোমার গায়বী ইলমে নিজের নিকট গোপন রেখেছ, তুমি কুরআনকে আমার হৃদয়ের বসন্ত কর, আমার বক্ষের জ্যোতি কর, আমার দুশ্চিন্তা দূর করার এবং আমার উদ্বেগ চলে যাওয়ার কারণ বানিয়ে দাও। *(মুসনাদে আহমদ ১/৩৯১)*

মানুষের জীবনে তাঁর ফায়সালা নিশ্চয় অমোঘ। তিনি বান্দার জন্য ফায়সালা করেন, তা তার মঙ্গলের জন্য করেন। তাই বাহ্যতঃ কাঙ্ক্ষিত ও বাঞ্ছিতের প্রতিকূল হলেও ধৈর্যধারণ করতে হয়। মাদ্য়ানবাসীদেরকে তাদের নবী শুআইব ﷺ বলেছিলেন,

{وَإِن كَانَ طَآئِفَةٌ مِّنكُمْ آمَنُواْ بِالَّذِي أُرْسِلْتُ بِهِ وَطَآئِفَةٌ لَّمْ يْؤْمِنُواْ فَاصْبِرُواْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ بَيْنَنَا وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ} (٨٧) سورة الأعراف

অর্থাৎ, আমি যা দিয়ে (আল্লাহর পক্ষ হতে) প্রেরিত হয়েছি, তাতে যদি তোমাদের একটি দল বিশ্বাস করে এবং একটি দল বিশ্বাস না করে, তাহলে তোমরা ধৈর্য ধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে ফায়সালা ক'রে দেন, আর তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী।' (আ'রাফ ঃ ৮৭)

মহান আল্লাহ তাঁর শেষনবীকে নির্দেশ ও সান্ত্বনা দিয়ে বলেছিলেন,

{وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَاصْبِرْ حَتَّى يَحْكُمَ اللّهُ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ} (١٠٩) سورة يونس

অর্থাৎ, তোমার প্রতি যা প্রত্যাদেশ হয়েছে তুমি তার অনুসরণ কর এবং আল্লাহর ফায়সালা না আসা পর্যন্ত ধৈর্য ধারণ কর। আর তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ফায়সালাদাতা। *(ইউনুস ঃ ১০৯)*

বিনয়্যামীনকে ইউসুফ ﷺ আটক ক'রে রাখলে তাঁর বড় ভাই অন্য ভাইদেরকে বলেছিলেন,

{فَلَمَّا اسْتَيْأَسُواْ مِنْهُ خَلَصُواْ نَجِيًّا قَالَ كَبِيرُهُمْ أَلَمْ تَعْلَمُواْ أَنَّ أَبَاكُمْ قَدْ أَخَذَ عَلَيْكُم مَّوْثِقًا مِّنَ اللّهِ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطتُمْ فِي يُوسُفَ فَلَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَّىَ يَأْذَنَ لِي أَبِي أَوْ يَحْكُمَ اللّهُ لِي وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ } (٨٠) سورة يوسف

অর্থাৎ, যখন তারা ইউসুফের নিকট হতে সম্পূর্ণ নিরাশ হল, তখন তারা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগল। ওদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল সে বলল, 'তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট হতে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে ত্রুটি করেছিলে। সুতরাং আমি কিছুতেই এই দেশ ত্যাগ করব না, যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ আমার জন্য কোন ফায়সালা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী। (ইউসুফ ঃ ৮০)

মহান আল্লাহ তাঁর শেষ নবীকে আদেশ দিয়ে বলেন,

{قُلْ إِنِّي عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَكَذَّبْتُم بِهِ مَا عِندِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ يَقُصُّ الْحَقَّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ} (٥٧) سورة الأنعام

অর্থাৎ, বল, 'আমি আমার প্রতিপালকের স্পষ্ট প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত অথচ তোমরা ঐটিকে মিথ্যাজ্ঞান করেছ। তোমরা যা সত্বর চাচ্ছ, তা আমার নিকট নেই। কর্তৃত্ব তো আল্লাহরই; তিনি সত্য বিবৃত করেন এবং তিনি সর্বশ্রেষ্ঠ ফায়সালাকারী।' *(আনআম ঃ ৫৭)*

তাঁর ফায়সালা সকল সৃষ্টিকে মেনে চলতে হয়। আপনি স্বদেশে মহাসুখে আছেন, তাঁর ফায়সালা। আমি বিদেশে মহাদুঃখে আছি, তাঁর ফায়সালা। জয়-পরাজয়, সুখ-দুঃখ, শান্তি-অশান্তি, উত্থান-পতন, উন্নতি-অবনতি, ধনবত্তা-দারিদ্র্য, স্বামী-ভাগ্য, স্ত্রী-ভাগ্য, সন্তানবত্তা-সন্তানহীনতা ইত্যাদি---সবই তাঁর ফায়সালা। এ ফায়সালা না মেনে কি কারো উপায় আছে?

সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী

বিপদে-আপদে, বালা-মুসীবতে ও যুদ্ধের ময়দানে সাহায্যকারী কে?

কোন শক্তি নয়, কোন বুযুর্গ নয়, কোন তাবীয-কবচ নয়, বরং একমাত্র মহান আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{بَلِ اللّهُ مَوْلاَكُمْ وَهُوَ خَيْرُ النَّاصِرِينَ} (١٥٠) سورة آل عمران

অর্থাৎ, আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী। (আলে ইমরান ঃ ১৫০)

শক্তির আতিশয্য ও সংখ্যাধিক্যই মুসলিমদের বিজয় আনতে পারে না। আল্লাহর সাহায্য না হলে, কোন সৈন্যবাহিনী যুদ্ধে জয়লাভ করতে পারে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَمَّنْ هَذَا الَّذِي هُوَ جُندٌ لَّكُمْ يَنصُرُكُم مِّن دُونِ الرَّحْمَنِ إِنِ الْكَافِرُونَ إِلَّا فِي غُرُورٍ } (٢٠)

অর্থাৎ, পরম দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের এমন কোন সৈন্যবাহিনী আছে কি, যারা তোমাদের সাহায্য করবে? অবিশ্বাসীরা তো ধোঁকায় রয়েছে। (মুল্ক ঃ ২০)

যে মহান আল্লাহ বদর-উহুদ-খন্দকে সাহায্য করেছেন, তিনি মুসলিমদেরকে সকল স্থানে সাহায্য তথা বিজয়ী করবেন। তবে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن تَنصُرُوا اللَّهَ يَنصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ} (٧) سورة محمد

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহর (দ্বীনের) সাহায্য কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করবেন, এবং তোমাদের পা দৃঢ়-প্রতিষ্ঠিত রাখবেন। (মুহাম্মাদ ঃ ৭)

আর এ কথা বিদিত যে,

{إِن يَنصُرْكُمُ اللَّهُ فَلاَ غَالِبَ لَكُمْ وَإِن يَخْذُلْكُمْ فَمَن ذَا الَّذِي يَنصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكِّلِ الْمُؤْمِنُونَ} (١٦٠) سورة آل عمران

অর্থাৎ, আল্লাহ তোমাদেরকে সাহায্য করলে কেউই তোমাদের উপর বিজয়ী হতে পারবে না। আর তিনি তোমাদের সাহায্য না করলে তিনি ছাড়া আর কে আছে, যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? আর বিশ্বাসিগণের উচিত, কেবল আল্লাহরই উপর নির্ভর করা। (আলে ইমরান ঃ ১৬০)

অবিনশ্বর ও চিরস্থায়ী

এ বিশ্বের সব কিছু নশ্বর। অবিনশ্বর কেবল মহান স্রষ্টার সত্তা। এ বিশ্বের সব কিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। অবশিষ্ট থাকবে কেবল মহান আল্লাহর সত্তা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ (٢٦) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ} (٢٧) سورة الرحمن

অর্থাৎ, ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে সমস্তই নশ্বর। অবিনশ্বর শুধু তোমার মহিমময়, মহানুভব প্রতিপালকের মুখমন্ডল (সত্তা)। (রাহমান ঃ ২৬-২৭)

{وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্যকে ডেকো না, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই । তাঁর মুখমন্ডল ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (ক্বাস্বাস্ ঃ ৮৮)

মহান আল্লাহই প্রকৃত প্রতিপালক এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ও অবিনশ্বর। এ কথাই ফিরআউনকে বলেছিল মূসা ﷺ-এর সম্প্রদায়,

{إِنَّا آمَنَّا بِرَبِّنَا لِيَغْفِرَ لَنَا خَطَايَانَا وَمَا أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى} (٧٣) طـه

অর্থাৎ, আমরা আমাদের প্রতিপালকের প্রতি বিশ্বাস করেছি; যাতে তিনি আমাদের পাপরাশি এবং তুমি আমাদেরকে যে জাদু করতে বাধ্য করেছিলে (তার পাপ) ক্ষমা ক'রে দেন। আর আল্লাহই শ্রেষ্ঠতম ও অবিনশ্বর।' (ত্বা-হা ঃ ৭৩)

এ সংসার ক্ষণস্থায়ী। ইহকালের জীবন অস্থায়ী। কিন্তু পরকালের জীবন চিরস্থায়ী। এ জীবনের দিনগুলিকে সংখ্যা দিয়ে গনা যেতে পারে। কিন্তু পরকালের দিনগুলিকে কোন সংখ্যা দিয়ে গণনা করা সম্ভব নয়। অনন্ত কালের সে জীবন চির সুখময় অথবা চির দুঃখময়। সুতরাং যদি কেউ পরকালের জীবন সুখময় করতে পারে, তাহলে ইহকালের জীবনে দুঃখ পেলেও তাতে নিজেকে পরাজিত মনে করা উচিত নয়, উচিত নয় কাফেরের সুখময় জীবন দেখে লোভ অথবা হিংসা করা, উচিত নয় তাদের পার্থিব আয়-উন্নতি দেখে আক্ষেপ ও আফসোস করা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَى} (١٣١) سورة طـه

অর্থাৎ, আমি তাদের বিভিন্ন শ্রেণীকে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য-স্বরূপ ভোগ-বিলাসের যে উপকরণ দিয়েছি, তার প্রতি তুমি কখনোও তোমার চক্ষুদ্বয় প্রসারিত করো না। তোমার প্রতিপালকের জীবিকাই উৎকৃষ্টতর ও স্থায়ী। (ত্বাহা ঃ ১৩১)

আল্লাহ-ওয়ালা অথবা আল্লাহ-ভোলা যে কোন বান্দাকেই দুনিয়ার সুখ-সম্পদ দেওয়া হয়, তা কেবল কিছু দিনকার ভোগ্য মাত্র। চির ভোগের সম্পদ আছে পরকালে। ইহকালে ভোগের সম্পদ না পেলেও পরকালে ভোগের জন্য আমল ক'রে যেতে হবে। কারণ আজ যা রোপণ করা হবে, কাল তা কর্তন করা যাবে। তাই পার্থিব জীবনের ভোগ-বিলাসকে প্রাধান্য না দিয়ে পারলৌকিক জীবনের সুখসামগ্রী সংগ্রহে মনোনিবেশ করতে হবে।

মানুষ দুনিয়ার সুখ-সম্ভোগের জন্য বহু কিছু করে, অথচ তা কেবল ষাট-সত্তর অথবা আশি-একশ বছরের জন্য। কিন্তু পরকাল হল অনন্ত কালের জন্য। তাহলে সে কালের সুখ-সম্ভোগের জন্য কত করা উচিত?

দুনিয়া সাময়িক মুসাফিরখানা। আখেরাত চিরস্থায়ী আবাসস্থল। জ্ঞানী লোকেরা অস্থায়ী মুসাফিরখানাকে নানা বিলাসসামগ্রী দিয়ে সাজায় না। তারা সাজায় আসল বাসস্থান ও চিরস্থায়ী ঘরকে।

ইহকালের চাকচিক্য দেখে কারো ভুলে যাওয়া উচিত নয়, যেহেতু পরকালের চাকচিক্য তুলনাবিহীন সুন্দর এবং অন্তহীন দীর্ঘ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ}

অর্থাৎ, তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও সৌন্দর্য এবং যা আল্লাহর নিকট আছে, তা উত্তম এবং স্থায়ী । তোমরা কি অনুধাবন করবে না? (ক্বাস্বাস্ ঃ ৬০)

{فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} (٣٦) سورة الشورى

অর্থাৎ, বস্তুতঃ তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা পার্থিব জীবনের ভোগ; কিন্তু আল্লাহর নিকট যা আছে, তা উত্তম ও চিরস্থায়ী তাদের জন্য, যারা বিশ্বাস করে ও তাদের প্রতিপালকের ওপর নির্ভর করে। (শূরা ঃ ৩৬)

{بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا (١٦) وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى} (١٧) سورة الأعلى

অর্থাৎ, বরং তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়ে থাক। অথচ পরকালের জীবনই উত্তম ও চিরস্থায়ী। (আ'লা ঃ ১৬-১৭)

{مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللّهِ بَاقٍ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُواْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}

অর্থাৎ, তোমাদের কাছে যা আছে, তা নিঃশেষ হবে এবং আল্লাহর কাছে যা আছে, তা চিরস্থায়ী থাকবে। যারা ধৈর্য ধারণ করে, আমি নিশ্চয়ই তাদেরকে তাদের কর্ম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দান করব। (নাহল ঃ ৯৬)

অনুরূপ পরকালের দুঃখ ও শাস্তিও কাফেরদের জন্য চিরস্থায়ী। কোন কাফের দুনিয়ায় যত কঠিন ও দীর্ঘ দুঃখ-কষ্টই পাক, সে তুলনায় আখেরাতে আরো অধিক বরং চিরস্থায়ী দুঃখ-কষ্ট পাবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى} (١٢٧)

অর্থাৎ, আর এইভাবেই আমি তাকে প্রতিফল দেব, যে সীমালংঘন করেছে ও তার প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করেনি। আর পরকালের শাস্তি অবশ্যই কঠোরতর ও চিরস্থায়ী।' (ত্বা-হা ঃ ১২৭)

কাফের দুনিয়াতে যত বেশিই দুঃখ-কষ্ট পাক না কেন, আখেরাতের দুঃখ-কষ্টের তুলনায় দুনিয়া তার জন্য বেহেশ্ত স্বরূপ। পক্ষান্তরে একজন মু'মিন দুনিয়াতে যত বেশিই সুখ-শান্তি পাক না কেন, আখেরাতের সুখ-শান্তির তুলনায় দুনিয়া তার জন্য দোযখ স্বরূপ। সুতরাং জ্ঞানীর উচিত, অস্থায়ী জীবনের উপর চিরস্থায়ী জীবনকে প্রাধান্য দেওয়া।

প্রবলতম শক্তিশালী কে?

প্রবলতম শক্তিশালী কি কাফেররা, যাদের পরমাণু-অস্ত্র আছে? নাকি সেই সন্ত্রাসীরা যাদের আছে অনেক নাশকতা-শক্তি, যারা পরাশক্তির কাছেও পরাজয় স্বীকার করে না? তাদের থেকে বেশি শক্তিমান কি কেউ নেই?

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّهِ لاَ تُكَلَّفُ إِلاَّ نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَسَى اللّهُ أَن يَكُفَّ بَأْسَ الَّذِينَ كَفَرُواْ وَاللّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنكِيلاً} (٨٤) سورة النساء

অর্থাৎ, সুতরাং তুমি আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর। (এ ব্যাপারে) কেবল তুমিই ভারপ্রাপ্ত। আর

বিশ্বাসীদেরকে উদ্বুদ্ধ কর। সম্ভবতঃ আল্লাহ অবিশ্বাসীদের শক্তি চূর্ণ ক'রে (যুদ্ধ বন্ধ ক'রে) দেবেন। আল্লাহ শক্তিতে প্রবলতর ও শাস্তিদানে কঠোরতর। (নিসা ঃ ৮৪)

মহান আল্লাহর শক্তি প্রবলতর। তিনি নিজ শক্তি প্রদর্শন করলে কোন শক্তিই ধোপে টিকে না। তিনিই সর্বশক্তিমান, তিনিই সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। তাঁর শক্তি অপার অসীম। তাঁর শক্তির উপকরণ অগণিত। তিনি বলেন,

{مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ} (٧٤) سورة الحج

অর্থাৎ, তারা আল্লাহর যথোচিত মর্যাদা উপলব্ধি করে না; আল্লাহ নিশ্চয়ই চরম ক্ষমতাবান, মহাপরাক্রমশালী। (হাজ্জ ঃ ৭৪)

{وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا} (٢٥) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, আল্লাহ অবিশ্বাসীদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় বিফল মনোরথ হয়ে ফিরে যেতে বাধ্য করলেন এবং যুদ্ধে বিশ্বাসীদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট হলেন। আর আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (আহ্যাব ঃ ২৫)

{كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ} (٢١) سورة المجادلة

অর্থাৎ, আল্লাহ লিপিবদ্ধ করেছেন যে, আমি এবং আমার রসূলগণ অবশ্যই বিজয়ী হব। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিমান, পরাক্রমশালী। (মুজাদালাহ ঃ ২১)

{وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا} (٧) سورة الفتح

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহই পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (ফাত্হ ঃ ৭)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَاءتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا} (٩) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর, যখন শত্রুবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে সমাগত হয়েছিল এবং আমি ওদের বিরুদ্ধে ঝড় এবং এমন সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যা তোমরা দেখতে পাওনি। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ তার দ্রষ্টা। (আহ্যাব ঃ ৯)

সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক

সর্বশ্রেষ্ঠ বিচার কাকে বলে, সে কথা কবির ভাষায় শুনুন,

'দন্ডদাতা কাঁদে যবে সমান আঘাতে
সর্বশ্রেষ্ঠ সে বিচার। যার তরে প্রাণ
কোন ব্যথা নাহি পায়, তারে দন্ড দান

প্রবলের অত্যাচার। যে দন্ডবেদনা
পুত্রেরে পারো না দিতে, সে কারে দিয়ো না।
যে তোমার পুত্র নহে তারো পিতা আছে
মহা অপরাধী হবে তুমি তার কাছে,
বিচারক। শুনিয়াছি, বিশ্ববিধাতার
সবাই সন্তান মোরা, পুত্রের বিচার
নিয়ত করেন তিনি আপনার হাতে
নারায়ণ, ব্যথা দেন, ব্যথা পান সাথে,
নতুবা বিচারে তাঁর নাই অধিকার।'

এ কথা সত্য যে, বিশ্ববিধাতাই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক। তিনি পরম করুণাময়, অতি দয়াবান। তিনি বলেছেন,

{إِنَّ اللّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (١٤٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি অতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। (বাক্বারাহ ঃ ১৪৩)

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاء أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ} (٦٥) سورة الحج

অর্থাৎ, তুমি কি লক্ষ্য কর না যে, আল্লাহ তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার সমস্তকে এবং তাঁর নির্দেশে সমুদ্রে বিচরণশীল নৌযানসমূহকে। তিনিই আকাশকে ধরে রাখেন, যাতে ওটা পৃথিবীর উপর তাঁর অনুমতি ছাড়া পতিত না হয়। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। (হাজ্জ ঃ ৬৫)

{مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاء فَعَلَيْهَا وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ} (٤٦) سورة فصلت

অর্থাৎ, যে সৎকাজ করে, সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেউ মন্দ কাজ করলে তার প্রতিফল সে নিজেই ভোগ করবে। আর তোমার প্রতিপালক তাঁর দাসদের প্রতি কোন যুলুম করেন না। (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৪৬, আরো দেখুন ঃ আলে ইমরান ঃ ১৮২, আনফাল ঃ ৫১, হাজ্জ ঃ ১০, ক্বাফ ঃ ২৯)

{إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا} (٤٠)

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ অণু পরিমাণও যুলুম করেন না এবং তা পুণ্যকার্য হলে, আল্লাহ তাকে বহুগুণে বর্ধিত করেন এবং আল্লাহ তাঁর নিকট হতে মহাপুরস্কার প্রদান করেন। (নিসা ঃ ৪০)

{مَن جَاء بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا وَمَن جَاء بِالسَّيِّئَةِ فَلاَ يُجْزَى إِلاَّ مِثْلَهَا وَهُمْ لاَ يُظْلَمُونَ}

অর্থাৎ, কেউ সৎকাজ করলে, সে তার দশগুণ (প্রতিদান) পাবে এবং কেউ অসৎকাজ করলে, তাকে শুধু তার সমপরিমাণ প্রতিফলই দেওয়া হবে। আর তারা অত্যাচারিত হবে না। (আন্আম ঃ ১৬০)

{إِنَّ اللّهَ لاَ يَظْلِمُ النَّاسَ شَيْئًا وَلَكِنَّ النَّاسَ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ} (٤٤) سورة يونس

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ মানুষের প্রতি কোন যুলুম করেন না, পরন্তু মানুষ নিজেরাই নিজেদের প্রতি যুলুম করে থাকে। (ইউনুস ঃ ৪৪)

{وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ وَيَقُولُونَ يَا وَيْلَتَنَا مَالِ هَذَا الْكِتَابِ لاَ يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلاَ كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا وَلاَ يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا} (٤٩)

অর্থাৎ, সেদিন (প্রত্যেকের হাতে) রাখা হবে আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে ভীত-সন্ত্রস্ত; তারা বলবে, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের! এ কেমন গ্রন্থ! এ তো ছোট-বড় কিছুই বাদ দেয়নি; বরং এ সমস্ত হিসাব রেখেছে!' তারা তাদের কৃতকর্ম সম্মুখে উপস্থিত পাবে; আর তোমার প্রতিপালক কারো প্রতি যুলুম করেন না। (কাহফ ঃ ৪৯)

বিশ্ববিধাতার বিচারে কোন যুলুম থাকতে পারে না। যেহেতু তিনি পরম করুণাময়। 'সমুদ্রের তল আছে পার আছে তার, অপার অগাধ মাতৃস্নেহপারাবার।' কিন্তু তাঁর করুণা মাতৃস্নেহ থেকেও অনেক বেশি, তুলনাহীন, অসীম, অনুপম।

উমার ইবনে খাত্ত্বাব ﷺ বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট কিছু সংখ্যক বন্দী এল। তিনি দেখলেন যে, বন্দীদের মধ্যে একজন মহিলা (তার শিশুটি হারিয়ে গেলে এবং স্তনে দুধ জমে উঠলে বাচ্চার খোঁজে অস্থির হয়ে) দৌড়াদৌড়ি করছে। হঠাৎ সে বন্দীদের মধ্যে কোন শিশু পেলে তাকে ধরে কোলে নিয়ে (দুধ পান করাতে লাগল। অতঃপর তার নিজের বাচ্চা পেয়ে গেলে তাকে বুকে-পেটে লাগিয়ে) দুধ পান করাতে লাগল। রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তোমরা কি মনে কর যে, এই মহিলা তার সন্তানকে আগুনে ফেলতে পারে?" আমরা বললাম, 'না, আল্লাহর কসম!' তারপর তিনি বললেন,

« لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا ».

"এই মহিলাটি তার সন্তানের উপর যতটা দয়ালু, আল্লাহ তার বান্দাদের উপর তার চেয়ে অধিক দয়ালু।" (বুখারী ও মুসলিম)

সুতরাং তাঁর বিচারে কোন অত্যাচার বা স্বেচ্ছাচারিতা থাকতে পারে না। তাই দুনিয়াতেও তাঁর বিচারই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচার।

এ কথা স্বীকার ক'রে সর্বপ্রথম রসূল নূহ ﵇ নিজ প্রতিপালককে ডেকে বলেছিলেন,

{رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ} (٤٥) سورة هود

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! আমার এই পুত্রটি আমারই পরিবারভুক্ত। আর তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং তুমি সমস্ত বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক। (হূদ ঃ ৪৫)

এ কথার স্বীকারোক্তি দিয়ে ইয়াকূব ﵇ তাঁর পুত্রদেরকে বলেছিলেন,

{وَقَالَ يَا بَنِيَّ لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ} (٦٧) سورة يوسف

অর্থাৎ, (সে (ইয়াকূব) বলল, 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা (শহরের) এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না; বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আমি

তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না। বিধান আল্লাহরই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করলাম এবং যারা নির্ভর করতে চায় তারা আল্লাহরই উপর নির্ভর করুক।' (ইউসুফ ঃ ৬৭)

এ কথার সমর্থন ক'রে ইউসুফ ﷺ কারা-সঙ্গীদ্বয়কে বলেছিলেন,

{إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبُدُواْ إِلاَّ إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ}

অর্থাৎ, বিধান দেওয়ার অধিকার শুধু আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া আর কারোই উপাসনা করবে না। এটাই সরল-সঠিক দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়। (ইউসুফ ঃ ৪০)

মহান সৃষ্টিকর্তা বিধান ও বিচারে অদ্বিতীয়। তিনি মানুষের হিসাব গ্রহণে অতি তৎপর। তিনি বলেছেন,

{ثُمَّ رُدُّواْ إِلَى اللّهِ مَوْلاَهُمُ الْحَقِّ أَلاَ لَهُ الْحُكْمُ وَهُوَ أَسْرَعُ الْحَاسِبِينَ} (٦٢) سورة الأنعام

অর্থাৎ, অতঃপর তাদের আসল প্রভুর দিকে তারা আনীত হয়। জেনে রাখ, ফায়সালা তো তাঁরই এবং হিসাব গ্রহণে তিনিই সর্বাপেক্ষা তৎপর। (আন্আম ঃ ৬২)

তিনি আরো বলেছেন,

{وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ} (٧٠)

অর্থাৎ, তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোন (সত্য) উপাস্য নেই, ইহকাল ও পরকালে সকল প্রশংসা তাঁরই এবং বিধান তাঁরই; তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। (ক্বাস্বাস্ব ঃ ৭০)

{وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ}

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহর সঙ্গে অন্য উপাস্যকে ডেকো না, তিনি ব্যতীত অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই । তাঁর মুখমন্ডল ব্যতীত সমস্ত কিছুই ধ্বংসশীল। বিধান তাঁরই এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। (ক্বাস্বাস্ব ঃ ৮৮)

তিনি মানুষকে প্রশ্ন করছেন,

{أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ} (٨) سورة التين

অর্থাৎ, আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক নন? (তীন ঃ ৮)

মানুষ যেন তার উত্তরে বলছে, 'না-না। মানুষের সৃষ্টিকর্তার বিচার সর্বশ্রেষ্ঠ নয়। বরং মানুষের সুখের জন্য মানুষের রচিত সংবিধান অনুযায়ী বিচারই সর্বশ্রেষ্ঠ বিচার।' কিন্তু মহান আল্লাহ বিশ্বাসী মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন,

{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (٥٠) سورة المائدة

অর্থাৎ, তবে কি তারা প্রাক্-ইসলামী (জাহেলী) যুগের বিচার-ব্যবস্থা পেতে চায়? খাঁটি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর? (মায়িদাহ ঃ ৫০)

সবচেয়ে বেশি ঈর্ষাবান

এখানে ঈর্ষা বলতে সেই ঈর্ষাকে বুঝাতে চাচ্ছি, যা সাধারণতঃ সুপুরুষদের হয়ে থাকে। নিজের স্ত্রীকে অন্যের সাথে ফষ্টিনষ্টি করতে দেখলে অথবা প্রেমালাপ বা হাসাহাসি করতে দেখলে গায়ে যে জ্বালা ধরে, সেই ঈর্ষাই এখানে উদ্দিষ্ট।

বহু পুরুষ আছে, যারা নিজ স্ত্রী-কন্যার পর্দাহীনতা ও নোংরামীর ব্যাপারে ঈর্ষাহীন। একটি মেড়া যেমন ঈর্ষাহীন হয়, অনুরূপ সে 'মাটির মানুষ' বা তথাকথিত 'উদার' মানুষ হয়ে স্ত্রীর অন্যাসক্তি দেখেও কিছু মনে নেয় না। নিজ স্ত্রী-কন্যার অশ্লীলতায় সম্মত থাকে। এই জন্য তাকে 'মেড়া বা ভেড়া পুরুষ'ও বলা হয়। এমন পুরুষদের অনুরূপ 'উদার' সমাজ ছাড়া অন্য কোথাও মর্যাদা থাকে না। আর এমন ঈর্ষা ও আত্মমর্যাদাহীন পুরুষদের কোন মর্যাদা আল্লাহর কাছেও নেই। রসূল ﷺ বলেছেন, "মেড়া ব্যক্তির দিকে আল্লাহ কিয়ামতে তাকিয়েও দেখবেন না।" *(নাসাঈ ২৫৬১ নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "তিন ব্যক্তি বেহেশ্তে যাবে না; পিতা-মাতার অবাধ্য ছেলে, মেড়া পুরুষ এবং পুরুষের বেশধারিণী মহিলা।" (নাসাঈ, হাকেম ১/৭২, বাযযার, সহীহুল জামে' ৩০৬৩নং)

মানুষের যেমন ঈর্ষা আছে, তেমনি আল্লাহরও ঈর্ষা আছে। তবে উভয় ঈর্ষার মধ্যে কোন মিল নেই, কোন তুলনা নেই। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إنَّ اللّه تَعَالَى يَغَارُ ، وَغَيرَةُ اللّه تَعَالَى ، أنْ يَأتِيَ المَرْءُ مَا حَرَّمَ اللّه عَلَيهِ)). متفق عَلَيهِ

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ঈর্ষান্বিত হন। আর আল্লাহ ঈর্ষান্বিত হন তখন, যখন কোন মানুষ এমন কাজ ক'রে ফেলে, যা তিনি তার উপর হারাম করেছেন। *(বুখারী-মুসলিম)*

বরং মহান আল্লাহর ঈর্ষা সবার চাইতে বেশি। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَغْيَرُ مِنْ اللَّهِ أَنْ يَزْنِيَ عَبْدُهُ أَوْ تَزْنِيَ أَمَتُهُ يَا أُمَّةَ مُحَمَّدٍ وَاللَّهِ لَوْ تَعْلَمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلبَكَيْتُمْ كَثِيرًا)).

অর্থাৎ, হে মুহাম্মাদের উম্মত! আল্লাহ অপেক্ষা বেশি ঈর্ষাবান কেউ নেই যে, তার ক্রীতদাস অথবা দাসী ব্যভিচার করবে (আর সে তা সহ্য ক'রে নেবে)। হে মুহাম্মাদের উম্মত! আল্লাহর কসম! আমি যা জানি যদি তোমরা তা জানতে, তাহলে অল্প হাসতে এবং বেশি কাঁদতে। *(বুখারী ১০৪৪, মুসলিম ২১২৭নং)*

একদা সা'দ বিন উবাদাহ বললেন, 'যদি কোন ব্যক্তিকে আমার স্ত্রীর সাথে (ব্যভিচারে লিপ্ত) দেখি, তাহলে তরবারির ধারালো দিকটা দিয়ে তাকে আঘাত করব।' এ কথা নবী ﷺ-এর কাছে পৌঁছলে তিনি বললেন,

((أَتَعْجَبُونَ مِنْ غَيْرَةِ سَعْدٍ فَوَاللَّهِ لأَنَا أَغْيَرُ مِنْهُ وَاللَّهُ أَغْيَرُ مِنِّى مِنْ أَجْلِ غَيْرَةِ اللَّهِ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ

مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ شَخْصَ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ)).

অর্থাৎ, তোমরা কি সা’দের ঈর্ষায় আশ্চর্যান্বিত হও? নিশ্চয় আমি ওর থেকে বেশি ঈর্ষাবান এবং আল্লাহ আমার থেকেও বেশি ঈর্ষাবান। আল্লাহর ঈর্ষার জন্য তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য সকল অশ্লীলতা হারাম করেছেন। আল্লাহর চেয়ে বেশি ঈর্ষাবান কেউ নেই। *(বুখারী, মুসলিম ৩৮-৩৭নং)*

« لاَ أَحَدٌ أَغْيَرَ مِنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيْهِ الْمَدْحُ مِنَ اللَّهِ وَلِذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ ».

অর্থাৎ, আল্লাহর চেয়ে বেশি ঈর্ষাবান কেউ নেই। আল্লাহর ঈর্ষার জন্য তিনি গুপ্ত ও প্রকাশ্য সকল অশ্লীলতা হারাম করেছেন। আল্লাহর চেয়ে বেশি ঈর্ষাবান কেউ নেই। আল্লাহর চাইতে বেশি আত্মপ্রশংসা-প্রিয় অন্য কেউ নেই। এই জন্য তিনি নিজের প্রশংসা নিজে করেছেন।” (মুসলিম ৭১৬৯নং)

তিনি আরো বলেছেন,

« الْمُؤْمِنُ يَغَارُ وَاللَّهُ أَشَدُّ غَيْرًا ».

অর্থাৎ, মু’মিনের ঈর্ষা হয়। আর আল্লাহ সবচেয়ে বেশি কঠিন ঈর্ষাবান। (মুসলিম ৭১৭৫নং)

সুতরাং যে নারী-পুরুষেরা বিবাহ-বহির্ভূত সম্পর্ক কায়েম ক’রে যৌন-মিলন করে, তারা জেনে রাখুক যে, মহান আল্লাহ তাঁর ঈর্ষায় দারুন কঠিন। এই জন্য তিনি বিবাহিত ব্যভিচারী ও ব্যভিচারিণীর শাস্তির বিধান দিয়েছেন, পাথর ছুড়ে হত্যা। আর অবিবাহিত নারী-পুরুষের শাস্তির বিধান দিয়েছেন একশত বেত্রাঘাত ও দেশান্তর। মধ্য জগতে শাস্তি রেখেছেন আগুনের চুল্লিতে উলঙ্গ অবস্থায় অবস্থান। আর জাহান্নামের শাস্তি আরো কঠিন।

ঈর্ষার কারণেই তিনি নির্দেশ দিয়ে বলেছেন,

{وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ} (١٥١) سورة الأنعام

অর্থাৎ, প্রকাশ্যে হোক কিংবা গোপনে হোক, তোমরা অশ্লীল আচরণের নিকটবর্তীও হয়ো না এবং আল্লাহ যার হত্যা নিষিদ্ধ করেছেন যথার্থ কারণ ব্যতীত তাকে হত্যা করো না। তোমাদেরকে তিনি এ নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তোমরা অনুধাবন কর। (আন্‌আম ঃ ১৫১)

তিনি আরো বলেছেন,

{وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً} (٣٢) سورة الإسراء

অর্থাৎ, তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না, নিশ্চয় তা অশ্লীল ও নিকৃষ্ট আচরণ। (বানী ইস্রাঈল ঃ ৩২)

সর্বোত্তম কথা কার?

সর্বশ্রেষ্ঠ যিনি, সবার চেয়ে বড় যিনি, সবচেয়ে মহান যিনি, অবশ্যই তাঁর কথাই সর্বোত্তম।

অনুরূপভাবে যিনি সেই সর্বমহান সত্তার প্রতি আহবান করেন, সেই সর্বসুন্দর সত্তার প্রতি মানুষকে পথপ্রদর্শন করেন, সেই সর্বশক্তিমান সত্তার সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীনের প্রতি মানুষকে দাওয়াত দেন, যিনি সৃষ্টির সেরা মানুষকে প্রকৃত স্রষ্টার দিকে ফিরিয়ে আনার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালান, যিনি মানুষের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক সার্বিক মঙ্গল চান, যিনি মানুষকে দোযখ-যন্ত্রণা থেকে মুক্তি দিয়ে বেহেশ্তের চিরসুখ দান করতে আপ্রাণ প্রয়াস চালান, যিনি দুনিয়া ও আখেরাতে চিরসুখের সন্ধান দিতে ঐকান্তিক ইচ্ছার সাথে মানুষকে সৎকাজে আদেশ ও মন্দকাজে বাধা দান করেন, যিনি কুরআন-হাদীসের বাণী শুনিয়ে পথভ্রষ্ট মানুষকে পথের দিশা দেন, তাঁর চাইতে আর কার কথা উত্তম হতে পারে?

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (٣٣) فصلت

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করে, সৎকাজ করে এবং বলে, ‘আমি তো আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)’ তার অপেক্ষা কথায় উত্তম আর কোন্ ব্যক্তি? (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩৩)

যিনি মহান আল্লাহর প্রতি আহবান করবেন, তিনি অবশ্যই সৎকাজ করবেন। আর কোন সৎকাজ তখনই ‘সৎ’ হবে, যখন তার কাজী হবে মুসলিম। যেহেতু ঈমান ছাড়া কোনও সৎকাজ ‘সৎ’ নয়। অবশ্য সেই সাথে থাকবে কাজের মধ্যে আন্তরিকতা তথা সুমহান আল্লাহর নির্ভেজাল সন্তুষ্টি-কামনা এবং তাঁর রসূল ﷺ কর্তৃক নির্দেশিত পদ্ধতি।

নিশ্চয় তাঁর কথাই সর্বোত্তম, যাঁর কথায় আমল ক’রে মানুষ সত্যের দিশা পেয়ে সওয়াব উপার্জন করতে থাকলে তিনিও অনুরূপ সমান সওয়াব লাভ করতে থাকেন!

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি সৎপথের দিকে আহবান করে (দাওয়াত দেয়), সে ব্যক্তির ঐ পথের অনুসারীদের সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হবে। এতে তাদের সওয়াব থেকে কিছু মাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি অসৎ পথের দিকে আহবান করে, সেই ব্যক্তির ঐ পথের অনুসারীদের সমপরিমাণ গোনাহর ভাগী হবে। এতে তাদের গোনাহ থেকে কিছুমাত্র কম হবে না।” *(মুসলিম ২৬৭৪নং প্রমুখ)*

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর নিকট এসে যাচ্ঞা করল। তিনি বললেন, “আমার কাছে এমন কিছু নেই, যা আমি তোমাকে দান করব। তবে তুমি অমুকের নিকট যাও।” সে ঐ লোকটির নিকট গেল। লোকটি তাকে দান করল। এ দেখে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, “যে ব্যক্তি কল্যাণের প্রতি পথনির্দেশ করে, তার জন্য ঐ কল্যাণ সম্পাদনকারীর সমপরিমাণ সওয়াব লাভ হয়।” *(ইবনে হিব্বান)*

অন্য বর্ণনায় আছে, “কল্যাণের প্রতি পথনির্দেশক কল্যাণ সম্পাদনকারীরই অনুরূপ।” *(বাযযার, সহীহ তারগীব ১১১নং)*

তাঁর কথা অবশ্যই সর্বোত্তম যিনি সুমহান সত্তার ইবাদতের জন্য, সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদতের জন্য মানুষকে দিবারাত্রে পাঁচ-পাঁচবার আহবান করেন। তাঁর থেকে আর কারো কথা বেশি উত্তম নয়, যিনি প্রত্যহ পাঁচবার মানুষকে বলেন, 'এসো নামাযের দিকে, এসো সাফল্যের দিকে।' যিনি সুউচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা দিয়ে বলেন, 'আল্লাহ সবার চেয়ে মহান। আল্লাহ ছাড়া কেউ (সত্য) উপাস্য নেই।'

তাঁর কথা অবশ্যই সর্বোত্তম, যিনি মাথা উঁচু ক'রে বলেন, 'আমি একজন মুসলিম। আমি আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণকারী।

আমি একজন বিশ্বাসী মুসলিম, আমি কোন অবিশ্বাসী নাস্তিক নই।

আমি একজন তাওহীদবাদী মুসলিম, আমি কোন মুশরিক নই। আমি মুনাফিক নই। আমি পৌত্তলিক নই।

আমি একজন মুসলিম, আমি একজন সৌভাগ্যবান। আমি ইয়াহুদী নই, আমি খ্রিস্টান নই, আমি কোন বেদ্বীন নই।

আমি মুসলিম, আমি কোন কাফের নই।

আমি মুসলিম, ইসলাম আমার অলঙ্কার, ঈমান আমার গর্ব। আমি কোন ধর্মহীন বেঈমান নই।

আমি মুসলিম, আমার সুউচ্চ শির। আমার উন্নত শির এক আল্লাহ ছাড়া আর কারো সম্মুখে নত হয় না।

আমি মুসলিম। আমার একমাত্র উপাস্য মহান আল্লাহ। কোন সৃষ্টি আমার উপাস্য, আরাধ্য ও পূজ্য নয়।

আমি মুসলিম। আমি সকল নবী-রসূলকে বিশ্বাস করি। আমি কেবল ইসলামের নবীর পথনির্দেশনা মেনে চলি।

আমি মুসলিম। আমি কেবল ইসলামের আইন মান্য করি।

আমি মুসলিম। আমি কেবল এক আল্লাহকে ভয় করি, তাঁরই প্রতি আশা ও ভরসা রাখি। আমি কেবল তাঁকেই আমার হৃদয়-মথিত ভালোবাসা ও ভক্তি নিবেদন করি। আমি মুসলিম।'

সবচেয়ে বেশি সত্যবাদী

মহান আল্লাহর সাথে কোন গুণে কোন সৃষ্টির কোন তুলনাই হয় না। তবুও 'সবচেয়ে বেশি' বলে অনেক গুণকে তিনি নিজেই উল্লেখ করেছেন। যে গুণ মানুষের কাছে পছন্দনীয়, সে গুণ মহান আল্লাহর আছে, তবে অতিশয় আছে। যেহেতু তাঁর গুণের কাছে মানুষের গুণ অতি নগণ্য।

মানুষ সত্যবাদী হয়। মহান আল্লাহ মানুষকে সত্যবাদী হতে উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু তাঁর মতো সত্যবাদী আর কে আছে? তিনি বলেছেন,

{اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لاَ رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ حَدِيثًا} (٨٧)

অর্থাৎ, আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন (সত্য) উপাস্য নেই। নিশ্চয়ই তিনি তোমাদেরকে শেষ বিচারের দিন একত্র করবেন --এতে কোন সন্দেহ নেই। আর কথায় আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী কে আছে? (নিসা ঃ ৮৭)

{وَالَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّهِ قِيلاً} (١٢٢) سورة النساء

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তাদেরকে বেহেশ্তে প্রবেশাধিকার দান করব; যার পাদদেশে নদীসমূহ প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। আর কে আছে আল্লাহ অপেক্ষা অধিক সত্যবাদী? (নিসা ঃ ১২২)

মহান আল্লাহ সত্যই বলেন। তিনি বলেছেন,

{قُلْ صَدَقَ اللّهُ فَاتَّبِعُواْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ} (٩٥) سورة آل عمران

অর্থাৎ, বল, 'আল্লাহ সত্য বলেছেন।' সুতরাং তোমরা একনিষ্ঠ ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ কর এবং সে অংশীবাদীদের দলভুক্ত ছিল না। (আলে ইমরান ঃ ৯৫)

তাঁর সকল কথা সত্য। তাঁর বাণী মিথ্যা হতে পারে না এবং 'কাফের' ছাড়া তাঁর বাণীকে কেউ অসত্য ধারণা করতে পারে না।

মহানবী ﷺ সে কথার সত্যায়ন ক'রে প্রায় ভাষণের শুরুতে আল্লাহর প্রশংসার পর বলতেন,

(أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ).

অর্থাৎ, অতঃপর (বলি যে,) নিশ্চয়ই সবচেয়ে বেশি সত্য বাণী আল্লাহর গ্রন্থ। (আহমাদ ১৪৩৩৪, নাসাঈ ১৫৭৮নং)

যিনি সত্য, তাঁর বাণীও সত্যতম ও শ্রেষ্ঠতম বাণী। বরং মহান সত্য আল্লাহর বাণী সবচেয়ে সত্য।

বহু হতভাগা মানুষ আছে, যারা এ বাণীতে বিশ্বাস করার সৌভাগ্য লাভ করেনি। বরং এমন হতভাগা আরো আছে, যারা সে বাণীকে সম্পূর্ণভাবে অথবা আংশিকভাবে মিথ্যাজ্ঞান ও অস্বীকার করে! অনেক যালেম তার বিরোধিতা করে এবং সমালোচনাও করে! নিজের শাকবেচা দাঁড়িপাল্লা নিয়ে পাহাড় অথবা সোনা ওজন করে!!

{وَالَّذِينَ كَفَرواْ وَكَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (٣٩) سورة البقرة

অর্থাৎ, আর যারা (কাফের) অবিশ্বাস করে ও আমার নিদর্শনকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তারাই অগ্নিবাসী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।'(বাক্বারাহ ঃ ৩৯)

সবচেয়ে সুন্দর বাণী

এ বিশ্বের মানুষ বহু বাণী শ্রবণ করেছে, বহু বাণী পাঠ করেছে, কিন্তু সেই বাণী অপেক্ষা বেশি সুন্দর ও শাশ্বত এমন কোন বাণী শ্রবণ করেনি ও পাঠ করেনি, যা খোদ মহান সৃষ্টিকর্তা নিজের ভাষায় বলেছেন এবং সর্বশ্রেষ্ঠ মাস রমযানে, সর্বশ্রেষ্ঠ রাত শবেকদরে,

সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান মক্কানগরীতে, সর্বশ্রেষ্ঠ ফিরিশ্‌তা জিবরীল মারফৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ মুহাম্মাদ ﷺ-এর উপরে অবতীর্ণ করেছেন।

যে অমিয়-বাণী জ্বিনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শ্রবণ ক'রে বলেছিল, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি। যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে; ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি।' (জ্বিন ঃ ১-২)

অর্থাৎ, আমরা এমন কুরআন শুনেছি যা ভাষার চমৎকারিত্ব ও সাহিত্য-শৈলীর দিক দিয়ে বড়ই বিস্ময়কর অথবা অনুদেশ-উপদেশের দিক দিয়ে বিস্ময়কর কিংবা বর্কতের দিক দিয়ে অতি আশ্চর্যজনক।

এই সেই অমিয় বাণী, যা শ্রবণ ক'রে উদার ও মুক্ত মনের কাফেররা ইসলাম গ্রহণ করেছিল।

অলীদ বিন মুগীরাহ কুরাইশের একজন নেতা ছিল। প্রভাব-প্রতিপত্তি ও বিষয়-বিভবের অধিপতি ছিল। দশ বা তারও অধিক পুত্রের পিতা ছিল। কিন্তু সে ছিল সংকীর্ণ ও অনুদার মনের। মুহাম্মাদ ও তাঁর সংস্কারের কথা সে মোটেই সহ্য করতে পারত না। একদা মহানবী ﷺ কুরআন পাঠ করছিলেন। অনিচ্ছা সত্ত্বেও অলীদের কর্ণকুহরে তা প্রবেশ করল। ভারী অবাক হল সে। তার মনে সুন্দরের পরশ লাগল। সে তার সম্প্রদায়ের কাছে গিয়ে বলল,

وَاللهِ لَقَدْ سَمِعْتُ مُحَمَّداً آنِفاً يَقُولُ كَلاَماً مَا هُوَ مِنْ كَلاَمِ الإِنْسِ ، ولاَ مِنْ كَلاَمِ الجِنِّ ، إِنَّ لَهُ لَحَلاَوَةً ، وَإِنَّ عَلَيْهِ لَطَلاَوَةً ، وَإِنَّ أَعْلاَهُ لَمُثْمِرٌ ، وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ ، وَإِنَّهُ يَعْلُو وَمَا يُعْلَى عَلَيْهِ.

অর্থাৎ, আল্লাহর কসম! একটু আগে মুহাম্মাদের কাছে কিছু বাক্য শুনলাম, তা মানবের বাণী নয়, দানবের বাণীও নয়। সত্যিই সে বাণীতে রয়েছে মধুরতা, তাতে রয়েছে মনোহারিত্ব, তার উর্ধ্বাংশ ফলদার (বৃক্ষ) এবং নিম্নাংশ মুশলধার (বৃষ্টি)। সে বাণী প্রবল। তা পরাজেয় নয়।

এমন শংসাবাক্য শুনে আবু জাহলের আশঙ্কা হল, অলীদ হয়তো মুসলমান হয়ে যাবে। সুতরাং সে তাকে ক্ষান্ত ও নিবৃত্ত করার চেষ্টা করল। অবশেষে অলীদ কুরাইশের মিলনায়তনে এসে বলল, 'মুহাম্মাদ পাগল নয়, গণক নয়, কবি নয়, মিথ্যুকও নয়।' সকলে যেন একবাক্যে বলল, 'তাহলে সে কী?' হঠকারী অলীদ বলল, 'সে একজন যাদুকর!'

অর্থাৎ, কুরআন তার নিজস্ব রচনা এবং তারই মাধ্যমে সে মানুষকে যাদু ক'রে নিজের দলে আকর্ষণ করছে। মানুষ সেই যাদুতে মোহগ্রস্ত হয়ে নিজ আপনজন ছেড়ে তার দলে শামিল হয়ে যাচ্ছে।

মহান আল্লাহ তার ব্যাপারেই বললেন,

{إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ (١٨) فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (١٩) ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ (٢٠) ثُمَّ نَظَرَ (٢١) ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ (٢٢) ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ (٢٣) فَقَالَ إِنْ هَذَا إِلاَّ سِحْرٌ يُؤْثَرُ (٢٤) إِنْ هَذَا إِلاَّ قَوْلُ الْبَشَرِ (٢٥) سَأُصْلِيهِ سَقَرَ (٢٦) وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ (٢٧) لا تُبْقِي وَلا تَذَرُ (٢٨) لَوَّاحَةٌ لِلْبَشَرِ (٢٩) عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ}

(٣٠) سورة المدثر

অর্থাৎ, সে তো চিন্তা করল এবং সিদ্ধান্ত করল। ধ্বংস হোক সে! কেমন ক'রে সে এই সিদ্ধান্ত করল! আবার ধ্বংস হোক সে! কেমন ক'রে সে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হল! সে আবার চেয়ে দেখল। অতঃপর সে ভ্রূকুঞ্চিত ও মুখ বিকৃত করল। অতঃপর সে পিছনে ফিরল এবং দম্ভ প্রকাশ করল। এবং বলল, এটা তো লোক পরম্পরায় প্রাপ্ত যাদু ছাড়া আর কিছু নয়। এটা তো মানুষেরই কথা। আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাক্বার (জাহান্নামে)। কিসে তোমাকে জানাল, সাক্বার কী? ওটা তাদেরকে (জীবিত অবস্থায়) রাখবে না, আর (মৃত অবস্থায়ও) ছেড়ে দেবে না। ওটা দেহের চামড়া দগ্ধ ক'রে দেবে। ওর তত্ত্বাবধানে রয়েছে উনিশ জন প্রহরী। (মুদ্দাষ্‌ষির ঃ ১৮-৩০)

মানুষের মন সুন্দরের আকর্ষণে আকৃষ্ট হয়। অতঃপর উদার হলে তা গ্রহণ করে, নচেৎ অনুদার হলে প্রত্যাখ্যান করে। মুক্ত মনের হলে বিশ্বাসী হয়ে আল্লাহর হিদায়াত পায়। সুন্দরতম বাণীর চিত্তাকর্ষী বর্ণনে মুগ্ধ হয়। সে বাণী শ্রবণ ক'রে হৃদয়ে কম্পন আসে। সুন্দরের আলোয় মন আলোকিত হয়। সুন্দর লাভের আনন্দে চিত্ত পুলকিত হয়। সুন্দরের বরিষণে দেহপ্রাণ পরিপ্লুত হয়। সুন্দরতম বাণী---আলক্বুরআন।

মহান আল্লাহ বলেন,

{اللَّهُ نَزَّلَ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُّتَشَابِهًا مَّثَانِيَ تَقْشَعِرُّ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاء وَمَن يُضْلِلْ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ}

(٢٣) سورة الزمر

অর্থাৎ, আল্লাহ অবতীর্ণ করেছেন উত্তম বাণী সম্বলিত এমন এক গ্রন্থ, যাতে পারস্পরিক সাদৃশ্যপূর্ণ একই কথা নানাভাবে বার বার বলা হয়েছে। এতে যারা তাদের প্রতিপালককে ভয় করে, তাদের চামড়ার (লোম) খাড়া হয়, অতঃপর তাদের দেহ-মন আল্লাহর স্মরণের প্রতি নরম হয়ে যায়। এটিই আল্লাহর পথনির্দেশ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দিয়ে পথপ্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন, তার কোন পথপ্রদর্শক নেই। (যুমার ঃ ২৩)

এই বাণীর আকর্ষণে জ্বিন সম্প্রদায়ও মুগ্ধ হয়ে ঈমান এনেছিল। তারা বলেছিল,

إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآناً عَجَباً (١) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَداً (٢) وَأَنَّهُ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا مَا اتَّخَذَ صَاحِبَةً وَلا وَلَداً (٣)

অর্থাৎ, 'আমরা তো এক বিস্ময়কর কুরআন শ্রবণ করেছি। যা সঠিক পথ-নির্দেশ করে; ফলে আমরা তাতে বিশ্বাস স্থাপন করেছি। আর আমরা কখনো আমাদের প্রতিপালকের কোন শরীক স্থাপন করব না। এবং নিশ্চয়ই সমুচ্চ আমাদের প্রতিপালকের মর্যাদা; তিনি গ্রহণ করেননি কোন পত্নী এবং না কোন সন্তান।...... (জ্বিন ঃ ১-৩)

এই সেই বাণী, যাঁর উপর তা অবতীর্ণ হল, তিনি হলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। যে মাসে তা অবতীর্ণ হল, সে মাস হয়ে গেল সর্বশ্রেষ্ঠ মাস। যে রাতে তা অবতীর্ণ হল, সে রাত হয়ে গেল সর্বশ্রেষ্ঠ রাত। যে মানুষ তা শেখে ও শেখায়, সে মানুষ হয়ে যায় সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। সে বাণী যে পাঠ করে, তার প্রত্যেকটি হরফের বিনিময়ে সে লাভ করে দশটি ক'রে সওয়াব। কত

মাহাত্ম্যপূর্ণ সে বাণী! কত সুন্দর সে বাণী!

মহানবী ﷺ তাঁর প্রায় ভাষণের ভূমিকায় বলতেন,

(إِنَّ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله).

অর্থাৎ, নিশ্চয় সবচেয়ে সুন্দর বাণী হল আল্লাহর গ্রন্থ। *(আহমাদ ১৪৪৩১, সিঃ সহীহাহ ১৬৯নং)*

কখনো বলতেন,

(إِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ).

অর্থাৎ, নিশ্চয় সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী হল আল্লাহর গ্রন্থ। (মুসলিম ২০৪২নং)

সেই সুন্দরতম বাণীর অনুসরণ করতে আহবান ক'রে মহান সৃষ্টিকর্তা মানব-দানবের উদ্দেশ্যে বলেন,

{وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ العَذَابُ بَغْتَةً وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ}

অর্থাৎ, তোমাদের অজ্ঞাতসারে তোমাদের ওপর অতর্কিতে শাস্তি আসার পূর্বে তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের তরফ থেকে যে সুন্দরতম (বাণী) অবতীর্ণ করা হয়েছে, তার অনুসরণ কর। (যুমার ঃ ৫৫)

আর যারা সুন্দরতম বাণীর অনুসরণ করে, তাদের প্রশংসা ক'রে এবং তাদেরকে সুসংবাদ দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

{فَبَشِّرْ عِبَادِ (١٧) الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُوْلَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُوْلَئِكَ هُمْ أُوْلُوا الْأَلْبَابِ} (١٨) سورة الزمر

"অতএব সুসংবাদ দাও আমার দাসদেরকে---যারা মনোযোগ সহকারে কথা শোনে এবং যা সুন্দরতম তার অনুসরণ করে। ওরাই তারা, যাদেরকে আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ওরাই বুদ্ধিমান। (যুমার ঃ ১৭-১৮)

সুন্দরতম বাণী, সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ, সর্বোত্তম কথায় যদি মানুষ বিশ্বাসী না হয়,

{فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ} (٥٠) سورة المرسلات

তাহলে তারা এর পরিবর্তে আর কোন্ কথায় বিশ্বাস স্থাপন করবে? (মুরসালাত ঃ ৫০)

সবচেয়ে সুন্দর ও শ্রেষ্ঠ রীতি-নীতি

মহানবী ﷺ তাঁর প্রায় খুতবার শুরুতে বলতেন,

(أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ).

"আম্মা বা'দ (আল্লাহর প্রশংসা ও সাক্ষ্য দান করার পর) নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম কথা আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম রীতি মুহাম্মাদ ﷺ-এর রীতি। আর নিকৃষ্টতম কাজ (দ্বীনে) নব আবিষ্কৃত কর্মসমূহ এবং প্রত্যেক বিদআত ভ্রষ্টতা।" *(মুসলিম ২০৪২নং)*

أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَإِنَّ أَفْضَلَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، (وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ).

"আম্মা বা'দ (আল্লাহর প্রশংসা ও সাক্ষ্য দান করার পর) নিঃসন্দেহে সবচেয়ে সত্য কথা আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম (সবচেয়ে সুন্দর) রীতি মুহাম্মাদ ﷺ-এর রীতি। আর নিকৃষ্টতম কাজ (দ্বীনে) নব আবিষ্কৃত কর্মসমূহ এবং প্রত্যেক বিদআত ভ্রষ্টতা। (আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামের পথ।)" (আহমাদ, নাসাঈ ১৫৭৮নং)

আল্লাহ বান্দার সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী কখন হন?

মহান আল্লাহর জ্ঞান, দৃষ্টি, সাহায্য-সহযোগিতা বান্দার সাথে থাকে। তাঁর যিক্র থাকে মু'মিনের হৃদয়ে। তিনি থাকেন সাত আসমানের উপর আরশে। তিনি বলেছেন,

{هُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ}

(٤) سورة الحديد

অর্থাৎ, তিনিই ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা কিছু ভূমিতে প্রবেশ করে ও যা কিছু তা হতে বের হয় এবং আকাশ হতে যা কিছু নামে ও আকাশে যা কিছু উত্থিত হয়। তোমরা যেখানেই থাক না কেন, তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন, তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা দেখেন। (হাদীদ ঃ ৪)

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِن ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرَ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ أَيْنَ مَا كَانُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (٧) سورة المجادلة

অর্থাৎ, তুমি কি অনুধাবন কর না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে, আল্লাহ তা জানেন। তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয় না যাতে চতুর্থজন হিসাবে তিনি থাকেন না এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে ষষ্ঠজন হিসাবে তিনি থাকেন না; তারা এ অপেক্ষা কম হোক বা বেশী হোক এবং যেখানেই থাকুক না কেন, আল্লাহ তাদের সঙ্গে থাকেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে কিয়ামতের দিন জানিয়ে দেবেন তারা যা করে। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ববিষয়ে সম্যক অবগত। (মুজাদালাহ্ ঃ ৭)

তিনি ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন। (বাক্বারাহ ঃ ১৫৩, ২৪৯, আনফাল ঃ ৪৬, ৬৬)

তিনি পরহেযগারদের সাথে থাকেন। (বাক্বারাহ ঃ ১৯৪, তাওবাহ ঃ ৩৬, ১২৩)

তিনি মু'মিনদের সাথে থাকেন। (আনফাল ঃ ১৯)

তিনি সৎশীলদের সঙ্গে থাকেন। (নাহ্ল ঃ ১২৮, আনকাবূত ঃ ৬৯)

তিনি থাকেন সকল সৃষ্টির ঊর্ধ্বে আরশে। (ত্বাহা ঃ ৫) তবুও তিনি বান্দার নিকটবর্তী। তিনি বলেছেন,

{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} (١٨٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, আর আমার দাসগণ যখন আমার (অবস্থান) সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তুমি বল, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন প্রার্থনাকারী আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক, যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে। (বাক্বারাহ ঃ ১৮৬)

তিনি রাতের শেষ তৃতীয়াংশে যেভাবে তাঁর জন্য শোভনীয়, সেইভাবে নিচের আসমানে অবতরণ করেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআলা প্রত্যহ রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে নীচের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, "কে আমাকে ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব। এবং কে আমার নিকট ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করব।" *(বুখারী, মুসলিম, সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১২২৩নং)*

সুতরাং তিনি এই সময় বান্দার সবচেয়ে নিকবর্তী হন। মহানবী ﷺ বলেছেন, "প্রতিপালক বান্দার সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী হন রাতের শেষ মধ্যাংশে। সুতরাং যদি ঐ সময়ে আল্লাহর যিক্‌রকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার, তাহলে হয়ে যাও।" (তিরমিযী ৩৫৭৯, নাসাঈ ৫৭২, হাকেম, সঃ জামে' ১১৭৩নং)

বান্দা যখন সিজদায় যায়, তখনও মহান আল্লাহ তার সবচেয়ে নিকটবর্তী হন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبِّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ ، فَأَكْثِرُوا الدُّعَاءَ)) . رواه مسلم

"বান্দা স্বীয় প্রভুর সর্বাধিক নিকটবর্তী হয় তখন, যখন সে সিজদার অবস্থায় হয়। সুতরাং (ঐ সময়) তোমরা বেশি মাত্রায় দুআ কর।" *(মুসলিম ১১১১নং)*

আর তিনি নিকটে হলে, দুআ কবুল হওয়ার আশা বেশি করা যায়। সে জন্যই নিকটবর্তী হওয়া অবস্থায় বেশি বেশি দুআ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

যিনি সবচেয়ে বেশি দূরে থাকেন, তিনিই সবচেয়ে বেশি নিকটে। তিনি আমাদের সাথে থাকেন, তিনি আমাদের ঘাড়ে অবস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর। তিনি বলেছেন,

{وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ} (١٦)

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি এবং তার মন তাকে যে কুমন্ত্রণা দেয়, তা আমি জানি। আমি তার ঘাড়ে অবস্থিত ধমনী অপেক্ষাও নিকটতর। (ক্বাফ ঃ ১৬)

আর তার জন্যই ভয়, ভরসা, আশা, প্রার্থনা কেবল তাঁরই কাছে হওয়া উচিত। তাঁর কাছে আবেদন জানাতে জোরে-শোরে দুআ করা বাঞ্ছনীয় নয়। যেমন বিধেয় নয় কাউকে মাধ্যম বা অসীলা বানিয়ে তাঁকে আহবান করা।

কার নিকট বেশি লজ্জা হওয়া উচিত?

মানুষ মানুষকে লজ্জা করে। অপরিচিত থেকে পরিচিত ব্যক্তির নিকট বেশি লজ্জা হয় মানুষের। লজ্জাশীলতা ঈমানের অঙ্গ। লজ্জাশীলতা একটি সচ্চরিত্রতা।

মহানবী ﷺ বলেন, "প্রত্যেক ধর্মে সচ্চরিত্রতা আছে, ইসলামের সচ্চরিত্রতা হল লজ্জাশীলতা।" *(ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ২১৪৯নং)*

কিন্তু কার নিকট সবচেয়ে বেশি লজ্জা হওয়া উচিত মানুষের?

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমার স্ত্রী ও ক্রীতদাসী ছাড়া অন্য মানুষ থেকে নিজের শরমগাহ হিফাযত কর। নিজেদের আপোসে থাকলেও যথাসাধ্য তা কাউকে দেখাবে না এবং একাকী নির্জনে থাকলেও (উলঙ্গ থাকবে না। কারণ)

« اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ يُسْتَحْيَى مِنَ النَّاسِ ».

মানুষ অপেক্ষা আল্লাহ এর বেশী হকদার যে, তাঁকে লজ্জা করা হবে।" *(আবূ দাউদ ৪০১৭, তিরমিযী ২৭৯৪, ইবনে মাজাহ ১৯২০নং)*

বলা বাহুল্য, মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি লজ্জা হওয়া উচিত। যে পাপ করতে মানুষকে লজ্জা করা হয়, সে পাপ করতে আল্লাহকে বেশি লজ্জা করা উচিত। মহান আল্লাহ বলেন,

{يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلاَ يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لاَ يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ وَكَانَ اللّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا} (١٠٨) سورة النساء

অর্থাৎ, এরা মানুষকে লজ্জা করে (মানুষের দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করে), কিন্তু আল্লাহকে লজ্জা করে না (তাঁর দৃষ্টি থেকে গোপনীয়তা অবলম্বন করতে পারে না) অথচ তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন, যখন রাত্রে তারা তাঁর (আল্লাহর) অপছন্দনীয় কথা নিয়ে পরামর্শ করে। আর তারা যা করে, তা সর্বতোভাবে আল্লাহর জ্ঞানায়ত্ত। (নিসা ঃ ১০৮)

এই লজ্জা যখন আল্লাহকে করা হয়, তখন লজ্জাশীল ব্যক্তি আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য করতে এবং তাঁর অবাধ্যাচরণ থেকে দূরে থাকতে অনুপ্রাণিত হয়। তা না হলে যথাযথভাবে লজ্জা করা হয় না।

একদা মহানবী ﷺ বললেন, "তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা কর।" সকলে বলল, 'হে আল্লাহর নবী! আমরা তো---আলহামদু লিল্লাহ---আল্লাহকে লজ্জা করে থাকি।' তিনি বললেন, "না, ঐরূপ নয়। আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করার অর্থ এই যে, মাথা ও তার সংযুক্ত অন্যান্য অঙ্গ (জিভ, চোখ এবং কান)কে (অবৈধ প্রয়োগ হতে) হিফাযত করবে, পেট ও তার সংশ্লিষ্ট অঙ্গ (লিঙ্গ, হাত, পা ও হৃদয়)কে (তাঁর অবাধ্যাচরণ ও হারাম হতে) হিফাযত করবে এবং মরণ ও তার পর হাড় মাটি হয়ে যাওয়ার কথা (সর্বদা) স্মরণে রাখবে। আর যে ব্যক্তি পরকাল (ও তার সুখময় জীবন) পাওয়ার ইচ্ছা রাখে, সে ইহকালের সৌন্দর্য পরিহার করবে। যে ব্যক্তি এ সব কিছু করে, সেই প্রকৃতপক্ষে

আল্লাহকে যথাযথভাবে লজ্জা করে।” *(সহীহ তিরমিযী ২০০০ নং)*

কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে, বহু মানুষ মানুষকে লজ্জা করে, কিন্তু আল্লাহকে লজ্জা করে না। অথচ মহানবী ﷺ বলেন, “আমি তোমাকে অসিয়ত করছি যে, তুমি আল্লাহ তাআলাকে ঠিক সেইরূপ লজ্জা করবে, যেরূপ লজ্জা ক’রে থাক তোমার সম্প্রদায়ের নেক লোককে।” *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে ২৫৪১নং)*

স্বভাবতঃ প্রশ্ন হবে যে, মানুষ অপেক্ষা যদি আল্লাহকে বেশি লজ্জা করতে হয়, তাহলে প্রস্রাব-পায়খানা, গোসল বা স্ত্রী-মিলন করার সময়ও কি নিরাবরণ হওয়া যাবে না?

না, তা নয়। প্রয়োজনে নগ্ন হতেই হলে তখন অতিরিক্ত গোপনীয়তার প্রয়োজন নেই। যেহেতু মহান আল্লাহর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَلَا إِنَّهُمْ يَثْنُونَ صُدُورَهُمْ لِيَسْتَخْفُوا مِنْهُ أَلَا حِينَ يَسْتَغْشُونَ ثِيَابَهُمْ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ} (٥)

অর্থাৎ, জেনে রাখ, তারা নিজ নিজ বুক কুঞ্চিত করে, যাতে তাঁর দৃষ্টি হতে লুকাতে পারে। জেনে রাখ, তারা যখন নিজেদের কাপড় (দেহে) জড়ায়, তিনি তখনও সব জানেন যা কিছু তারা গোপন করে এবং যা কিছু প্রকাশ করে। তিনি তো মনের ভিতরের কথাও জানেন। (হূদ ঃ ৫)

উক্ত আয়াতটি সেই সকল মুসলিমদের ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে, যারা লজ্জার খাতিরে পেশাব-পায়খানার সময় এবং স্ত্রী-সহবাসের সময় উলঙ্গ হওয়াকে অপছন্দ করত; এই ভেবে যে, আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে দেখছেন। ফলে তারা এই সময় লজ্জাস্থান আবৃত করার নিমিত্তে নিজেদের বক্ষদেশকে ঘুরিয়ে দিত। আল্লাহ তাআলা বলেন, রাত্রের অন্ধকারে যখন তারা বিছানাতে নিজেদেরকে কাপড় দ্বারা আচ্ছাদিত করে, তখনও তিনি তাদেরকে দেখেন এবং তাদের চুপে চুপে ও প্রকাশ্যে আলাপনকেও তিনি জানেন। উদ্দেশ্য হল যে, লজ্জা-শরম আপন জায়গায় ঠিক আছে, কিন্তু তাতে এত বাড়াবাড়ি করা ঠিক নয়। কারণ যে সত্তার কারণে তারা এরূপ করে, তাঁর নিকট তা গুপ্ত নয়। তবে এরূপ কষ্ট করায় লাভ কি? (আহসানুল বায়ান)

আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কারা বেশি ভালবাসে?

এ কথা অতি স্পষ্ট যে, ঈমানদাররাই আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে বেশি ভালবাসে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللّهِ أَندَاداً يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللّهِ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَشَدُّ حُبًّا لِّلّهِ}

আর কোন কোন লোক আছে, যারা আল্লাহ ছাড়া অন্যান্যকে (আল্লাহর) সমকক্ষ বলে মনে করে এবং তাদেরকে আল্লাহকে ভালোবাসার মতো ভালবাসে, কিন্তু যারা বিশ্বাস করেছে, তারা আল্লাহর ভালবাসায় দৃঢ়তর। (বাক্বারাহ ঃ ১৬৫)

নবীর প্রতি ভালবাসা কোন মুসলিমের নেই? বরং সে পূর্ণ মু’মিন হতে পারে না, যে ব্যক্তি

মহান আল্লাহর পর তাঁর নবীকে তার নিজের জীবন, আত্মীয়-পরিজন ও সারা বিশ্বের সব কিছু থেকে বেশি ভালবাসে।

কিন্তু বর্তমানে কার ভালবাসা বেশি? কে তাঁকে বেশি ভালবাসে? সে ভালবাসার নিদর্শন কী?

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَشَدُّ أُمَّتِي لِي حُبًّا قَوْمٌ يَكُونُونَ أَوْ يَخْرُجُونَ بَعْدِي يَوَدُّ أَحَدُهُمْ أَنَّهُ أَعْطَى أَهْلَهُ وَمَالَهُ وَأَنَّهُ رَآنِي).

অর্থাৎ, আমার উম্মতের মধ্যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি ভালবাসা পোষণ করবে এমন এক সম্প্রদায়, যারা আমার পরে আসবে। তাদের প্রত্যেকে চাইবে, নিজের পরিজন ও ধন-সম্পদের বিনিময়ে আমাকে দর্শন করবে! *(আহমাদ ২ ১৩৮৫, মুসলিম ৭৩২৩, ইবনে হিব্বান ৭২৩ ১নং)*

মহান আল্লাহ যেন আমাদেরকে সেই সম্পদায়ভুক্ত করেন। আমীন।

আল্লাহর কাছে প্রিয়তম মানুষ

মানুষের কাছে অনেক মানুষ প্রিয়তম হতে পারে, কিন্তু আল্লাহর কাছে প্রিয়তম হওয়াটা বড় কঠিন। তবুও (দ্বীনী দৃষ্টিতে) মানুষের কাছে যে প্রিয়, মহান আল্লাহর নিকটে সে প্রিয়। প্রবাদে বলা হয়, ‘দশ যেথা, খোদা সেথা।’ মানুষের নিকট যে ভাল, সে আল্লাহর কাছেও ভাল। মহান আল্লাহর কাছে মানুষের ভাল-মন্দের সাক্ষী মানুষই।

আনাস ﷺ বলেন, কিছু লোক একটা জানাযা নিয়ে পার হয়ে গেল। লোকেরা তার প্রশংসা করতে লাগল। নবী ﷺ বললেন, “অবধারিত হয়ে গেল।” অতঃপর দ্বিতীয় আর একটি জানাযা নিয়ে পার হলে লোকেরা তার দুর্নাম করতে লাগল। নবী ﷺ বললেন, “অবধারিত হয়ে গেল।” উমার বিন খাত্ত্বাব ﷺ বললেন, ‘কী অবধারিত হয়ে গেল?’ তিনি বললেন, “তোমরা যে এর প্রশংসা করলে তার জন্য জান্নাত, আর ওর দুর্নাম করলে তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত হয়ে গেল। তোমরা হলে পৃথিবীতে আল্লাহর সাক্ষী।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

আবুল আসওয়াদ ﷺ বলেন, আমি মদীনায় এসে একদা উমার ইবনে খাত্ত্বাব ﷺ-এর নিকট বসলাম। অতঃপর তাঁদের পাশ দিয়ে একটি জানাযা পার হলে তার প্রশংসা করা হল। উমার ﷺ বললেন, ‘ওয়াজেব (অনিবার্য) হয়ে গেল।’ অতঃপর আর একটা জানাযা পার হলে তারও প্রশংসা করা হলে উমার ﷺ বললেন, ‘ওয়াজেব হয়ে গেল।’ অতঃপর তৃতীয় একটা জানাযা পার হলে তার নিন্দা করা হলে উমার ﷺ বললেন, ‘ওয়াজেব হয়ে গেল।’ আবুল আসওয়াদ বলেন, আমি বললাম, ‘কী ওয়াজেব হয়ে গেল? হে আমীরুল মু’মিনীন!’ তিনি বললেন, ‘আমি বললাম, যেমন নবী ﷺ বলেছিলেন, “যে মুসলমানের নেক হওয়ার ব্যাপারে চারজন লোক সাক্ষ্য দেবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।” আমরা বললাম, ‘আর তিনজন?’ তিনি বললেন, “তিনজন হলেও।” আমরা বললাম, ‘আর দু’জন?’ তিনি বললেন, “দু’জন হলেও।” অতঃপর আমরা এক জনের (সাক্ষ্য) সম্পর্কে আর জিজ্ঞাসা করলাম না। *(বুখারী)*

মহান আল্লাহ মানুষের মাল (যাকাত) থেকে নিজের হক নিয়ে থাকেন মানুষের জন্যই।

মানুষের ঈমান, জান, মান, জ্ঞান ও ধন ---এই পঞ্চসম্পদ রক্ষার জন্যই তিনি শরীয়তের বিধান দিয়েছেন, কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং নবী-রসূল প্রেরণ করেছেন। মানুষের কল্যাণের জন্যই তিনি মানুষকে কল্যাণ সাধনে উদ্বুদ্ধ করেন।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ আয্যা অজাল্ল কিয়ামতের দিন বলবেন, 'হে আদম সন্তান! আমি অসুস্থ ছিলাম, তুমি আমাকে দেখতে আসনি।' সে বলবে, 'হে প্রভু! কীভাবে আমি আপনাকে দেখতে যাব, আপনি তো সারা জাহানের পালনকর্তা?' তিনি বলবেন, 'তুমি কি জানতে না যে, আমার অমুক বান্দা অসুস্থ ছিল? তুমি তাকে দেখতে যাওনি। তুমি কি জানতে না যে, তুমি যদি তাকে দেখতে যেতে, তাহলে অবশ্যই তুমি আমাকে তার কাছে পেতে?

হে আদম সন্তান! আমি তোমার কাছে খাবার চেয়েছিলাম, তুমি আমাকে খাবার দাওনি।' সে বলবে, 'হে প্রভু! আমি আপনাকে কীভাবে খাবার দেব, আপনি তো সারা জাহানের প্রভু?' আল্লাহ বলবেন, 'তোমার কি জানা ছিল না যে, আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে খাবার চেয়েছিল, কিন্তু তাকে তুমি খাবার দাওনি? তোমার কি জানা ছিল না যে, যদি তাকে খাবার দিতে, তাহলে অবশ্যই তা আমার কাছে পেতে?

হে আদম সন্তান! তোমার কাছে আমি পানি পান করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তুমি আমাকে পান করাওনি।' বান্দা বলবে, 'হে প্রভু! আপনাকে কীরূপে পানি পান করাবো, আপনি তো সমগ্র জগতের প্রভু?' তিনি বলবেন, 'আমার অমুক বান্দা তোমার কাছে পানি চেয়েছিল, তুমি তাকে পান করাওনি। তুমি কি জানতে না যে, যদি তাকে পান করাতে, তাহলে তা অবশ্যই আমার কাছে পেতে? " *(মুসলিম)*

সুতরাং মানুষের কল্যাণই সৃষ্টিকর্তার কাম্য। মানুষকে ভালবাসার মাঝেই আল্লাহর ভালবাসা লাভ করা যায়। মানুষকে ভালবেসে ভাল পথে আনতে পারলে, মহান আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।

এই কারণে মানুষের জন্য যে উপকারী, সে আল্লাহর কাছে প্রিয়। বরং যে নিজ পরিবার-পরিজনের জন্য বেশি উপকারী, সে আল্লাহর নিকট বেশি প্রিয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَحَبُّ الْعِبَادِ إِلَى اللهِ تَعَالَى أَنْفَعُهُمْ لِعِيَالِهِ).

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দা সেই ব্যক্তি, যে তার সন্তান-সন্ততির জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী। (সঃ জামে' ১৭২নং) তিনি আরো বলেছেন,

(أَحَبُّ النَّاس إِلَى اللهِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاس).

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় মানুষ সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী। (সঃ জামে' ১৭৬নং) তিনি আরো বলেছেন,

(أَحَبُّ عِبَادِ اللَّهِ إِلَى اللَّهِ أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا).

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলার নিকট সবচেয়ে প্রিয় বান্দা সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবার চেয়ে সুন্দর। (ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ৪৩২নং)

যে মানুষ দ্বীনদার এবং তার চরিত্র অতি সুন্দর, সে মানুষ দ্বীনদার মানুষদের কাছে অবশ্যই অতি সুন্দর। আর তার জন্য সে মহান আল্লাহর কাছেও সবার চেয়ে প্রিয়।

আল্লাহর সবচেয়ে বেশি নিকটবর্তী ব্যক্তি কে?

মহান আল্লাহর বান্দাগণের মধ্যে অনুগত বান্দাগণ অবশ্যই আল্লাহর রহমত ও নৈকট্যের অধিকারী। কিন্তু তাদের মধ্যে সবার চেয়ে বেশি অধিকারী কে?

যে ব্যক্তি সাক্ষাৎ ও বিদায়ের সময় সবার আগে সালাম দেয়।

এমনিতে সালাম দেওয়ার সাধারণ নীতি হল, উট, ঘোড়া, সাইকেল বা গাড়ির উপর সওয়ার লোক পায়ে হেঁটে যাওয়া লোককে, পায়ে হেঁটে যাওয়া লোক বসে থাকা লোককে, অল্প সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোককে, বয়সে ছোট মানুষ অপেক্ষাকৃত বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষকে সালাম দেবে। *(বুখারী ৬২৩১-৬২৩২, মুসলিম ২১৬০নং)*

তবুও তাদের মধ্যে চরিত্র ও ব্যবহারের দিক থেকে সর্বশ্রেষ্ঠ লোক সে, যে আগে-ভাগে সালাম দেয়। যেহেতু সেই প্রথমে আল্লাহর যিক্র করে এবং অপরকে তা স্মরণ করিয়ে দেয়। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ أَوْلَى النَّاس بِاللّهِ مَنْ بَدَأَهُمْ بالسَّلَامِ))

"লোকেদের মধ্যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহর নিকটবর্তী সেই, যে লোকদেরকে প্রথমে সালাম করে।" *(আবূ দাঊদ)*

অন্য বর্ণনায় আবূ উমামাহ ﷺ বলেন, জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! দু'জনের সাক্ষাৎকালে তাদের মধ্যে কে প্রথমে সালাম দেবে?' তিনি বললেন, "যে মহান আল্লাহর সর্বাধিক নিকটবর্তী হবে।" *(তিরমিযী)*

অনুরূপ দুই ব্যক্তির মধ্যে মনোমালিন্য হলে উভয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ও উত্তম ব্যক্তি সে, যে সর্বপ্রথম সালাম দিয়ে কথাবার্তা শুরু করে।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "কোন মুসলিমের জন্য এটা বৈধ নয় যে, সে তার ভায়ের সাথে তিন দিনের বেশি কথাবার্তা বলা বন্ধ রাখে। যখন তারা পরস্পর সাক্ষাৎ করে, তখন এ এ দিকে মুখ ফিরায় এবং ও ওদিকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। আর তাদের দু'জনের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সেই হবে, যে সাক্ষাৎকালে প্রথমে সালাম পেশ করবে।" *(বুখারী ৬২৩২নং, মুসলিম)*

নবী ﷺ-এর সবচেয়ে নিকটবর্তী ব্যক্তি কে?

মহানবী ﷺ সৃষ্টির সেরা মানুষ। তিনি আল্লাহর খলীল। পুরুষদের মধ্যে তাঁর নিকট সবার প্রিয় আবূ বাক্র সিদ্দীক ﷺ। আর মহিলাদের মধ্যে সবার প্রিয় আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)। তিনি ইমামুল আম্বিয়া, ইমামুল মুত্তাক্বীন। তাঁর সবচেয়ে নিকটবর্তী ব্যক্তিবর্গ মুত্তাক্বীনগণ। তাঁর উম্মতের পরহেযগার ব্যক্তিগণ। তিনি বলেছেন।

(إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِي الْمُتَّقُونَ مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا).

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমার সবচেয়ে নিকটবর্তী মুত্তাক্বীনগণ; তারা যেই হোক, যেখানেই থাক। *(আহমাদ ২২০৫২, সঃ জামে' ২০১২নং)*

আর মুত্তাক্বীনগণ আল্লাহরও বন্ধু। তিনি বলেছেন,

{أَلا إِنَّ أَوْلِيَاء اللّهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ (٦٢) الَّذِينَ آمَنُواْ وَكَانُواْ يَتَّقُونَ (٦٣) لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَياةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ لاَ تَبْدِيلَ لِكَلِمَاتِ اللّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (٦٤)

অর্থাৎ, মনে রেখো যে, আল্লাহর বন্ধুদের না কোন আশংকা আছে আর না তারা বিষণ্ন হবে। তারা হচ্ছে সেই লোক, যারা বিশ্বাস করেছে এবং সাবধানতা অবলম্বন ক'রে থাকে। তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব জীবনে এবং পরকালেও; আল্লাহর বাণীসমূহের কোন পরিবর্তন নেই; এটাই হচ্ছে বিরাট সফলতা। (ইউনুস ঃ ৬২-৬৪)

মহানবী ﷺ-এর ঘনিষ্ঠতম বা নিকটতম ব্যক্তি কারা?

প্রত্যেক ব্যক্তির আত্মীয়রাই নিকটতম হয়। কিন্তু ঈমানী বন্ধন আত্মীয়তা অপেক্ষা দৃঢ়তর। আহলে বায়ত তাঁর আপনজন ঠিকই, কিন্তু তাঁর উম্মতের মুত্তাক্বীগণ তাঁর বেশি আপনজন---যেমন সে কথা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে। তিনি আরো বলেছেন,

(إِنَّ أَهْلَ بَيْتِي هؤُلاءِ يَروْنَ أَنَّهُمْ أَوْلَى النَّاسِ بِي ، وَإِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بِيَ الْمُتَّقُونَ، مَنْ كَانُوا وَحَيْثُ كَانُوا).

অর্থাৎ, আমার পরিবারের লোক মনে করে, ওরা আমার বেশি ঘনিষ্ঠতম। অথচ আমার বেশি ঘনিষ্ঠ হল পরহেযগার লোকেরা, তারা যেই হোক, যেখানেই থাক। (আহমাদ, সঃ জামে' ২০১২নং)

সৃষ্টির সেরা নবী। আমাদের সকলের প্রিয়তম তিনি। কিন্তু তাঁর কাছে প্রিয়তম ব্যক্তি কে? এমন সৌভাগ্য কার হবে, যে কিয়ামতে তাঁর সবচেয়ে নিকটবর্তী স্থানে অবস্থান করবে?

নিশ্চয় মুত্তাক্বীগণ সকল সৃষ্টি বরং নিজেদের প্রাণের চেয়েও বেশি তাঁকে ভালোবাসে। আর যারা তাঁকে প্রাণাপেক্ষা বেশি ভালোবাসে, তারা তাঁর প্রতি বেশি বেশি দরূদ পাঠ করে। এই জন্য অধিকাধিক দরূদ পাঠকারীও মহানবী ﷺ-এর ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি। তিনি বলেছেন,

(أَوْلَى النَّاسِ بِي يَوْمَ القِيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَيَّ صَلاَةً).

অর্থাৎ, কিয়ামতে আমার ঘনিষ্ঠতম ব্যক্তি সে, যে আমার প্রতি সবার চেয়ে বেশি দরূদ পাঠ করে। (তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ১৬৬৮-নং)

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, যে মুসলিমরা চরিত্রে সবার চেয়ে উত্তম, তারা মহানবী ﷺ-এর প্রিয়তম এবং কিয়ামতের দিন অবস্থানে তাঁর নিকটতম। তিনি বলেছেন,

(إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقاً، وإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي يَوْمَ القِيَامَةَ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ).

"তোমাদের মধ্যে আমার প্রিয়তম এবং কিয়ামতের দিন অবস্থানে আমার নিকটতম

ব্যক্তিদের কিছু সেই লোক হবে, যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঘৃণ্যতম এবং কিয়ামতের দিন অবস্থানে আমার নিকট থেকে দূরতম হবে তারা, যারা অনর্থক অত্যধিক আবোল-তাবোল বলে ও বাজে বকে, এমন বাচাল ও বখাটে লোক; যারা আলস্যভরে বা কায়দা ক'রে টেনে-টেনে কথা বলে। আর অনুরূপ অহংকারীরাও।" *(তিরমিযী, সঃ জামে' ২১৯৭নং)*

সবচেয়ে বেশি ঘৃণ্য ও দূরবর্তী ব্যক্তি

সকলের নিকট নবীই আমাদের প্রিয়তম। কিন্তু আমাদের সকলে তাঁর প্রিয় হতে পারে না। বরং অধিকাংশ মানুষ এমন আছে, যারা তাঁর নিকট ঘৃণ্য। কিন্তু সেই প্রিয় নবী ﷺর নিকট সবচেয়ে বেশি ঘৃণ্য ব্যক্তি কে? কোন্ সে দুর্ভাগা ব্যক্তি, যে কিয়ামতে তাঁর সবচেয়ে দূরবর্তী স্থানে অবস্থান করবে?

তিনি বলেছেন,

(إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِساً يَوْمَ القِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقاً، وإِنَّ مِنْ أَبْغَضِكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدِكُمْ مِنِّي يَوْمَ القِيَامَةَ الثَّرْثَارُونَ وَالْمُتَشَدِّقُونَ وَالْمُتَفَيْهِقُونَ).

"তোমাদের মধ্যে আমার প্রিয়তম এবং কিয়ামতের দিন অবস্থানে আমার নিকটতম ব্যক্তিদের কিছু সেই লোক হবে, যারা তোমাদের মধ্যে চরিত্রে শ্রেষ্ঠতম। আর তোমাদের মধ্যে আমার নিকট ঘৃণ্যতম এবং কিয়ামতের দিন অবস্থানে আমার নিকট থেকে দূরতম হবে তারা, যারা অনর্থক অত্যধিক আবোল-তাবোল বলে ও বাজে বকে, এমন বাচাল ও বখাটে লোক; যারা আলস্যভরে বা কায়দা করে টেনে-টেনে কথা বলে। আর অনুরূপ অহংকারীরাও।" *(তিরমিযী, সহীহুল জামে' ২১৯৭নং)*

যে ব্যক্তি বাজে বকে, আবোল-তাবোল বলে, সে ব্যক্তি এক শ্রেণীর পাগল। লোকে কোন বাচাল মানুষকে পছন্দ করে না। হয়তো-বা কোন কোন সময় কেউ কেউ তার সাথে উপহাসছলে অনেক কিছু বলে, কিন্তু আন্তরিকভাবে তাকে ঘৃণা করে। মজলিসে এমন লোককে বসতে বাধা দিতে না পারলেও মনে মনে লোকে তাকে 'দূর-দূর' করে।

যে মানুষ কথায় কথায় ক্রিটিসাইজ করে, নানা ভঙ্গিমায় মুখ বাঁকিয়ে কত রকমের টানা-টানা কথা বলে, যে মানুষের কথার ভাঁজে ভাঁজে অহংকার পরিস্ফুট হয়, সে মানুষকে কি কোন মানুষ ভালোবাসতে পারে? সে মানুষকে কি কেউ নিজের নিকট করতে চায়, সে মানুষের কাছাকাছি কেউ কি বসতে চায়? অবশ্যই না।

হলেই বা সে মুসলিম, সে সমাজ থেকে বহু দূরে। সমাজের সদস্য হয়েও সমাজচ্যুত সে। যার মাঝে সামাজিকতা নেই, সমাজ তাকে স্থান দেবে কেন? সমাজে এমন ব্যক্তিই আসল অপাঙ্‌ক্তেয়। যার মাঝে অহংকার আছে, সেই আসল ঘৃণ্য জীব।

সবচেয়ে বেশি ঘৃণ্য ব্যক্তি

চরিত্রগত বহু কারণে মানুষ মানুষের নিকট ঘৃণ্য হয়। কিন্তু যে ব্যক্তি মহান আল্লাহর কাছে ঘৃণ্য, সে সবার চাইতে বেশি ঘৃণ্য।

যে সকল ব্যক্তিবর্গ মহান আল্লাহর নিকট সবার চাইতে বেশি ঘৃণ্য, তারা নিম্নরূপ ঃ-

১। অত্যন্ত ঝগড়াটে ঃ

মহানবী ﷺ বলেন,

(أَبْغَضُ الرِّجَال إِلى اللهِ الأَلَدُّ الْخَصِم).

“আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অধিক ঘৃণিত ব্যক্তি সেই, যে অত্যাধিক ঝগড়াটে ও অত্যন্ত কলহপ্রিয়।” (বুখারী, মুসলিম)

বহু মানুষ আছে, যারা কথায় কথায় হুজ্জত করে, নগণ্য কারণে ঝগড়া বাধায়, বৃথা তর্ক করে এবং তাতে তাদের গর্ব, অহংকার ও অহমিকা প্রকাশ পায়। অথবা নিজেদের ইল্ম, বিদ্যা বা অনুগ্রহ জাহির করে। অথবা অন্যায়ভাবে অপরের অপমান ও কষ্ট কামনা করে। তাতে তাদের অনেকে নিজেকে ‘হিরো’ এবং অপরকে ‘জিরো’ ধারণা করে।

এমন মানুষরা নিজেদের যুক্তি-তর্কে অপরকে তাক লাগিয়ে দেয়। এই শ্রেণীর মানুষ সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللّهُ لا يُحِبُّ الْفَسَادَ (٢٠٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ} (٢٠٦) البقرة

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে এমনও লোক আছে, যার পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তার অন্তরে যা আছে, সে সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে, কিন্তু আসলে সে অত্যন্ত ঝগড়াটে লোক। যখন সে (তোমার কাছ থেকে) প্রস্থান করে, তখন পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শস্যক্ষেত্র ও (জীব-জন্তুর) বংশনিপাতের চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না। আর যখন তাকে বলা হয়, তুমি আল্লাহকে ভয় কর, তখন তার আত্মাভিমান তাকে অধিকতর পাপাচারে লিপ্ত করে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট এবং নিশ্চয়ই তা অতি মন্দ শয়নাগার। (বাক্বারাহ ঃ ২০৪-২০৬)

২। হারাম সীমানায় পাপাচরণকারী

পাপাচরণ সব জায়গাতেই নিষিদ্ধ। কিন্তু পবিত্র জায়গায় পাপাচরণ করা দ্বিগুণ নিষিদ্ধ। সুতরাং রমযান মাসে পাপাচরণ, অন্যান্য মাসের পাপাচরণের মতো নয়। যেমন মসজিদের ভিতরে পাপাচরণ, অন্যান্য স্থানে পাপাচরণের সমান নয়।

পক্ষান্তরে এ কথা বিদিত যে, মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় স্থান হল মসজিদ। আর পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বেশি পবিত্র স্থান হল মক্কা ও মদীনার হারাম। যাকে মানুষ ‘হারাম শরীফ’ বা ‘হেরেম শরীফ’ বলে থাকে। এই হারামের পবিত্রতা রক্ষার্থে

অনেক বৈধ জিনিসও সেখানে করা অবৈধ। যেমন গাছ কাটা, শিকার করা ইত্যাদি সেখানে বৈধ নয়। তাহলে কোন পাপাচরণ করা কত পরিমাণে অবৈধ হতে পারে, তা অনুমেয়।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} (٢٥) سورة الحـج

অর্থাৎ, যারা অবিশ্বাস করে এবং মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহর পথ হতে ও ‘মাসজিদুল হারাম’ হতে; যাকে আমি করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সবারই জন্য সমান। আর যে ওতে সীমালংঘন ক’রে পাপকার্যের ইচ্ছা করে, তাকে আমি আস্বাদন করাবো মর্মন্তুদ শাস্তি। (হাজ্জ ঃ ২৫)

বড় দুঃখের বিষয় যে, হারাম সীমানায় এমন বহু মানুষ বসবাস করে, যারা তার উপযুক্ত নয়। হারাম সীমানায় অবস্থান ক’রে অনেকে ধোঁকাবাজি, ব্যভিচার, বিদআত ও শির্ক করে! অনেকে তামাক সেবন করে, নামায ত্যাগ করে, অশ্লীল ছবি দর্শন করে, অবৈধ ব্যবসা করে, আরো কত কী! তারা নিশ্চয় আল্লাহর নিকট এবং মানুষের নিকট অতিশয় ঘৃণ্য।

৩। জাহেলী যুগের কৃষ্টি অনুসরণকারী

বহু মুসলমান আছে, যারা ইসলামের আলো পেয়েও জাহেলী যুগের অন্ধকারে বসবাস করতে চায়। ইসলামের পূর্বের সেই অন্ধকার যুগের রীতি-নীতি অবলম্বন করতে চায়। জাহেলী বা মূর্খতার যুগের কুসংস্কার ইসলামী পরিবেশে পুনর্বহাল করতে চায়। সে যুগের লোকেদের আচরণ ও অভ্যাস নিজেদের পরিবেশে প্রচলিত করতে চায়।

জাহেলী যুগের কুপ্রথা ও কুসংস্কারের কিছু নমুনা পেশ করলে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে উঠবে।

কায়েস ইবনে আবূ হাযেম ؓ বলেন, আবূ বাক্র সিদ্দীক ؓ আহমাস গোত্রের যয়নাব নামক এক মহিলার নিকট এসে দেখলেন যে, সে কথা বলে না। তিনি বললেন, ‘ওর কী হয়েছে যে, কথা বলে না?’ তারা বলল, ‘ও নীরব থেকে হজ্জ করার সংকল্প করেছে।’ তিনি বললেন, ‘কথা বল। কারণ, এ (নীরবতা) বৈধ নয়। এ হল জাহেলী যুগের কাজ।’ সুতরাং সে কথা বলতে লাগল। (বুখারী)

ইবনে মাসউদ ؓ কর্তৃক বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, “সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি (বিপদে অধৈর্য হয়ে অথবা লোক দেখানোর উদ্দেশ্যে) গালে চাপড় মারে, গলা ও বুকের কাপড় ফাড়ে এবং জাহেলী যুগের (লোকেদের) মত ডাক ছেড়ে মাতম করে!” (বুখারী ১২৯৪, ২১৯৭, মুসলিম ১০৩, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ১৫৮৪নং, আহমাদ, ইবনে হিব্বান)

রসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, “যে কেউ মদ পান করবে, তার ৪০ দিনের নামায কবুল হবে না। যে ব্যক্তি তার মূত্রথলিতে ঐ মদের কিছু পরিমাণ রাখা অবস্থায় মারা যাবে, তার জন্য জান্নাত হারাম হয়ে যাবে এবং যে কেউ ঐ ৪০ দিনের ভিতরে মারা যাবে, সে জাহেলী যুগের মরণ মরবে।” (সিলসিলাহ সহীহাহ ২৬৯৫নং)

মা'রূর ইবনে সুওয়াইদ বলেন, একদা আমি আবূ যার্র ﷺ-কে দেখলাম যে, তাঁর পরনে জোড়া পোশাক রয়েছে এবং তাঁর গোলামের পরনেও অনুরূপ জোড়া পোশাক বিদ্যমান! আমি তাঁকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি ঘটনা উল্লেখ ক'রে বললেন যে, 'তিনি আল্লাহর রসূলের যুগে তাঁর এক গোলামকে গালি দিয়েছিলেন এবং তাকে তার মায়ের সম্বন্ধ ধরে হেয় প্রতিপন্ন করেছিলেন। এ কথা শুনে নবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন, "(হে আবূ যার্র!) নিশ্চয় তুমি এমন লোক; যার মধ্যে জাহেলিয়াত (ইসলামের পূর্ব যুগের অভ্যাস) রয়েছে! ওরা তোমাদের ভাই স্বরূপ এবং তোমাদের সেবক। আল্লাহ ওদেরকে তোমাদের মালিকানাধীন করেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তির ভাইকে আল্লাহ তার মালিকানাধীন করেছেন, সে ব্যক্তি যেন তাকে (দাসকে) তাই খাওয়ায়; যা সে নিজে খায় এবং তাই পরায় যা সে নিজে পরে। আর তোমরা ওদেরকে এমন কাজের ভার দিয়ো না, যা করতে ওরা সক্ষম নয়। পরন্তু যদি তোমরা এমন দুঃসাধ্য কাজের ভার দিয়েই ফেল, তাহলে তোমরা ওদের সহযোগিতা কর।" (বুখারী ও মুসলিম)

একদা মুআবিয়াহ ইবনে হাকাম ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি জাহেলী যুগের অত্যন্ত নিকটবর্তী (অর্থাৎ আমি অল্পদিন হল অন্ধযুগ থেকে নিষ্কৃতি পেয়েছি) এবং বর্তমানে আল্লাহ আমাকে ইসলামে দীক্ষিত করেছেন। আমাদের কিছু লোক গণকদের নিকট (ভাগ্য-ভবিষ্যৎ জানতে) যায়।' তিনি বললেন, "তুমি তাদের কাছে যেও না।" আমি বললাম, 'আমাদের কিছু লোক অশুভ লক্ষণ মেনে চলে।' তিনি বললেন, "এ এমন জিনিস, যা তারা নিজেদের অন্তরে অনুভব করে। সুতরাং এ (সব ধারণা) যেন তাদেরকে (বাঞ্ছিত কর্মে) বাধা না দেয়।" আমি নিবেদন করলাম, 'আমাদের মধ্যে কিছু লোক দাগ টেনে শুভাশুভ নিরূপণ করে।' তিনি বললেন, "(প্রাচীনযুগে) এক পয়গম্বর দাগ টানতেন। সুতরাং যার দাগ টানার পদ্ধতি উক্ত পয়গম্বরের পদ্ধতি অনুসারে হবে, তা সঠিক বলে বিবেচিত হবে (নচেৎ না)।" (মুসলিম)

নবী ﷺ বলেন, "চারটি কর্ম জাহেলিয়াত যুগের যা আমার উম্মত ত্যাগ করবে না; (নিজের) বংশ নিয়ে গর্ব করা, (পরের) বংশে খোঁটা মারা, নক্ষত্রের মাধ্যমে বৃষ্টির আশা করা এবং মৃতের উপর মাতম করা।" (সহীহুল জামে ৮৮৮নং)

সাহাবী আবু ওয়াক্বেদ আল-লাইষী বলেন, রসূল ﷺ-এর সাথে আমরা হুনাইনের পথে বের হলাম। তখন আমরা সদ্য নও মুসলিম ছিলাম। (কুফরী ও জাহেলী যুগের নিকটবর্তী ছিলাম।) মুশরিকদের একটি কুল গাছ ছিল; যার নিকটে ওরা ধ্যানমগ্ন হত এবং (বর্কতের আশায়) তাদের অস্ত্র-শস্ত্রকে তাতে ঝুলিয়ে রাখত; যাকে 'যা-তে আনওয়াত্ব' বলা হত। সুতরাং একদা আমরা এক কুল গাছের পাশ দিয়ে অতিক্রম করলাম। (তা দেখে) আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাদের জন্য একটি 'যা-তে আনওয়াত্ব' করে দিন যেমন ওদের রয়েছ। (তা শুনে) তিনি বললেন, 'আল্লাহু আকবার! এটাই তো পথরাজি! যার হাতে আমার জীবন আছে তাঁর কসম! তোমরা সেই কথাই বললে যে কথা বানী ইস্রাঈল মূসাকে বলেছিল, 'আমাদের জন্য এক দেবতা গড়ে দিন যেমন ওদের অনেক দেবতা রয়েছে!' মূসা বলেছিলেন, 'তোমরা মূর্খ জাতি।' অবশ্যই তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী

(জাতির) পথ অনুসরণ করবে।" (তিরমিযী ২১৮০, মুসনাদ আহমাদ ৫/২১৮ নং)

বুরাইদাহ ﷺ বলেন, 'আমরা জাহেলী যুগে আমাদের কারো ছেলে সন্তান হলে ছাগল বা ভেড়া যবেহ ক'রে তার রক্ত তার মাথায় মাখিয়ে দিতাম। কিন্তু ইসলাম আসার পর আমরা ছাগল বা ভেড়া (আক্বীক্বা) যবেহ করতাম, শিশুর মাথা নেড়া ক'রে দিতাম এবং তার মাথায় জাফরান লাগিয়ে দিতাম।' (আবূ দাউদ ২৮৪৩, ত্বাহাবী, হাকেম ৪/২৩৮, বাইহাক্বী ৯/৩০৩)

সাহাবী জারীর বিন আব্দুল্লাহ বাজালী বলেন, 'দাফনের পর মড়া বাড়িতে খানা ও ভোজের আয়োজনকে এবং লোকদের জমায়েতকে আমরা জাহেলিয়াতের মাতম হিসাবে গণ্য করতাম। (যা ইসলামে হারাম।) (আহমাদ ৬৯০৫নং, ইবনে মাজাহ ১৬১২নং, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৩০৮নং)

জাহেলী যুগের একটি আচরণ সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেন,

{ثُمَّ أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّن بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُّعَاسًا يَغْشَى طَآئِفَةً مِّنكُمْ وَطَآئِفَةٌ قَدْ أَهَمَّتْهُمْ أَنفُسُهُمْ يَظُنُّونَ بِاللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ يَقُولُونَ هَل لَّنَا مِنَ الأَمْرِ مِن شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ يُخْفُونَ فِي أَنفُسِهِم مَّا لاَ يُبْدُونَ لَكَ يَقُولُونَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هَاهُنَا قُل لَّوْ كُنتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِينَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ إِلَى مَضَاجِعِهِمْ} (١٥٤) سورة آل عمران

অর্থাৎ, অতঃপর তিনি তোমাদেরকে দুঃখের পর তন্দ্রারূপে নিরাপত্তা (ও শান্তি) প্রদান করলেন, যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল। আর একদল ছিল যারা নিজের জান নিয়েই ব্যস্ত ছিল। প্রাক্-ইসলামী অজ্ঞদের ন্যায় আল্লাহ সম্বন্ধে অবাস্তব ধারণা পোষণ করেছিল। তারা বলেছিল যে, 'এ বিষয়ে আমাদের কি কোন এখতিয়ার আছে?' বল, 'সমস্ত বিষয় আল্লাহরই এখতিয়ারভুক্ত।' তারা তাদের অন্তরে এমন কিছু গোপন রাখে, যা তোমার নিকট প্রকাশ করে না। তারা বলে, 'যদি এ ব্যাপারে আমাদের কোন এখতিয়ার থাকত, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না।' বল, 'যদি তোমরা তোমাদের গৃহে অবস্থান করতে, তবুও নিহত হওয়া যাদের ভাগ্যে অবধারিত ছিল, তারা নিজেদের বধ্যভূমিতে এসে উপস্থিত হত।' (আলে ইমরানঃ ১৫৪)

রাষ্ট্রনেতার অধীনস্থ জামাআত থেকে বিচ্ছিন্ন থাকা জাহেলী যুগের আচরণ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(وَمن مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقه بيعَة مَاتَ ميتَة جَاهِلِيَّة).

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মারা গেল অথচ তার ঘাড়ে কোন বায়আতের রশি নেই, সে জাহেলী যুগের মরণ মরল। (মুসলিম, হাকেম ১/৭৭, মিশকাত ৩৬৭৪নং)

হক-নাহক না বুঝেই অন্ধ পক্ষপাতিত্বের বশে লড়াই-ঝগড়া করা সেই জাহেলী যুগের আচরণ। এ লড়াইয়ে যে মারা যায়, তার মরণ জাহেলী যুগের মরণ। (মুসলিম ৪৮৯২নং)

মহান আল্লাহ জাহেলী যুগের অন্য একটি আচরণ উল্লেখ ক'রে বলেন,

{إِذْ جَعَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى

الْمُؤْمِنِينَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وَأَهْلَهَا وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا} (٢٦) سورة الفتح

অর্থাৎ, যখন অবিশ্বাসীরা তাদের অন্তরে গোত্রীয় অহমিকা ---অজ্ঞতা যুগের অহমিকা পোষণ করেছিল, তখন আল্লাহ তাঁর রসূল ও বিশ্বাসীদের উপর স্বীয় প্রশান্তি বর্ষণ করলেন; আর তাদেরকে তাকওয়ার বাক্যে সুদৃঢ় করলেন এবং তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আর আল্লাহ সমস্ত বিষয়ে সম্যক জ্ঞান রাখেন। (ফাত্হ ঃ ২৬)

জাহেলী যুগের আরো একটি আচরণ সম্বন্ধে মহান আল্লাহ মুসলিম নারীদেরকে সতর্ক ক'রে বলেন,

{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ} (٣٣) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর এবং (প্রাক্-ইসলামী) জাহেলী যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শন করে বেড়িয়ো না। তোমরা নামায প্রতিষ্ঠা কর ও যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগতা হও। (আহ্যাব ঃ ৩৩)

বর্তমানে আধুনিকতার নামে অসভ্যতা ও বেলেল্লাপনা সেই জাহেলী যুগেরই নমুনা। আসল সেকেলেপনা ঐ ঘৃণ্য আধুনিকারাই প্রদর্শন ক'রে থাকে। প্রগতির নামে দুর্গতির সেই আচরণ বড় প্রাচীন। অথচ প্রগতি মানে সামনে অগ্রসর হওয়া, পিছনে ফিরে যাওয়া নয়।

মুসলিমদের উচিত নয়, মুসলিম সমাজে জাহেলী যুগের রীতি-নীতির অনুসরণ ক'রে নিজেদেরকে ঘৃণ্য ক'রে তোলা। মুসলিমদের জন্য তো মহান আল্লাহর বিধানই সবচেয়ে সুন্দর। মহান আল্লাহ বলেন,

{أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ} (٥٠) سورة المائدة

অর্থাৎ, তবে কি তারা প্রাক-ইসলামী (জাহেলী) যুগের বিচার-ব্যবস্থা পেতে চায়? খাঁটি বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বিচারে আল্লাহ অপেক্ষা কে শ্রেষ্ঠতর? (মায়িদাহ ঃ ৫০)

৪। খুনী

খুন করা মহাপাপ। কিয়ামতে বান্দার হক সংক্রান্ত বিষয়ক প্রথম বিচার হবে এই খুনের। মানুষ খুন করার ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ} (٣٢) سورة المائدة

অর্থাৎ, এ কারণেই বনী ইস্রাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, যে ব্যক্তি নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার দন্ডদান উদ্দেশ্য ছাড়া কাউকে হত্যা করল, সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণরক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। তাদের নিকট তো আমার রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ এনেছিল,

কিন্তু এর পরও অনেকে পৃথিবীতে সীমালংঘনকারীই রয়ে গেল। (মায়িদাহ ঃ ৩২)

{وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا} (٩٣) سورة النساء

অর্থাৎ, আর যে কেউ ইচ্ছাকৃতভাবে কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করবে, তার শাস্তি জাহান্নাম। সেখানে সে চিরকাল থাকবে এবং আল্লাহ তার প্রতি রুষ্ট হবেন, তাকে অভিসম্পাত করবেন এবং তার জন্য মহাশাস্তি প্রস্তুত ক'রে রাখবেন। (নিসা ঃ ৯৩)

বলাই বাহুল্য, এমন কাজ বড়ই ঘৃণ্য। খুন করা ও খুনের দাবী করা উভয়ই ঘৃণ্য। মহানবী ﷺ বলেন,

(أَبْغَضُ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ ثَلَاثَةٌ مُلْحِدٌ فِي الْحَرَمِ وَمُبْتَغٍ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَمُطَّلِبُ دَمِ امْرِئٍ بِغَيْرِ حَقٍّ لِيُهَرِيقَ دَمَهُ).

"তিন ব্যক্তি আল্লাহর নিকট সব মানুষের চাইতে বেশী ঘৃণিত; যে ব্যক্তি (মক্কা-মদীনার) হারাম সীমানার ভিতরে সীমালংঘন করে পাপ কার্য (ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি) করে, যে ব্যক্তি ইসলামে থেকে জাহেলী যুগের কৃষ্টি-তরীকা অনুসন্ধান করে এবং যে ব্যক্তি নাহক কোন মুসলিমকে খুন করার চেষ্টা করে।" *(বুখারী ৬৮৮২নং)*

সৃষ্টির নিকৃষ্টতম জীব

কাফের ও মুশরিকরা সৃষ্টির নিকৃষ্টতম জীব। মহান স্রষ্টা আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا أُوْلَئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ} (٦) سورة البينة

অর্থাৎ, নিশ্চয় আহলে কিতাব ও মুশরিকদের মধ্যে যারা কুফরী করেছে, তারা দোযখের আগুনের মধ্যে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; তারাই সৃষ্টির অধম। (বাইয়েনাহ ঃ ৬)

মহানবী ﷺ-এর অসুস্থ থাকার সময় তাঁর কিছু স্ত্রী হাবশার 'মারিয়াহ' নামক গির্জার কথা আলোচনা করছিলেন। তাঁদের মধ্যে উম্মে সালামা ও উম্মে হাবীবা হিজরতের সময় তা দেখেছিলেন। সুতরাং তাঁরা তাঁর সৌন্দর্য ও ছবি বা মূর্তির কথা উল্লেখ করলেন। তা শুনে নবী ﷺ বললেন,

« إِنَّ أُولَئِكِ إِذَا كَانَ فِيهِمُ الرَّجُلُ الصَّالِحُ فَمَاتَ بَنَوْا عَلَى قَبْرِهِ مَسْجِدًا وَصَوَّرُوا فِيهِ تِلْكَ الصُّوَرَ، أُولَئِكِ شِرَارُ الْخَلْقِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ».

"ওরা এমন লোক, যাদের কোন নেক লোক মারা গেলে ওরা তাঁর কবরের উপর মসজিদ বানাত এবং তার মাঝে তাঁর ছবি বা মূর্তি বানিয়ে রাখত। ওরা কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক।" *(বুখারী-মুসলিম)*

খাওয়ারেজ বা বিদ্রোহীদল ঃ যারা মুসলিম রাষ্ট্রনেতার আনুগত্য থেকে বের হয়ে যায়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(سَيَكُونُ فِي أُمَّتِي خِلَافٌ وَفُرْقَةٌ قَوْمٌ يُحْسِنُونَ الْقِيلَ وَيُسِيئُونَ الْفِعْلَ يَقْرَءُونَ الْقُرْآنَ لَا يُجَاوِزُ تَرَاقِيَهُمْ يَحْقِرُ أَحَدُكُمْ صَلَاتَهُ مَعَ صَلَاتِهِمْ وَصِيَامَهُ مَعَ صِيَامِهِمْ يَمْرُقُونَ مِنْ الدِّينِ مُرُوقَ السَّهْمِ مِنْ الرَّمِيَّةِ لَا يَرْجِعُونَ حَتَّى يَرْتَدُّوا عَلَى فُوقِهِ هُمْ شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ يَدْعُونَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءٍ مَنْ قَاتَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بِاللَّهِ مِنْهُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا سِيمَاهُمْ قَالَ التَّحْلِيقُ).

"আমার উম্মতের মাঝে মতবিরোধ ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হবে। একদল হবে যাদের কথাবার্তা সুন্দর হবে এবং কর্ম হবে অসুন্দর। তারা কুরআন পাঠ করবে, কিন্তু তা তাদের গলদেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করবে না। তোমাদের কেউ নিজ নামাযকে তাদের নামাযের কাছে এবং তার রোযাকে তাদের রোযার কাছে তুচ্ছ মনে করবে। তারা দ্বীন থেকে এমনভাবে বের হয়ে যাবে, যেমন তীর শিকার ভেদ ক'রে বের হয়ে যায়। তারা (সেইরূপ দ্বীনে) ফিরে আসবে না, যেরূপ তীর ধনুকে ফিরে আসে না। তারা সৃষ্টির সবচেয়ে নিকৃষ্ট জাতি। শুভ পরিণাম তার জন্য, যে তাদেরকে হত্যা করবে এবং যাকে তারা হত্যা করবে। তারা আল্লাহর কিতাবের দিকে মানুষকে আহবান করবে, অথচ তারা (সঠিকভাবে) তার উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে না। যে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, সে হবে বাকী উম্মত অপেক্ষা আল্লাহর নিকটবর্তী। তাদের চিহ্ন হবে মাথা নেড়া।" (আহমাদ, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৩৬৬৮-নং)

এরা সেই খাওয়ারেজ দল, যাদের আবির্ভাব ঘটেছিল তৃতীয় খলীফা উষমান ﷺ-এর যুগে। অথচ ইসলামের নির্দেশ ছিল, ক্ষমতাসীন মুসলিম রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা যাবে না।

মহানবী ﷺ বলেন, "অদূর ভবিষ্যতে তোমাদের উপর এমন শাসকবৃন্দ নিযুক্ত করা হবে, যাদের (কিছু কাজ) তোমরা ভালো দেখবে এবং (কিছু কাজ) গর্হিত। সুতরাং যে ব্যক্তি (তাদের গর্হিত কাজকে) ঘৃণা করবে, সে দায়িত্বমুক্ত হয়ে যাবে এবং যে আপত্তি ও প্রতিবাদ জানাবে, সেও পরিত্রাণ পেয়ে যাবে। কিন্তু যে ব্যক্তি (তাতে) সম্মত হবে এবং তাদের অনুসরণ করবে (সে ধ্বংস হয়ে যাবে)।" সাহাবীগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব না?' তিনি বললেন, "না; যে পর্যন্ত তারা তোমাদের মাঝে নামায কায়েম করবে।" *(মুসলিম)*

রসূল ﷺ বলেন, "আমি তোমাদেরকে আল্লাহ-ভীতি এবং (নেতার নেতৃত্ব) মান্য ও আনুগত্য করতে অসিয়ত করছি; যদিও তোমাদের নেতা একজন হাবশী ক্রীতদাস হয়। যেহেতু তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি (আমার মৃত্যুর পরও জীবিত থাকবে, সে বহু মতভেদ দেখতে পাবে। সুতরাং তোমরা আমার সুন্নত (আদর্শ) এবং সুপথপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশেদীনের সুন্নত (আদর্শ) অবলম্বন করো, তা শক্তভাবে ধারণ করো এবং দন্ত দ্বারা দৃঢ়ভাবে ধরো। আর অভিনব কর্মাবলী হতে দূরে থেকো। যেহেতু প্রত্যেক অভিনব কর্ম

বিদ্আত, প্রত্যেক বিদ্আত ভ্রষ্টতা এবং প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামে (নিয়ে যায়)।" *(তিরমিযী)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যদি একজন নাক-কাটা হাবশী (আফ্রিকান কৃষ্ণকায়) ক্রীতদাস তোমাদের নেতা (আমীর) রূপে নির্বাচিত হয়, তবুও তার কথা তোমরা মান্য কর, তার আনুগত্য কর; যতক্ষণ সে আল্লাহর কিতাব দ্বারা তোমাদের মাঝে নেতৃত্ব দেয়।" *(সহীহঃ আস্-সুন্নাহ, ইবনে আবী আসেম ১০৬২ নং)*

উবাদাহ বিন সামেত কর্তৃক বর্ণিত, তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট থেকে আমাদের খুশী ও কষ্টের বিষয়ে, স্বস্তি ও অস্বস্তির বিষয়ে এবং আমাদের অগ্রাধিকার নষ্ট হলেও আনুগত্য ও আদেশ পালনের উপর এবং ক্ষমতাসীন শাসকের বিদ্রোহ না করার উপর বায়আত (প্রতিশ্রুতি) গ্রহণ করেছেন। বলেছেন, "তবে হ্যাঁ, যদি তোমরা প্রকাশ্য কুফরী ঘটতে দেখ, যাতে তোমাদের নিকট আল্লাহর তরফ থেকে কোন দলীল বর্তমান থাকে (তাহলে বিদ্রোহ করতে পার)।" *(বুখারী + মুসলিম)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি জামাআত থেকে আধ হাত পরিমাণ বিচ্ছিন্ন হয়ে (সরে) গেল, সে আসলে তার ঘাড় থেকে ইসলামের গলরশিকে খুলে ফেলল।" (অর্থাৎ, ইসলাম থেকে খারিজ হয়ে গেল।) *(আস্-সুন্নাহ, ইবনে আবী আসেম ৮৯২, ১০৫৩ নং)*

তিনি বলেন, "যে ব্যক্তি মারা গেল, অথচ তার কোন ইমাম (রাষ্ট্রীয়-নেতার বায়াত) নেই, সে আসলে জাহেলিয়াতের মরণ মারা গেল।" *(ঐ ১০৫৭নং)*

এ ছাড়া আরো বহু হাদীস রয়েছে, যার নির্দেশ অমান্য ক'রে খাওয়ারেজরা ক্ষমতাসীন মুসলিম রাষ্ট্রনেতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে উম্মাহর মাঝে ফিতনা ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি করে। তার জন্য তারা রক্তের গঙ্গা বইয়ে দেয়, কত সম্মানীকে সম্মানহারা করে, কত শিশুকে এতীম বানায়, মহিলাকে বিধবা বানায় এবং কত শত মানুষকে বাস্তহারা করে। অথচ তারা নিজেদেরকে মনে করে, সবার চেয়ে বেশি দ্বীনদার। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে তারাই হল সৃষ্টির সর্বনিকৃষ্ট জীব।

দ্বিতীয় এক শ্রেণীর মানুষ---সৃষ্টির সেরা হয়েও---তারা সৃষ্টির সর্বনিকৃষ্ট জীব। আর তারা হল সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সম্বন্ধে নির্বোধ ও অচেতন মানুষ, যারা আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে না, অথচ এ বিশ্বের সব কিছুই তাঁর তাসবীহ পাঠ করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلاَّ يُسَبِّحُ بِحَمْدَهِ وَلَكِن لاَّ تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا} (٤٤) سورة الإسراء

অর্থাৎ, সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং ওদের অন্তর্বর্তী সব কিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না; কিন্তু ওদের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না। নিশ্চয় তিনি অতীব সহনশীল, অত্যন্ত ক্ষমাশীল। (বানী ইস্রাঈল ঃ ৪৪)

{أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالطَّيْرُ صَافَّاتٍ كُلٌّ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ

وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ} (٤١) سورة النـــور

অর্থাৎ, তুমি কি দেখ না যে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড়ন্ত পাখীদল আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে? সকলেই তাঁর প্রশংসা এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি জানে। আর ওরা যা করে, সে বিষয়ে আল্লাহ সম্যক অবগত। *(নূর ঃ ৪১)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

«مَا تَسْتَقِلُّ الشَّمْسُ فَيَبْقَى شَيْءٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ إِلاَّ سَبَّحَ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ وَحَمِدَهُ ، إِلاَّ مَا كَانَ مِنَ الشَّيَطِانِ وَأَعْتَى بَنِي آدَمَ».

অর্থাৎ, সূর্য উপরে উঠলেই কেবল শয়তান ও সবচেয়ে বেশি অবাধ্য আদম-সন্তান ছাড়া আল্লাহ আয্যা অজাল্লার সৃষ্টির কোন কিছুই তাঁর তাসবীহ ও তাহমীদ পাঠ করতে অবশিষ্ট থাকে না।

বর্ণনাকারী জিজ্ঞাসা করলেন, 'অবাধ্য আদম-সন্তান কারা?' উত্তরে তিনি বললেন,

«شِرَارُ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ».

অর্থাৎ, আল্লাহ আয্যা অজাল্লার সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি। (আমালুল য়্যাউমি অল্লাইলাহ ১৪৮, সিঃ সহীহাহ ২২২৪নং)

সবচেয়ে বড় হতভাগ্য ব্যক্তি

পৃথিবীর মানুষদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হতভাগ্য বা বদমায়েশ লোক হল দু'টি। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((أَلَا أُحَدِّثُكُمَ بِأَشْقَى النَّاسِ رَجُلَيْنِ أُحَيْمِرُ ثَمُودَ الَّذِي عَقَرَ النَّاقَةَ، وَالَّذِي يَضْرِبُكَ يَا عَلِيُّ عَلَى هَذِهِ [يَعْنِي قَرْنَهُ] حَتَّى تُبَلَّ مِنْهُ هَذِهِ [يَعْنِي لِحْيَتَهُ])).

অর্থাৎ, আমি কি তোমাদেরকে দু'জন সবচেয়ে বড় হতভাগ্য লোকের কথা বলব না? সামূদ জাতির লালচে লোকটি, যে উটনী হত্যা করেছে। আর হে আলী! যে তোমাকে এই (মাথার সিঁথি)তে মারবে এবং (তার রক্তে তোমার) এই (দাড়ি) ভিজে যাবে। (ত্বাবারানী, হাকেম, সঃ জামে' ২৫৮৯নং)

সামূদ জাতির লালচে ঐ হতভাগ্য লোকটির নাম ছিল 'কুদ্দার বিন সালেফ'। মহান আল্লাহ তাকে সবচেয়ে বেশি হতভাগ্য বা সবচেয়ে বড় বদমায়েশ বলেছেন,

{كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا (١١) إِذْ انْبَعَثَ أَشْقَاهَا (١٢) فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللهِ نَاقَةَ اللهِ وَسُقْيَاهَا (١٣) فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنْبِهِمْ فَسَوَّاهَا (١٤) وَلا يَخَافُ عُقْبَاهَا} (١٥)

সামূদ সম্প্রদায় অবাধ্যতাবশতঃ (সত্যকে) মিথ্যা জ্ঞান করল। তাদের মধ্যে যে সর্বাধিক হতভাগ্য, সে যখন তৎপর হয়ে উঠল। তখন আল্লাহর রসূল তাদেরকে বলল, 'আল্লাহর উষ্ট্রী ও তাকে পানি পান করাবার বিষয়ে সাবধান হও।' কিন্তু তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলল।

অতঃপর ঐ উষ্ট্রীকে হত্যা করল। সুতরাং তাদের পাপের জন্য তাদের প্রতিপালক তাদেরকে সমূলে ধ্বংস ক'রে একাকার ক'রে দিলেন। আর তিনি ওর পরিণামকে ভয় করেন না। (শাম্‌স ঃ ১১-১৫)

আর দ্বিতীয় হতভাগ্যটি ছিল আলী ﷺ-এর খুনী ঃ আব্দুর রহমান বিন মুলজিম।

সন চল্লিশ হিজরীর রমযান মাসে মক্কার হারামে তিনজন খারেজী একত্রে পরামর্শ করল, নাহরাওয়ানে সাথী-সঙ্গীদের হত্যার প্রতিশোধ নিতেই হবে। তারা সিদ্ধান্ত নিল, এই পবিত্র মাসে ভ্রষ্টদের তিন নেতা আলী, মুআবিয়া ও আম্র বিন আসকে হত্যা ক'রে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে! সুতরাং রাত জেগে ইবাদত ক'রে দিনে রোযা রেখে এক সময় তারা উক্ত সংকল্প নিয়ে একে অন্যকে কেঁদে বিদায় দিয়ে মক্কা ত্যাগ করল।

আল্লাহর নবী ﷺ-এর জামাতা, ফাতেমার স্বামী, হাসান-হুসাইনের পিতা, চতুর্থ খলীফা, আমীরুল মু'মিনীন আলী ﷺ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে উক্ত হাদীস দ্বারা খবর পেয়েছিলেন যে, তিনি কারো হাতে হত্যা হয়ে শহীদ হবেন। এই জন্য তিনি বিদ্রোহী খাওয়ারেজদের ফিতনার সময় কূফার রাস্তায় চলতে চলতে প্রায় বলতেন, 'ওহে আবূ তালেবের পুত্র!

أشدد حيازيمك للموت فإن الموت لاقيك

ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك

অর্থাৎ, মৃত্যুর জন্য বেঁধে-ছেঁদে প্রস্তুত থাক, কারণ নিশ্চয় মৃত্যু তোমার সাক্ষাতে আসবে।

মৃত্যু (দেখে) ঘাবড়ে যেয়ো না; যখন তা তোমার (দেহ) উপত্যকায় নামবে।'

যথা সময়ে ইবনে মুলজিম কূফায় পৌঁছে গেল। আলী ﷺ সতেরো রমযান ফজরের নামাযের জন্য মসজিদে যাচ্ছিলেন। পথে কোন এক সংকীর্ণ স্থানে সে তলোয়ার চালিয়ে তাঁর উপর হামলা ক'রে বলল, 'গ্রহণ কর (তরবারির আঘাত) ওহে আবূ তালেবের বেটা! নিজের জন্য কাফের হওয়ার কথা সাক্ষ্য দাও। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বিধান চলবে না।'

তরবারি মাথায় লাগলে মুখ থেঁতলে পড়লেন আমীরুল মু'মিনীন। হাসান ﷺ সঙ্গে ছিলেন। তিনি খুনীকে ধরতে আদেশ করলে, তাকে ধরা হল।

কী সুন্দর তার চেহারা! কপালে সিজদার কালো দাগ। সে অনেক অনেক নামায-রোযা ও অন্যান্য ইবাদত করে। অনেক অনেক আল্লাহর যিক্র করে। আল্লাহর বিধানকেই সর্ববিষয়ে প্রাধান্য দেয়। আল্লাহর জন্য জান দেয়, জান নেয়। আল্লাহর জন্যই আজ আমীরুল মু'মিনীনের জান নিতে চেয়েছে সে। যিনি তাকে কত সহযোগিতা করেছেন, অভাবে অনুগ্রহ করেছেন, কত অর্থ দিয়ে সাহায্য করেছেন। কিন্তু এই নিমকহারামি আল্লাহর জন্য!

খলীফা আলী ﷺ-কে বাসায় বহন ক'রে আনা হল। ইবনে মুলজিমকে তাঁর সামনে পেশ করা হলে তিনি তাকে বললেন, 'হে আল্লাহর দুশমন! আমি কি তোমার প্রতি অনুগ্রহ করিনি? আমি কি তোমাকে এত এত মাল দিয়ে সাহায্য করিনি? আমি কি ?'

নিমকহারাম বলল, 'হ্যাঁ।'

আলী ﷺ বললেন, 'আমি ওর জীবন চাই, আর ও আমার হত্যা চায়! (এ যেন দুধ দিয়ে

কাল সাপ পুষেছিলাম!) আমি মারা গেলে ওকে হত্যা করো। আর যদি আমি বেঁচে থাকি, তাহলে আমিই তার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেব।'

গোঁড়া ধর্মান্ধ ইবনে মুলজিম বলল, 'আমি ঐ তরবারিতে চল্লিশ দিন শান দিয়েছি এবং আল্লাহর কাছে দুআ করেছি যে, ওর দ্বারা আল্লাহর সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টিকে হত্যা করব।'

আলী ﵁ বললেন, 'আমি মনে করি, তুমিই আল্লাহর সবচেয়ে নিকৃষ্ট সৃষ্টি। ঐ তরবারি দ্বারা তোমারই গর্দান উড়ানো হবে।'

সুতরাং তাই হল। পৃথিবীর সবচেয়ে বড় হতভাগ্য বা বদমায়েশদের দ্বিতীজনকে তারই তরবারি দিয়ে হত্যা করা হল। কিন্তু চরমপন্থীর আঘাত থেকে সুস্থ হয়ে সরলপন্থী আমীরুল মু'মিনীনও বাঁচতে পারলেন না। তিন দিন পর ২১শে রমযান সন ৪০ হিজরী তিনি দেহত্যাগ করলেন। রাযিয়াল্লাহু আনহু অআরয়্যাহ।

উম্মতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি

উম্মতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি হল অহংকারী ব্যক্তি, যে বেশি বিলাসিতা পছন্দ করে, ভোজন-বিলাসী, পরন-বিলাসী ও আরোহণ-বিলাসী হয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(شِرَارُ أُمَّتِي الَّذِينَ غُذُّوا بِالنَّعِيمِ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَلْوَانَ الطَّعَامِ وَيَلْبَسُونَ أَلْوَانَ الثِّيَابِ وَيَتَشَدَّقُونَ فِي الكَلَامِ). وفي رواية زاد فيه : (وَيَرْكَبُونَ مِنَ الدَّوَابِّ أَلْوَاناً).

অর্থাৎ, আমার উম্মতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক তারা, যারা নিয়ামতে লালিত হয়েছে, যারা নানা রঙের খাদ্য ভক্ষণ করে, নানা রঙের বস্ত্র পরিধান করে এবং কথায় আলস্যভাব ও কায়দা প্রকাশ করে।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, 'তারা নানা রঙের সওয়ারীতে চড়ে।' (সিঃ সহীহাহ ১৮৯১নং)

তিনি আরো বলেছেন,

(شِرَارُ أُمَّتِي الثَّرْثَارُونَ الْمُتَشَدِّقُونَ الْمُتَفَيْهِقُونَ وَخِيَارُ أُمَّتِي أَحَاسِنُهُمْ أَخْلَاقاً).

অর্থাৎ, আমার উম্মতের সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোক তারা, যারা অনর্থক অত্যধিক আবোল-তাবোল বলে ও বাজে বকে এমন বাচাল ও বখাটে লোক; যারা অহংকারের সাথে আলস্যভরে বা কায়দা করে টেনে-টেনে কথা বলে। আর আমার উম্মতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লোক তারা, যারা চরিত্রে সবার চেয়ে সুন্দর। (সঃ জামে' ৩৭০৪নং)

নিকৃষ্টতম লোক

সমাজে নিকৃষ্ট লোকের অভাব নেই। একটা খুঁজতে হাজারটা মিলবে। কিন্তু সব থেকে নিকৃষ্ট ব্যক্তি কারা?

১। যারা কবরকে মসজিদ বা সিজদার জায়গা বানিয়ে নেয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(اعْلَمُوا أَنَّ شَرَّ النَّاسِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ).

অর্থাৎ, জেনে রেখো, সবচেয়ে খারাপ লোক তারা, যারা তাদের নবীদের কবরকে মসজিদ বানিয়ে নেয়। (সঃ তারগীব ১১৩২নং)

২। যে স্বামী তার স্ত্রী-মিলন-রহস্য এবং যে স্ত্রী তার স্বামী-মিলন-রহস্য অপরের কাছে প্রকাশ করে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

«إِنَّ مِنْ أَشَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ مَنْزِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِي إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِي إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا».

"কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মানের দিক থেকে সবচেয়ে জঘন্য মানের এক ব্যক্তি হল সে, যে স্বামী স্ত্রী-মিলন করে এবং যে স্ত্রী স্বামী-মিলন করে, অতঃপর একে অন্যের মিলন-রহস্য (অপরের নিকট) প্রচার করে।" *(মুসলিম ১৪৩৭, আবূ দাউদ ৪৮৭০নং)*

আসমা বিন্তে ইয়াযিদ (রাঃ) বলেন, একদা আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে ছিলাম, আর তাঁর সেখানে অনেক পুরুষ ও মহিলাও বসেছিল। তিনি বললেন, "সম্ভবতঃ কোন পুরুষ নিজ স্ত্রীর সাথে যা করে তা (অপরের কাছে) বলে থাকে এবং সম্ভবতঃ কোন মহিলা নিজ স্বামীর সাথে যা করে তা (অপরের নিকট) বলে থাকে?" এ কথা শুনে মজলিসের সবাই কোন উত্তর না দিয়ে চুপ থেকে গেল। আমি বললাম, 'জী হ্যাঁ। আল্লাহর কসম, হে আল্লাহর রসূল! মহিলারা তা বলে থাকে এবং পুরুষরাও তা বলে থাকে।' অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা এরূপ করো না। যেহেতু এমন ব্যক্তি তো সেই শয়তানের মতো, যে কোন নারী-শয়তানকে রাস্তায় পেয়ে সঙ্গম করতে লাগে, আর লোকেরা তার দিকে চেয়ে চেয়ে দেখে।" *(আহমাদ, ইবনে আবী শাইবাহ, আবূ দাউদ, বাইহাক্বী প্রভৃতি, আদাবুয যিফাফ ১৪৩পৃঃ)*

৩। যারা দু'মুখে কথা বলে এমন সুবিধাবাদী লোক।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(مِنْ شَرِّ النَّاسِ ذُو الْوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هؤُلَاءِ بِوَجْهٍ وَهؤُلَاءِ بِوَجْهٍ).

"দু'মুখো লোক নিকৃষ্টতম মানুষদের অন্যতম। যে এর নিকট এক মুখে আসে এবং ওর নিকট আর এক মুখে আসে।" *(আবূ দাঊদ, সহীহুল জামে' ৫৭৯৩নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ذَا الْوَجْهَيْنِ).

অর্থাৎ, কিয়ামতে সব চাইতে মন্দ লোকদের মধ্যে একজনকে পাবে, যে দু'মুখে কথা বলে।" *(আহমাদ ১০৪২৭, তিরমিযী ২০২৫নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "দুনিয়াতে যে ব্যক্তির দু'টি মুখ হবে (দু'মুখে কথা বলবে) কিয়ামতের দিন সে ব্যক্তির আগুনের দু'টি জিভ হবে।" *(আবূ দাউদ ৪৮৭৩, ইবনে হিব্বান, সিলসিলাহ সহীহাহ ৮৯২নং)*

তিনি আরো বলেছেন, দু'মুখো লোকের জন্য আমানতদার হওয়া সঙ্গত নয়। (সিঃ

সহীহাহ ৩১৯৭নং)

'গোদা বাড়ি, ছাঁদন দড়ি এখন তুমি কার? যখন যার কাছে থাকি তখন আমি তার!' এই হল দু'মুখোদের অবস্থা; কখনো এরা 'চোরকে বলে চুরি করতে আর গৃহস্থকে বলে সজাগ থাকতে।' সুতরাং তারা মোটেই ভল লোক নয়।

'স্বার্থের বালাই তরে কহিতে উচিত কথা
কুণ্ঠিত যারা তারা সৎলোক নহে,
যেদিকে পেটের সেবা সেই দিকে বলে কথা
যেমত সুবিধা দেখে সেই মত কহে।'

৪। যাদের উপর কিয়ামত কায়েম হবে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ عَلَى شِرَارِ النَّاسِ).

অর্থাৎ, সবচেয়ে নিকৃষ্ট লোকের উপরেই কিয়ামত কায়েম হবে। (মুসলিম, আহমাদ, সঃ জামে' ৭৪০৭নং)

কিয়ামতের পূর্বমুহূর্তে যে সকল লোক অবশিষ্ট থাকবে, তারা হবে জাহেলী যুগের লোক অপেক্ষা বেশি নোংরা। তাদের এমন অবস্থা হবে যে, লোকের সামনেই গাধার মতো যৌন-মিলন করবে। যদিও সেই আচরণ বিশ্বের বহু পার্ক ও সমুদ্রসৈকতে এখন থেকেই শুরু হয়ে গেছে।

৫। মস্তান, সন্ত্রাসী ও বদমায়েশ লোক।

সমাজে এমন কিছু লোক আছে, যাদেরকে মানুষ শ্রদ্ধা ও সম্মানের চোখে দেখে না। কিন্তু সামনে এলে তাদের ভয়ে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদর্শন করে। এরা যেমন সমাজে নিকৃষ্ট ও ঘৃণ্য, আল্লাহর কাছেও তাই। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ شِرَارَ النَّاسِ الَّذِيْنَ يُكْرَمُوْنَ اتِّقَاءَ شَرِّهِمْ).

অর্থাৎ, সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টমানের লোক তারা, যাদেরকে তাদের ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য সম্মান করা হয়। (আবূ দাঊদ, সঃ জামে' ৭৯২৩নং)

এক অভদ্র ব্যক্তি আল্লাহর নবী ﷺ-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে চাইল। নবী ﷺ-এর কাছে খবর গেলে তিনি বললেন, "বাজে লোক!" তারপর তাকে প্রবেশ করার অনুমতি দিলেন। সে যখন বসল, তখন নবী ﷺ তার সামনে খুশী প্রকাশ করলেন এবং নম্রভাবে কথা বলতে লাগলেন। অতঃপর লোকটি চলে গেলে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি তার সম্পর্কে এই এই (কুমন্তব্য) করলেন। তারপর সে যখন ভিতরে এল, তখন তার সামনে খুশী প্রকাশ করলেন এবং নম্রভাবে কথা বলতে লাগলেন!' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্টমানের ব্যক্তি সেই হবে, যাকে মানুষ তার অশ্লীলতা থেকে বাঁচার জন্য বর্জন ক'রে থাকে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

'মন্দ লোক অগ্নিবৃক্ষের মত, যা এক অপরকে জ্বালিয়ে থাকে। আর সবচেয়ে মন্দ লোক হল তারা, যাদের অনিষ্টের ভয়ে তাদেরকে সম্মান করা হয়।'

সর্বনিকৃষ্ট আল্লাহর বান্দা

নিকৃষ্ট বান্দার অভাব নেই। নিকৃষ্ট কাজ করলেই বান্দা নিকৃষ্ট হয়। কিন্তু সবচেয়ে বেশি নিকৃষ্ট বান্দা কে?

মহানবী ﷺ বলেছেন,

خِيَارُ عِبَادِ اللَّهِ الَّذِينَ إِذَا رُءُوا ذُكِرَ اللَّهُ وَشِرَارُ عِبَادِ اللَّهِ الْمَشَّاءُونَ بِالنَّمِيمَةِ الْمُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَحِبَّـةِ الْبَاغُونَ الْبُرَآءَ الْعَنَتَ)

অর্থাৎ, আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা তারা, যাদেরকে দেখলে আল্লাহ স্মরণ হয়। আর আল্লাহর সর্বনিকৃষ্ট বান্দা হল তারা, যারা চুগলখোরি ক'রে বেড়ায়, বন্ধুদের মাঝে বিচ্ছিন্নতা ঘটায় এবং নির্দোষ লোকেদের মাঝে দোষ (বা কষ্ট) খুঁজে বেড়ায়।" *(আহমাদ, বাইহাক্বী, সিঃ সহীহাহ ২৮৪৯নং)*

মানুষের মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট গুণ

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

(شَرُّ مَافِي رَجُلٍ شُحٌّ هَالِعٌ وَجُبْنٌ خَالِعٌ).

"পুরুষের মাঝে দু'টি চরিত্র বড় নিকৃষ্টতম; কাতরতাপূর্ণ কার্পণ্য এবং সীমাহীন ভীরুতা।" *(আহমাদ ২/৩২০, আবূ দাঊদ ২৫১১, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ৩৭০৯নং)*

ধন থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ কৃপণ হয় এবং শক্তি থাকা সত্ত্বেও যদি কেউ ভীরু হয়, তাহলে সত্যই তা নিন্দনীয় চরিত্র এবং অপছন্দনীয় গুণ। পক্ষান্তরে একজন মু'মিন হয় নির্ভীক বীর এবং দানশীল উদার।

সবচেয়ে নিকৃষ্ট কর্ম

যত পাপ আছে, সবই নিকৃষ্ট। তবে পাপের চাইতে বেশি নিকৃষ্ট কর্ম বিদআত। মহানবী ﷺ খুতবার প্রারম্ভে বলতেন,

« أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ وَشَرُّ الأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ».

অর্থাৎ, আম্মা বা'দ (আল্লাহর প্রশংসা ও সাক্ষ্য দান করার পর) নিঃসন্দেহে সর্বোত্তম কথা আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম রীতি মুহাম্মাদ ﷺ-এর রীতি। আর নিকৃষ্টতম কাজ (দ্বীনে) নব আবিষ্কৃত কর্মসমূহ এবং প্রত্যেক বিদআত ভ্রষ্টতা। (মুসলিম ২০৪২নং)

তিনি বলতেন, "(দ্বীনে) নবরচিত কর্মসমূহ হতে সাবধান! কারণ, নিশ্চয়ই প্রত্যেক বিদআত (নতুন আমল) হল ভ্রষ্টতা।" *(আবূ দাঊদ ৪৪৪৩, তিরমিযী ২৮১৫, ইবনে মাজাহ ৪২ নং)*

আর নাসাঈর এক বর্ণনায় আছে, "আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতা জাহান্নামে (নিয়ে যায়)।"

পাপ থেকে বিদআত বেশি নিকৃষ্ট কেন?

সুফইয়ান ষওরী (রঃ) বলেন, 'ইবলীসের নিকট পাপের চেয়ে বিদআতই অধিকতর পছন্দনীয়। কারণ, পাপ হতে তওবার আশা থাকে, কিন্তু বিদআত হতে তওবার কোন সম্ভাবনা থাকে না। (অর্থাৎ, তওবার তওফীকই লাভ হয় না। কারণ, বিদআতী তার বিদআত কর্মকে দ্বীন মনে ক'রে থাকে।)

মহানবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা প্রত্যেক বিদআতী হতে তওবা অন্তরিত করেছেন।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১৬২০নং)*

ইয়াহয়্যা বিন আবী উমার শাইবানী বলেন, 'বলা হতো যে, বিদআতীদের তওবা আল্লাহ অগ্রাহ্য করেন এবং বিদআতী অধিকতর মন্দ বিদআতের দিকে স্থানান্তরিত হয়।'

এ প্রসঙ্গেই আওয়াম বিন হাওশাব তাঁর পুত্রের উদ্দেশ্যে বলতেন, 'হে (বৎস) ঈসা! তুমি তোমার চিত্ত বিশুদ্ধ কর ও ধন অল্প কর। আল্লাহর কসম! ঈসাকে বিরুদ্ধাচারী (বিদআতী)দের দলে বসতে দেখার চাইতে তাকে গানবাদ্য ও মদের মজলিসে বসতে দেখা আমার নিকট (তুলনামূলকভাবে) অধিকতর পছন্দনীয়।'

কারণ বিদআতী তার বিদআতকে দ্বীন মনে করে এবং দ্বীনকে ধারণ ও মান্য করার মতোই বিদআতকে ধারণ ও মান্য করে চলে। আবার কোন কারণবশতঃ ঐ বিদআত থেকে বহির্গত হলে অন্য কোন বড় বিদআতে প্রবেশ করে। পক্ষান্তরে মহাপাপী যারা; যেমন ব্যভিচারী, গান-বাদ্যকারী ও শ্রবণকারী মদ্যপায়ী ইত্যাদি, তারা নিজ কামবশীভূত। তারা জানে যে, তারা যা করে তা মহাপাপ। কিন্তু তাদের কামপ্রবৃত্তি এবং মন্দকর্ম-প্রবণ মনের বশবর্তী হয়ে তা বর্জন করতে সহজে সক্ষম হয় না। সম্ভবতঃ তাদের অবৈধতা-জ্ঞানের ফলে কখনো তা পরিহার করতেও পারে। যেহেতু গোনাহগার মানুষের ক্ষেত্রে তওবা, অনুশোচনা এবং সমূলে মন্দ কাজ বর্জন করার অধিক সম্ভাবনা ও আশা থাকে; যতটা বিদআতকে ধর্ম জ্ঞানকারী বিদআতীর ক্ষেত্রে থাকে না।

ইবনে আবী আসেম প্রভৃতি বর্ণনা করেন যে, নবী ﷺ বলেছেন, "শয়তান বলে আমি মানুষকে বিভিন্ন পাপ দ্বারা সর্বনাশগ্রস্ত করেছি; কিন্তু ওরা আমাকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও ইস্তিগফার দ্বারা ধ্বংস করেছে। অতঃপর যখন আমি তা লক্ষ্য করলাম, তখন ওদের মধ্যে কুপ্রবৃত্তি প্রক্ষিপ্ত করলাম। সুতরাং ওরা পাপ করবে; কিন্তু আর ইস্তিগফার করবে না। কারণ, তারা ধারণা করবে যে, তারা ভালো কাজই করছে।"

ইমাম ইবনুল কাইয়েম (রঃ) বলেন, সাধারণ পাপীর পাপের ক্ষতি তার নিজের উপরই বর্তায়, কিন্তু বিদআতীদের বিদআতের ক্ষতি ও অনিষ্ট শ্রেণী (বহু মানুষের) উপর ব্যাপক হয়। বিদআতীর ফিৎনা হয় মূল দ্বীনে অথচ সাধারণ পাপীর ফিৎনা তার প্রবৃত্তিতে হয়। বিদআতী সহজ ও সরল পথের উপর বসে মানুষকে সে পথে চলা হতে বিরত করে, কিন্তু পাপী সেরূপ করে না। বিদআতী আল্লাহর গুণগ্রাম ও তাঁর পরিপূর্ণতায় আঘাত হানে, অথচ পাপী তা করে না। বিদআতী রসূল ﷺ কর্তৃক আনীত শরীয়তের পরিপন্থী হয়, কিন্তু পাপী তা হয় না। বিদআতী মানুষকে আখেরাতের সঠিক পথ হতে বিচ্যুত করে, কিন্তু পাপী

নিজেই স্বীয় পাপের কারণে মৃদুগামী হয়। *(আল-জাওয়াবুল কা-ফী)*

বিদআতীদের বিদআত খন্ডন করতে গেলে তারা 'হায়-হায়' ক'রে বলে ওঠে, 'দ্বীন গেল, দ্বীন গেল। এরা হয়তো নামায-রোযাও আর রাখবে না দেখছি! এ যে পায়জামা খাটাতে খাটাতে আন্ডার-প্যান্ট্ হয়ে যাবে দেখছি। কম্বলের রোঁয়া বাছতে বাছতে কম্বলই শেষ হয়ে যাবে মনে হয়।' যেহেতু তারা শরীয়তের মৌলিক ইবাদতসমূহের মতোই অতিরিক্ত ও সংযোজিত বিদআতকেও 'ইবাদত' ধারণা করে।

বিদআতীরা কেবল গোনাহর জন্য গোনাহগারই হয় না, বরং তারও অধিক কিছু হয়। কারণ, গোনাহগার যখন গোনাহ করে, তখন তাতে অপরের জন্য শরীয়ত-বিধায়ীর প্রতিদ্বন্দ্বিতা ক'রে কোন আদর্শ বা চিরপালনীয় রীতির রূপ দান করে না; যেমন বিদআতী ক'রে থাকে। অতএব তার দুষ্কর্ম সাধারণ দুষ্কর্মের চেয়ে বহু গুণে নিকৃষ্ট।

সবচেয়ে বেশি ঘৃণ্য আমল

খাষআম গোত্রের এক ব্যক্তি তার কিছু সঙ্গী-সাথীর সাথে এসে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন্ আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয়?'

উত্তরে তিনি বললেন, "আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা।"

সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! তারপর কী?'

তিনি বললেন, "তারপর আত্মীয়তার বন্ধন বজায় রাখা।'

সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! তারপর কী?'

তিনি বললেন, "তারপর ভালো কাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান করা।

সে আবার জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন্ আমল আল্লাহর নিকট সবচেয়ে ঘৃণ্য?'

তিনি বললেন, "আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করা।"

সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! তারপর কী?'

তিনি বললেন, "তারপর আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করা।"

সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! তারপর কী?'

তিনি বললেন, "তারপর মন্দ কাজের আদেশ ও ভালো কাজে বাধা দান করা।" (আবূ য়্যা'লা, সঃ তারগীব ২৫২২নং)

সবচেয়ে বড় কৃপণ

কৃপণ হল সেই ব্যক্তি, যে নিজের ধন পরকে দান করতে চায় না। ব্যয়কুণ্ঠ মানুষ নিজ পরিবার ও সন্তান-সন্ততির জন্য সহজে কিছু ব্যয় করতে চায় না। প্রয়োজনে টাকা খরচ করতে চায় না বখীল।

কিন্তু তার চাইতে বড় বখীল আর কে হতে পারে, যে নিজের জন্যও কিছু ব্যয় করতে চায় না? টাকা নষ্ট হওয়ার ভয়ে খিদে পেলে খায় না, বরং অনাহারে থাকে। শীতের কাপড় ক্রয়

করে না, বরং শীতভোগ করে। চিকিৎসা করায় না, বরং অসুখ ভোগ করে।

তার চাইতে বড় কৃপণ আর কে হতে পারে, যে অপরের জিনিস দান করতেও কার্পণ্য করে? পরের ধনে পোদ্দারি ক'রে দানের জিনিস দান করতে বড় আনন্দ পাওয়া উচিত। কিন্তু তা না পেয়ে কৃপণ অপরের মালও ব্যয় করতে চায় না। সুতরাং সে কি সবার চেয়ে বড় কৃপণ নয়?

তার চাইতে বড় বখীল আর কে হবে, যে দানের বিনিময়ে বড় প্রতিদান পাবে জানা সত্ত্বেও দান করতে চায় না? দানের বিনিময়ে দশগুণ প্রতিদান লাভের কথা জেনেশুনেও দান দিতে কার্পণ্য করে যে, তার থেকে বড় কৃপণ আর কে হতে পারে?

তার চেয়ে বড় কৃপণ আর কে হতে পারে, যে এমন দান দিতেও প্রস্তুত হয় না, যা অতি সহজসাধ্য?

একদা মহানবী ﷺ এক ব্যক্তির নিকট থেকে অন্য এক ব্যক্তির জন্য একটি খেজুর গাছ দান চাইলেন। কিন্তু লোকটি তা দিল না। তিনি তাকে মূল্যের বিনিময়ে তা বিক্রি করতে বললে তাতেও সে রাজি হল না। পরিশেষে জান্নাতের একটি গাছের বিনিময়ে তা দান করতে উৎসাহিত করলেন, কিন্তু তাতেও সে সম্মত হল না! লোকটির কার্পণ্য দেখে বললেন,

(هَذَا أَبْخَلُ النَّاسِ).

অর্থাৎ, এ হল সবচেয়ে বড় কৃপণ। (আহমাদ ২৩০৮৫নং)

জান্নাতের গাছ মানে, জান্নাতে যাওয়ার নিশ্চয়তা। তা জেনেও সে দুনিয়ার একটি গাছের বিনিময়ে নিজের জন্য জান্নাতে স্থান ক'রে নিতে কার্পণ্য করল। সুতরাং তার চাইতে বড় কৃপণ আর কে হতে পারে?

অনুরূপ এক ব্যক্তি জানে, নবী ﷺ-এর প্রতি একবার দরূদ পাঠ করলে তার দশগুণ উপকার লাভ হয়। তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার দরুন তার উপর দশটি রহমত (করুণা) অবতীর্ণ করবেন।" *(মুসলিম)*

করুণানিধির করুণার মুখাপেক্ষী মানুষ সর্বত্র সর্বদা। জীবনে চলার পথে তাঁর কৃপা ও করুণা একমাত্র সম্বল। অথচ সেই করুণা হাত পেতে নিতে যে মানুষ আলস্য ও কার্পণ্য করে, তার চেয়ে বড় কৃপণ আর কে হতে পারে?

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ ذُكِرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلِّ عَلَيَّ).

অর্থাৎ, সব চাইতে বড় বখীল লোক সেই ব্যক্তি, যার নিকট আমার নাম উল্লেখ করা হল, অথচ সে (আমার নাম শুনেও) আমার প্রতি দরূদ পড়ল না।" (সহীহ তারগীব ১৬৮৪নং)

"প্রকৃত কৃপণ সেই ব্যক্তি, যার কাছে আমি উল্লিখিত হলাম (আমার নাম উচ্চারিত হল), অথচ সে আমার প্রতি দরূদ পাঠ করল না।" *(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ এই অভিশাপ দিলেন যে, "সেই ব্যক্তির নাক ধূলা-ধূসরিত হোক, যার কাছে আমার নাম উল্লেখ করা হল, অথচ সে (আমার নাম

শুনেও) আমার প্রতি দরূদ পড়ল না।" (অর্থাৎ, 'স্বাল্লাল্লাহু আলাইহি অসাল্লাম' বলল না।) *(তিরমিযী)*

অনুরূপ সেই ব্যক্তিও বড় বখীল, যে তার মুসলিম ভাইকে সালাম দিতে অথবা তার জবাব দিতে বখীলী করে। সালাম দেওয়া সুন্নত, কিন্তু তার উত্তর দেওয়া ওয়াজেব। আর তাতে আছে দশ থেকে ত্রিশটি সওয়াব। পরন্তু মুখের কথায় তা উচ্চারণ করতে কোন কষ্ট বা পরিশ্রমও হয় না। তবুও এ কৃপণ 'পিপু-ফিশু'র মতো মুখ খুলতে চায় না; যদিও লাভ নিজেরই।

সালামের মাধ্যমে সম্প্রীতি বৃদ্ধি পায় সমাজে। কিন্তু সেই সম্প্রীতি আনয়ন করতে চায় না সমাজের এই শ্রেণীর কৃপণ লোকেরা। ধন দান করলে যেমন মানুষের মন জয় হয়, তেমনি 'সালাম' দান করলেও জয় হয় মানুষের মন। প্রথমটিতে অর্থ ব্যয় হয় বলে কেউ না করলেও করতে পারে, কিন্তু দ্বিতীয়টিতে কোন অর্থ বা শ্রম ব্যয় হয় না। তা সত্ত্বেও নিখরচার এমন কল্যাণ থেকে নিজেকে ও অপরকে বঞ্চিত করে এক শ্রেণীর মানুষ। নিঃসন্দেহে তারা সবার চাইতে বেশি বখীল।

মহানবী ﷺ বলেন,

(إِنَّ أَبْخَلَ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلَامِ).

অর্থাৎ, লোকেদের মধ্যে সব চাইতে বড় বখীল সেই ব্যক্তি, যে সালামে বখীলী করে। (ত্বাবারানী, সহীহ আদাবুল মুফরাদ ৭৯৯, সিঃ সহীহাহ ৬০১নং)

অহাব বিন মুনাব্বিহ বলেন, "সবচেয়ে বড় বিষয়-বিরাগী সেই ব্যক্তি, যে হালাল ছাড়া অন্য উপার্জন পছন্দ করে না; যদিও সে সবচেয়ে বড় দুনিয়াদার।

সবচেয়ে বড় বিষয়াসক্ত সেই ব্যক্তি, যে উপার্জনে হালাল-হারাম কিছুই বাছ-বিচার করে না; যদিও সে সবচেয়ে বড় বিষয়-বিরাগী।

সবচেয়ে বড় দানশীল সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর হক দান করে; যদিও অন্য ব্যাপারে লোকে তাকে সবচেয়ে বড় 'কৃপণ' বলে জানে।

আর সবচেয়ে বড় কৃপণ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর হক দান করতে কার্পণ্য করে; যদিও অন্য ব্যাপারে লোকে তাকে সবচেয়ে বড় 'দানশীল' বলে জানে।" *(হিল্য়াতুল আওলিয়া ৪/৪৯)*

দুনিয়ায় সবচেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত মানুষ

এ পৃথিবীর মনুষ্য-সংসারে চিরসুখ কারো হয় না। কোন না কোন বালা-মুসীবত, শোক-দুঃখ বা যন্ত্রণা-কষ্ট মানুষকে ক্লিষ্ট করে। অবশ্য তা আসে সৃষ্টিকর্তার তরফ থেকেই। আর তা আসে ঃ-

১। পাপের সত্বর শাস্তিস্বরূপ।

২। মু'মিনের পাপ ক্ষয় করার জন্য।

৩। মু'মিনকে পরীক্ষা করার জন্য।

৪। মু'মিনের মর্যাদা বর্ধনের জন্য।

কিন্তু সবচেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত হয় কারা?

কাফের ও মুনাফিকরা? নাকি মুসলিম ও ঈমানদাররা?

সবচেয়ে বেশি বিপদগ্রস্ত খারাপ লোকেরা হয় না। বরং যারা ভালো লোক, তারাই বিপদগ্রস্ত হয় বেশি। যারা যত ভালো, তারা তত বেশি বিপদগ্রস্ত হয়।

সা'দ ﷺ বলেন, একদা আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত কারা হয়?' উত্তরে তিনি বললেন, "সকল মানুষ অপেক্ষা নবীগণই অধিকতর কঠিন বিপদের সম্মুখীন হন। অতঃপর তাঁদের চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তি এবং তারপর তাদের চেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তিগণ অপেক্ষাকৃত হাল্কা বিপদে আক্রান্ত হন। মানুষকে তার দ্বীনের (পূর্ণতার) পরিমাণ অনুযায়ী বিপদগ্রস্ত করা হয়; সুতরাং তার দ্বীনে যদি মজবুতি থাকে, তবে (যে পরিমাণ মজবুতি আছে) ঠিক সেই পরিমাণ তার বিপদও কঠিন হয়ে থাকে। আর যদি তার দ্বীনে দুর্বলতা থাকে, তবে তার দ্বীন অনুযায়ী তার বিপদও (হাল্কা) হয়। পরন্তু বিপদ এসে এসে বান্দার শেষে এই অবস্থা হয় যে, সে জমীনে চলা ফেরা করে অথচ তার কোন পাপ অবশিষ্ট থাকে না।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে'* ৯৯২ নং)

আল্লাহর রসূল ﷺ আরো বলেছেন, "মুমিনের ব্যাপারটাই আশ্চর্যজনক। তার প্রতিটি কাজে তার জন্য মঙ্গল রয়েছে। এটা মু'মিন ব্যতীত অন্য কারো জন্য নয়। সুতরাং তার সুখ এলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। ফলে এটা তার জন্য মঙ্গলময় হয়। আর দুঃখ পৌঁছলে সে ধৈর্য ধারণ করে। ফলে এটাও তার জন্য মঙ্গলময় হয়।" (মুসলিম)

বিপদ মু'মিনকে শুধু কষ্টই দেয় না, বরং বিপদ তাকে শিক্ষা ও সমৃদ্ধি দান ক'রে যায়। দুঃখ কেবল তার চোখের পানি বইয়েই যায় না, বরং দুঃখ তার চোখ খুলেও দিয়ে যায়। শোক ও দুঃখ ভালো মানুষকে আরো ভালো ক'রে গড়ে তোলে।

সুতরাং যে ভালো মানুষ, তাকে বিপদে ধৈর্যধারণ করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তবে ভালো মানুষ হতে কখনো বিপদ প্রার্থনা করবে না। কখনো এ প্রার্থনা করবে না,

'দুঃখ যদি দিয়ো প্রভু, শক্তি দিয়ো সহিবারে।
জীবন আমার ধন্য করো তোমার বাণী বহিবারে।'

কারণ, তাতে প্রত্যক্ষভাবে দুঃখ প্রার্থনা করা হয়। বরং প্রার্থনা ক'রে বলবে,

'দুঃখ মোরে দিয়ো না প্রভু, শক্তি নাহি সহিবারে।
জীবন আমার ধন্য করো তোমার বাণী বহিবারে।'

যেমন এ প্রার্থনাও করা উচিত নয়,

'বিপদে মোরে রক্ষা করো এ নহে মোর প্রার্থনা
বিপদে আমি না যেন করি ভয়,
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে নাইবা দিলে সান্ত্বনা
দুঃখ যেন করিতে পারি জয়।
সহায় মোর না যদি জুটে, নিজের বল না যেন টুটে
সংসারেতে ঘটিলে ক্ষতি লভিলে শুধু বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।'

বরং প্রার্থনায় এই বলা উচিত,

'বিপদে মোরে নাহি ফেলো এ হল মোর প্রার্থনা
বিপদ দিয়ে দিয়ো না আমায় ভয়,
দুঃখ তাপে ব্যথিত চিতে চাই না আমি সান্ত্বনা
দুঃখ যেন দেখিতে নাহি হয়।
সহায় মোর যেন গো জুটে, নিজের বল না যেন টুটে
সংসারে না ঘটাও ক্ষতি না দাও মোরে বঞ্চনা
নিজের মনে না যেন মানি ক্ষয়।'

সর্বশ্রেষ্ঠ আমল, আল্লাহর প্রিয়তম আমল

১। আল্লাহর প্রতি ঈমান

এটাই হল সব আমলের মূল। এ আমল না হলে, অন্য কোন আমল ফলপ্রসূ নয়। কাজ যত বড় ও যত বেশি উপকারী হোক না কেন, যদি তার সাথে আল্লাহর প্রতি ঈমান না থাকে, তাহলে তার কোন মূল্য নেই। পৃথিবীর বুকে কোন মানুষ যতই প্রসিদ্ধ ও খ্যাতিমান হোক না কেন, যদি তার মাঝে ঈমান না থাকে, তাহলে তার কোন মান নেই। পরন্তু সে ঈমান হতে হবে সর্বশেষ দূত 'মুহাম্মাদী' মার্কা। নচেৎ অন্য কোন মার্কার ঈমান বর্তমান বিশ্বে উপকারী নয়।

২। আল্লাহর পথে সংগ্রাম

যেহেতু আল্লাহর প্রতি ঈমান ও তাঁর বিধানকে পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠাকল্পে এবং তার পথে যাবতীয় বাধা দূরীকরণার্থে সংগ্রামের বড় গুরুত্ব আছে।

আবূ যার্র ﷺ বলেন, একদা আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন্ আমল সবার চেয়ে উত্তম?' তিনি বললেন, "আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" আমি বললাম, 'কী ধরনের ক্রীতদাস মুক্ত করা উত্তম?' তিনি বললেন, "যে ক্রীতদাস তার মালিকের কাছে সর্বাধিক আকর্ষণীয় এবং সবার চেয়ে বেশি মূল্যবান।" *(বুখারী)*

৩। যথাসময়ে নামায

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোন আমল সর্বাপেক্ষা মাহাত্ম্যপূর্ণ?' তিনি উত্তরে বললেন, "প্রথম অক্তে (নামাযের সময় শুরু হওয়ার সাথে সাথে) নামায আদায় করা।" আমি বললাম, 'তারপর কোন্‌টি?' তিনি বললেন, "পিতামাতার সেবা-যত্ন করা।" আমি বললাম, 'তারপর কোন্‌টি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা।" *(বুখারী ২৭৮২ নং, মুসলিম ৯৫ নং)*

নামায দ্বীনের খুঁটি, ইসলামের দ্বিতীয় রুক্ন। মুসলিমের জীবনে নামাযের গুরুত্ব অপরিসীম। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(اسْتَقِيمُوا وَلَنْ تُحْصُوا وَاعْلَمُوا أَنَّ خَيْرَ أَعْمَالِكُمْ الصَّلَاةُ وَلَنْ يُحَافِظَ عَلَى الْوُضُوءِ إِلَّا مُؤْمِنٌ).

"তোমরা (প্রত্যেক বিষয়ে) কর্তব্যনিষ্ঠ রহ; আর তাতে কখনই সক্ষম হবে না। জেনে রেখো, তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ আমল হল নামায। আর মুমিন ব্যতীত কেউই ওযুর হিফাযত করবে না।" *(আহমাদ ২২৩৭৮, ইবনে মাজাহ ২৭৭, হাকেম, সহীহ তারগীব ১৯০নং)*

মহানবী ﷺ আরো বলেছেন,

(مَا عَمِلَ ابنُ آدَمَ شَيئاً أَفْضَلَ مِنَ الصَّلاَةِ وَصَلاَحِ ذَاتِ البَينِ وَخُلُقٍ حَسَنٍ).

অর্থাৎ, আদম-সন্তান এমন কোন কাজ করেনি, যা নামায, সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা ও সচ্চরিত্রতা থেকে অধিক শ্রেষ্ঠ হতে পারে। (বুখারী তারীখ, সিঃ সহীহাহ ১৪৪৮নং)

আব্দুল্লাহ বিন আমর ؓ বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'সর্বশ্রেষ্ঠ আমল কী?' উত্তরে তিনি বললেন, "নামায।" সে আবার বলল, 'তারপর কী?' তিনি বললেন, "নামায।" সে আবার বলল, 'তারপর কী?' তিনি বললেন, "নামায।" এইরূপ তিনবার বললেন। (আহমাদ, ইবনে হিব্বান, সঃ তারগীব ৩৭৮নং)

৪। মহান আল্লাহর যিক্র

আল্লাহর যিক্র বা স্মরণও সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। একদা মুআয বিন জাবাল ؓ নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন্ আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়?' উত্তরে তিনি বললেন,

«أَنْ تَمُوتَ وَلِسَانُكَ رَطْبٌ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ»

অর্থাৎ, আজীবন আল্লাহর যিক্রে তোমার জিভ ভিজে থাকা। (ত্বাবারানী, বাযযার, সঃ তারগীব ১৪৯২নং)

একদা তিনি বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের উত্তম কাজের সন্ধান দেব না? যা তোমাদের প্রভুর নিকট সবচেয়ে পবিত্র, তোমাদের মর্যাদায় সব চেয়ে উচ্চ, সোনা-চাঁদি দান করার চেয়ে উত্তম এবং শত্রুর সম্মুখীন হয়ে গর্দান কাটা ও কাটানোর চেয়ে শ্রেয়।" সকলে বললেন, 'নিশ্চয় বলে দিন।' তিনি বললেন, "আল্লাহ তাআলার যিক্র।" *(তিরমিযী ৫/৪৫৮, ইবনে মাযাহ ২/১২৪৫, সহীহুল জামে' ২৬২৯নং)*

এ জন্যই মহানবী ﷺ বলেছেন, "মুফার্রিদগণ আগে বেড়ে গেছে।" সকলে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! 'মুফার্রিদ কারা?' তিনি বললেন, "আল্লাহর অধিক অধিক যিক্রকারী পুরুষ ও নারী।" *(মুসলিম ৬৯৮৪নং)*

প্রকাশ থাকে যে, জিহাদ ফরয হলে, সেটাই সর্বশ্রেষ্ঠ আমল। নফল হলে উল্লিখিত অন্যান্য আমল অধিক শ্রেষ্ঠ।

৫। মহান আল্লাহর প্রশংসা

যেহেতু মহান আল্লাহ নিজের প্রশংসা ভালোবাসেন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(التَّأَنِّي مِنَ اللهِ والعَجَلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَمَا أَحَدٌ أَكْثَرُ مَعَاذِيرَ مِنَ اللهِ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ أَحَبَّ إِلى اللهِ مِنَ الحَمْدِ).

অর্থাৎ, ধীর-স্থিরতা আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং জলদিবাজি শয়তানের পক্ষ থেকে। আল্লাহর চেয়ে বেশি ওজর কবুল করার কেউ নেই। আর প্রশংসার চেয়ে অধিক প্রিয় আল্লাহর কাছে অন্য কিছু নয়। (আবূ য়্যালা, সঃ তারগীব ১৫৭২নং)

৬। অপরকে খুশী করা

অপরের মনে খুশী ভরে দেওয়ার কাজে এক প্রকার তৃপ্তিকর আনন্দ আছে। অপরকে আনন্দিত করার মাঝে পরিপূর্ণ আনন্দের স্বাদ আছে। এই জন্য সে কাজও মহান সৃষ্টিকর্তার নিকটে সব চাইতে প্রিয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« إِنَّ أَحَبَّ أَلاعْمَالِ إِلَى اللَّهِ تعَالَى بَعْدَ الفَرَائِضِ إِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَى الْمُسْلِمِ».

অর্থাৎ, ফরয আমলসমূহের পর মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় আমল হল, মুসলিমের মনে আনন্দ ভরে দেওয়া। (ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ৯০৬নং)

যে কোনভাবে উপকার ক'রে অপরকে আনন্দ দেওয়া যায়। ক্ষুধার্তকে অন্নদান ক'রে, বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান ক'রে, অভাবীর অভাব দূর ক'রে মানুষকে আনন্দ দেওয়া যায়। আর সেই আনন্দ দানে নিজের মনেও বড় আনন্দ পাওয়া যায়।

আনন্দ আছে দানে, গ্রহণে আনন্দ নেই। বরং গ্রহণে আছে লজ্জা। কবি বলেছেন,

'আত্মসুখ অন্বেষণে আনন্দ নাহিরে
বারে বারে আসে অবসাদ,
পরার্থে যে করে কর্ম তিতি ঘর্ম নীরে
সেই লভে স্বর্গের প্রাসাদ।'

এই জন্য পরার্থপর মানুষ বড় সুখী হয়। আর সে জন্যই আত্মকেন্দ্রিক না হয়ে সদা পরোপকারে মনযোগী হতে হয়। কবি বলেছেন,

'পরের কারণে স্বার্থ দিয়া বলি-
এ জীবন-মন সকলি দাও,
তার মত সুখ কোথাও কি আছে?
আপনার কথা ভুলিয়া যাও।
পরের কারণে মরণেও সুখ
সুখ সুখ করি কেঁদো না আর,
যতই কাঁদিবে যতই ভাবিবে
ততই বাড়িবে হৃদয়-ভার।'

৭। নিরবচ্ছিন্নভাবে আমল করা

কোন আমল করলে তা নিরবচ্ছিন্নভাবে ক'রে যাওয়া উচিত। কম হলেও তা ধারাবাহিকতার সাথে কোন ফাঁক-বিরতি না দিয়ে যথাসময়ে ক'রে যাওয়া উচিত। ভাল কাজ কখনও কখনও করা এবং মাঝে-মধ্যে বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত নয়। অল্প হলেও তা বরাবর ক'রে যাওয়া উচিত। এমন কাজই মহান আল্লাহর নিকট প্রিয়তম।

আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন্ আমল আল্লাহর নিকট সব চাইতে বেশি প্রিয়?' উত্তরে তিনি বললেন, "নিরবচ্ছিন্নভাবে যা করা হয়; যদিও তা কম হয়।" *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সঃ জামে' ১২২৮নং)*

সবচেয়ে প্রিয় কথা, সবচেয়ে উত্তম কথা

মহান আল্লাহর পছন্দনীয় প্রত্যেক গুপ্ত ও প্রকাশ্য কথা ও কাজকে ইবাদত বলা হয়। তাই বান্দা আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার জন্য অনেক কথাই বলে। অবশ্য তা ইবাদত কবুল হওয়ার দ্বিতীয় শর্তানুযায়ী---অর্থাৎ, সুন্নাহর রীতি অনুযায়ী বলে। তার মধ্যে মহান আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় কথা কী?

১। মহানবী ﷺ এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলেছেন,

« إِنَّ أَحَبَّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ».

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় কথা হল ঃ 'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ।' (মুসলিম ৭১০২নং)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, উত্তরে তিনি বলেছেন,

«مَا اصْطَفَى اللَّهُ لِمَلاَئِكَتِهِ أَوْ لِعِبَادِهِ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ».

"(মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে উত্তম কথা হল,) যা তিনি নিজ ফিরিশ্তামন্ডলী অথবা নিজ বান্দাগণের জন্য নির্বাচিত করেছেন ঃ 'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ।' (মুসলিম ৭১০১, সিঃ সহীহাহ ১৪৯৮নং)

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ ، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ)) . متفقٌ عَلَيْهِ

"যে ব্যক্তি দিনে একশবার *'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ'* পড়বে তার গুনাহসমূহ মোচন করা হবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনা বরাবর হয়।" *(বুখারী ৬৪০৫, মুসলিম ৭০১৮নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((مَنْ قَالَ : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمدِهِ ، غُرِسَتْ لَهُ نَخْلَةٌ فِي الجَنَّةِ)) . رواه الترمذي

"যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ' পড়ে, তার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি খেজুর বৃক্ষ রোপণ করা হয়।" *(ত্বাবারানীর স্বাগীর ২৮৭, বাযযার ২৪৬৮)*

তিনি আরো বলেছেন,

((مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحِينَ يُمْسِي : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، مِئَةَ مَرَّةٍ ، لَمْ يَأْتِ أَحَدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ ، إلاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ)) . رواه مسلم

"যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় 'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ' একশতবার পাঠ করবে, কিয়ামতের দিনে ওর চাইতে উত্তম আমল কেউ আনতে পারবে না। কিন্তু যদি কেউ তার সমান বা তার থেকে বেশি সংখ্যায় ঐ তাসবীহ পাঠ ক'রে থাকে (তাহলে ভিন্ন কথা)।" *(মুসলিম ৭০১৯নং)*

২। চারটি কথা মহান আল্লাহর নিকট সবার চাইতে প্রিয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

«أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ أَرْبَعٌ: سُبْحَانَ اللَّهِ، وَالْحَمْدُ للهِ، وَلاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ. لاَ يَضُرُّكَ بِأَيِّهِنَّ بَدَأْتَ».

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় কথা হল ঃ 'সুবহানাল্লাহ, আলহামদু লিল্লাহ, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এবং 'আল্লাহু আকবার'। যে কোন একটি দিয়ে শুরু করলে কোন ক্ষতি হবে না। (মুসলিম ৫৭২৪নং)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "(ঐ বাক্যগুলি) সর্বশ্রেষ্ঠ বাক্য।" *(আহমাদ, সঃ তারগীব ১৫৪৮নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((لأَنْ أَقُولَ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالحَمْدُ للهِ ، وَلاَ إلهَ إلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أكْبَرُ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ)) . رواه مسلم

"আমার এই বাক্যমালা (সুবহানাল্লাহি অলহামদুলিল্লাহি অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার। (অর্থাৎ, আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ ছাড়া (সত্যিকার) কোন ইলাহ নেই এবং আল্লাহ সব চাইতে মহান) পাঠ করা সেই সমস্ত বস্তু অপেক্ষা অধিক প্রিয়, যার উপর সূর্যোদয় হয়।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন,

((لَقِيْتُ إِبْرَاهِيمَ لَيلَةَ أُسْرِيَ بِي ، فَقَالَ : يَا مُحَمَّدُ أَقْرِئْ أُمَّتَكَ مِنِّي السَّلاَمَ ، وَأَخْبِرْهُمْ أنَّ الجَنَّةَ طَيِّبَةُ التُّرْبَةِ ، عَذْبَةُ المَاءِ ، وَأنَّهَا قِيعَانٌ وَأنَّ غِرَاسَهَا: سُبْحَانَ اللهِ، وَالحَمْدُ للهِ، وَلاَ إلهَ إلاَّ اللهُ، وَاللهُ أَكْبَرُ)). رواه الترمذي

"মি'রাজের রাতে ইব্রাহীম ﷺ-এর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ঘটে। তিনি বললেন, 'হে মুহাম্মাদ! তুমি তোমার উম্মতকে আমার সালাম পেশ করবে এবং তাদেরকে বলে দেবে যে, জান্নাতের মাটি পবিত্র ও উৎকৃষ্ট, তার পানি মিষ্ট। আর তা একটি বৃক্ষহীন সমতলভূমি। আর 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদু লিল্লাহ', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' হল তার রোপিত বৃক্ষ।" *(তিরমিযী)*

তিনি আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদু লিল্লাহ', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' বলবে, তার জন্য প্রত্যেকটি বাক্যের বিনিময়ে বেহেশ্তে একটি ক'রে বৃক্ষ রোপণ করা হবে।" (ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ২৮৮০নং)

একদা আবূ হুরাইরা ؓ একটি বৃক্ষ রোপণ করছিলেন। মহানবী ﷺ সেদিকে পার হলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আবূ হুরাইরা! তুমি কী রোপণ করছ?" আবূ হুরাইরা ؓ বললেন, 'একটি বৃক্ষ।' তিনি বললেন, "আমি কি তোমাকে এর চাইতে উত্তম বৃক্ষ রোপণের কথা বলে দেব না? 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদু লিল্লাহ', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার'। এর প্রত্যেকটির বিনিময়ে বেহেশ্তে তোমার জন্য একটি ক'রে বৃক্ষ রোপণ করা হবে।" (ইবনে মাজাহ, হাকেম, সঃ তারগীব ১৫৪৯নং)

তিনি আরো বলেছেন, "নিশ্চয় 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদু লিল্লাহ', 'লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' গোনাহসমূহকে ঝরিয়ে দেয়, যেমন গাছ তার পাতাসমূহকে ঝরিয়ে দেয়।" (আহমাদ, সিঃ সহীহাহ ৩১৬৮নং)

তিনি আরো বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদের মাঝে তোমাদের চরিত্র বন্টন ক'রে দিয়েছেন, যেমন তিনি তোমাদের মাঝে তোমাদের রুযী বন্টন ক'রে দিয়েছেন। নিশ্চয় তিনি তাকে দুনিয়া দান করেন, যাকে তিনি ভালোবাসেন এবং যাকে তিনি ভালোবাসেন না। কিন্তু তিনি ঈমান দান করেন কেবল তাকে, যাকে তিনি ভালোবাসেন। সুতরাং যে ব্যক্তি ধন ব্যয় করতে কার্পণ্য করে, শত্রুর বিরুদ্ধে জিহাদ করতে ভয় করে এবং রাত্রি জেগে ইবাদত করতে ভয় করে, তার উচিত বেশি বেশি 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদু লিল্লাহ', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' বলা।" (ত্বাবারানী প্রমুখ, সিঃ সহীহাহ ২৭১৪নং)

তিনি আরো বলেন, "সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদু লিল্লাহ', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' স্থায়ী সৎকর্মসমূহের অন্তর্ভুক্ত।" (সিঃ সহীহাহ ৩২৬৪নং)

একদা তিনি সাহাবাগণকে বললেন, "তোমরা তোমাদের ঢাল সংগ্রহ কর।" তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন শত্রু উপস্থিত হল কি?' তিনি বললেন, "না। বরং জাহান্নাম থেকে বাঁচার ঢাল। তোমরা 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদু লিল্লাহ', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার' বল। যেহেতু এগুলি কিয়ামতের দিন অগ্রণী হয়ে, আযাব-রোধক হয়ে, ক্রমাগতভাবে শুভ-পরিণাম হয়ে উপস্থিত হবে। আর এগুলিই হল স্থায়ী সৎকর্ম।" (নাসাঈ, হাকেম, বাইহাক্বী সঃ তারগীব ১৫৬৭নং)

আর স্থায়ী সৎকর্মসমূহ সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا}

অর্থাৎ, ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা। আর সৎকার্য, যার ফল স্থায়ী ওটা তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং আশা প্রাপ্তির ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট। (কাহফ ঃ ৪৬)

{وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا} (٧٦)

অর্থাৎ, যারা সৎপথে চলে আল্লাহ তাদের পথপ্রাপ্তিতে বৃদ্ধি দান করেন; আর স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসাবেও শ্রেষ্ঠ।(মারয়্যাম ঃ৭৬)

মহানবী ﷺ আরও বলেছেন, "আল্লাহ চারটি বাক্য নির্বাচিত করেছেন ঃ 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদু লিল্লাহ', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার'। সুতরাং যে ব্যক্তি 'সুবহানাল্লাহ' বলবে, তার জন্য ২০টি নেকি লেখা হবে এবং ২০টি গোনাহ মোচন করা হবে। যে ব্যক্তি 'আল্লাহু আকবার' বলবে, তারও অনুরূপ উপকার হবে। যে ব্যক্তি 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলবে, তারও অনুরূপ উপকার হবে। আর যে ব্যক্তি নিজের তরফ থেকে 'আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন' বলবে, তার জন্য ৩০টি নেকি লেখা হবে এবং ৩০টি গোনাহ মোচন করা হবে।" (আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম, সঃ তারগীব ১৫৫৪নং)

একদা তিনি 'বাঃ! বাঃ!' বলে হাত দ্বারা পাঁচ সংখ্যার প্রতি ইঙ্গিত ক'রে বললেন, "এ

(পাঁচটি জিনিস) মীযানে কত ভারী! 'সুবহানাল্লাহ', 'আলহামদু লিল্লাহ', 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ও 'আল্লাহু আকবার'। আর নেক সন্তান, যে মারা গেলে মুসলিম তাতে সওয়াব কামনা করে।" (নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সঃ তারগীব ২০০৯নং)

উক্ত বাক্য চারটি কেউ বললে মহান আল্লাহ তার জবাবে বলেন, 'তুমি সত্য বলেছ।' (সিঃ সহীহাহ ৩৩৩৬নং)

৩। নামাযের প্রারম্ভে দুআয়ে সানাও মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় বাক্য।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إنَّ أحبَّ الكَلاَمِ إلَى اللهِ أَن يَقُولَ العَبدُ : سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَـدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرَكَ).

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় বাক্য বান্দার এই কথা, 'সুবহানাকাল্লাহুম্মা।" (সিঃ সহীহাহ ২৫৯৮নং)

৪। আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় বাক্য, যা তিনি ফিরিশ্তাবর্গের জন্য নির্বাচিত করেছেন, 'সুবহানা রাব্বী অবিহামদিহ' ৩ বার। *(তিরমিযী, হাকেম, সঃ জামে' ১৭৫নং)*

সবচেয়ে বেশি অপ্রিয় কথা

অনেক কথাই মানুষ বলে থাকে, অনেক নোংরা ও অপ্রিয় কথা বলে থাকে। কিন্তু মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে অপ্রিয় কথাটি কী?

প্রিয় নবী ﷺ বলেন,

(وَإِنَّ أَبْغَضَ الْكَلَامِ إِلَى اللهِ أَنْ يَقُوْلَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : اِتَّقِ اللهَ فَيَقُوْلُ : عَلَيكَ بِنَفْسِكَ).

অর্থাৎ, যখন কাউকে 'আল্লাহকে ভয় কর' বলা হয় তখন ঐ ব্যক্তির, 'নিজের চরকায় তেল দাও' বলা আল্লাহর নিকট সর্বাপেক্ষা ঘৃণিত কথা।' *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৫৯৮ নং)*

এক শ্রেণীর উদ্ধত মানুষই আছে, যারা নিজেদের ব্যাপারে কোন টীকা-টিপ্পনি, সংশোধন, উপদেশ ইত্যাদি শুনতেই চায় না। ফলে চট্ ক'রে ঐ অপ্রিয় কথাটি বলে জবাব দেয় এবং হক প্রত্যাখ্যান ক'রে অহংকার প্রদর্শন করে। এই শ্রেণীর মানুষের ব্যাপারে কুরআন বলে,

وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ (٢٠٤) وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللهُ لَايُحِبُّ الْفَسَادَ (٢٠٥) وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ (٢٠٦)

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে এমনও লোক আছে, যার পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তার অন্তরে যা আছে, সে সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে, কিন্তু আসলে সে অত্যন্ত ঝগড়াটে লোক। আর যখন সে (তোমার কাছ থেকে) প্রস্থান করে, তখন পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শস্যক্ষেত্র ও (জীব-জন্তুর) বংশনিপাতের চেষ্টা করে। কিন্তু আল্লাহ

অশান্তি পছন্দ করেন না। আর যখন তাকে বলা হয়, 'তুমি আল্লাহকে ভয় কর', তখন তার আত্মাভিমান তাকে অধিকতর পাপাচারে লিপ্ত করে। সুতরাং তার জন্য জাহান্নামই যথেষ্ট এবং নিশ্চয়ই তা অতি মন্দ শয়নাগার। (বাক্বারাহ ঃ ২০৪-২০৬)

প্রিয়তম কথা

মানুষ অনেক সময় অনেক কথা বলে, অনেক ওয়াদা করে, প্রতিশ্রুতি দেয়, অঙ্গীকার করে, কিন্তু তাতে সে সত্যবাদী হয় না। অনেক সময় মনে কপটতা রেখে মুখে এক বলে, আর মনে এক থাকে। অনেক সময় মিথ্যা বলে, বাঁধা-ছাঁদা কথা বলে, বাস্তবের বিপরীত কথা বলে। অনেকের কথা বলার সময় 'মুখে মধু হৃদে ছুরি' থাকে। ঠোঁটা লোকের মুখে আঁট, বাইরে থেকে কাটে গাঁট। অনেকের মনে খিল, মুখে মিল। মুখে খুব মিঠে, নিম নিষিন্দে পেটে। আর 'মুখে মধু হৃদে ক্ষুর, সেই তো হয় বিষম ক্রুর।'

এই জন্য সত্য কথা বলা মু'মিনের অভ্যাস। আর কথায় কথায় মিথ্যা বলা মুনাফিকের অভ্যাস। সত্য কথা সবাই পছন্দ করে, এমনকি মিথ্যাবাদীও চায় না, তার সাথে কেউ মিথ্যা বলুক।

সত্য কথা অনেক সময় তিক্ত হয়। সত্য কথায় বন্ধু বেজার হয়। তবু সত্য বলতে হয়। সত্য মানতে হয়। সত্য সবার কাছে প্রিয়। 'সত্য চিরকালই কঠোর, রূঢ় এবং তিক্ত; কিন্তু শাশ্বত ও চিরন্তন।'

মহানবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় সত্য পুণ্যের পথ দেখায় এবং পুণ্য জান্নাতের দিকে নিয়ে যায়। একজন মানুষ (অবিরত) সত্য বলতে থাকে। শেষ পর্যন্ত আল্লাহর কাছে তাকে খুব সত্যবাদী বলে লিখা হয়। পক্ষান্তরে মিথ্যা পাপের পথ দেখায় এবং পাপ জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়। একজন মানুষ (সর্বদা) মিথ্যা বলতে থাকে, শেষ অবধি আল্লাহর নিকটে তাকে মহা মিথ্যাবাদী বলে লিপিবদ্ধ করা হয়।" *(বুখারী-মুসলিম)*

তিনি ছিলেন মহাসত্যবাদী এবং তিনি সত্যকে খুব পছন্দ করতেন। তাই তিনি বলেছেন,

(أَحَبُّ الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ).

অর্থাৎ, আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় কথা হল, যা সত্য। (বুখারী ২৩০৭নং)

কিন্তু বড় দুঃখের বিষয়, সত্য কথা খুব কম লোকেই বলে, সত্যবাদী খুব কম লোকই আছে। এমনকি অধিকাংশ নামাযীও নামাযে সত্য কথা বলে না। এই ধরুন, যখন সে বলে,

{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (٥) سورة الفاتحة

অর্থাৎ, আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই কাছে সাহায্য চাই।

অথচ সে অন্যেরও দাসত্ব করে, অন্যেরও ইবাদত করে, বিপদে আপদে অন্যকে ডাকে, অন্যের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করে।

আবার যখন বলে,

اَلتَّحِيَّاتُ للّهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ...

অর্থাৎ, মৌখিক, শারীরিক ও আর্থিক যাবতীয় ইবাদত আল্লাহর নিমিত্তে।

অথচ সে অনেক ইবাদত অন্যের জন্যও নিবেদন করে। অন্যের জন্য পশু যবেহ করে, অন্যের নামে মানসিক মানে, অন্যের জন্য নযর-নিয়ায পেশ করে, অন্যকে সিজদা করে, অন্যের কাছে সুখ-সমৃদ্ধি, রোগমুক্তি ও সন্তান চায় ইত্যাদি।

ওরা মানুষের সাথে মিথ্যা বলে, আর এরা মহান আল্লাহর সাথে মিথ্যা বলে। এরা কিন্তু মহামিথ্যাবাদী।

সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনী

মানুষ অনেক কাহিনী পড়ে, অনেক গল্প, উপন্যাস, উপাখ্যান, উপকথা, রূপকথা পড়ে, যার অধিকাংশ মনগড়া, কল্পনাপ্রসূত, স্বকপোলকল্পিত। কিন্তু এমন একটি কাহিনী আছে, যা গল্পের মতো লাগলেও, তা বাস্তব ও সত্য। তা হল ইউসুফ নবীর জীবনী। কুরআন বলেছে,

{نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ} (٣) سورة يوسف

অর্থাৎ, আমি অহীর মাধ্যমে তোমার কাছে এই কুরআন প্রেরণ ক'রে সর্বশ্রেষ্ঠ কাহিনী বর্ণনা করছি,; যদিও এর পূর্বে তুমি ছিলে অনবহিতদের অন্তর্ভুক্ত। *(ইউসুফ ঃ ৩)*

কাহিনীর সূত্রপাত স্বপ্ন দিয়ে। ছোটবেলায় ইউসুফ স্বপ্নে দেখলেন, এগারটি নক্ষত্র, সূর্য এবং চন্দ্র তাঁকে সিজদাহ করছে।

স্বপ্নের বৃত্তান্ত জেনে তাঁর দশজন ভাই তাঁর প্রতি হিংসা করল। তারা চক্রান্ত ক'রে তাঁকে মেরে ফেলতে চাইল। তাদের একজন বলল, 'আমাদের পিতার নিকট ইউসুফ এবং তার (সহোদর) ভাই (বিন্‌য়ামীন)ই আমাদের চেয়ে অধিক প্রিয়, অথচ আমরা একটি (সংহত) দল, আমাদের পিতা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছেন। ইউসুফকে হত্যা কর অথবা তাকে কোন (দূরবর্তী) স্থানে ফেলে এস, তাহলে তোমাদের পিতার দৃষ্টি শুধু তোমাদের প্রতিই নিবিষ্ট হবে এবং তারপরে তোমরা (তওবা ক'রে) ভাল লোক হয়ে যাবে।'

তাদের মধ্যে একজন বলল, 'ইউসুফকে হত্যা করো না, বরং যদি তোমরা কিছু করতেই চাও, তাহলে তাকে কোন গভীর কূপে নিক্ষেপ কর, যাত্রীদলের কেউ তাকে তুলে নিয়ে যাবে।'

সুতরাং পরিকল্পিতভাবে একদিন তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা! ইউসুফের ব্যাপারে আপনি আমাদেরকে অবিশ্বাস করছেন কেন, যদিও আমরা তার হিতাকাঙ্ক্ষী? আপনি আগামীকাল তাকে আমাদের সাথে প্রেরণ করুন, সে ফল-মূল খাবে ও খেলাধূলা করবে, আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব।'

আব্বা বললেন, 'তোমাদের ওকে নিয়ে যাওয়াটা আমার দুশ্চিন্তার কারণ হবে। আর আমার ভয় হয় যে, তোমরা ওর প্রতি অমনোযোগী হলে ওকে নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে।'

তারা বলল, 'আমরা একটি (সংহত) দল হওয়া সত্ত্বেও যদি নেকড়ে বাঘ ওকে খেয়ে

ফেলে, তাহলে তো আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হব।'

অতঃপর যখন তারা তাকে নিয়ে গেল এবং তাকে গভীর কূপে নিক্ষেপ করতে একমত হল। এমতাবস্থায় মহান আল্লাহ ইউসুফকে জানিয়ে দিলেন, 'তুমি তাদেরকে তাদের এই কর্মের কথা অবশ্যই বলে দেবে; যখন তারা তোমাকে চিনবে না।'

দিন পার হলে তারা সন্ধ্যা-রাতে কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার নিকট এল এবং বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা দৌড়-প্রতিযোগিতা করছিলাম এবং ইউসুফকে আমাদের মালপত্রের নিকট রেখে গিয়েছিলাম, অতঃপর নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলেছে; কিন্তু আপনি তো আমাদেরকে বিশ্বাস করবেন না; যদিও আমরা সত্যবাদী।'

আব্বার আশঙ্কা অনুসারে তারা ইউসুফের জামায় ছাগলের মিথ্যা রক্ত লেপন ক'রে এনেছিল। যাতে তিনি নিশ্চিত হন যে, সত্যই ইউসুফকে বাঘে খেয়ে ফেলেছে।

কিন্তু পিতা ইয়াকূব ﷺ তাঁর জামা অক্ষত দেখে বললেন, 'বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী গড়ে নিয়েছে। সুতরাং আমার পক্ষে পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়। তোমরা যা বর্ণনা করছ, সে বিষয়ে একমাত্র আল্লাহই আমার সাহায্যস্থল।'

ওদিকে এক বাণিজ্যিক কাফেলা এসে তারা তাদের পানি সংগ্রাহককে সেই কুয়ার নিকট প্রেরণ করল, যাতে ইউসুফকে ফেলে দেওয়া হয়েছিল। সে তার পানির বালতি নামিয়ে দিল। সে নিচে তাকাতেই বলে উঠল, 'কী সুখবর! এ যে এক কিশোর!' অতঃপর তারা তাঁকে তুলে নিয়ে পণ্যরূপে লুকিয়ে রাখল। অতঃপর তারা তাঁকে স্বল্প মূল্যে মাত্র কয়েক দিরহামের বিনিময়ে বিক্রি ক'রে দিল।

মিসরের যে অপুত্রক রাজা তাঁকে ক্রয় করেছিল, সে তাঁর স্ত্রী যুলাইখাকে বলল, 'সম্মানজনকভাবে এর থাকবার ব্যবস্থা কর, সম্ভবতঃ এ আমাদের উপকারে আসবে অথবা আমরা একে পুত্ররূপে গ্রহণ করব।'

সুতরাং এভাবে মহান আল্লাহ ইউসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলেন। যাতে তাঁর স্বপ্ন সফল হয়। আর আল্লাহ তাঁর কার্য সম্পাদনে অপ্রতিহত; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা অবগত নয়।

রাজ-পরিবারে ইউসুফ যখন পূর্ণ যৌবনে উপনীত হলেন, তখন তিনি রূপে-গুণে, প্রজ্ঞা ও জ্ঞানে সমৃদ্ধ হয়ে উঠলেন।

এতদিন যে মহিলা তাঁকে মায়ের মতো স্বগৃহে রেখে মানুষ করল, একদিন সেই তাঁর কাছে (উপযাচিকা হয়ে) যৌন-মিলন কামনা করল। সুযোগ বুঝে এক কক্ষে তাঁকে একা পেয়ে দরজাগুলি বন্ধ ক'রে দিয়ে বলল, 'এস! (আমরা কাম-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করি।)'

ইউসুফ বললেন, 'আমি আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি। (আমি এ কাজ করতে পারি না।) বাদশা আযীয আমার প্রভু! তিনি আমাকে সম্মানজনকভাবে স্থান দিয়েছেন। নিশ্চয় সীমালংঘনকারীরা সফলকাম হয় না।'

সেই নির্জন কক্ষে এক অপরূপ সুন্দর নবযুবককে নাগালের মধ্যে পেয়ে সেই মহিলা তার প্রতি আসক্তা হয়ে পড়েছিল। একজন পরিপূর্ণ যুবতীর কাছে একটি যুবক আগুনের কাছে ঘিয়ের মতো। সুতরাং ইউসুফও তার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়তেন; যদি না তিনি তাঁর

প্রতিপালকের নিদর্শন প্রত্যক্ষ করতেন। মহান আল্লাহ তাঁকে মন্দ কর্ম ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখবার জন্য কোন এক নিদর্শন প্রদর্শন করলেন। যেহেতু তিনি ছিলেন মহান আল্লাহর একজন নির্বাচিত বান্দা।

ইউসুফ মিলনে সম্মত হলেন না। যুলাইখা তাঁকে বারবার ফুসলাতে লাগল। অবশেষে সে তাঁর সাথে জবরদস্তি শুরু করল। ইউসুফ তার নিকট থেকে রক্ষা পাওয়ার মানসে পালাতে শুরু করলেন। দৌড়ে দরজার দিকে গেলে যুলাইখা পিছন হতে (তাঁকে টেনে রুখতে গিয়ে) তাঁর জামা ধরে টান দিল। জামা ছিঁড়ে গেল, কিন্তু তিনি থামলেন না। বরং দরজা খুলে বের হয়ে গেলেন।

কিন্তু দরজা খুলতেই দেখলেন রাজা দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে আছেন। বন্ধ কক্ষ থেকে দু'জনকে বের হতে দেখে রাজার সন্দেহ হওয়ারই কথা। নিজেকে বাঁচাবার জন্য স্ত্রী যুলাইখা ইউসুফের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে বলে উঠল, 'যে তোমার পরিবারের সাথে কুকর্ম কামনা করে, তার জন্য কারাগারে প্রেরণ অথবা অন্য কোন বেদনাদায়ক শাস্তি ব্যতীত কী দন্ড হতে পারে?'

ইউসুফ বললেন, 'সেই আমার কাছে যৌন-মিলন কামনা করেছিল। (আমার কোন দোষ নেই।) সেই আমাকে কুকর্মে লিপ্ত হওয়ার জন্য বাধ্য করার চেষ্টা করেছে। আর আমি তার স্পর্শ থেকে বাঁচার জন্য বাইরের দরজার দিকে ছুটে পালিয়ে এসেছি।'

স্বামীর মনে সন্দেহ প্রবিষ্ট হল। তিনি দোষী-নির্দোষ প্রমাণ করতে চাইলে যুলাইখার পরিবারের একজন সাক্ষী সাক্ষ্য দিল, 'যদি তার জামার সম্মুখ দিক ছিন্ন করা হয়ে থাকে, তাহলে মহিলাটি সত্য কথা বলেছে এবং সে মিথ্যাবাদী। আর যদি তার জামা পিছন দিক হতে ছিন্ন করা হয়ে থাকে, তাহলে মহিলাটি মিথ্যা কথা বলেছে এবং সে সত্যবাদী।'

সুতরাং রাজা যখন দেখলেন যে, তাঁর জামা পিছন দিক থেকে ছিন্ন করা হয়েছে, তখন তিনি স্ত্রীর উদ্দেশ্যে বললেন, 'এটা তোমাদের (নারীদের) ছলনা; নিশ্চয় তোমাদের ছলনা বিরাট! হে ইউসুফ! তুমি এ বিষয়কে উপেক্ষা কর। (কারো নিকট প্রকাশ ও প্রচার করো না।) আর হে নারী! তুমি তোমার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয় তুমিই অপরাধিনী।'

রাজা স্বামীও ক্ষমা ক'রে দিলেন স্ত্রীকে। তিনি বুঝে গেলেন, ইউসুফ নির্দোষ। তাঁর মনে কোন প্রেম বা পাপ চিন্তা ছিল না। সুতরাং মান-সম্ভ্রম বজায় রাখার লক্ষ্যে বিষয়টি যাতে প্রচার না হয়, তার চেষ্টা করেছিলেন বাদশা। কিন্তু যেরূপ কাপড়ের পর্দা দ্বারা সুবাস গোপন করা যায় না, প্রেম-ভালোবাসার বিষয়টিও অনুরূপ। মিসরের আযীয ইউসুফ ﷺ-কে উক্ত ঘটনা ভুলে যাওয়ার জন্য বললেন। আর সত্যই তিনি তাঁর পবিত্র মুখে এর কোন চর্চাই করেননি। তার পরেও ঘটনাটি অন্য কারো দ্বারা জঙ্গলের আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল এবং মিসরের মহিলাদের মাঝে এর দারুণ চর্চা হতে লাগল। নগরের মহিলারা আশ্চর্য হল এই ভেবে যে, (স্বামী থাকতেও যুলাইখা অন্যাসক্তা!) যদি প্রেম করার খুব ইচ্ছাই ছিল, তাহলে একজন সুদর্শন (স্বাধীন) পুরুষের সাথে করত। রানী হয়েও সে আপন দাসের প্রতি প্রেমে উন্মত্তা হয়ে পড়েছে! এটা তার বড় মূর্খামি!

যুলাইখা যখন শহরের মহিলাদের পশ্চাতে সমালোচনা এবং নিন্দা ও ভর্ৎসনার কথা শুনল, তখন সে তাদেরকে ডেকে পাঠাল এবং একটি বৈঠকের আয়োজন করল। শুধু এই বাস্তব প্রমাণ করার জন্য যে, সে যার প্রতি আসক্তা হয়ে পড়েছিল, সে শুধু একজন দাস বা সাধারণ ব্যক্তি নয়; বরং সে বাহ্যিক ও আভ্যন্তরিক এমন অসাধারণ সৌন্দর্যের অধিকারী যে, তাকে দেখে মন মুগ্ধ ও প্রাণ লুণ্ঠিত হওয়া কোন আশ্চর্যের বিষয় নয়।

সুতরাং ফল বা অন্য কিছু কেটে খাওয়ার জন্য সে তাদের প্রত্যেককে একটি ক'রে ছুরি দিল এবং তাঁকে বলল, 'তাদের সামনে বের হও।' অতঃপর তারা যখন তাঁকে দেখল, তখন তারা তাঁর (রূপ-মাধুর্যে) অভিভূত হল এবং (ফল কাটতে গিয়ে) নিজেদের হাত কেটে ফেলল। তারা বলল, 'আল্লাহ পবিত্র! এ তো মানুষ নয়। এ তো এক মহিমান্বিত ফিরিশ্তা!'

যেহেতু ইউসুফ (عليه السلام)-কে (সৃষ্টির) অর্ধেক রূপ দান করা হয়েছিল। (মুসলিম) তিনি ছিলেন সবার চেয়ে সুন্দর ও সুদর্শন যুবক।

যখন আযীযের স্ত্রী দেখল যে, তার ছলনা ও চক্রান্ত আহূত ও সমবেত মহিলাদের নিকট সফল ও কৃতকার্য হয়েছে এবং ইউসুফের রূপ দেখে সমালোচক মহিলারা অভিভূত হয়ে পড়েছে, তখন সে বলতে লাগল যে, 'তাকে এক ঝলক দেখাতেই তোমাদের এ অবস্থা হয়ে গেল, তাহলে কি এখন তার প্রেম-জালে আবদ্ধ হওয়ার কারণে তোমরা আমার নিন্দা করবে? এ তো সেই রূপবান তরুণ, যার সম্বন্ধে তোমরা আমাকে ভর্ৎসনা ও নিন্দা করেছ।'

বরং সমালোচক মহিলাদেরকে অভিভূত হতে দেখে তার স্পর্ধা আরো বেড়ে গেল এবং লজ্জা-শরমের সমস্ত আবরণ খুলে দিয়ে সে তার অসৎ কামনা আরো একবার প্রকাশ করল। এবারে অস্বীকার অবস্থায় তাকে হুমকি দেখানো হল। যেহেতু সে ছিল রানী। আর রাজ্য চালায় রাজা এবং রাজা চালায় রানী।

সুতরাং সমবেত মহিলাদের সামনেই সে বলল, 'আমি তো তার কাছে যৌন-মিলন কামনা করেছি; কিন্তু সে নিজেকে পবিত্র রেখেছে। এখন আমি তাকে যা আদেশ করি, সে যদি তা পালন না করে, তাহলে অবশ্যই সে কারারুদ্ধ হবে এবং লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে।'

ইউসুফ সেই রাজ-পরিবারে ক্রীতদাসরূপে ছিলেন। পরন্তু শহরের মহিলারাও তার সমর্থনে একমত হল। অতএব তিনি প্রতিবাদে কাকে কী বলতে পারতেন? হয়তো বা উল্টা অপবাদ দিয়ে আবারও যুলাইখা স্বামীর কাছে তাঁকে দোষী সাব্যস্ত করার চেষ্টা করবে। সুতরাং তিনি এ ফিতনা থেকে রক্ষা পাওয়ার মানসে মহান প্রতিপালকের নিকট আকুল আবেদন জানিয়ে বললেন, 'হে আমার প্রতিপালক! এই মহিলারা আমাকে যার প্রতি আহবান করছে, তা অপেক্ষা কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়। তুমি যদি তাদের ছলনা হতে আমাকে রক্ষা না কর, তাহলে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব।'

অতঃপর তার প্রতিপালক তার আহবানে সাড়া দিলেন এবং তাকে তাদের ছলনা হতে রক্ষা করলেন। তিনি তো সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

কিন্তু প্রমাণ ও নিদর্শনাবলী দেখার পরও তাদের মনে হল যে, ইউসুফকে কিছুকালের জন্য কারারুদ্ধ করতেই হবে। তাঁর নির্দোষিতা ও পবিত্রতা প্রকাশ হওয়ার পরেও ইউসুফ (عليه السلام)-কে জেলখানায় পাঠানোতে আযীযের দৃষ্টিতে এই যুক্তি ও কল্যাণ থাকতে পারে যে, তিনি ইউসুফ (عليه السلام)-কে তাঁর স্ত্রী থেকে দূরে রাখতে চাচ্ছিলেন, যাতে সে পুনরায় ইউসুফ (عليه السلام)-কে নিজ প্রেম-জালে ফাঁসানোর চেষ্টা না করতে পারে, যেমন তার ইচ্ছাও তাঁর জেল-হাজতই ছিল।

সুতরাং তাঁকে কারাগারে বন্দী ক'রে রাখা হল। কোন অপরাধে তাঁর সাথে দু'জন যুবক কারাগারে প্রবেশ করল। একদিন তাদের একজন বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, আমি (আঙ্গুর) নিঙড়ে মদ তৈরি করছি' এবং অপরজন বলল, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম আমি আমার মাথায় রুটি বহন করছি এবং পাখি তা হতে খাচ্ছে। আমাদেরকে আপনি এর তাৎপর্য জানিয়ে দিন, আমরা আপনাকে সৎকর্মপরায়ণ দেখছি।'

ইউসুফ বলল, 'তোমাদেরকে যে খাদ্য দেওয়া হয়, তা আসবার পূর্বে আমি তোমাদেরকে স্বপ্নের ব্যাখ্যা জানিয়ে দেব, এ জ্ঞান আমার প্রতিপালক আমাকে যা শিক্ষা দিয়েছেন তারই অন্তর্ভুক্ত। যে সম্প্রদায় আল্লাহকে বিশ্বাস করে না ও পরলোকে অবিশ্বাসী, আমি তাদের মতবাদ বর্জন করেছি।

সুতরাং আমি যে তাৎপর্য বলব, তা জ্যোতিষী ও গণকদের মত ধারণা বা অনুমানের ভিত্তিতে নয়, যাতে ঠিক ও ভুল উভয়েরই সম্ভাবনা থাকে। বরং আমার তাৎপর্য সুদৃঢ় জ্ঞানের উপর ভিত্তি ক'রে হবে, যা আল্লাহর পক্ষ থেকে আমাকে প্রদান করা হয়েছে। যাতে ভুলের কোন অবকাশ নেই।'

অতঃপর এই সুযোগে তিনি দাওয়াতের কাজও শুরু ক'রে দিলেন। কারারুদ্ধ থেকেও মানুষকে সর্বপ্রথম তাওহীদের দাওয়াত দিয়ে শির্ক বর্জন করতে উপদেশ দিতে লাগলেন। আর প্রত্যেক নবীর সর্বপ্রথম দাওয়াত এটাই ছিল। সুতরাং তিনি বললেন, 'আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকূবের দ্বীন অনুসরণ করি। আল্লাহর সাথে কোন বস্তুকে শরীক করা আমাদের কাজ নয়। এটা আমাদের এবং সমস্ত মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। হে আমার কারা-সঙ্গীদ্বয়! ভিন্ন ভিন্ন বহু প্রতিপালক শ্রেয়, না পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? তাঁকে ছেড়ে তোমরা শুধু এমন কতকগুলি নামের উপাসনা করছ, যা তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরা রেখে নিয়েছ। এইগুলির কোন প্রমাণ আল্লাহ অবতীর্ণ করেননি। বিধান দেওয়ার অধিকার শুধু আল্লাহরই। তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা তিনি ছাড়া আর কারোই উপাসনা করবে না। এটাই সরল-সঠিক দ্বীন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়।'

'যে নাম তোমরা এবং তোমাদের পিতৃপুরুষরা রেখে নিয়েছ'---এর এক অর্থ এই যে, তাদের 'উপাস্য' নামটি তোমরা নিজেরাই দিয়েছ। প্রকৃতপক্ষে না তারা উপাস্য, আর না সে সম্পর্কে কোন প্রমাণ আল্লাহ তাআলা অবতীর্ণ করেছেন। দ্বিতীয় অর্থ এই যে, সেই উপাস্যদের বিভিন্ন নাম যা তোমরা দিয়ে রেখেছ; যেমন বর্তমানে, খাজা গরীব নেওয়ায, গঞ্জ বখশ, কিরনী ওয়ালা, কারমাঁ ওয়ালা, গওসে আযম, দস্তগীর, মুশকিল কুশা (অনুরূপ দাতা

সাহেব, খাজাবাবা, সাঁইবাবা) ইত্যাদি এসব তোমাদের নিজেদের মনগড়া নাম, আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এর কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করা হয়নি।

অতঃপর তিনি তাদের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত বলতে লাগলেন, 'হে আমার কারাসঙ্গীদ্বয়! তোমাদের একজন সম্বন্ধে কথা এই যে, সে তার প্রভুকে মদ্য পান করাবে এবং অপরজন সম্বন্ধে কথা এই যে, সে শূলবিদ্ধ হবে, অতঃপর তার মস্তক হতে পাখি আহার করবে। যে বিষয়ে তোমরা জানতে চেয়েছ তার সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে।'

ইউসুফ ﷺ তাদের মধ্যে যে মুক্তি পাবে মনে করলেন, তাকে বললেন, 'তোমার প্রভুর কাছে আমার কথা বলো।' (যাতে আমিও মুক্তিলাভ করতে পারি।) কিন্তু শয়তান তাকে তার প্রভুর কাছে তাঁর বিষয় বলবার কথা ভুলিয়ে দিল; সুতরাং তিনি কয়েক বছর কারাগারে থেকে গেলেন।

ইতিমধ্যে রাজা স্বপ্ন দেখলেন এবং তার ব্যাখ্যা জানতে চাইলেন। তিনি বললেন, 'আমি স্বপ্নে দেখলাম, সাতটি স্থূলকায় গাভী; ওগুলিকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক। হে প্রধানগণ! যদি তোমরা স্বপ্নের ব্যাখ্যা করতে পার, তাহলে আমার স্বপ্ন সম্বন্ধে অভিমত দাও।'

তারা বলল, 'এটা একটা আবোল-তাবোল (অর্থহীন) স্বপ্ন এবং আমরা এরূপ স্বপ্ন ব্যাখ্যায় অভিজ্ঞ নই।'

দু'জন কারা-বন্দীর মধ্যে যে মুক্তি পেয়েছিল এবং দীর্ঘকাল পরে ইউসুফের কথা তার স্মরণ হল, সে বলল, 'আমি এর তাৎপর্য তোমাদেরকে জানিয়ে দেব, সুতরাং তোমরা আমাকে পাঠিয়ে দাও।'

সুতরাং সে অনুমতিক্রমে জেলে গিয়ে বলল, 'হে ইউসুফ! হে মহা সত্যবাদী! সাতটি স্থূলকায় গাভী, ওগুলিকে সাতটি শীর্ণকায় গাভী ভক্ষণ করছে এবং সাতটি সবুজ শীষ ও অপর সাতটি শুষ্ক শীষ সম্বন্ধে আপনি আমাদেরকে ব্যাখ্যা দিন, যাতে আমি লোকদের কাছে ফিরে যেতে পারি এবং যাতে তারা অবগত হতে পারে।'

ব্যাখ্যায় ইউসুফ বললেন, 'তোমরা সাত বছর একাদিক্রমে চাষ করবে, অতঃপর তোমরা যে শস্য সংগ্রহ করবে তার মধ্যে যে সামান্য পরিমাণ তোমরা ভক্ষণ করবে, তা ব্যতীত সমস্ত শস্য শীষ সমেত রেখে দেবে। এরপর আসবে সাতটি কঠিন (দুর্ভিক্ষের) বছর, এই সাত বছর যা পূর্বে সঞ্চয় ক'রে রাখবে, লোকে তা খাবে; শুধু সামান্য কিছু যা তোমরা সংরক্ষণ করবে তা ব্যতীত। এরপর আসবে এক বছর, সেই বছর মানুষের জন্য প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে এবং সেই বছর মানুষ ফলের রস নিঙড়াবে।'

যখন সেই ব্যক্তি ব্যাখ্যা নিয়ে বাদশার নিকট গেল ও ব্যাখ্যা বর্ণনা করল, তখন সেই ব্যাখ্যা ও ইউসুফ ﷺ-এর বলা তদবীর শ্রবণ ক'রে বাদশাহ বড় প্রভাবিত হলেন এবং তিনি অনুমান করলেন যে, এই ব্যক্তি, যাঁকে বেশ কিছুদিন থেকে জেলে রাখা হয়েছে, তিনি অসাধারণ জ্ঞান, মর্যাদা ও উচ্চ যোগ্যতার অধিকারী। সুতরাং বাদশাহ তাঁকে দরবারে উপস্থিত করার জন্য আদেশ দিলেন এবং বললেন, 'তোমরা ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এস।'

সুতরাং যখন দূত তার কাছে উপস্থিত হল, তখন ইউসুফ বললেন, 'তুমি তোমার প্রভু (রাজা)র কাছে ফিরে যাও এবং তাঁকে জিজ্ঞাসা কর, যে মহিলারা তাদের হাত কেটে ফেলেছিল তাদের অবস্থা কী? আমার প্রতিপালক তাদের ছলনা সম্বন্ধে সম্যক অবগত।'

ইউসুফ ﷺ যখন দেখলেন যে, এখন বাদশাহ সম্মান দিতে প্রস্তুত, তখন তিনি এইভাবে শুধু অনুগ্রহের পাত্র হয়ে জেল থেকে বের হওয়া পছন্দ করলেন না। বরং আপন চরিত্রকে উচ্চ এবং নিজের পবিত্রতাকে সাব্যস্ত করাকে প্রাধান্য দিলেন, যাতে পৃথিবীর সামনে তাঁর নির্মল চরিত্র ও সুউচ্চ মর্যাদা পরিস্ফুটিত হয়ে যায়। কারণ একজন (দায়ী) আল্লাহর পথে আহবানকারীর জন্য এই পবিত্রতা ও মহান চরিত্র খুবই জরুরী।

রাজা মহিলাদেরকে বলল, 'কী ব্যাপার তোমাদের? যখন তোমরা ইউসুফের কাছে যৌন-মিলন কামনা করেছিলে, (তখন কি সে সম্মত হয়েছিল?)' তারা বলল, 'আল্লাহ পবিত্র! আমরা তার মধ্যে কোন দোষ দেখিনি।' আর আযীযের স্ত্রী বলল, 'এক্ষণে সত্য প্রকাশ পেয়ে গেল। আমিই তার কাছে যৌন-মিলন কামনা করেছিলাম, আর সে অবশ্যই সত্যবাদী। এটা এ জন্য যে, যাতে সে জানতে পারে যে, তার অনুপস্থিতিতে আমি তার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিনি এবং আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না। আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দকর্ম-প্রবণ, কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। নিশ্চয় আমার প্রতিপালক অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

অতঃপর রাজা বললেন, 'ইউসুফকে আমার কাছে নিয়ে এস, আমি তাকে আমার একান্ত সহচর নিযুক্ত করব।' সুতরাং রাজা যখন তাঁর সাথে কথা বললেন, তখন তিনি বললেন, 'আজ তুমি আমাদের কাছে মর্যাদাবান ও বিশ্বাসভাজন।'

ইউসুফ বললেন, 'আমাকে দেশের কোষাধ্যক্ষ নিযুক্ত করুন। নিশ্চয়ই আমি সুসংরক্ষণকারী, সুবিজ্ঞ।'

তিনি এ (শস্যাগারের) ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব নিজ হাতে নেওয়ার ইচ্ছা এই জন্য প্রকাশ করলেন, যাতে (স্বপ্নের তা'বীর বা ব্যাখ্যা অনুসারে) আসন্ন দুর্ভিক্ষের জন্য উচিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে শস্য সংরক্ষিত রাখা যেতে পারে। সাধারণ অবস্থায় যদিও পদ বা নেতৃত্ব প্রার্থনা করা বৈধ নয়, কিন্তু ইউসুফ ﷺ-এর এই পদক্ষেপ গ্রহণ থেকে জানা যায় যে, বিশেষ অবস্থায় যদি কোন লোক এটা মনে করে যে, জাতি ও রাষ্ট্রের উপর আগত সঙ্কটের উচিত ব্যবস্থার যথাযথ যোগ্যতা আমার মধ্যে বিদ্যমান, যা অন্যের মধ্যে নেই, তাহলে সে নিজের যোগ্যতা অনুসারে এই বিশেষ পদ প্রার্থনা করতে পারে। পক্ষান্তরে ইউসুফ ﷺ মূলতঃ পদ প্রার্থনাই করেননি। বরং যখন মিসরের রাজা তাঁর সামনে এর প্রস্তাব দিয়েছিলেন, তখন তিনি এমন পদ গ্রহণের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন, যাতে অধিষ্ঠিত থেকে তিনি জাতি ও রাষ্ট্রের সেবা সুন্দর ও সহজভাবে করতে পারেন।

মহান আল্লাহ বলেন, "এইভাবে আমি ইউসুফকে সেই দেশে প্রতিষ্ঠিত করলাম; সে ঐ দেশে যেখানে ইচ্ছা অবস্থান করতে পারত। আমি যাকে ইচ্ছা তার প্রতি দয়া ক'রে থাকি। আর আমি সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করি না। অবশ্যই যারা বিশ্বাসী ও সাবধানী তাদের জন্য পরকালের পুরস্কারই উত্তম।"

মহান আল্লাহ ইউসুফ ﷺ-কে ঐ দেশের উপর এমন শক্তি ও কৌশল প্রদান করলেন যে, মিসরের রাজা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী কাজ করতেন এবং তিনি মিসরের মাটিতে এমন অধিকার প্রয়োগ করতেন, যেমন কোন মানুষ নিজ গৃহে প্রয়োগ করে থাকে। তিনি যেখানে ইচ্ছা সেখানে অবস্থান করতেন, পুরা মিসর ছিল তাঁর পরিপূর্ণ অধীনস্থ।

এটা ছিল তাঁর সেই সবরের সুফল, যা তিনি ভাইদের অন্যায়-অত্যাচারের উপর করেছিলেন এবং ঐ সুদৃঢ় পদক্ষেপের (বদলা ছিল) যা তিনি যুলাইখার পাপের আহবানের মোকাবিলায় এখতিয়ার করেছিলেন এবং সেই দৃঢ়তার (বদলা ছিল), যা তিনি কয়েদখানার জীবনে অবলম্বন করেছিলেন। ইউসুফ ﷺ-এর এই পদ সেই পদ ছিল, যার উপর ইতিপূর্বে মিসরের সেই রাজা অধিষ্ঠিত ছিলেন, যাঁর স্ত্রী ইউসুফ ﷺ-কে ব্যভিচারে উদ্বুদ্ধ করার অপচেষ্টা করেছিল।

কারো কারো মন্তব্য যে, উক্ত রাজা ইউসুফ ﷺ-এর দা'ওয়াত ও তবলীগে মুসলমান হয়ে গিয়েছিলেন। অনুরূপ কারো কারো মন্তব্য যে, মিসরের রাজা ইতফীরের মৃত্যুর পর ইউসুফ ﷺ-এর সাথে যুলাইখার বিয়ে হয়েছিল এবং দুটি সন্তানও হয়েছিল; একজনের নাম আফরাইম এবং দ্বিতীয়জনের নাম মীশা ছিল। আফরাইমই ছিল ইউশা' বিন নূন ও আইউব ﷺ-এর স্ত্রী 'রাহমাত'-এর পিতা। (তাফসীর ইবনে কাষীর) কিন্তু এ কথা কোন বিশ্বস্ত সূত্রে প্রমাণিত নয়, তাই বিবাহ সংক্রান্ত কথাটা বিশুদ্ধ বলে মনে হয় না। এ ছাড়া উক্ত মহিলার পক্ষ থেকে পূর্বে যে ব্যভিচার-মূলক অসদাচরণ প্রদর্শিত হয়েছিল, তার কারণে এক নবী পরিবারের সাথে তার বৈবাহিক সম্পর্ক কায়েম হওয়ার কথা নেহাতই অনুচিত মনে হয়।

কিছু কাল পর শুরু হয়ে গেল দুর্ভিক্ষ। যা মিশর দেশের সমস্ত এলাকা ও শহরকে আক্রমণ করল, এমনকি কানআন পর্যন্ত এর প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল, যেখানে ইয়াকূব ﷺ ও ইউসুফ ﷺ-এর ভাইগণ বসবাস রত ছিলেন। ইউসুফ ﷺ এই দুর্ভিক্ষের জন্য সুকৌশলের সাথে যে সুব্যবস্থা নিয়েছিলেন, তা সফল হল এবং শস্যপ্রাপ্তির জন্য সব দিক থেকে লোকজন তাঁর কাছে আসতে লাগল। ইউসুফ ﷺ-এর প্রসিদ্ধি কানআন পর্যন্তও পৌঁছে গেল যে, মিসরের বাদশা এভাবে শস্য বিক্রি করছেন। সুতরাং পিতার আদেশে ইউসুফ ﷺ-এর ভায়েরাও বাড়ি থেকে পুঁজি নিয়ে শস্য প্রাপ্তির জন্য রাজদরবারে উপস্থিত হল, যেখানে ইউসুফ ﷺ রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইউসুফ তাদেরকে চিনলেন, কিন্তু তারা তাঁকে চিনতে পারল না।

ইউসুফ ﷺ অপরিচিত থেকে স্বীয় ভাইদেরকে কিছু কথা জিজ্ঞেস করলে তারা অন্যান্য কথা বলার সাথে সাথে এটাও বলে ফেলল যে, আমরা দশ ভাই এখানে উপস্থিত রয়েছি, কিন্তু আরো দুজন বৈমাত্রেয় ভাই আছে, তাদের একজন তো জঙ্গলে ধ্বংস হয়ে গেছে এবং দ্বিতীয়জনকে আব্বা সান্ত্বনা স্বরূপ নিজের কাছে রেখে নিয়েছেন, আমাদের সাথে পাঠাননি। তখন ইউসুফ ﷺ তাদের খাদ্য-সামগ্রীর ব্যবস্থা ক'রে দিলেন এবং বললেন, 'তোমরা আমার নিকট তোমাদের বৈমাত্রেয় ভাইকে নিয়ে এসো। তোমরা কি দেখছ না যে, আমি

মাপে পূর্ণ মাত্রায় দিই এবং আমিই উত্তম অতিথিপরায়ণ? কিন্তু তোমরা যদি তাকে আমার নিকট নিয়ে না আস, তাহলে আমার নিকট তোমাদের জন্য কোন খাদ্য-সামগ্রী থাকবে না এবং তোমরা আমার নিকটবর্তী হবে না।'

তারা বলল, 'ওর বিষয়ে আমরা ওর পিতাকে সম্মত করার চেষ্টা করব এবং আমরা নিশ্চয়ই এটা করব।'

অতঃপর ইউসুফ ﷺ তাঁর (কর্মচারী) যুবকদেরকে বললেন, 'তাদের দেওয়া পণ্যমূল্য তাদের মালপত্রের মধ্যে রেখে দাও; যাতে ওরা স্বজনগণের নিকট ফিরে যাওয়ার পর তারা তা চিনতে পারে, তাহলে সম্ভবতঃ তারা পুনরায় ফিরে আসবে।'

সুতরাং যখন তারা তাদের পিতার নিকট ফিরে এল, তখন বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য খাদ্য-সামগ্রী নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সুতরাং আমাদের সাথে আমাদের ভাইকে পাঠিয়ে দিন; যাতে আমরা খাদ্য-সামগ্রী পেতে পারি। আমরা অবশ্যই তার রক্ষণাবেক্ষণ করব। আগামীর শস্যপ্রাপ্তি বিন্‌য়্যামীনকে পাঠানোর উপর নির্ভরশীল। যদি সে আমাদের সাথে যায়, তাহলে শস্য পাওয়া যাবে। আর যদি না যায়, তাহলে শস্য পাওয়া যাবে না। সুতরাং তাকে আমাদের সাথে অবশ্যই পাঠান, যেন গত বারের মত দ্বিতীয়বারও শস্য পাই। আর ইউসুফকে পাঠাবার সময় যে ভয় করেছিলেন, সে ধরনের ভয় করবেন না। এর রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব আমাদের।'

কিন্তু পিতা বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে ওর সম্বন্ধে সেইরূপই বিশ্বাস করব, যেরূপ বিশ্বাস ওর ভাই সম্বন্ধে পূর্বে তোমাদেরকে করেছিলাম? সুতরাং আল্লাহই শ্রেষ্ঠ রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ দয়ালু।'

অতঃপর যখন তারা তাদের মালপত্র খুলল, তখন তারা দেখতে পেল মালের সাথে তাদের পণ্যমূল্য তাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। তারা বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমরা আর কী প্রত্যাশা করতে পারি? এই তো আমাদের দেওয়া পণ্যমূল্য আমাদেরকে ফেরত দেওয়া হয়েছে। পুনরায় আমরা আমাদের পরিবারবর্গকে খাদ্য-সামগ্রী এনে দেব এবং আমরা আমাদের ভাইয়ের রক্ষণাবেক্ষণ করব এবং আমরা অতিরিক্ত আর এক উটনী বোঝাই পণ্য আনব। যা এনেছি তা পরিমাণে অল্প।'

যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তিকে ততটা পরিমাণ শস্য দেওয়া হয়, যতটা তার উট বহন করতে পারে। সুতরাং বিন্‌য়্যামীনের কারণে একটি উটের বোঝ পরিমাণ শস্য আরো বেশি পাওয়া যাবে।

কিন্তু পিতা বললেন, 'আমি ওকে কক্ষনো তোমাদের সাথে পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা আল্লাহর নামে অঙ্গীকার কর যে, তোমরা তাকে আমার নিকট অবশ্যই ফিরিয়ে আনবে; তবে তোমরা অবরুদ্ধ হয়ে পড়লে সে কথা ভিন্ন।' অতঃপর যখন তারা তাঁর নিকট অঙ্গীকার করল তখন তিনি বললেন, 'আমরা যা কিছু বলছি, আল্লাহ তার বিধায়ক।'

আশঙ্কা থাকা সত্ত্বেও যেহেতু শস্যের অত্যন্ত প্রয়োজন ছিল, তাই পিতা বিন্‌য়্যামীনকে তাদের সাথে পাঠাতে অস্বীকার করা উচিত মনে করলেন না এবং আল্লাহর উপর ভরসা ক'রে তাকে পাঠাবার জন্য তৈরী হয়ে গেলেন।

অতঃপর তিনি বললেন, 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা (শহরের) এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না; বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না। বিধান আল্লাহরই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করলাম এবং যারা নির্ভর করতে চায় তারা আল্লাহরই উপর নির্ভর করুক।'

একই সঙ্গে যেতে নিষেধ এই জন্য করলেন যে, একই পিতার এগারো জন পুত্র যারা দেহের উচ্চতা এবং আকার-আকৃতিতেও শ্রেষ্ঠ, যখন একসাথে একই স্থান অথবা দলবদ্ধভাবে কোথাও দিয়ে অতিক্রম করে, তখন সাধারণতঃ লোকেরা আশ্চর্য এবং হিংসার দৃষ্টিতে দেখে, আর এটাই নজর লাগার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং তিনি তাদেরকে বদনজর থেকে বাঁচাবার জন্য উপায় স্বরূপ এই নির্দেশনা দিলেন।

সুতরাং যখন তারা তাদের পিতা তাদেরকে যেভাবে আদেশ করেছিল সেভাবেই (মিসর) প্রবেশ করল, তখন আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে ওটা তাদের কোন কাজে আসল না; ইয়াকূব ﷺ শুধু তাঁর মনের একটি অভিপ্রায় পূর্ণ করেছিলেন মাত্র। আর তিনি অবশ্যই জ্ঞানী ছিলেন। তাঁর উক্ত নির্দেশনা বাহ্যিক উপায়, সতর্কতা ও সুব্যবস্থা স্বরূপ; যা অবলম্বন করার আদেশ মানুষকে করা হয়েছে। কিন্তু এর মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্ধারিত ভাগ্যে কোন পরিবর্তন ঘটতে পারে না। ঘটবে সেটাই যেটা তাঁর সিদ্ধান্ত বা ফায়সালা অনুসারে তাঁর হুকুম হবে।

এক সময় তারা যখন ইউসুফ ﷺ-এর সামনে হাজির হল, তখন তিনি তাঁর (সহোদর) ভাইকে নিজের কাছে রাখলেন এবং বললেন, 'আমিই তোমার (সহোদর) ভাই, সুতরাং তারা যা করত তার জন্য তুমি দুঃখ করো না।'

এক একটি রুমে দু'জন ক'রে ভাইকে থাকার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া হল, এমনিভাবে বিন্‌য়্যামীন যখন একাই অবশিষ্ট রয়ে গেলেন, তখন ইউসুফ ﷺ তাঁকে একটি পৃথক রুমে থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিলেন। অতঃপর নির্জনে তাঁর সাথে আলাপ-আলোচনা করলেন এবং পূর্বের ঘটনা উল্লেখ ক'রে বললেন যে, এই ভায়েরা আমার সাথে যে আচরণ করেছে তার জন্য দুঃখ করো না। আর সেই সময় বিন্‌য়্যামীনকে আটকানোর জন্য যে ফন্দি বা বাহানা করার ছিল, সে সম্পর্কেও তাঁকে আগাম জানিয়ে দিলেন, যাতে তিনি পেরেশান না হন।

অতঃপর ইউসুফ ﷺ যখন তাদের সামগ্রীর ব্যবস্থা ক'রে দিলেন, তখন চুপিসারে তিনি তাঁর (সহোদর) ভাই-এর মালপত্রের মধ্যে পানপাত্র (সা') রেখে দিলেন। অতঃপর এক আহবায়ক চীৎকার ক'রে বলল, 'হে যাত্রীদল তোমরা নিশ্চয়ই চোর।'

চুরির এই দোষারোপ স্বস্থানে বাস্তবিক ছিল। কেননা আহবায়ক সেবক ইউসুফ ﷺ-এর পরিকল্পিত কৌশল সম্পর্কে অবগত ছিল না।

ভায়েরা তাদের দিকে চেয়ে বলল, 'তোমরা কী হারিয়েছ?' বা 'তোমাদের কী হারিয়েছে?'

তারা বলল, 'আমরা রাজার পানপাত্র (সা') হারিয়েছি; যে ওটা এনে দেবে (বা ফেরত দেবে), সে (পুরস্কারস্বরূপ) এক উট বোঝাই মাল পাবে এবং আমি তার জামিন।'

ভায়েরা বলল, 'আল্লাহর শপথ! তোমরা তো জান যে, আমরা এই দেশে অশান্তি সৃষ্টি

করতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই।'

রাজার লোকেরা বলল, 'যদি তোমরা মিথ্যাবাদী হও, তাহলে তার শাস্তি কী?'

ভায়েরা বলল, 'এর শাস্তি এই যে, যার মালপত্রের মধ্যে পাত্রটি পাওয়া যাবে, সেই হবে তার বিনিময়। (সে দাস হয়ে তোমাদের দাসত্ব করবে।) এভাবে আমরা সীমালংঘনকারীদের শাস্তি দিয়ে থাকি।'

অতঃপর ইউসুফ ﷺ নিজ (সহোদর) ভ্রাতার মালপত্র তল্লাশি করার পূর্বে ওদের মালপত্র তল্লাশি করতে লাগলেন। অর্থাৎ, প্রথমে অন্য ভাইদের মালপত্রের তল্লাশি নিলেন এবং সবশেষে বিন্‌য়্যামীনের মালপত্র দেখলেন, যাতে ক'রে তাদের সন্দেহ না হয় যে, এটা কোন সুপরিকল্পিত কৌশল।

সুতরাং তাঁর সহোদরের মালপত্রের মধ্য হতে পাত্রটি বের করা হল।

মহান আল্লাহ বলেন, "এভাবে আমি ইউসুফের জন্য কৌশল করলাম। আল্লাহ ইচ্ছা না করলে রাজার আইনে তার সহোদরকে সে (দাস বানিয়ে) আটক করতে পারত না। আমি যাকে ইচ্ছা মর্যাদায় উন্নীত করি। আর প্রত্যেক জ্ঞানবান ব্যক্তির উপর আছে অধিক জ্ঞানী।"

অর্থাৎ রাজার যে আইন তথা নিয়ম মিসরে প্রচলিত ছিল, সেই মোতাবেক বিন্‌য়্যামীনকে এভাবে আটকানো সম্ভব ছিল না, তাই তারা যাত্রীদলকেই জিজ্ঞেস করল যে, বল, এই অপরাধের দন্ড কী হওয়া উচিত? যেহেতু এটা ইয়াকূব ﷺ-এর শরীয়তে শাস্তি ছিল, তাই সেই মোতাবেক ইউসুফ ﷺ-এর ভায়েরা উক্ত শাস্তির প্রস্তাব পেশ করেছিল।

ধরা খেয়ে তারা বলল, 'সে যদি চুরি ক'রে থাকে, তাহলে তার (সহোদর) ভাইও তো ইতিপূর্বে চুরি করেছিল।' কিন্তু ইউসুফ প্রকৃত ব্যাপার নিজের মনে গোপন রাখলেন এবং তাদের কাছে প্রকাশ করলেন না। তিনি (মনে মনে) বললেন, 'তোমাদের অবস্থা তো হীনতর এবং তোমরা যা বলছ, সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত।'

ভায়েরা নিজেদের পবিত্রতা ও সাধুতা প্রকাশ করার জন্য উক্ত কথা বলল। কেননা ইউসুফ ﷺ ও বিন্‌য়্যামীন উভয়ই তাদের সহোদর ভাই ছিলেন না; বরং বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন।

কতিপয় ব্যাখ্যাকারী ইউসুফ ﷺ-এর চুরির ব্যাপারে দুটি রহস্যময় কথা উল্লেখ করেছেন, যা কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণের উপর ভিত্তিশীল নয়। বিশুদ্ধ কথা এটাই মনে হচ্ছে যে, ভায়েরা নিজেদেরকে তো নেহাত সাধুতা ও সচ্চরিত্রের অধিকারী প্রমাণ করল। আর ইউসুফ ﷺ ও বিন্‌য়্যামীনকে হীন চরিত্রের সাব্যস্ত করল এবং মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে তাঁদেরকে চোর ও বেঈমান প্রতিপন্ন করার অপচেষ্টা করল!

অতঃপর যখন তারা দেখল যে, বিন্‌য়্যামীন চুরির অপরাধে দাস হয়ে এখানেই থেকে যাবে, তখন বলল, 'হে আযীয! এর পিতা আছেন অতিশয় বৃদ্ধ, সুতরাং এর স্থলে আপনি আমাদের একজনকে রাখুন! আমরা তো আপনাকে দেখছি মহানুভব ব্যক্তিদের একজন।'

পিতা তো অবশ্যই বৃদ্ধ ছিলেন, কিন্তু এখানে তাদের মূল উদ্দেশ্য ছিল বিন্‌য়্যামীনকে মুক্ত করা। তাঁদের মাথায় ইউসুফ ﷺ সংক্রান্ত কথা স্মরণ হচ্ছিল যে, এমন আবার না হয় যে,

বিন্য়্যামীনকে ছেড়ে পিতার কাছে আমাদেরকে ফিরে যেতে হয় এবং তিনি আমাদেরকে বলেন যে, তোমরা আমার বিন্য়্যামীনকে ইউসুফের মত হারিয়ে এলে। তাই তারা ইউসুফ ﷺ-এর মহানুভবতা ও অনুগ্রহের প্রশংসা ক'রে এই কথা বলল, হয়তো তিনি এ অনুগ্রহটুকুও করবেন যে, বিন্য়্যামীনকে ছেড়ে দিয়ে তার স্থলে অন্য কোন ভাইকে রেখে নেবেন।

কিন্তু মিসরের 'আযীয' উপাধিপ্রাপ্ত ইউসুফ ﷺ বললেন, 'যার নিকট আমরা আমাদের মাল পেয়েছি, তাকে ছাড়া অন্যকে রাখার অপরাধ হতে আমরা আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করছি! এরূপ করলে আমরা অবশ্যই সীমালংঘনকারী হব।'

তিনি এই কথা বললেন, যেহেতু বিন্য়্যামীনকেই আটকে রাখাই তো তাঁর মূল উদ্দেশ্য ছিল।

অতঃপর যখন তারা তাঁর নিকট হতে সম্পূর্ণ নিরাশ হল, তখন তারা নির্জনে গিয়ে পরামর্শ করতে লাগল। বিন্য়্যামীনকে ছেড়ে যাওয়া তাদের পক্ষে ভীষণ কঠিন ছিল। যেহেতু তারা পিতাকে মুখ দেখানোর যোগ্যই ছিল না। তাই তারা পরস্পর পরামর্শ করতে লাগল যে, এখন কী করা যায়?

ওদের মধ্যে যে বয়োজ্যেষ্ঠ ছিল সে বলল, 'তোমরা কি জান না যে, তোমাদের পিতা তোমাদের নিকট হতে আল্লাহর নামে অঙ্গীকার নিয়েছেন এবং পূর্বেও তোমরা ইউসুফের ব্যাপারে ত্রুটি করেছিলে। সুতরাং আমি কিছুতেই এই দেশ ত্যাগ করব না, যতক্ষণ না আমার পিতা আমাকে অনুমতি দেন অথবা আল্লাহ আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করেন এবং তিনিই শ্রেষ্ঠ বিচারক।

অর্থাৎ, আমি ততক্ষণ পর্যন্ত এখান থেকে যাব না; যতক্ষণ পর্যন্ত না আব্বাজান নিজে তদন্ত ক'রে দেখে আমার নির্দোষ হওয়ার কথা বিশ্বাস ক'রে নেবেন এবং আমাকে আসার অনুমতি দেবেন। অথবা কোন প্রকারে আযীয (মিসরের বাদশা) বিন্য়্যামীনকে ছেড়ে দিয়ে আমার সাথে যাওয়ার অনুমতি দেবেন। অথবা আল্লাহ তাআলা আমাকে এতটা শক্তি দান করবেন যে, আমি বিন্য়্যামীনকে তরবারির জোরে অর্থাৎ শক্তির জোরে মুক্ত ক'রে আমার সাথে নিয়ে যেতে পারব।

তোমরা তোমাদের পিতার নিকট ফিরে যাও এবং বল, 'হে আমাদের পিতা! আপনার পুত্র চুরি করেছে এবং আমরা যা জানি, তারই প্রত্যক্ষ বিবরণ দিলাম। আর অদৃশ্যের ব্যাপারে আমরা অবহিত ছিলাম না।

অর্থাৎ, আমরা যে কথা দিয়েছিলাম যে, আমরা বিন্য়্যামীনকে সকুশল ফিরিয়ে নিয়ে আসব, তা আমাদের জ্ঞানের উপর ভিত্তি ক'রে দিয়েছিলাম, পরে যে ঘটনা ঘটল এবং যার কারণে বিন্য়্যামীনকে রেখে আসতে হল, এটা তো আমাদের ধারণাতীত বিষয়। দ্বিতীয় অর্থ হলো এই যে, আমরা চুরির যে শাস্তির কথা বলেছিলাম যে, চোরকেই চুরির পরিবর্তে রেখে নেওয়া হোক, তা আমরা আমাদের জ্ঞানানুসারে নির্ধারণ করেছিলাম, এতে কোন প্রকার অসদুদ্দেশ্য ছিল না। (যেহেতু আমরা সুনিশ্চিত ছিলাম যে, আমাদের মধ্যে কেউ চুরি করতেই পারে না।) কিন্তু ঘটনাক্রমে যখন সামানের তল্লাশি নেওয়া হলো, তখন চুরিকৃত পানপাত্র বিন্য়্যামীনের মালপত্র থেকেই বের হলো। সুতরাং এ ব্যাপারে আমাদের কোন দোষ নেই।

তাছাড়া যে জনপদে আমরা ছিলাম ওর অধিবাসীদেরকে এবং যে যাত্রীদলের সাথে আমরা এসেছিলাম তাদেরকেও জিজ্ঞাসা করুন; তাহলে বুঝতে পারবেন যে, আমরা অবশ্যই সত্যবাদী।'

বলা বাহুল্য, বাকী ভায়েরা ফিরে গেল এবং পিতার কাছে অনুরূপ কথা বললে পিতা বললেন, 'বরং তোমাদের মন তোমাদের জন্য একটি কাহিনী সাজিয়ে নিয়েছে; সুতরাং পূর্ণ ধৈর্যই শ্রেয়; হয়তো আল্লাহ ওদের সকলকেই আমার কাছে এনে দেবেন। নিশ্চয় তিনিই সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

ইউসুফের স্বপ্ন-বৃত্তান্ত যে সত্য হবে, তা তাঁর বিশ্বাসে ছিল বলেই এই শ্রেণীর আশা তাঁর বুকে বাসা বেঁধেছিল। কিন্তু অদৃশ্যের খবর তিনি জানতেন না। তাই তিনি দুঃখিত ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ছিলেন। বিন্য়্যামীন হারানোর এই টাটকা ঘা ইউসুফ হারানোর পুরাতন ঘাকেও তাজা করে তুলল।

তিনি ওদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন এবং বললেন, 'আফসোস ইউসুফের জন্য!' আর শোকে তার চক্ষুদ্বয় সাদা হয়ে গেল এবং অসহনীয় মনস্তাপে তিনি ক্লিষ্ট হতে লাগলেন।

ইউসুফের প্রতি হিংসার জ্বালা বুকে ছিল। তাই তারা তাঁর নাম পিতার মুখে সহ্য করতে পারল না। তারা বলল, 'আল্লাহর শপথ! আপনি তো ইউসুফের কথা স্মরণ করতেই থাকবেন, যতক্ষণ না আপনি মুমূর্ষু হবেন অথবা মৃত্যুবরণ করবেন।'

আশাভরা বুক ও মুখে ইয়াকূব ﷺ বললেন, 'আমি আমার অসহনীয় বেদনা ও দুঃখ শুধু আল্লাহরই নিকট নিবেদন করছি এবং আমি আল্লাহর নিকট হতে তা জানি, যা তোমরা জান না। হে আমার পুত্রগণ! তোমরা যাও, ইউসুফ ও তাঁর সহোদরের অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়ো না, কারণ অবিশ্বাসী সম্প্রদায় ব্যতীত কেউই আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয় না।'

সুতরাং তারা আবার মিসর ফিরে গেল এবং যখন তারা ইউসুফ ﷺ-এর নিকট উপস্থিত হল, তখন বলল, 'হে আযীয! আমরা ও আমাদের পরিবার-পরিজন বিপন্ন হয়ে পড়েছি এবং আমরা তুচ্ছ পণ্য নিয়ে এসেছি; আপনি আমাদের রসদ পূর্ণ মাত্রায় দিন এবং আমাদেরকে দান করুন; নিশ্চয় আল্লাহ দানীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন।'

যখন তারা অতি নম্রতার সাথে দান-খয়রাত করার অথবা ভাইকে মুক্ত করার জন্য আপীল করল এবং সাথে সাথে পিতার বার্ধক্য, দুর্বলতা ও পুত্র-বিচ্ছেদের আঘাতের কথাও উল্লেখ করল, তখন ইউসুফ ﷺ-এর হৃদয় আকুল হয়ে পড়ল, চক্ষুদ্বয় অশ্রুসজল হয়ে গেল এবং বাস্তব ঘটনা ব্যক্ত করতে বাধ্য হলেন। কিন্তু তিনি ভাইদের ক্রূরতার কথা উল্লেখ করার সাথে সাথে উদার চরিত্রের বিকাশ ঘটাতে ভুললেন না। সুতরাং তিনি বললেন, 'তোমরা কি জান, তোমরা ইউসুফ ও তার সহোদরের প্রতি কীরূপ আচরণ করেছিলে, যখন তোমরা ছিলে (পরিণাম সম্বন্ধে) অজ্ঞ?'

ভায়েরা যখন মিসর-অধিপতির মুখ থেকে সেই ইউসুফের কথা শুনল, যাকে বাল্যকালে তারা কানআনের এক অন্ধকার কূপে নিক্ষেপ করে দিয়েছিল, তখন তারা অবাক হল এবং তার দিকে মনোযোগ সহকারে তাকিয়ে ভাবল, ব্যাপার এমন তো নয় যে, যিনি আমাদের

সাথে আলাপ করছেন, তিনিই ইউসুফ? তা নাহলে ইউসুফের নাম ও ঘটনা তিনি কীভাবে জানতে পারলেন? সুতরাং তারা প্রশ্ন করল যে, 'তবে কি তুমিই ইউসুফ?'

ইউসুফ ﷺ বললেন, 'আমিই ইউসুফ এবং এই আমার সহোদর; আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন; যে ব্যক্তি সংযম ও ধৈর্য অবলম্বন করে, আল্লাহ সেইরূপ সৎকর্মপরায়ণদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।'

তারা বলল, 'আল্লাহর শপথ! আল্লাহ নিশ্চয় তোমাকে আমাদের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন এবং নিঃসন্দেহে আমরাই ছিলাম অপরাধী।'

উদারমনা ইউসুফ ﷺ বললেন, 'আজ তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করুন এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ দয়ালু। তোমরা আমার এ জামাটি নিয়ে যাও এবং এটা আমার পিতার মুখমন্ডলের উপর রাখো; তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবেন। আর তোমরা তোমাদের পরিবারের সকলকেই আমার নিকট নিয়ে এস।'

অতঃপর যাত্রীদল বের হয়ে পড়ল, তখনও তারা বাড়ি পৌঁছেনি। এদিকে ইয়াকূব ﷺ মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে সুসংবাদ পেয়ে পরিবারের লোকদিগকে বললেন, 'তোমরা যদি আমাকে ভারসাম্যহীন মনে না কর, তাহলে বলি, 'আমি ইউসুফের ঘ্রাণ পাচ্ছি।'

তারা বলল, 'আল্লাহর শপথ! আপনি তো আপনার পূর্ব বিভ্রান্তিতেই রয়েছেন।'

কিন্তু যখন সুসংবাদবাহক উপস্থিত হল এবং তাঁর মুখমন্ডলের উপর জামাটি রাখল, তখন তিনি দৃষ্টিশক্তি ফিরে পেলেন। তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাদেরকে বলিনি যে, আমি আল্লাহর নিকট হতে তা জানি, যা তোমরা জান না?'

তারা লজ্জিত ও লাঞ্ছিত হয়ে বলল, 'হে আমাদের পিতা! আমাদের পাপের জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করুন; নিশ্চয়ই আমরা অপরাধী।'

কিন্তু ইয়াকূব ﷺ সাথে সাথে তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন না। বরং ভবিষ্যতে দুআ করার ওয়াদা করলেন। উদ্দেশ্য এই ছিল যে, রাতের শেষ প্রহরে যে সময়টি আল্লাহর ইবাদতের জন্য তাঁর প্রিয় বান্দাদের বিশেষ সময় সেই সময়ে আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা-প্রার্থনার দুআ করব। দ্বিতীয় কথা এই যে, তারা ইউসুফের প্রতি অন্যায় করেছিল, সেহেতু তার পরামর্শ নেওয়া জরুরী ছিল। তাই তিনি সত্বর ক্ষমা-প্রার্থনার দুআ না ক'রে পরে করার ওয়াদা করলেন এবং বললেন, 'আমি আমার প্রতিপালকের কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব, তিনি অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।'

অতঃপর এক সময় ইয়াকূব ﷺ সপরিবারে মিসর যাত্রা করলেন। সুতরাং তাঁরা যখন ইউসুফের নিকট উপস্থিত হলেন, তখন ইউসুফ তাঁর পিতা-মাতাকে নিজের কাছে স্থান দান করলেন এবং বললেন, 'আপনারা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন।'

ইউসুফ ﷺ নিজ পিতা-মাতাকে সিংহাসনে বসালেন এবং তাঁরা সবাই তাঁর সামনে সিজদায় লুটিয়ে পড়লেন।

ইউসুফ ﷺ বললেন, 'হে আমার পিতা! এটাই আমার পূর্বেকার (শৈশবে দেখা) স্বপ্নের ব্যাখ্যা; আমার প্রতিপালক তা বাস্তবে পরিণত করেছেন এবং তিনি আমাকে কারাগার হতে মুক্ত ক'রে এবং শয়তানের আমার ও আমার ভাইদের মাঝে সম্পর্ক নষ্ট করার পরও

আপনাদেরকে মরু অঞ্চল হতে এখানে এনে দিয়ে আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আমার প্রতিপালক যা ইচ্ছা তা নিপুণতার সাথে ক'রে থাকেন, তিনি তো সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়।'

মহান আল্লাহর অনুগ্রহসমূহের মধ্যে কূপ থেকে বের করার কথা উল্লেখ করলেন না তিনি, যেন তাতে তাঁর ভায়েরা লজ্জিত না হন। এ হল নববী চরিত্র। আর এটাও উদার চরিত্রের একটি নমুনা যে, ভাইদেরকে একটুও দোষারোপ না ক'রে শয়তানকে উক্ত কীর্তিকলাপের কারণ বানালেন!

কী মহান সে চরিত্র, কত সুন্দর এ কাহিনী!

পরিশেষে ইউসুফ ﷺ মহান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সাথে প্রার্থনা করলেন, 'হে আমার প্রতিপালক! তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছ এবং স্বপ্নের ব্যাখ্যা শিক্ষা দিয়েছ; হে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা! তুমিই ইহলোক ও পরলোকে আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) হিসাবে মৃত্যু দান করো এবং আমাকে সৎকর্মপরায়ণদের অন্তর্ভুক্ত কর।' (সূরা ইউসুফ ও তার তফসীর দ্রঃ আহসানুল বায়ান)

সুন্দরতম অবয়ব

মহান আল্লাহ মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সুন্দর ভুবনে স্থান দিয়েছেন। মানুষের জন্য পৃথিবীর সব কিছু সৃজন করেছেন। কিন্তু সবচেয়ে সুন্দর রূপ ও আকৃতি দিয়েছেন মানুষকে। তিনি মানুষকে সুন্দর বানিয়ে সম্মান দিয়েছেন, ফিরিশ্তাবর্গকে সিজদা করিয়ে সম্মান দিয়েছেন। জ্ঞান-বুদ্ধি দিয়ে সুন্দরতম করেছেন। তিনি বলেছেন,

{اللَّهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ قَرَارًا وَالسَّمَاء بِنَاء وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ فَتَبَارَكَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ} (٦٤) سورة غافر

অর্থাৎ, আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বাসোপযোগী করেছেন এবং আকাশকে করেছেন ছাদস্বরূপ এবং তিনি তোমাদের আকৃতি গঠন করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি করেছেন উৎকৃষ্ট এবং তোমাদেরকে দান করেছেন উৎকৃষ্ট জীবিকা; তিনিই তো আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক। সুতরাং কত মহান বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহ! *(মু'মিন ঃ ৬৪)*

{خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ} (٣) التغابن

অর্থাৎ, তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি তোমাদেরকে আকৃতি দান করেছেন এবং তোমাদের আকৃতি সুন্দর করেছেন। আর প্রত্যাবর্তন তো তাঁরই নিকট। (তাগাবুন ঃ ৩)

প্রেমিক তার প্রেমিকাকে ভালোবেসে রূপ-সৌন্দর্যে তাকে একটি ফুটন্ত ফুলের সাথে তুলনা করে। তার সুন্দর ও লাবণ্যময় মুখমন্ডল দর্শন ক'রে তাকে চাঁদের সাথে তুলনা ক'রে 'চন্দ্রবদনা' বলে। কিন্তু রূপ-লাবণ্যময়ী যুবতী ফুল থেকেও সুন্দর, চাঁদ থেকেও সুন্দর।

আবূ জা'ফর মনসূর খলীফার খিলাফত-আমলে ঈসা বিন মূসা হাশেমী নামক এক যুবক

তার সুন্দরী স্ত্রীকে অত্যন্ত ভালোবাসত। এক জ্যোৎস্না-পুলকিত পূর্ণিমার রাতে মুক্ত আকাশের নিচে নির্জনে বসে প্রেমালাপ করতে করতে চাঁদের দিকে তাকিয়ে সে তার স্ত্রীকে বলল, 'তুমি ঐ পূর্ণিমার চাঁদের থেকেও বেশি সুন্দর। যদি তা তুমি না হও, তাহলে তোমাকে তিন তালাক।'

স্ত্রীকে নানা কথা বলে আদর-আহ্লাদ করা যায়, কিন্তু 'তালাক' শব্দ বলে কোন প্রকার খেল-তামাশা বৈধ নয়। স্ত্রী জানত সে কথার মানে। 'আপনি এ কী কথা বললেন? আমি আর আপনার জন্য হালাল নই' বলে সে স্বামীর নিকট থেকে উঠে গেল এবং পর্দা করতে লাগল। কারণ তার মতে সে যতই সুন্দরী ও লাবণ্যময়ী হোক, সমধুর জ্যোৎস্নাময় চাঁদের থেকে সে বেশি নয়।

ঈসা পড়ে গেল সমস্যায়। বড় দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় পৃথক রাত্রিবাস ক'রে সকালে খলীফা মনসূরের দরবারে উপস্থিত হয়ে ঘটনা খুলে বলল। খলীফা ফকীহগণকে আহবান ক'রে সে ব্যাপারে ফতোয়া চাইলেন। সকলেই এক বাক্যে বললেন, 'তালাক হয়ে গেছে। কারণ চাঁদের লাবণ্য মানুষের তুলনায় অনেক বেশি।'

কিন্তু য়্যাহয়্যা বিন আকষাম নামে একজন ফকীহ নীরব বসে ছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্যে খলীফা বললেন, 'আপনি নীরব কেন? আপনি কিছু বলুন।'

তিনি বললেন, 'তালাক হয়নি।'

সকলে বলল, 'আপনি কি আপনার ওস্তাযদের বিরোধিতা করবেন?'

তিনি বললেন, 'ফতোয়ার উৎস হল ইল্ম। আর সর্বজ্ঞাতা আল্লাহ এ ব্যাপারে ফতোয়া দিয়েছেন।'

অতঃপর তিনি সূরা তীন পড়তে শুরু করলেন,

{وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونِ، وَطُورِ سِينِينَ، وَهَذَا الْبَلَدِ الأَمِينِ، لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِى أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ}

অর্থাৎ, শপথ তীন ও যাইতূনের। শপথ 'সিনাই' পর্বতের। এবং শপথ এই নিরাপদ নগরী (মক্কা)র। নিশ্চয় আমি সৃষ্টি করেছি মানুষকে সুন্দরতম গঠনে। (তীন ঃ ১-৪)

অতঃপর বললেন, 'হে আমীরুল মু'মিনীন! মানুষই হচ্ছে মহান আল্লাহর সুন্দরতম আকৃতির সৃষ্টি। তার থেকে সুন্দর কোন সৃষ্টি নেই!'

এই অভিমত খলীফার মনে ধরল এবং তিনি ফায়সালা দিলেন যে, ঈসার স্ত্রীর তালাক হয়নি। ঈসা ও তার স্ত্রী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

অবশ্য তালাক হলেও সঠিক মতে উক্ত তালাকের মাসআলাটা এক তালাকের ছিল। কেবল রজঅত করলেই স্ত্রী হালাল হয়ে যেতো।

সে যাই হোক, প্রমাণ হল যে, এ সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি, সুন্দরতম আকার-আকৃতির সৃষ্টি হল মানুষ। কেন নয়? মহান আল্লাহ যে মূল মানুষ আদমকে নিজ দুই হাত দিয়ে বানিয়েছেন। কিন্তু সেই অকৃতজ্ঞ মানুষ নিজ সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক সম্বন্ধে উদাসীন। মহান আল্লাহ প্রশ্ন করেছেন মানুষকে,

{يَا أَيُّهَا الإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ (٦) الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ (٧) فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا

شَاءَ رَكَّبَكَ} (٨)

অর্থাৎ, হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম প্রতিপালক হতে প্রতারিত করল? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং তারপর সুসমঞ্জস করেছেন। যে আকৃতিতে চেয়েছেন তিনি তোমাকে গঠন করেছেন। (ইনফিত্বার ঃ ৬-৮)

অতঃপর তার উত্তর তিনি নিজেই দিয়েছেন,

{كَلاَّ بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ (٩) وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ (١٠) كِرَاماً كَاتِبِينَ (١١) يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ} (١٢)

অর্থাৎ, না কখনই না, বরং তোমরা শেষ বিচারকে মিথ্যা মনে ক'রে থাক; অবশ্যই তোমাদের উপর (নিযুক্ত আছে) সংরক্ষকগণ; সম্মানিত (আমল) লেখকবর্গ (ফিরিশ্তা); তারা জানে, যা তোমরা ক'রে থাক।(ইনফিত্বার ঃ ৯-১২)

যেহেতু তিনিই মানুষের সৃষ্টিকর্তা। তিনিই জানেন তার আচরণ ও প্রকৃতি। তবুও কি মানুষ 'মানুষ' হবে না?

সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম হল ইসলাম। ইসলাম মহান আল্লাহর মনোনীত ধর্ম। সকল মহাপুরুষদের ধর্ম ছিল ইসলাম। অবশিষ্ট সকল ধর্ম তারই অপভ্রংশ, ভ্রষ্টাংশ।

{وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاء عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ}

অর্থাৎ, সংগ্রাম কর আল্লাহর পথে যেভাবে সংগ্রাম করা উচিত; তিনি তোমাদেরকে মনোনীত করেছেন। তিনি দ্বীনের ব্যাপারে তোমাদের উপর কোন কঠিনতা আরোপ করেননি; এটা তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের মিল্লাত (ধর্মাদর্শ); তিনি পূর্বে তোমাদের নামকরণ করেছেন 'মুসলিম' এবং এই গ্রন্থেও; যাতে রসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী স্বরূপ হয় এবং তোমরা সাক্ষী স্বরূপ হও মানব জাতির জন্য। সুতরাং তোমরা নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আল্লাহকে অবলম্বন কর; তিনিই তোমাদের অভিভাবক, কত উত্তম অভিভাবক এবং কত উত্তম সাহায্যকারী তিনি! (হাজ্জ ঃ ৭৮)

{إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللّهِ الإِسْلاَمُ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوْتُواْ الْكِتَابَ إِلاَّ مِن بَعْدِ مَا جَاءهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللّهِ فَإِنَّ اللّهِ سَرِيعُ الْحِسَابِ} (١٩) سورة آل عمران

অর্থাৎ, নিশ্চয় ইসলাম আল্লাহর নিকট (একমাত্র মনোনীত) ধর্ম। যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছিল তারা পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ তাদের নিকট জ্ঞান আসার পরও তাদের মধ্যে মতানৈক্য ঘটিয়েছিল! আর যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করে (সে জেনে রাখুক যে), নিশ্চয় আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী। (আলে ইমরান ঃ ১৯)

{الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلاَمَ دِينًا} (٣) المائدة

অর্থাৎ, আজ তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্ম (ইসলাম) পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের ধর্ম হিসাবে মনোনীত করলাম। (মায়িদাহ ঃ ৩)

{وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٨٥) آل عمران

অর্থাৎ, যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ হতে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত। (আলে ইমরান ঃ ৮৫)

মহান আল্লাহ নিজ বান্দাগণকে বলতে আদেশ করেছেন,

{صِبْغَةَ اللّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدونَ} (١٣٨) سورة البقرة

অর্থাৎ, (আমরা গ্রহণ করলাম) আল্লাহর রং (আল্লাহর ধর্ম বা তাঁর প্রকৃতি)। রঙে আল্লাহ অপেক্ষা কে অধিকতর সুন্দর? আর আমরা তাঁরই উপাসনাকারী। (বাক্বারাহ ঃ ১৩৮)

খ্রিস্টানদের কাছে এক প্রকার হলুদ রঙের পানি থাকে; যা প্রত্যেক খ্রিস্টান শিশুকে এবং প্রত্যেক সেই ব্যক্তিকে পান করানো হয়; যাকে খ্রিস্টান বানানো উদ্দেশ্য হয়। এই অনুষ্ঠানের নাম তাদের নিকট 'ব্যাপ্টিজম' (পবিত্র বারি দ্বারা অভিসিঞ্চিত করে খ্রিস্টধর্মের দীক্ষাদানোৎসব)। এটা তাদের নিকট অত্যধিক জরুরী ব্যাপার। এ ছাড়া তারা কাউকেও পবিত্র গণ্য করে না। মহান আল্লাহ তাদের এ বিশ্বাস খন্ডন ক'রে বলেন, আসল রঙ তো আল্লাহর রঙ। এর চেয়ে উত্তম কোন রঙ নেই। আর আল্লাহর রঙের তাৎপর্য হল, প্রাকৃতিক ধর্ম ইসলাম, যার প্রতি প্রত্যেক নবী নিজ নিজ যুগে স্ব স্ব উম্মতকে আহবান করেছেন; যা ছিল তাওহীদের আহবান।

শ্রেষ্ঠতম দ্বীনদারী

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যুগে যুগে আল্লাহর মনোনীত একমাত্র দ্বীন হল ইসলাম। সেই দ্বীন হল ইব্রাহীমী মিল্লত, একত্ববাদের ধর্ম। সেই দ্বীনই সুন্দরতম দ্বীন, সেই দ্বীন অবলম্বনকারী সর্বোত্তম মানব, শ্রেষ্ঠতম দ্বীনদার। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لله وَهُوَ مُحْسِنٌ واتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلاً} (١٢٥) سورة النساء

অর্থাৎ, আর তার অপেক্ষা ধর্মে কে উত্তম, যে বিশুদ্ধ (তওহীদবাদী) হয়ে আল্লাহর নিকট আত্মসমর্পণ করে এবং একনিষ্ঠভাবে ইব্রাহীমের ধর্মাদর্শ অনুসরণ করে? আর আল্লাহ ইব্রাহীমকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করেছেন। (নিসা ঃ ১২৫)

এই দ্বীনের মধ্যেও সর্বোত্তম হল সাবধানতা ও সতর্কতা অবলম্বন। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(فَضْلُ الْعِلْمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ فَضْلِ الْعِبَادَةِ ، وَخَيْرُ دِينِكِمُ الْوَرَعُ).

"ইলমের (শরয়ী জ্ঞানের) মর্যাদা ইবাদতের মর্যাদা অপেক্ষা উচ্চতর। আর তোমাদের শ্রেষ্ঠতম দ্বীন হল সংযমশীলতা। (পরহেযগারী; অর্থাৎ, সর্বপ্রকার অবৈধ, সন্দিগ্ধ ও ঘৃণিত আচরণ, কর্ম ও বস্তু থেকে নিজেকে সংযত রাখা।) *(ত্বাবারানীর আওসাত্ব, বাযযার, সহীহ তারগীব ৬৫নং)*

"সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীন হল পরহেযগারী।" *(সহীহুল জামে' ৩৩০৮নং)*

অনুরূপ যে দ্বীনদারীতে সরলতা ও মধ্যমপন্থা আছে, সেই দ্বীনদারী হল সর্বোত্তম। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(خَيْرُ دِينِكُمْ أَيْسَرُهُ).

"সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীন হল, যা (পালন করা) সহজ।" *(ঐ ৩৩০৯নং)*

নবী ﷺ বলেন, "দ্বীনের ব্যাপারে নিজের পক্ষ থেকে কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়ে গেল। (অথবা ধ্বংস হোক।)" এ কথা তিনি তিনবার বললেন। *(বুখারী)*

তিনি আরো বলেন, "নিশ্চয় দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি অহেতুক দ্বীনকে কঠিন বানাবে, তার উপর দ্বীন জয়ী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ মানুষ পরাজিত হয়ে আমল ছেড়ে দিবে।) সুতরাং তোমরা সোজা পথে থাক এবং (ইবাদতে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। তোমরা সুসংবাদ নাও। আর সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে ইবাদত করার মাধ্যমে সাহায্য নাও।" *(বুখারী)*

একদা নবী ﷺ আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স -কে বললেন, "আমি কি এই সংবাদ পাইনি যে, তুমি দিনে রোযা রাখছ এবং রাতে নফল নামায পড়ছ?" আমি বললাম, 'সম্পূর্ণ সত্য, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "পুনরায় এ কাজ করো না। তুমি রোযাও রাখ এবং (কখনো) ছেড়েও দাও। নিদ্রাও যাও এবং নামাযও পড়। কারণ তোমার উপর তোমার দেহের অধিকার আছে। তোমার উপর তোমার চক্ষুদ্বয়ের অধিকার আছে। তোমার উপর তোমার স্ত্রীর অধিকার আছে এবং তোমার উপর তোমার অতিথির অধিকার আছে। তোমার জন্য প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখা যথেষ্ট। কেননা, প্রত্যেক নেকীর পরিবর্তে তোমার জন্য দশটি নেকী রয়েছে আর এটা জীবনভর রোযা রাখার মত।" কিন্তু আমি কঠোরতা অবলম্বন করলাম। যার ফলে আমার উপর কঠিন করে দেওয়া হল। আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি সামর্থ্য রাখি।' তিনি বললেন, "তুমি আল্লাহর নবী দাউদ -এর রোযা রাখ এবং তার চেয়ে বেশী করো না।" আমি বললাম, 'দাউদের রোযা কেমন ছিল?' তিনি বললেন, "অর্ধেক জীবন।" অতঃপর আব্দুল্লাহ বৃদ্ধ হয়ে যাওয়ার পর বলতেন, 'হায়! যদি আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর অনুমতি গ্রহণ করতাম, (তাহলে কতই না ভাল হত)!'

সহজ-সরল দ্বীন, সুন্দরতম দ্বীন, মধ্যমপন্থী দ্বীন, আধুনিকতম ও সর্বশেষ দ্বীন, দ্বীনে ইসলাম। আর কর্তব্যনিষ্ঠ মুসলিমরাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীনদার।

মহান আল্লাহর নিকট প্রিয়তম দ্বীনদারী

মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় দ্বীনদারী হল নিরবচ্ছিন্ন আমল। যা মধ্যমপন্থা অবলম্বন করলে করা যায়। যাতে বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন থাকবে না এবং অবজ্ঞা ও শৈথিল্যও থাকবে না।

কিছু মানুষ আছে যারা কর্মে বাড়াবাড়ি করে। ফলে সমস্ত শক্তি ব্যয় ক'রে আমল করে। কিন্তু কিছু সময় বা কিছু দিন পর নিস্তেজ হয়ে পড়ে। যে কাজ এক নাগাড়ে ক'রে যাওয়া উচিত, সে কাজে বাড়াবাড়ি করার ফলে তা বরাবর চালিয়ে যেতে অক্ষম হয়ে পড়ে। কিন্তু মহান আল্লাহ পছন্দ করেন, কাজ অল্প হোক, কিন্তু তা নিরবচ্ছিন্নভাবে হতে থাক। তাঁর প্রিয় রসূল ﷺ-ও তাই পছন্দ করতেন।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা নবী ﷺ তাঁর নিকট গেলেন, তখন এক মহিলা তাঁর কাছে (বসে) ছিল। তিনি বললেন, "এটি কে?" আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বললেন, '(আসাদ গোত্রের) অমুক মহিলা, যে প্রচুর নামায পড়ে।' তিনি বললেন,

« عَلَيْكُمْ مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَاللّهِ لاَ يَمَلُّ اللّهُ حَتَّى تَمَلُّوا».

"থামো! তোমরা সাধ্যমতো আমল কর। আল্লাহর কসম! আল্লাহ ক্লান্ত হন না, যতক্ষণ না তোমরা ক্লান্ত হয়ে পড়।" আর সেই আমল তাঁর নিকট প্রিয়তম ছিল, যেটা তার আমলকারী লাগাতার ক'রে থাকে। *(বুখারী-মুসলিম)*

'আল্লাহ ক্লান্ত হন না' এ কথার অর্থ এই যে, তিনি সওয়াব দিতে ক্লান্ত হন না। অর্থাৎ, তিনি তোমাদেরকে সওয়াব ও তোমাদের আমলের প্রতিদান দেওয়া বন্ধ করেন না এবং তোমাদের সাথে ক্লান্তের মত ব্যবহার করেন না; যে পর্যন্ত না তোমরা নিজেরাই ক্লান্ত হয়ে আমল ত্যাগ ক'রে বস। সুতরাং তোমাদের উচিত, তোমরা সেই আমল গ্রহণ করবে, যা একটানা করে যেতে সক্ষম হবে। যাতে তাঁর সওয়াব ও তাঁর অনুগ্রহ তোমাদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন থাকে।

মহানবী ﷺ বলেন, "সেই (ধরনের) আমল আল্লাহর অধিক পছন্দনীয়, যে আমল নিরবচ্ছিন্নভাবে করে যাওয়া হয়; যদিও তা পরিমাণে কম হয়।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১২৪২নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমরা মধ্যপন্থা অবলম্বন কর। যেহেতু আল্লাহ (সওয়াব দানে) বিরক্তিবোধ করবেন না, যতক্ষণ না তোমরা (আমলে) বিরক্তিবোধ করে বসবে।" *(সহীহুল জামে' ২৭৪৭নং)*

"তোমরা (আমলে) অতিরঞ্জন ও অবজ্ঞা প্রদর্শন করো না। তোমরা সুসংবাদ নাও ও জেনে রাখ যে, তোমাদের মধ্যে কেউই আর না আমি (আল্লাহর রহমত ছাড়া) নিজ আমলের বলে পরিত্রাণ পেতে পারব। যদি না আল্লাহ আমাকে তাঁর করুণা ও অনুগ্রহ দ্বারা আচ্ছাদিত করেন।" *(আহমাদ, মুসলিম, ইবনে মাজাহ)*

মহান আল্লাহর নিকট সেই দ্বীনদারী পছন্দ, যাতে সরলতা ও সহজতা আছে। মহানবী

ﷺ বলেছেন,

(أَحَبُّ الدِّيْنِ إِلَى اللهِ الْحَنَفِيَّةُ السَّمْحَةُ).

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় দ্বীন হল একনিষ্ঠ সরল। (আহমাদ ২১০৮, আল-আদাবুল মুফরাদ বুখারী ২৮৩, সিঃ সহীহাহ ৮৮১নং)

তিনি আরো বলেছন, "নিশ্চয় দ্বীন সহজ। যে ব্যক্তি অহেতুক দ্বীনকে কঠিন বানাবে, তার উপর দ্বীন জয়ী হয়ে যাবে। (অর্থাৎ মানুষ পরাজিত হয়ে আমল ছেড়ে দিবে।) সুতরাং তোমরা সোজা পথে থাক এবং (ইবাদতে) মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর। তোমরা সুসংবাদ নাও। আর সকাল-সন্ধ্যা ও রাতের কিছু অংশে ইবাদত করার মাধ্যমে সাহায্য নাও।" *(বুখারী)*

বুখারীর অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তোমরা সরল পথে থাকো, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, সকাল-সন্ধ্যায় চল (ইবাদত কর) এবং রাতের কিছু অংশে। আর তোমরা মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, মধ্যমপন্থা অবলম্বন কর, তাহলেই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে।"

অর্থাৎ, অবসর সময়ে উদ্যমশীল মনে আল্লাহর ইবাদত কর; যে সময়ে ইবাদত ক'রে তৃপ্তি পাওয়া যায় এবং তা মনে ভারী বা বিরক্তিকর না হয়। আর তাহলেই অভীষ্টলাভ করতে পারবে। যেমন বুদ্ধিমান মুসাফির উক্ত সময়ে সফর করে এবং যথাসময়ে সে ও তার সওয়ারী বিশ্রাম গ্রহণ করে। (না ধীরে চলে এবং না তাড়াহুড়া করে।) ফলে সে বিনা কষ্টে যথা সময়ে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যায়।

মোট কথা, মুসলিমের উচিত, কচ্ছপের মতো ধীর গতিতে হলেও আমল চালিয়ে যাওয়া। খরগোশের মতো ছুটে গিয়ে আমল বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত নয়। নচেৎ সফল হওয়া যাবে না।

মনের অবস্থায় তারতম্য থাকলেও কোন আমল বিলকুল বন্ধ ক'রে দেওয়া উচিত নয়। অথবা ইচ্ছামতো ধরলাম ও ছাড়লাম---তা করাও উচিত নয়। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "প্রত্যেক কর্মের উদ্যম আছে এবং প্রত্যেক উদ্যমের আছে নিরুদ্যমতা। সুতরাং যার নিরুদ্যমতা আমার সুন্নাহর গন্ডির ভিতরেই থাকে সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হয় এবং যার নিরুদ্যমতা এ ছাড়া অন্য কিছুতে (সুন্নত বর্জনে) অতিক্রম করে সে ধ্বংস হয়ে যায়।" *(ইবনে আবী আসেম, ইবনে হিব্বান, আহমদ, ত্বাহাবী, সহীহ তারগীব ৫৩ নং)*

সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি

এ পৃথিবীতে বহু জাতি বসবাস ক'রে গেছে, করছে ও করবে। তাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে মনোনয়ন করেছেন।

{كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللّهِ}

অর্থাৎ, তোমরাই শ্রেষ্ঠতম জাতি। মানবমন্ডলীর জন্য তোমাদের অভ্যুত্থান হয়েছে, তোমরা সৎকার্যের নির্দেশ দান করবে, অসৎ কার্য (করা থেকে) নিষেধ করবে, আর আল্লাহতে বিশ্বাস করবে। (আলে ইমরান ঃ ১১০)

উক্ত আয়াতে মুসলিম উম্মাহকে সর্বশ্রেষ্ঠ উম্মত গণ্য করা হয়েছে এবং তার কারণ কী---তাও বলে দেওয়া হয়েছে। আর তা হল, ভাল কাজের আদেশ দেওয়া, মন্দ কাজে নিষেধ করা এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখা। অর্থাৎ, মুসলিম উম্মার মধ্যে যদি এই (ভাল কাজের আদেশ দেওয়া, মন্দ কাজে নিষেধ করা এবং আল্লাহর উপর ঈমান রাখার) বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে তারা শ্রেষ্ঠ উম্মত। অন্যথা এই উপাধি থেকে তারা বঞ্চিত হবে।

আসলেই উম্মাহ সেই উপাধি থেকে বঞ্চনার শিকার হয়েছে। কারণ, জাতির বৈশিষ্ট্য ভোগ-বিলাসের মায়ায় লোপ পেতে চলেছে। জাতির ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্মীয় গ্রন্থ। তার ছিলেন সর্বশ্রেষ্ঠ নবী। তার ছিল সর্বশ্রেষ্ঠ দ্বীন। তা সত্ত্বেও শ্রেষ্ঠতম জাতিরূপে প্রতিষ্ঠালাভ করতে সক্ষম নয়।

যেহেতু এ জাতি মূল দ্বীন থেকে দূরে সরে গেছে। দলাদলি ক'রে শতধাবিচ্ছিন্ন জাতিতে পরিণত হয়েছে। ভোগ-বিলাসের মায়ায় মুগ্ধ হয়ে পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দিয়েছে। জীবনে চলার পথে অন্ধকার দূরীকরণে কুরআনের আলো নিতে আলস্য ও শৈথিল্য প্রদর্শন করেছে। ফলে পদে-পদে হোঁচট খাচ্ছে। না দ্বীনদারীতে অগ্রসর হচ্ছে, আর না দুনিয়াদারীতে। আজ জাতি না ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান, আর না পার্থিব শক্তিকে বলীয়ান। ফাল্লাহুল মুস্তআন, অআলাইহিত তুকলান।

কাদের মজলিস সর্বশ্রেষ্ঠ?

কাদের মজলিস সর্বশ্রেষ্ঠ? ধনীদের, নাকি গরীবদের? মুসলিমদের, নাকি কাফেরদের? কাফেররা অবশ্যই ধারণা করে, তাদের মজলিস, তাদের জীবন-ধারা, তাদের মন্ত্রণালয়, তাদের ক্লাব ও পরিষদ সর্বশ্রেষ্ঠ। যেহেতু তাদের হাতে আছে পার্থিব ক্ষমতা, জাগতিক ঐশ্বর্য। কিন্তু তাদের দাবী কি সত্য?

মহান আল্লাহ বলেন,

{وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا} (٧٣) سورة مريم

অর্থাৎ, তাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ স্পষ্টভাবে আবৃত্ত হলে অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদেরকে বলে, 'দু'দলের মধ্যে কোন্‌টি মর্যাদায় শ্রেষ্ঠতর ও মজলিস হিসাবে কোন্‌টি উত্তম?' (মারয়্যাম ঃ ৭৩)

মক্কার কাফেররা দরিদ্র মুসলিম ও ধনী কুরাইশ তথা তাদের সভা ও ঘর-বাড়ির মধ্যে তুলনা ক'রে কুরআনী আহবানের মোকাবেলা করেছিল। মুসলিমদের মধ্যে আম্মার, বিলাল, সুহাইবের মতো দরিদ্র মানুষ ছিলেন। তাঁদের পরামর্শগৃহ (মন্ত্রণালয়) ছিল 'দারুল আরক্বাম'। অন্য দিকে কাফেরদের মধ্যে ছিল আবু জাহল, নযর বিন হারিষ, উতবা, শাইবা প্রভৃতির মত নেতৃস্থানীয় লোক, তাদের উঁচু উঁচু প্রাসাদ ছিল এবং মন্ত্রণাসভার জন্য ছিল 'দারুন নাদওয়াহ' যা অতি সুন্দর। কিন্তু আল্লাহ তাআলা বলেন,

{وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُم مِّن قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِئْيًا} (٧٤) سورة مريم

অর্থাৎ, তাদের পূর্বে কত জাতিকে আমি বিনাশ করেছি, যারা তাদের অপেক্ষা সাজ-সরঞ্জাম ও বাহ্য দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ ছিল। (মারয়্যাম ঃ ৭৪)

অর্থাৎ, দুনিয়ার এই সমস্ত জিনিস এমন নয়, যা নিয়ে পরস্পর গর্ব করা যেতে পারে বা হক ও বাতিল (সত্য ও অসত্য)এর মধ্যে পার্থক্য নির্বাচন করা যেতে পারে। এসব তো পূর্ববর্তী উম্মতের কাছেও ছিল, তা সত্ত্বেও সত্যকে অস্বীকার করার ফলে তাদেরকে ধ্বংস ক'রে দেওয়া হয়েছে। পৃথিবীর এই ধন-সম্পদ তাদেরকে আল্লাহর আযাব হতে বাঁচাতে পারেনি।

তাহলে তাদেরকে পৃথিবীর ঐশ্বর্য প্রদান করা হল কেন? তাদেরকে সুখ-বিলাসী বানানো হল কেন? মহান আল্লাহ বলেন,

{قُلْ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا} (٧٥) سورة مريم

অর্থাৎ, বল, 'যারা বিভ্রান্তিতে আছে, পরম দয়াময় তাদেরকে প্রচুর ঢিল দেবেন; পরিশেষে যখন তারা যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হচ্ছে তা প্রত্যক্ষ করবে; তা শাস্তি হোক অথবা কিয়ামতই হোক; তখন তারা জানতে পারবে, কে মর্যাদায় নিকৃষ্ট ও কে দলবলে দুর্বল।' (মারয়্যাম ঃ ৭৫)

অর্থাৎ, এসব পার্থিব সুখসম্ভার পথভ্রষ্ট ও কাফেরদেরকে অবকাশ ও ঢিল দেওয়ার জন্য দান করা হয়। অতএব তা দেখার বিষয় নয়। মূলতঃ ভাল-মন্দের পার্থক্য ঐ সময় সূচিত হবে, যখন আমলের অবকাশ সময় শেষ হয়ে গিয়ে আল্লাহর আযাব এসে পড়বে বা কিয়ামত এসে পড়বে। কিন্তু ঐ সময়ের জ্ঞান কোন উপকার দেবে না। কারণ ঐ সময় শুধরে নেওয়ার অথবা সংশোধনের কোন সুযোগ থাকবে না।

সুতরাং সাময়িক সুখ দেখে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করা ভুল। শ্রেষ্ঠত্বের বিচার করতে হলে চিরসুখ দেখে করতে হবে। যারা চিরসুখী তারাই হল সর্বশ্রেষ্ঠ। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَّرَدًّا} (٧٦)

অর্থাৎ, যারা সৎপথে চলে আল্লাহ তাদের পথপ্রাপ্তিতে বৃদ্ধি দান করেন; আর স্থায়ী সৎকর্ম তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং প্রতিদান হিসাবেও শ্রেষ্ঠ। (মারয়্যাম ঃ ৭৬)

যেমন কুরআন দ্বারা যাদের অন্তরে কুফরী, শির্ক তথা ভ্রষ্টতার ব্যাধি রয়েছে, তাদের বদমায়েশি ও ভ্রষ্টতা আরো বৃদ্ধি পায়, তেমনি যারা ঈমানদার তাদের ঈমান ও হিদায়াতে আরো বেশী দৃঢ়তা আসে।

উক্ত আয়াতসমূহে দরিদ্র মুসলিমদেরকে সান্ত্বনা দেওয়া হয়েছে যে, কাফের ও মুশরিকরা যে সব ধন-সম্পদ নিয়ে গর্ব, অহংকার করে তা এক সময় ধ্বংস হয়ে যাবে। আর তোমরা যে সৎকর্ম করছ তা চিরকাল বাকী থাকবে; যার সওয়াব ও নেকী তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের নিকট অবশ্যই প্রাপ্ত হবে এবং তার উত্তম প্রতিদান ও উপকারিতা তোমরা

সেখানে লাভ করবে। (আহসানুল বায়ান দ্রঃ)

সুতরাং হে মুসলিমগণ! পৃথিবীতে তোমরা দরিদ্র হলেও, তোমরাই শ্রেষ্ঠ। তোমাদের সব কিছু শ্রেষ্ঠ। তবে শর্ত হল, প্রকৃত মুসলিম হতে হবে। নচেৎ না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (١٣٩) سورة آل عمران

অর্থাৎ, আর তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখিত হয়ো না, তোমরাই হবে সর্বোপরি (বিজয়ী); যদি তোমরা মু'মিন হও। (আলে ইমরান ঃ ১৩৯)

সবচেয়ে বেশি ভয়ানক যা

১। গুপ্ত শির্ক বা ছোট শির্ক

বড় শির্ক যদিও বড়, তবুও তা সচেতন উম্মাহ করবে না। কিন্তু যে শির্ক ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা খুব বেশি, যে শির্ক থেকে বাঁচা কঠিন, তা হল ছোট শির্ক।

মাহমূদ বিন লাবীদ ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

(إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمُ الشِّرْكُ الأَصْغَرُ.)

"তোমাদের উপর আমার সবচেয়ে অধিক যে জিনিসের ভয় হয় তা হল ছোট শির্ক।"

সাহাবাগণ প্রশ্ন করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ছোট শির্ক কী জিনিস?' উত্তরে তিনি বললেন, "রিয়া (লোকপ্রদর্শনের উদ্দেশ্যে আমল)। আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ যখন (কিয়ামতে) লোকেদের আমলসমূহের বদলা দান করবেন, তখন সকলের উদ্দেশ্যে বলবেন, 'তোমরা তাদের নিকট যাও, যাদেরকে প্রদর্শন ক'রে দুনিয়াতে আমল করেছিলে। অতঃপর দেখ, তাদের নিকট কোন প্রতিদান পাও কি না!" *(আহমাদ, ইবনে আবিদ্দুনয়্যা, বাইহাক্বীর যুহদ, সহীহ তারগীব ২৯ নং)*

কানা দাজ্জালের ফিতনা মানুষের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ফিতনা। কিন্তু তার থেকেও বড় ফিতনা হল এই গুপ্ত শির্কের ফিতনা। যেহেতু দাজ্জাল প্রকাশ হলে তাকে চেনা যাবে, তার কবল থেকে বাঁচাও যাবে। কিন্তু গুপ্ত শির্ক থেকে বাঁচা বড় কঠিন।

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, একদা আল্লাহর রসূল ﷺ আমাদের নিকট এলেন। তখন আমরা কানা দাজ্জাল নিয়ে আলোচনা করছিলাম। তিনি বললেন,

(أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَا هُوَ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنْ الْمَسِيحِ عِنْدِي؟)

"আমি তোমাদেরকে এমন জিনিসের কথা বলে দেব না কি, যা আমার নিকট তোমাদের জন্য কানা দাজ্জাল অপেক্ষাও অধিক ভয়ানক?"

আমরা বললাম, 'অবশ্যই বলে দিন, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "গুপ্ত শির্ক; আর তা এই যে, এক ব্যক্তি নামায পড়তে দাঁড়ায়। অতঃপর অন্য কেউ তার নামায পড়া লক্ষ্য করছে দেখে সে তার নামাযকে আরো অধিক সুন্দর ক'রে পড়ে।" *(ইবনে মাজাহ, বাইহাক্বী, সহীহ তারগীব ২৭ নং)*

কেন এই ভয়?

কোন সহীহ আমলে আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কোন নিয়তের ভেজাল অনুপ্রবেশ করলে সে আমল পন্ড হয়ে যায়। যেহেতু আমল কবুলের প্রথম ও প্রধান শর্ত (ইখলাস)টাই বিলীন হয়ে যায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا} (١١٠)

অর্থাৎ, সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে, সে যেন সৎকর্ম করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকেও শরীক না করে।' *(কাহফ ঃ ১১০)*

{مَن كَانَ يُرِيدُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَالَهُمْ فِيهَا وَهُمْ فِيهَا لاَ يُبْخَسُونَ، أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُواْ فِيهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ}

অর্থাৎ, যারা শুধু পার্থিব জীবন ও তার সৌন্দর্য কামনা করে, আমি তাদেরকে তাদের কৃতকর্মসমূহ (এর ফল) পৃথিবীতেই পরিপূর্ণরূপে প্রদান ক'রে দিই এবং সেখানে তাদের জন্য কিছুই কম করা হয় না। এরা এমন লোক যে, তাদের জন্য পরকালে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই, আর তারা যা কিছু করেছে, তা সবই পরকালে নিষ্ফল হবে এবং যা কিছু করে থাকে, তাও নিরর্থক হবে। *(হূদ ঃ ১৫-১৬)*

আল্লাহ পাক হাদীসে কুদসীতে বলেন, "আমি শির্ক হতে সমস্ত শরীকদের চেয়ে বেপরোয়া। যে কেউ এমন আমল করে, যাতে সে আমার সাথে অপরকে শরীক (অংশী) করে, আমি তার শির্ক-সহ তাকে প্রত্যাখ্যান করি।" *(মুসলিম)*

২। বাগ্মী মুনাফিক

إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي كُلُّ مُنَافِقٍ عَلِيمِ اللِّسَانِ

মহানবী ﷺ বলেন, "আমি আমার উম্মতের উপর মুখের (জিবের) জ্ঞানী বা পন্ডিত বাগ্মী মুনাফিকদেরকে অধিক ভয় করি।" *(মুসনাদে আহমদ ১/২২, ৪৪)*

মহানবী ﷺ বলেন, "লজ্জাশীলতা ও মুখচোরামি ঈমানের দু'টি শাখা। আর মুখ খিস্তি করা ও বাক্‌পটু হওয়া মুনাফিকীর দু'টি শাখা।" *(তিরমিযী)*

মহান আল্লাহ মুনাফিকদের এই আচরণের কথা কুরআনে উদ্ধৃত করেছেন,

{وَمِنْ النَّاسِ مَنْ يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ}

অর্থাৎ, মানুষের মধ্যে এমনও লোক আছে, যার পার্থিব জীবনের কথাবার্তা তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তার অন্তরে যা আছে সে সম্বন্ধে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে, কিন্তু আসলে সে অত্যন্ত ঝগড়াটে লোক। *(সূরা বাক্বারাহ ২০৪ আয়াত)*

{وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتَلَهُمُ اللَّهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ} (٤)

অর্থাৎ, তুমি যখন তাদের দিকে তাকাও তখন তাদের দেহাকৃতি তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তারা যখন কথা বলে, তখন তুমি সাগ্রহে তা শ্রবণ কর; তারা যেন দেওয়ালে ঠেকানো কাঠের খুঁটি, তারা যে কোন শোরগোলকে মনে করে তাদেরই বিরুদ্ধে। তারাই শত্রু অতএব

তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও, আল্লাহ তাদেরকে ধ্বংস করুন! বিভ্রান্ত হয়ে তারা কোথায় চলেছে? *(সূরা মুনাফিক্বুন ৪ আয়াত)*

৩। নক্ষত্র বা রাশিচক্রে বিশ্বাস

নক্ষত্রের অবস্থান ও রাশিচক্র দর্শন ক'রে আন্দাজে-অনুমানে ভবিষ্যৎ ও অদৃশ্যের নানা খবর বলা। অমুক রাশির ফলে বৃষ্টি হয় ধারণা করা। অমুক নক্ষত্রের ফলে অমুক কল্যাণ বা অকল্যাণ হয় বিশ্বাস করা। এমন বিশ্বাসের ফলে মুসলিম কাফের হয়ে যায়।

যায়েদ ইবনে খালেদ ﷺ বলেন, একদা হুদাইবিয়াতে রাতে বৃষ্টি হলে আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ানোর পর নবী ﷺ সকলের দিকে মুখ ক'রে বসে বললেন, "তোমরা জান কি, তোমাদের প্রতিপালক কী বলেন?" সকলে বলল, 'আল্লাহ ও তদীয় রসূল ভাল জানেন।' তিনি বললেন, "আল্লাহ বলেন, আমার বান্দাদের মধ্যে কিছু বান্দা মু'মিন হয়ে ও কিছু কাফের হয়ে প্রভাত করেছে। সুতরাং যে ব্যক্তি বলেছে যে, 'আল্লাহর অনুগ্রহ ও তাঁর দয়ায় আমাদের উপর বৃষ্টি হল', সে তো আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী (মু'মিন)ও নক্ষত্রের প্রতি অবিশ্বাসী (কাফের)। আর যে ব্যক্তি বলেছে যে, 'অমুক অমুক নক্ষত্রের ফলে আমাদের উপর বৃষ্টি হল', সে তো আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাসী (কাফের) এবং নক্ষত্রের প্রতি বিশ্বাসী (মু'মিন)।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

৪। তকদীর বা ভাগ্যকে অবিশ্বাস

মহান আল্লাহ সৃষ্টি রচনার পূর্বে তার ভাগ্য নির্ধারণ করেছেন---এ কথা অনেক লোকেই বিশ্বাস করে না। তারা ধারণা করে, মানুষ তার নিজের কপাল নিজেই গড়ে। তারা মানে না যে,

(ক) মহান আল্লাহর প্রত্যেক বস্তুর ব্যাপারে ইজমালী ও তফসীলী খবর পূর্বেই জেনেছেন।

(খ) সেই খবর তিনি 'লাওহে মাহফূয'-এ লিপিবদ্ধ করেছেন।

(গ) সকল সৃষ্টির ঘটন-অঘটন আল্লাহর ইচ্ছাধীন।

(ঘ) এই বিশ্বচরাচরের সকল বস্তুর সত্তা, গুণ ও বিচরণ-ক্ষমতা মহান আল্লাহর সৃষ্টি।

তকদীরের প্রতি বিশ্বাস ঈমানের একটি রুক্ন। তাই তাতে অবিশ্বাস করলে মানুষ মু'মিন থাকে না। মহানবী ﷺ আমাদেরকে সতর্ক করে বলেছেন, 'প্রত্যেক উম্মতের মাঝে মজুস (অগ্নিপূজক সম্প্রদায়) আছে। আর আমার উম্মতের মজুস তারা, যারা বলে, তকদীর বলে কিছু নেই।' ওরা যদি রোগাক্রান্ত হয়, তাহলে ওদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করো না এবং ওরা মরলে ওদের জানাযায় অংশ গ্রহণ করো না।' *(সহীহুল জামে' ৫০৩৯নং)*

প্রিয় নবী ﷺ আরো বলেছেন, তিন ব্যক্তির নিকট হতে কিয়ামতের দিন আল্লাহ ফরয, নফল কিছুই গ্রহণ করবেন না; পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান, দান করে প্রচারকারী এবং তকদীর অস্বীকারকারী ব্যক্তি।" *(সহীহুল জামে' ৩০৬০নং)*

তকদীরে বিশ্বাস রাখে না বলে মানুষ বিপদে ভেঙ্গে পড়ে। শোকে-দুঃখে কোন সান্ত্বনা পায় না। সুতরাং এই অবিশ্বাস দ্বীন-দুনিয়া উভয়ের ব্যাপারে বড় ভয়ঙ্কর।

৫। শাসকের অবিচার ও অত্যাচার

ক্ষমতাসীন শাসকের অবিচার উম্মতের জন্য বড় ক্ষতিকর ও ভয়ঙ্কর।

ক্ষমতাসীন শাসক গদির স্বার্থে যোগ্য-অযোগ্যের মাঝে সমতা বজায় করতে চেয়ে যোগ্যদের প্রতি অন্যায় করে।

ক্ষমতাসীন শাসক গদির স্বার্থে ধর্ম-অধর্মের মাঝে সাম্য প্রতিষ্ঠা করে এবং সত্যের অপলাপ ঘটিয়ে মিথ্যার জয়গান গায়।

ক্ষমতাসীন শাসক গদির স্বার্থে অপাত্রে অযোগ্যকে দান দেয়। ফলে যোগ্যরা বঞ্চিত হয়।

ক্ষমতাসীন শাসক শিশুর মতো নিরীহ জনগণকে ১০ টাকার ৫/৬টি নোট দিয়ে তাদের হাত থেকে ১০০ টাকার নোটটি ভুলিয়ে কেড়ে নেয়। অর্থাৎ, বাহ্যতঃ বেশি দিয়ে কার্যতঃ বেশি লুটে নেয়।

ক্ষমতাসীন শাসক গদির স্বার্থে সমশ্রেণী সম্প্রীতিশীল মানুষদের মাঝে ভেদাভেদ সৃষ্টি করে।

ক্ষমতাসীন শাসক গদির স্বার্থে নিরপরাধ মানুষকে দন্ড প্রদান ক'রে থাকে।

ক্ষমতাসীন শাসক গদির স্বার্থে দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষদের মন রক্ষা ক'রে চলে।

ক্ষমতাসীন শাসক গদির স্বার্থে দেশের অধিকাংশ মানুষের মন রাখতে আল্লাহর আইন ছেড়ে নিজেদের মনগড়া আইন চালায়।

ক্ষমতাসীন শাসক গদির স্বার্থে স্বেচ্ছাচারিতা চালায়। ক্ষমতার অহংকারে সে অন্ধ হয়ে যায়।

ক্ষমতাসীন শাসক গদিকে সুযোগ মনে করে তার সদ্ব্যবহার করে এবং দুর্নীতি প্রয়োগ ক'রে নিজের আখের গুছিয়ে নেয়, স্বজনপোষণ করে, দেশের আম সম্পদকে খাস বানিয়ে নেয়। সুতরাং আম জনগণের জন্য সে শাসক হয় বড় ভয়ঙ্কর।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي فِي آخِرِ زَمَانِهَا : النُّجُومُ، وَتَكْذِيبُ الْقَدَرِ، وَحَيْفُ السُّلْطَانِ).

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি আমার উম্মতের জন্য তার শেষ যামানায় যা বেশি ভয় করি, তা হল নক্ষত্র-বিশ্বাস, তকদীর অবিশ্বাস ও শাসকের অন্যায়-অত্যাচার। (সঃ জামে' ১৫৫৩নং)

৬। ভ্রষ্টকারী ইমাম, জননেতা

নেতা বা শাসক, ইমাম বা মান্যবর যে পরিবেশ সৃষ্টি করে, নিরীহ জনসাধারণ সেই অনুসারে গড়ে ওঠে। ভ্রষ্ট নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গের অন্ধানুকরণ ক'রে নিজেদেরকে ভ্রষ্ট করে।

কাক যদি কারো পথের হয় রাহবার,
চালাইবে সেই পথে, যে পথে ভাগাড়।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ তোমাদেরকে যে ইল্ম দান করেছেন, তা তোমাদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নেওয়ার মতো তুলে নেবেন না। বরং ইল্ম-ওয়ালা (বিজ্ঞ) উলামা তুলে নিয়ে ইল্ম তুলে নেবেন। এমতাবস্থায় যখন কেবল জাহেলরা অবশিষ্ট থাকবে, তখন লোকেরা তাদেরকেই নেতা বানাবে এবং তাদেরকেই ফতোয়া জিজ্ঞাসা করবে। ফলে তারা নিজেদের রায় দ্বারা ফতোয়া দেবে, যাতে তারা নিজেরা ভ্রষ্ট হবে এবং অপরকেও ভ্রষ্ট

করবে। *(বুখারী ৭৩০৭ ও মুসলিম ২৬৭৩ নং)*

নিশ্চয় এমন নেতা আম জনসাধারণের জন্য বড় ভয়ঙ্কর। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي الْأَئِمَّةُ الْمُضِلُّونَ).

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি আমার উম্মতের জন্য সবচেয়ে বেশি যে জিনিসের আশঙ্কা করি, তা হল ভ্রষ্টকারী নেতৃবর্গ। (আহমাদ, ত্বাবারানী, সঃ জামে' ১৫৫১নং)

তিনি আরো বলেছেন, "আমার উম্মতের জন্য দাজ্জাল অপেক্ষা বেশি ভয়ঙ্কর হল অদাজ্জাল ব্যক্তিত্ব ঃ ভ্রষ্টকারী নেতৃবৃন্দ। (আহমাদ, সঃ জামে' ৪১৬৫নং)

ভ্রষ্ট ভক্তিভাজন ও মান্যবরেরা যাদেরকে ভ্রষ্ট করে, তাদের এবং নিজেদের ভ্রষ্টতার পাপভার কিয়ামতে অবশ্যই বহন করবে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ (٢٤) لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ} (٢٥) النحل

অর্থাৎ, যখন তাদেরকে বলা হয়, 'তোমাদের প্রতিপালক কী অবতীর্ণ করেছেন?' উত্তরে তারা বলে, 'পূর্ববর্তীদের উপকথা।' ফলে কিয়ামত দিবসে তারা বহন করবে তাদের পাপভার পূর্ণমাত্রায় এবং তাদেরও পাপভার যাদেরকে তারা অজ্ঞতা হেতু বিভ্রান্ত করেছে। দেখ, তারা যা বহন করবে, তা কতই না নিকৃষ্ট। (নাহল ঃ ২৪-২৫)

অনুগত অনুসারী তথা ভক্তবৃন্দ তাদের নেতৃবর্গের একান্ত ভৃত্যে পরিণত হয়। অন্ধের মতো অনুকরণ ক'রে নিজেদেরকে সর্বনাশগ্রস্ত করে। আর সেই অনুকরণের মাসুল দিতে হবে রোজ কিয়ামতে। পস্তাতে হবে সেদিন, যেদিন পস্তানি কোন কাজ দেবে না।

{يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَ (٦٦) وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَ (٦٧) رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنْ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْناً كَبِيراً (٦٨)

سورة الأحزاب

অর্থাৎ, যেদিন অগ্নিতে ওদের মুখমন্ডল উল্টেপাল্টে দগ্ধ করা হবে সেদিন ওরা বলবে, 'হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করতাম ও রসূলকে মান্য করতাম!' তারা আরো বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা আমাদের নেতা ও বড় বড় লোক (বুযুর্গ)দের আনুগত্য করেছিলাম, সুতরাং ওরা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল। হে আমাদের প্রতিপালক! ওদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও এবং মহা অভিসম্পাত কর।' (আহ্যাব ঃ ৬৬-৬৮)

{وَبَرَزُواْ لِلّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُواْ إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللّهِ مِن شَيْءٍ قَالُواْ لَوْ هَدَانَا اللّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ سَوَاء عَلَيْنَآ أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِن مَّحِيصٍ}

(٢١) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, সবাই আল্লাহর নিকট উপস্থিত হবে; যারা অহংকার করত দুর্বলেরা তাদেরকে বলবে, 'আমরা তো তোমাদের অনুসারী ছিলাম; এখন তোমরা কি আল্লাহর শাস্তি হতে

আমাদেরকে কিছুমাত্র রক্ষা করতে পারবে?' তারা বলবে, 'আল্লাহ আমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করলে আমরাও তোমাদেরকে সৎপথে পরিচালিত করতাম; এখন আমাদের ধৈর্যচ্যুত হওয়া অথবা ধৈর্যশীল হওয়া একই কথা; আমাদের কোন নিষ্কৃতি নেই।'(ইব্রাহীম ঃ ২১)

{وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاء لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنتُم مُّغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِّنَ النَّارِ (٤٧) قَالَ الَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُلٌّ فِيهَا إِنَّ اللَّهَ قَدْ حَكَمَ بَيْنَ الْعِبَادِ} (٤٨) غافر

অর্থাৎ, যখন ওরা জাহান্নামে পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হবে, তখন দুর্বলেরা প্রবলদেরকে বলবে, 'আমরা তো তোমাদেরই অনুসারী ছিলাম, এখন কি তোমরা আমাদের থেকে জাহান্নামের আগুনের কিয়দংশ নিবারণ করবে?' প্রবলেরা বলবে, 'আমরা সকলেই তো জাহান্নামে আছি, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর দাসদের মাঝে ফায়সালা ক'রে দিয়েছেন।' (মু'মিন ঃ ৪৭-৪৮)

{إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُواْ مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ وَرَأَوُاْ الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الأَسْبَابُ (١٦٦) وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُواْ لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّؤُواْ مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُم بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ} (١٦٧) سورة البقرة

অর্থাৎ, (স্মরণ কর,) যখন অনুসৃত ব্যক্তিবর্গরা অনুসারীদের প্রতি বিমুখ হবে এবং তারা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে ও তাদের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যাবে। অনুসারীরা বলবে, 'হায়! যদি একটিবার (পৃথিবীতে) ফিরে যাবার সুযোগ আমাদের ঘটত, তাহলে আমরাও তাদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতাম, যেমন তারা আমাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল!' এভাবে আল্লাহ তাদের কার্যাবলীকে তাদের পরিতাপরূপে দেখাবেন। আর তারা কখনও আগুন হতে বের হতে পারবে না। (বাক্বারাহ ঃ ১৬৬-১৬৭)

৭। ব্যভিচার ও গুপ্ত কুপ্রবৃত্তি

মহানবী ﷺ বলেছেন,

إِنَّ أَخوَفَ ما أَخافُ عَلَيكُم : الزِّنا والشَّهوَةُ الخَفِيَّةُ.

অর্থাৎ, তোমাদের উপর আমার সবচেয়ে অধিক যে জিনিসের ভয় হয়, তা হল ব্যভিচার ও গুপ্ত কুপ্রবৃত্তি। (ত্বাবারানী, সঃ তারগীব ২৩৯০নং)

তিনি আরো বলেছেন, "আমি তোমাদের জন্য যে জিনিস সবচেয়ে বেশী ভয় করি, তা হল তোমাদের উদর ও যৌন-সংক্রান্ত ভ্রষ্টকারী কুপ্রবৃত্তি এবং ভ্রষ্টকারী ফিতনা।" (আহমাদ ৪/৪২০, ৪২৩)

যেহেতু পূর্বে যে যৌন-স্বাধীনতা ছিল, সেই যৌন-স্বাধীনতা ফিরে আসবে। নারী-স্বাধীনতার নামে নারীর দেহ-স্বাধীনতা ব্যাপক হবে। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে উলঙ্গ নারীদেহ ও ব্যভিচার দেখা যাবে। যুবক-যুবতীর অবাধ মেলামিশা বৃদ্ধি পাবে। তাদের আপোসে যোগাযোগের মাধ্যমও ব্যাপক হবে। অবৈধ প্রেম বিনিময়ের নির্দিষ্ট মুক্তাঙ্গন তৈরি হবে। সমুদ্র-সৈকত ও বনানী-পার্কে প্রকাশ্যে ব্যভিচার পরিদৃষ্ট হবে। নর্তকী ও বেশ্যার সংখ্যা

বর্ধন লাভ করবে। ফলে অবৈধ দেহমিলন বাড়তে থাকবে। ঘরে-ঘরে ব্যভিচারের দুর্গন্ধ পৌঁছে যাবে। এমনকি ভদ্র ও দ্বীনদার ঘরেও আধুনিক ব্যভিচার অনুপ্রবেশ করবে। পর্দানশীন বোরকা-ওয়ালীরাও অন্দরমহলে থেকে গোপন প্রেমের বাঁশি বাজাবে।

আর গুপ্ত কুপ্রবৃত্তিও নারীর নেশা। নারীর নেশা পুরুষের মনে প্রকৃতিগত ব্যাপার। কিন্তু চরিত্রবান লোকে তা গুপ্ত রাখে এবং চরিত্রহীন তা প্রকাশ ক'রে দেয়।

নারীর নেশা মিটাতে পুরুষে একাধিক 'গার্লফ্রেন্ড' গ্রহণ করবে। কেউ একাধিক বিবাহ করতে চাইলে দেশের আইন ও স্ত্রী বাধা দান করবে। মহিলা স্বনির্ভর হওয়ার ফলে তালাকের হার বৃদ্ধি পাবে। মহিলা পুরুষ-মহলে চাকরি ক'রে অর্থোপার্জন করবে। পর্দার বিধান তো 'কুসংস্কার' হয়ে দাঁড়াবে পরিবেশে। সামাজিক ও আর্থিক নানা কারণে যুবক-যুবতী বিবাহে অনীহা প্রকাশ করবে। এই সকল কারণে এবং আরো অনেক কারণে ব্যভিচারের বাজার রমরমা হয়ে উঠবে।

গুপ্ত কুপ্রবৃত্তি চরিতার্থ করতে অর্থের প্রয়োজন হবে। আর তার জন্য হারাম ব্যবসা-বণিজ্যও ব্যাপক হবে। ফলে এক সাথে বাড়ি-নারী-গাড়ির নেশা মানুষের মনে ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করবে।

৮। পুরুষ-গমন

অনেক সময় নারীর নেশা দূর করা দুরূহ কাজ হলে অথবা তা ব্যয়বহুল হলে দুধের সাধ ঘোলে মিটাতে পুরুষে পুরুষ ব্যবহার করবে। আর পুরুষ ব্যবহারের নেশা অভ্যাসে পরিণত হলে, সে নারী কামনাও করবে না। সমমিলনকে আইনী স্বীকৃতি দেওয়া হবে। স্বাধীন 'বানর' থেকে হওয়া 'নর'গণ নরাধিকার ও ব্যক্তি-স্বাধীনতা রক্ষার মানসে উক্ত কদর্যতাকে বৈধতা দান করবে! নারী-অধিকার রক্ষা করতে গিয়ে নারীকে নগ্ন ক'রে পথে নামাবে এবং পুরুষাধিকার রক্ষা করতে গিয়ে পুরুষে-পুরুষে মিলন বৈধ করবে। সমাজ ও পরিবেশের অবস্থা তখন কত যে ভয়ঙ্কর হবে, তা অনুমেয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي عَمَلُ قَوْمِ لُوطٍ).

অর্থাৎ, তোমাদের উপর আমার সবচেয়ে অধিক যে জিনিসের ভয় হয় তা হল লূত-কওমের কর্ম। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম)

যেহেতু পুরুষে-পুরুষে যৌন-মিলনের কাজ লূত ﷺ-এর জাতির মধ্যেই সর্বপ্রথম শুরু হয়, তাই উক্ত অশ্লীলতাকে তাদের দিকে সম্বদ্ধ করা হয়েছে। লূত ﷺ তাঁর জাতিকে বলেছিলেন,

{أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ الْعَالَمِينَ (٨٠) إِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ} (٨١)

অর্থাৎ, 'তোমরা এমন কুকর্ম করছ, যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে কেউ করেনি। তোমরা তো কাম-তৃপ্তির জন্য নারী ছেড়ে পুরুষের নিকট গমন কর, তোমরা তো সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।' (আ'রাফ ঃ ৮০-৮১)

{أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ (٥٤) أَئِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَاءِ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ} (٥٥)

অর্থাৎ, 'তোমরা কি জেনে শুনে অশ্লীল কাজ করবে? তোমরা কি কাম-তৃপ্তির জন্য নারীকে ছেড়ে পুরুষে উপগত হবে? তোমরা তো এক অজ্ঞ সম্প্রদায়।'

কিন্তু তার উত্তরে তাঁর সম্প্রদায় বলেছিল,

{أَخْرِجُوا آلَ لُوطٍ مِنْ قَرْيَتِكُمْ إِنَّهُمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} (٥٦)

অর্থাৎ, লূত-পরিবারকে তোমাদের জনপদ হতে বহিষ্কার কর, এরা তো এমন লোক যারা পবিত্র সাজতে চায়।

মহান আল্লাহ বলেন,

{فَأَنجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلاَّ امْرَأَتَهُ قَدَّرْنَاهَا مِنْ الْغَابِرِينَ (٥٧) وَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ مَطَراً فَسَاءَ مَطَرُ الْمُنْذَرِينَ}

(٥٨) سورة النمل

"সুতরাং তাকে ও তার স্ত্রী ব্যতীত তার পরিজনবর্গকে উদ্ধার করলাম। তার স্ত্রীর জন্য অবশিষ্ট লোকদের ভাগ্য নির্ধারণ করলাম। তাদের উপর বিশেষ ধরনের বৃষ্টি বর্ষণ করলাম; যাদেরকে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছিল, তাদের জন্য এই বর্ষণ ছিল কত মারাত্মক!" (নাম্‌ল ঃ ৫৪-৫৮)

৯। জিহ্বা

মানুষের জিভ ছোট হলেও বড় ভয়ঙ্কর। জিভ নরম হলেও তা কিন্তু একটি তরবারি। পা পিছলে গেলে মানুষ নাও মরতে পারে, কিন্তু জিভ পিছলে গেলে নির্ঘাত মরণ আসতে পারে। আবার মরণের পর দোযখ-বরণের পালাও আসতে পারে। এ জন্যই মহানবী ﷺ জিভের ব্যাপারে বড় সতর্ক করেছেন।

একদা মুআয ﷺ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে উপদেশ দিন।' তিনি বললেন, "এমনভাবে আল্লাহর ইবাদত কর, যেন তুমি তাঁকে দেখছ এবং তুমি নিজেকে মৃতদের মধ্যে গণ্য কর। আর যদি চাও, তাহলে আমি তোমাকে এমন কাজের কথা বলব, যা তোমার পক্ষে এ সবের চেয়ে অধিক সহজসাধ্য।" অতঃপর তিনি নিজ হাত দ্বারা নিজের জিভের প্রতি ইঙ্গিত করে বললেন, "এটা (সংযত রাখ)।" *(ইবনে আবিদ্ দুনয়্যা)*

অন্য বর্ণনায় তিনি মুআযকে বললেন, "তোমাকে সকল বিষয়ের মস্তক, স্তম্ভ ও শীর্ষের কথা বলে দেব না কি?" মুআয বললেন, 'নিশ্চয়ই; হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "সকল বিষয়ের মস্তক হল ইসলাম। এর স্তম্ভ হল নামায এবং শীর্ষ হল জিহাদ।' অতঃপর তিনি বললেন, "আমি কি তোমাকে এসব কিছুর মূল সম্পর্কে বলব না?" মুআয বললেন, 'নিশ্চয়ই হে আল্লাহর নবী!' তখন তিনি নিজের জিহ্বা ধারণ ক'রে বললেন, "এটাকে সংযত রাখ।" মুআয বললেন, 'হে আল্লাহর নবী! আমরা যে কথা বলি, তাতেও কি আমাদের হিসাব নেওয়া হবে?' তিনি বললেন, "তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক, হে মুআয! মানুষকে তাদের নিজ জিভে জাত পাপ ছাড়া অন্য কিছু কি তাদের মুখ অথবা

নাক হেঁচড়ে দোযখে নিক্ষেপ করবে?” *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

তিনি আরো বলেছেন, “মানুষ চিন্তা-ভাবনা না ক’রে এমন কথাবার্তা বলে ফেলে, যার দ্বারা তার পদস্খলন ঘ’টে পূর্ব-পশ্চিমের মধ্যবর্তী দূরত্ব থেকে বেশি দূরত্ব দোযখে গিয়ে পতিত হয়।” *(বুখারী, মুসলিম)*

জিভ অতি ভয়ানক অঙ্গ বলেই মহানবী ﷺ সাহাবাবর্গকে বারবার সতর্ক করতেন। সুফয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন কথা বাতলে দিন, যা মজবুতভাবে ধরে রাখব।’ তিনি বললেন, “তুমি বল, আমার রব আল্লাহ, অতঃপর তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাক।” আমি পুনরায় নিবেদন করলাম,

يَا رَسُولَ اللهِ مَا أَخْوَفُ مَا تَخَافُ عَلَيَّ ؟

‘হে আল্লাহর রসূল! আমার জন্য আপনি কোন্ জিনিসকে সব চাইতে বেশি ভয় করেন?’

তিনি স্বীয় জিহ্বাকে (স্বহস্তে) ধারণপূর্বক বললেন, “এটাকে।” *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

১০। বেআমল আলেম

এমন আলেমও ইসলাম ও সমাজের জন্য বড় ভয়ঙ্কর, যে কুরআন-হাদীস জানার পরেও মানে না, সেই অনুযায়ী আমল করে না। কুরআনের আলোকে আলোকপ্রাপ্ত হয় না। বরং দেশীয় পরিবেশের আলোকে নিজেকে আলোকপ্রাপ্ত বানায়।

এমন আলেম, যে কুরআন-হাদীসের অনেক কথা বিশ্বাস করে না, তার জ্ঞানে ধরে না বলে সে তাতে সন্দেহ পোষণ করে।

এমন আলেম, যে পাশ্চাত্যের রাজনীতিতে ফেঁসে গিয়ে কুরআনের অপব্যাখ্যা করে।

এমন আলেম, যে অবৈধ ব্যবসা ও সূদ হালালের ফতোয়া দেয়।

এমন আলেম, যে পাঁচ-ওয়াক্ত নামাযটাও ঠিকমতো পড়ে না।

এমন আলেম, যে দ্বীনদারী ছেড়ে পাকা দুনিয়াদার হয়ে যায়।

এমন আলেম, যার বাড়ি গান-বাজনাতে মুখরিত এবং বেপর্দা মহিলাতে আমোদিত।

এমন আলেম, যার আখলাক-চরিত্র ইউরোপীয় সাহেবদের মতো!

এমন আলেম, যার ধারণা হল, ইসলামের আদব ও আখলাক আমাদের পরিবেশে না মানলেও চলে।

এমন হাফেযও বটে। তবে যদি সে কুরআনের মানে বোঝে তাহলে। নচেৎ সে এমন ব্যক্তি, যে চিনি বহন করে, কিন্তু তার স্বাদ মিষ্ট না তিক্ত, তা জানে না। এমন অন্ধ, যার হাতে আলো থাকে, অথচ সে আলো দ্বারা নিজে উপকৃত হতে পারে না।

এমন আলেম ও হাফেয, যে ইলমের অহংকারে পাকা বেদানার মতো ফেটে পড়ে, কিন্তু আমলে বড় টক ও টপ দুনিয়াদার।

এমন আলেম ও হাফেযকে দেখে সমাজের সাধারণ মানুষও বেআমল হতে উদ্বুদ্ধ হয়। তার স্বার্থ-ঘেসা ফতোয়ায় সমাজে ফিতনা সৃষ্টি হয়। ফতোয়াবাজি ক’রে অপরকে ‘জাহেল’ বা ‘কাফের’ বানায়! সুতরাং সে অবশ্যই বড় ভয়ঙ্কর।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ أَخْوَفَ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ رَجُلٌ قَرَأَ الْقُرْآنَ حَتَّى إِذَا رُئِيَتْ بَهْجَتُهُ عَلَيْهِ وَكَانَ رِدْءاً لِلإِسْلاَمِ انْسَلَخَ مِنْهُ وَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ وَسَعَى عَلَى جَارِهِ بِالسَّيْفِ وَرَمَاهُ بِالشِّرْكِ).

অর্থাৎ, তোমাদের উপর আমার সবচেয়ে অধিক যে জিনিসের ভয় হয় তা হল এমন ব্যক্তি, যে কুরআন পড়ল। অতঃপর যখন তার চমৎকারিত্ব তার উপর দেখা গেল এবং সে ইসলামের এক সাহায্যকারীও হল, তখন সে তা হতে সরে পড়ল এবং তা নিজ পশ্চাতে ফেলে দিল। আর নিজ প্রতিবেশীর প্রতি তরবারি ধারণ করল এবং তাকে মুশরিক বলে অপবাদ দিল। (ইবনে হিব্বান ৮১, সিঃ সহীহাহ ৩২০১নং)

এই শ্রেণীর কুরআন-জান্তাকে মহান আল্লাহ কুকুরের সঙ্গে তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

{وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِيَ آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ (١٧٥) وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَث ذَّلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (١٧٦) سَاء مَثَلاً الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُواْ يَظْلِمُونَ} (١٧٧) سورة الأعراف

অর্থাৎ, তাদেরকে ঐ ব্যক্তির বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও, যাকে আমি আমার আয়াতসমূহ দান করেছিলাম, অতঃপর সে সেগুলিকে বর্জন করে, তারপর শয়তান তার পিছনে লাগে, ফলে সে বিপথগামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়। আমি ইচ্ছা করলে ঐ (আয়াতসমূহ) দ্বারা তাকে উচ্চ মর্যাদা দান করতাম, কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত হয় এবং নিজ কামনা-বাসনার অনুসরণ করে। তার উদাহরণ কুকুরের মতো, ওকে তুমি তাড়া করলে সে জিভ বের করে হাঁপায় এবং তুমি ওকে এমনি ছেড়ে দিলেও সে জিভ বের করে হাঁপাতে থাকে। যে সম্প্রদায় আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা মনে করে, তাদের উদাহরণ এটা। সুতরাং তুমি কাহিনী বিবৃত কর, যাতে তারা চিন্তা করে। যে সম্প্রদায় আমার আয়াতসমূহকে মিথ্যা বলে ও নিজেদের প্রতি অনাচার করে, তাদের উদাহরণ কত নিকৃষ্ট! (আ’রাফ ঃ ১৭৫-১৭৭)

এই শ্রেণীর কিতাবের ধারক ও বাহককে মহান আল্লাহ গাধার সাথেও তুলনা করেছেন। তিনি বলেছেন,

{مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (٥) سورة الجمعة

অর্থাৎ, যাদেরকে তাওরাতের দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়েছিল, অতঃপর তা তারা বহন করেনি, তাদের দৃষ্টান্ত পুস্তক বহনকারী গর্দভ। কত নিকৃষ্ট সেই সম্প্রদায়ের দৃষ্টান্ত, যারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে। আর আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (জুমুআহ ঃ ৫)

আমলহীন আলেম, ফল-ফুলহীন গাছের মতো। যে গাছের ছায়াও নেই। গাছ দেখতে মোটা। যা জ্বালানি ছাড়া অন্য কোন কাজে লাগে না।

আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নামের জ্বালানি হওয়া থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

সবচেয়ে বড় সূদ

সূদ খাওয়া কাবীরা গোনাহ। মহান আল্লাহ সূদকে হারাম ঘোষণা করেছেন।

সূদখোর অভিশপ্ত।

মধ্যজগতে সূদখোরের সাজা হল, রক্তের নদীতে সে সাঁতার কাটবে। আর নদীর তীরে একজন ফিরিশ্তা থাকবেন এবং তিনি তার কাছে অনেকগুলো পাথর একত্রিত ক'রে রাখবেন। আর ঐ সূদখোর সাঁতাররত ব্যক্তি বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর সেই ফিরিশ্তার কাছে ফিরে আসবে, যিনি তাঁর নিকট পাথর একত্রিত ক'রে রাখবেন। সেখানে এসে সে তার সামনে নিজ মুখ খুলে দেবে এবং ঐ ফিরিশ্তা তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দেবেন। তারপর সে চলে গিয়ে আবার সাঁতার কাটবে এবং আবার তাঁর কাছে ফিরে আসবে। আর যখনই ফিরে আসবে, তখনই ঐ ফিরিশ্তা তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেবেন!

এক দিরহাম পরিমাণ সূদ খেলে ৩৬ বার ব্যভিচার করা হয়! বরং আল্লাহর কাছে তার থেকেও বড় পাপ হয়।

আর অন্য পাড়ার মেয়ের সাথে ব্যভিচার করার চাইতে প্রতিবেশীর কোন মেয়ের সাথে ব্যভিচার করা দশগুণ পাপ। তার চাইতে বড় পাপ নিজের বাড়ির কোন গম্য নারীর সাথে ব্যভিচার করা। তার চাইতে বড় পাপ বাড়ির কোন অগম্য নারীর সাথে ব্যভিচার করা। তার চাইতে বড় পাপ নিজের বোনের সাথে ব্যভিচার করা। তার চাইতে বড় পাপ নিজের মেয়ের সাথে ব্যভিচার করা। তার চাইতে বড় পাপ নিজের মায়ের সাথে ব্যভিচার করা। পরন্তু সূদ খাওয়ার সবচেয়ে ছোট পাপ হল সবচেয়ে বড় ব্যভিচার মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মতো! নাউযু বিল্লাহি মিন যালিক।

তার মানে সূদ খাওয়ার আরো বড় পাপ আছে। আর তা হল মায়ের সাথে ব্যভিচার করার পাপের চেয়ে ৭০-৭৩ গুণ বড়! কিন্তু সব থেকে বড় সূদ কী? সূদ খাওয়ার থেকেও বড় পাপ কী? মহানবী ﷺ বলেছেন,

(الرِّبا اثْنانِ وَسَبْعُونَ بَاباً أدْنَاهَا مِثْلُ إتْيانِ الرَّجُلِ أُمَّهُ، وَإنَّ أَرْبَى الرِّبَا اسْتِطالَةُ الرَّجُلِ فِي عِرْضِ أَخِيهِ).

"সূদ (খাওয়ার পাপ হল) ৭২ প্রকার। যার মধ্যে সবচেয়ে ছোট পাপ হল মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মতো! আর সবচেয়ে বড় (পাপের) সূদ হল নিজ (মুসলিম) ভায়ের সম্ভ্রম নষ্ট করা।" *(ত্বাবারানীর আউসাত্ব, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৮৭১নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(أَهْوَنُ الرِّبا كالذي يَنْكِحُ أُمَّهُ وإنّ أرْبَى الرِّبا اسْتِطالَةُ المَرْءِ في عِرْضِ أخِيهِ).

অর্থাৎ, সূদ খাওয়ার সবচেয়ে ছোট পাপ মায়ের সাথে ব্যভিচার করার মতো। আর সবচেয়ে বড় সূদ হল নিজ (মুসলিম) ভায়ের সম্ভ্রম নষ্ট করা। (সঃ জামে' ২৫৩১নং)

তিনি আরো বলেছেন,

(أَرْبَى الرِّبَا شَتْمُ الأعْرَاض).

অর্থাৎ, সবচেয়ে বড় সূদ হল গালি দিয়ে সম্মান নষ্ট করা। (সিঃ সহীহাহ ১৪৩৩নং)

নিঃসন্দেহে একজন মুসলিম ভায়ের মর্যাদা ও মান-সম্মান এত বেশি যে, তা নষ্ট করলে নিজ মায়ের সাথে সত্তর-তিয়াত্তর বার ব্যভিচার করার চাইতেও বেশি পাপ হয়। কিন্তু সমাজের অহংকারীরা তা জানে না।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমাদের খুন, সম্পদ, সম্ভ্রম তোমাদের পরস্পরের উপর হারাম ও মর্যাদাপূর্ণ; যেমন তোমাদের এই আজকের দিন, এই মাসে এবং এই শহরে হারাম ও মর্যাদাপূর্ণ।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

একদা আব্দুল্লাহ বিন উমার ﷺ কা'বার প্রতি দৃক্পাত করে বললেন, "কী মহান তুমি! তোমার মর্যাদা কত মহান! কিন্তু মুমিন তোমার চেয়ে অধিক মর্যাদাপূর্ণ।" *(গা-য়াতুল মারাম ৪৩৫ নং)*

কিন্তু বংশীয় ভুয়ো মর্যাদা অথবা ইলমের মেকি চমক নিয়ে অহংকারীরা পরের ইজ্জত নষ্ট করতে কসুর করে না। যারা পরিবারগত কোন ত্রুটি ধরে অপরকে গালাগালি করে অথবা তা বই আকারে ছেপে প্রচার ক'রে 'ছাদকায়ে জারিয়াহ' করে। যার পাপ ঐ গালি ও বই লোক-মাঝে অবশিষ্ট থাকা অবধি লেখকের মরণের পরেও জারি থাকবে ইনশাআল্লাহ।

ভদ্র মানুষেরা রাগে গালাগালি করলেও ভদ্র গালি ব্যবহার করে। অভদ্র ছোটলোকদের মতো মা-বাপ তুলে গালাগালি করে না। নাবালক-বালিকারা খেলা করে। কোন বিষয় নিয়ে ঝগড়া হলে মা-বোন তুলে গালাগালি করে। অজ্ঞ ছোটলোকেরাও এমন গালাগালি ক'রে থাকে। তর্কে হেরে গিয়ে প্রতিপক্ষের পরিবারের লোককে টেনে নিয়ে এসে তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে। এমন লোকেরা সেই জাহেলী যুগের জাহেল বৈকি?

মা'রূর ইবনে সুওয়াইদ বলেন, একদা আমি আবূ যার্র ﷺ-কে দেখলাম, তাঁর পরনে জোড়া পোশাক রয়েছে এবং তাঁর গোলামের পরনেও অনুরূপ জোড়া পোশাক বিদ্যমান! আমি তাঁকে সে সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। তিনি ঘটনা উল্লেখ ক'রে বললেন, 'তিনি আল্লাহর রসূলের যুগে তাঁর এক গোলামকে গালি দিয়েছিলেন এবং তাকে তার মা তুলে হেয় প্রতিপন্ন করেছিলেন। এ কথা শুনে নবী ﷺ তাঁকে বলেছিলেন, "(হে আবূ যার্র!) নিশ্চয় তুমি এমন লোক; যার মধ্যে জাহেলিয়াত (ইসলামের পূর্ব যুগের অভ্যাস) রয়েছে! " *(বুখারী ও মুসলিম)*

এ তো গেল এমন ত্রুটি ধরে গালাগালি করা, যা প্রতিপক্ষের মাঝে আছে। কিন্তু যে ত্রুটি প্রতিপক্ষের মাঝে নেই, তা রচনা ক'রে রটনা করার পাপ ও তার শাস্তি কী?

রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি কোন মুমিন সম্বন্ধে এমন দোষ উল্লেখ করে যা তার মধ্যে নেই, সে ব্যক্তিকে আল্লাহ তাআলা জাহান্নামীদের রক্ত-পূঁজে বাস করতে দেবেন; যতক্ষণ পর্যন্ত সে যা বলেছে তা থেকে বের হয়ে না আসে। আর সে বের হতে পারবে না।" *(সহীহুল জামে' ৬০৭২)*

"যে ব্যক্তি কোন মুসলিমকে বদনাম করার জন্য তার প্রতি কোন অপবাদ দেয়, আল্লাহ

তাকে পুলসিরাতে আটকে রাখবেন---যতক্ষণ পর্যন্ত সে যা বলেছে, তা থেকে বের না হয়।” *(সহীহ আবূ দাউদ ৪৮৮৩নং, আলবানী)*

এমন ইল্ম-গর্বিত অহংকারীদেরকে মহান আল্লাহ পরকালের আগে ইহকালেই তাদের আপনজন দ্বারা লাঞ্ছিত করুন। আমীন।

সব চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ পালনীয় শর্ত

মানুষের সাথে কোন শর্ত করলে তা পালন করা জরুরী। যেহেতু শর্ত হল চুক্তির বিশদ বিবরণ। আর চুক্তি ও অঙ্গীকার পালনের ব্যাপারে মহান আল্লাহর নির্দেশ হল নিম্নরূপ ঃ-

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُودِ} (١) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা অঙ্গীকার (ও চুক্তিসমূহ) পূর্ণ কর। (মায়িদাহ ঃ ১)

{وَأَوْفُواْ بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْؤُولاً} (٣٤) سورة الإسراء

অর্থাৎ, প্রতিশ্রুতি পালন করো; নিশ্চয়ই প্রতিশ্রুতি সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করা হবে। (বানী ইস্রাঈল ঃ ৩৪)

সুতরাং লেনদেন, ব্যবসা-বাণিজ্য ও আচার-ব্যবহারের সকল চুক্তি ও অঙ্গীকার অবশ্য পালনীয়। কিন্তু কোন্ চুক্তি ও শর্ত সর্বাধিক বেশি পালনীয়?

বিবাহ-শাদীর শর্ত অধিক গুরুত্বের সাথে পালনীয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ).

মহানবী ﷺ বলেন, “যে সকল শর্ত তোমাদের জন্য পালন করা জরুরী, তন্মধ্যে সব চাইতে অধিক গুরুত্বপূর্ণ শর্ত হল তাই---যার দ্বারা তোমরা তোমাদের (পরস্পরের) গোপনাঙ্গ হালাল ক’রে থাক।” *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৩১৪৩ নং)*

যেহেতু তা হল মানুষের মান-সম্মান ও ইজ্জতের চুক্তি। অন্যান্য চুক্তি অপেক্ষা তার গুরুত্ব বেশি।

বিবাহে যে সব শর্তাবলী হয়ে থাকে, তা সাধারণতঃ দুই শ্রেণীর ঃ-

১। শুদ্ধ ও বৈধ, যা পালন করা জরুরী।

২। অশুদ্ধ ও অবৈধ, যা পালন করা জরুরী নয়।

শুদ্ধ ও বৈধ শর্ত যেমন ঃ স্ত্রী যদি এই শর্ত লাগায় যে, বিয়ের পর সে মায়ের বাড়িতে থাকবে, তাহলে স্বামী তা মেনে নিয়ে তাকে বিয়ে করলে তা পালন করা জরুরী। পালন না করলে স্ত্রী বিবাহ-বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে।

স্ত্রী যদি মোহরে জমি চায় অথবা বাড়ি চায়, তাহলে তা মেনে নিয়ে বিয়ে করলে স্বামীর জন্য তা পালন করা জরুরী।

স্ত্রী যদি শর্তারোপ করে যে, তার প্রথম স্বামীর ঔরসজাত ছেলে তার সাথেই থাকবে, তাহলে স্বামী তা মেনে নিলে সে তা পালন করতে বাধ্য।

স্ত্রী ছাত্রী অথবা চাকরি-ওয়ালী হলে যদি সে শর্ত লাগায় যে, বিয়ের পরও সে পড়াশোনা

চালিয়ে যাবে অথবা চাকরি করে যাবে এবং স্বামী তা মেনে নিয়ে বিয়ে করলে সে শর্ত পালন করতে বাধ্য।

অনুরূপ স্ত্রী যদি সংসারে দাসী রাখার শর্তারোপ করে, তাহলে স্বামী মেনে নিলে তা পালন করতে বাধ্য।

অশুদ্ধ ও অবৈধ শর্ত যেমন ঃ স্বামী যদি শর্ত আরোপ করে যে, তাকে এত টাকা বা জমি (পণ বা যৌতুক) লাগবে, তাহলে স্ত্রীর জন্য তা পালন করা জরুরী নয়। আর এর জন্য স্বামী তার উপর চাপ প্রয়োগ করতে পারে না এবং তাকে তালাক দিতে পারে না।

স্বামী যদি শর্ত লাগায় যে, সে স্ত্রীকে কোন মোহর প্রদান করবে না, তাহলে তা পালনীয় নয়। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاء ذَلِكُمْ أَن تَبْتَغُواْ بِأَمْوَالِكُم مُّحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً} (٢٤) سورة النساء

অর্থাৎ, উল্লিখিত নারীগণ ব্যতীত আর সকলকে বিবাহ করা তোমাদের জন্য বৈধ করা হল; এই শর্তে যে, তোমরা তাদেরকে নিজ সম্পদের বিনিময়ে বিবাহের মাধ্যমে গ্রহণ করবে, অবৈধ যৌন-সম্পর্কের মাধ্যমে নয়। অতঃপর তোমরা তাদের মধ্যে যাদের (মাধ্যমে দাম্পত্যসুখ) উপভোগ করবে, তাদেরকে নির্ধারিত মোহর অর্পণ কর। (নিসা ঃ ২৪)

তাছাড়া বিনা মোহরে বিয়ে হলে মহিলার পক্ষ থেকে নিজেকে ‘হেবা’ করা হয়। আর তা কেবল আল্লাহর রসূল ﷺ-এর জন্য খাস ছিল।

স্বামী যদি শর্ত লাগায় যে, সে স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করবে না, তাহলে তা পালনীয় নয়। যেহেতু শরীয়ত স্বামীর উপর স্ত্রীর ভরণ-পোষণ ফরয করেছে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ} [الطلاق: ٧].

অর্থাৎ, সামর্থ্যবান নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবনোপকরণ সীমিত, সে আল্লাহ তাকে যা দান করেছেন তা হতে ব্যয় করবে। (ত্বালাক্ব ঃ ৭)

অবশ্য কোন ধনী স্ত্রী যদি সে শর্ত পালন করতে সম্মত হয়, তাহলে বিবাহ শুদ্ধ। যেমন বর্তমানে বহু দেশে বিবাহের বয়সোত্তীর্ণ বহু মহিলা কেবল ‘আইবুড়ো’ নাম ঘুচাবার জন্য এমন স্বামী গ্রহণ ক’রে থাকে। যে নিজের বাড়িতেই থাকে, নিজের ভরণ-পোষণ নিজেই করে। স্বামী কেবল মাঝে-মধ্যে এসে তার খোঁজ-খবর নিয়ে এবং স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক বজায় ক’রে যায়।

যদি স্ত্রী এই শর্তারোপ করে যে, প্রথম স্ত্রীর তুলনায় তার কাছে বেশি সময় অবস্থান করতে হবে, তাহলে তা স্বামীর জন্য পালনীয় নয়। কারণ তা ইনসাফের পরিপন্থী।

যদি স্ত্রী শর্ত লাগায় যে, সে পর্দায় থাকতে পারবে না অথবা সে তার ছেলে-বন্ধুর সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ বজায় রাখবে অথবা তার স্বাধীনতায় বাধা দেওয়া যাবে না ইত্যাদি, তাহলে তা পালনীয় নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

(كُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ مِائَةَ شَرْطٍ).

অর্থাৎ, প্রত্যেক সেই শর্ত, যা আল্লাহর কিতাবে নেই (বা আল্লাহর কিতাব-বিরাধী), তা

বাতিল, যদিও সে শর্ত একশ’টি হয়। (ত্বাবারানী, বুখারী ২৭৩৫নং)

তিনি আরো বলেছেন,

(الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلاَّ شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلالا).

অর্থাৎ, মুসলিমরা সকল শর্ত পালন করতে বাধ্য। অবশ্য সে শর্ত নয়, যা হারামকে হালাল করে অথবা হালালকে হারাম করে। (তিরমিযী ১৩৫২নং)

তিনি আরো বলেছেন,

(وَالنَّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الْحَقّ).

অর্থাৎ, লোকেরা সকল শর্ত পালন করতে বাধ্য, যা ন্যায়সম্মত হয়। (বায্যার, সঃ জামে’ ৬৭৩২নং)

বিবাহের সময় যদি কোন মহিলা এই শর্তারোপ করে যে, তার জীবদ্দশায় স্বামী দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করতে পারবে না, তাহলে সে শর্ত স্বামীর জন্য পালন করা জরুরী নয়। কারণ তাতে সেই জিনিস হারাম করা হয়, যা মহান আল্লাহ পুরুষের জন্য বৈধ করেছেন।

দ্বিতীয় বিবাহ করার পূর্বে যদি মহিলা শর্তারোপ করে যে, প্রথমাকে তালাক দিতে হবে, তাহলে তা বৈধ নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন, “ কোন ব্যক্তি তার (মুসলিম) ভায়ের বিবাহ-প্রস্তাবের উপর নিজের প্রস্তাব দেবে না। কোন মহিলা তার বোনের (সতীনের) তালাক চাইবে না; যাতে সে তার পাত্রে যা আছে তা ঢেলে ফেলে দেয়। (এবং একাই স্বামী-প্রেমের অধিকারিনী হয়।)” *(বুখারী ও মুসলিম)*

তিনি বলেছেন,

(لا تَشْتَرِطِ الْمَرْأَةُ طَلاقَ أُخْتِهَا).

অর্থাৎ, মহিলা যেন তার বোনের (সতীনের) তালাকের শর্তারোপ না করে। (আহমাদ ২/৩১১)

স্বামী যদি বিবাহের পূর্বে শর্তারোপ করে যে, স্ত্রী তার ওয়ারেস হবে না; যেমন বহু পরিবেশে এমন ঘটে থাকে। বাড়িতে দাসী চাই। কিন্তু সে বাড়িতে অন্য কোন লোক নেই। একজন মহিলাকে বাড়ির ভিতরে একাকিনী কাজ করালে বিপদ ঘটতে পারে। গম্য নারী-পুরুষের একাকী নির্জনতাবলম্বন শরীয়তে নিষিদ্ধও বটে। সুতরাং যা ঘটার তা যদি শরয়ী বিয়ের মাঝে ঘটে, তাহলে দোষ নেই। কিন্তু তার সন্তানরা খরচ ও মীরাস ভাগের ভয়ে সম্ভ্রান্ত মহিলাকে বিবাহ করতে বাধা দেয়। বাধ্য হয়ে বয়স্ক বাবা এমন এক দাসীকে বিবাহ ক’রে তার নিকট থেকে দাসীর কাজ নেয়, যাকে মীরাস থেকে বঞ্চিত করার জন্য প্রথমেই শর্তারোপ করে। অনুরূপ ‘আইবুড়ো’ নাম দূরীকরণার্থে কোন ধনী স্ত্রী তার স্বামীর উপর ওয়ারেস না হওয়ার শর্তারোপ করলে তাও পালনীয় নয়। যেহেতু এমন শর্ত বাতিল, তবে বিবাহ শুদ্ধ। যেহেতু স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মীরাসের আইন মহান আল্লাহর কিতাবে আছে। সুতরাং তার পরিপন্থী কোন শর্তই পালনীয় নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّهُنَّ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِن

بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} (١٢) سورة النساء

অর্থাৎ, তোমাদের স্ত্রীদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্ধাংশ তোমাদের জন্য, যদি তাদের কোন সন্তান না থাকে, কিন্তু তাদের সন্তান থাকলে তোমাদের জন্য তাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ। এ তারা যা অসিয়ৎ করে, তা কার্যকর ও ঋণ পরিশোধ করার পর। আর তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-চতুর্থাংশ তাদের জন্য, যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে, তোমাদের সন্তান থাকলে, তাদের জন্য তোমাদের পরিত্যক্ত সম্পত্তির এক-অষ্টমাংশ। এ তোমরা যা অসিয়ৎ কর, তা কার্যকর ও ঋণ পরিশোধ করার পর। (নিসা ঃ ১২)

আল-কুরআনের শ্রেষ্ঠাংশ

মহানবী ﷺ বলেছেন,

أَفْضَلُ الْقُرْآنِ { اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن } .

অর্থাৎ, কুরআনের সর্বশ্রেষ্ঠ হল, আল-হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সূরা ফাতিহা)। (হাকেম, সঃ জামে’ ১১২৫নং)

আল-কুরআনের সবচেয়ে বড় মর্যাদাপূর্ণ সূরা হল সূরা ফাতিহা। আবূ সাঈদ রাফে’ ইবনে মুআল্লা ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, “মসজিদ থেকে বের হবার পূর্বেই তোমাকে কি কুরআনের সবচেয়ে বড় (মাহাত্ম্যপূর্ণ) সূরা শিখিয়ে দেব না?” এই সাথে তিনি আমার হাত ধরলেন। অতঃপর যখন আমরা বাইরে যাওয়ার ইচ্ছা করলাম, তখন আমি নিবেদন করলাম, ‘ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি যে আমাকে বললেন, তোমাকে অবশ্যই কুরআনের সবচেয়ে বড় (মাহাত্ম্যপূর্ণ) সূরা শিখিয়ে দেব?’ সুতরাং তিনি বললেন, “(তা হচ্ছে) ‘আলহামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন’ (সূরা ফাতেহা)। এটি হচ্ছে ‘সাবউ মাসানী’ (অর্থাৎ, নামাযে বারবার পঠিতব্য সপ্ত আয়াত) এবং মহা কুরআন; যা আমাকে দান করা হয়েছে।” *(বুখারী ৪৪৭৪নং)*

সূরা ফাতিহার এত গুরুত্ব যে, সূরা ফাতিহাবিহীন নামায শুদ্ধ নয়। নামায যেমন ইসলামের খুঁটি, অনুরূপ ফাতিহাও নামাযের খুঁটি। নবী ﷺ বলেছেন, “সেই ব্যক্তির নামায হয় না, যে ব্যক্তি তাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করে না।” *(বুখারী, মুসলিম)*

সূরা ফাতিহা হল নূর, জ্যোতি বা আলো। খাস নবী ﷺ-কে এ সূরা দান করা হয়েছিল। অন্য কোন নবীকে এই শ্রেণীর কোন সূরা দেওয়া হয়নি। এ সূরার সুসংবাদ নিয়ে খাস ফিরিশ্‌তা অবতরণ করেন। এ সূরাতে প্রার্থিত সকল বিষয় দান করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নবী ﷺ-কে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা জিবরীল ﷺ নবী ﷺ-এর নিকট উপবিষ্ট ছিলেন; এমন সময় উপর দিক হতে এক শব্দ শুনলেন। উপর দিকে

মাথা তুলে তিনি বললেন, “এ শব্দটি আসমানের এক দরজার শব্দ, যা আজ খোলা হল; যা আজ ছাড়া ইতিপূর্বে কক্ষনো খোলা হয়নি। ঐ দরজা দিয়ে এক ফিরিশ্তা অবতরণ করেন।” অতঃপর তিনি বললেন, “তিনি এমন এক ফিরিশ্তা যিনি (আজ) পৃথিবীর প্রতি অবতরণ করলেন, আজ ছাড়া ইতি পূর্বে কোনদিন তিনি অবতরণ করেননি। অতঃপর তিনি সালাম দিয়ে বললেন, ‘(হে মুহাম্মাদ!) আপনি দু’টি জ্যোতির সুসংবাদ নিন; যা আপনাকে দান করা হয়েছে এবং যা পূর্বে কোন নবীকেই দান করা হয়নি; (তা হল,) সূরা ফাতিহা ও বাক্বারার শেষ (দুই) আয়াত। যখনই আপনি উভয়কে পাঠ করবেন, তখনই আপনাকে উভয়ের প্রত্যেক বাক্যের (প্রার্থিত বিষয় অথবা সওয়াব) প্রদান করা হবে।” *(মুসলিম ১৮৭৭, নাসাঈ ৯১৩নং)*

উবাই বিন কা’ব হতে বর্ণিত হয়েছে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “উম্মুল কুরআন (কুরআনের জননী সূরা ফাতিহা)র মত আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ তাওরাতে ও ইঞ্জীলে কোন কিছুই অবতীর্ণ করেননি। এই (সূরাই) হল (নামাযে প্রত্যেক রাকআতে) পঠিতব্য ৭টি আয়াত এবং মহা কুরআন, যা আমাকে দান করা হয়েছে।” (মুওয়াত্ত্বা, আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম, তিরমিযী, মিশকাত ২১৪২ নং)

সূরা ফাতিহার অনেক নাম আছে। আর অনেক নাম মহত্ত্বের দলীল। প্রত্যেক জিনিস তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য অনুসারে মহৎ হয়ে থাকে। যেমন মহান আল্লাহ সবচেয়ে মহান বলে তাঁর বহু নাম রয়েছে। অনুরূপ নবী ﷺ-এর বহু নাম আছে। ঠিক একই কারণে কিয়ামত, জান্নাত, জাহান্নাম, বাঘ, তরবারি ইত্যাদিরও বহু নাম আছে।

কুরআন-হাদীসে বর্ণিত সূরা ফাতিহার নাম যেমন, ফাতিহাতুল কিতাব, উম্মুল কুরআন, আস্-সাবউল মাসানী, আল-কুরআনুল আযীম, আস্-স্বালাত ইত্যাদি।

আর তার গুণ বর্ণনায় বলা হয়েছে, নূর, রুক্বয়্যাহ ইত্যাদি। *(দেখুনঃ আল-ইতক্বান ফী উলূমিল কুরআন, সুয়ূত্বী ১/১৬৭-১৭১, এ গ্রন্থে সূরা ফাতিহার বহু নাম ও গুণাবলী উল্লিখিত হয়েছে।)*

সবচেয়ে বেশি আশাব্যঞ্জক আয়াত

মু’মিন আমল করে, কিন্তু ভয় করে, তা কবুল হবে কি না? তবে আল্লাহর কাছে আশাও রাখে। আল্লাহর রহমত থেকে নিরাশ হয় না। নিরাশ হওয়া বৈধ নয়।

সকল আমল হয়তো ঠিকমতো হয় না। নামাযে মন বসে না। প্রাত্যহিকী এমন বিশাল ইবাদতে দাঁড়িয়েও মন এখানে-সেখানে ছুটে যায়। মন ও শয়তানের বিরুদ্ধে লড়তে লড়তে সালাম ফেরা হয়!

মুসলিম ভয় ও ভরসা রেখে, চেষ্টা ও আশা রেখে আমল ক’রে যায়। প্রবল আশায় বুক বেঁধে পরিত্রাণের পথ অনুসন্ধান করে। কিন্তু সে আশা আসে কোত্থেকে?

কুরআন মাজীদে প্রায় ৬৬৬৬টি আয়াত আছে। তা পড়তে পড়তে বহু আশাব্যঞ্জক আয়াত পাওয়া যায়। তা পড়ে মনের ভিতরে আশা জাগে, ইনশাআল্লাহ পরিত্রাণ পাব।

সবচেয়ে বেশি আশাব্যঞ্জক আয়াতগুলি কী?

১। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُوا الْفَضْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُوْلِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (٢٢) سورة النــور

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা ঐশ্বর্য ও প্রাচুর্যের অধিকারী তারা যেন শপথ গ্রহণ না করে যে, তারা আত্মীয়-স্বজন ও অভাবগ্রস্তকে এবং আল্লাহর রাস্তায় যারা গৃহত্যাগ করেছে, তাদের কিছুই দেবে না; তারা যেন ওদেরকে ক্ষমা করে এবং ওদের দোষ-ত্রুটি মার্জনা করে। তোমরা কি পছন্দ করো না যে, আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা ক’রে দিন? আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়। (নূরঃ ২২)

মিসত্বাহ নামক এক সাহাবী, যিনি আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র চরিত্রে অপবাদ রটনার ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলেন, তিনি একজন গরীব মুহাজির ছিলেন। আত্মীয়তার দিক দিয়ে আবু বাকর সিদ্দীক ﵁-এর খালাতো ভাই ছিলেন। এই জন্য তিনি তাঁর তত্ত্বাবধায়ক ও ভরণপোষণের দায়িত্বশীল ছিলেন। যখন তিনিও (কন্যা) আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা)র বিরুদ্ধে চক্রান্তে শরীক হয়ে পড়েন, তখন আবু বাকর সিদ্দীক ﵁ অত্যন্ত মর্মাহত ও দুঃখিত হন; আর তা ছিল স্বাভাবিক ব্যাপার। সুতরাং পবিত্রতার আয়াত অবতীর্ণ হওয়ার পর তিনি কসম ক’রে বসলেন যে, আগামীতে তিনি মিসত্বাহকে কোন প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা করবেন না। আবু বাকর সিদ্দীক ﵁-এর এই শপথ যদিও মানব প্রকৃতির অনুকূলই ছিল, তবুও সিদ্দীকের মর্যাদা এর চাইতে উচ্চ চরিত্রের দাবীদার ছিল। সুতরাং তা আল্লাহর পছন্দ ছিল না। যার কারণে তিনি এই আয়াত অবতীর্ণ করলেন, যাতে অত্যন্ত স্নেহ-বাৎসল্যের সাথে তাঁর শীঘ্রতাপ্রবণ মানবীয় আচরণের উপর সতর্ক করলেন যে, তোমাদের ভুল-ভ্রান্তি হয়ে থাকে। আর তোমরা চাও যে, মহান আল্লাহ তোমাদের সে ভুল-ত্রুটিকে ক্ষমা ক’রে দেন। তাহলে তোমরা অন্যের সাথে ক্ষমা-সুন্দর আচরণ কর না কেন? তোমরা কি চাও না যে, মহান আল্লাহ তোমাদের ভুল-ত্রুটি ক্ষমা করুন?

সুতরাং কুরআনের এই বর্ণনা-ভঙ্গি এতই প্রভাবশালী ছিল যে, তা শোনার সাথে সাথে সহসা আবু বাকর ﵁-এর মুখ হতে বের হল, ‘কেন নয়? হে আমাদের প্রভু! আমরা নিশ্চয় চাই যে, তুমি আমাদেরকে ক্ষমা কর।’ এরপর তিনি কসমের কাফ্ফারা দিয়ে পূর্বের ন্যায় মিসত্বাহকে সাহায্য-সহযোগিতা করতে শুরু করলেন। *(ফাতহুল ক্বাদীর, ইবনে কাসীর, আহসানুল বায়ান)*

উক্ত আয়াত ও ঘটনা থেকে বুঝায় যায় যে, মিথ্যা অপবাদ দিলে মানুষ কাফের হয়ে যায় না এবং তা নেক আমল পন্ড করে না। যেহেতু মিসত্বাহর হিজরত পন্ড হয়নি। মহান আল্লাহ সে কথা উল্লেখ করেই মিসত্বাহর প্রতি সদয় হতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। সুতরাং আশা করা যায় যে, কাবীরা গোনাহ করলেও বান্দা মুক্তির আশা করতে পারে। এই জন্য উলামাগণ বলেন, উক্ত আয়াত কুরআন কারীমের অন্যতম সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক আয়াত। (আযওয়াউল বায়ান ৫/৪৮৮)

২। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ بِأَنَّ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ فَضْلاً كَبِيراً} [الأحزاب:٤٧]

অর্থাৎ, তুমি বিশ্বাসীদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহর নিকট মহা অনুগ্রহ রয়েছে। (আহযাব ঃ ৪৭)

আর উক্ত মহা অনুগ্রহের ব্যাখ্যা রয়েছে অন্য আয়াতে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فِي رَوْضَاتِ الْجَنَّاتِ لَهُمْ مَا يَشَاءُونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ}[الشورى: ٢٢]

অর্থাৎ, যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে, তারা জান্নাতের বাগানসমূহে প্রবেশ করবে, তারা যা কিছু চাইবে, তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে তাই পাবে। এটিই তো মহা অনুগ্রহ। (শূরা ঃ ২২)

এই সুসংবাদের মাঝেই রয়েছে, মু'মিনদের বুকভরা আশা।

৩। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ} (٥٣) سورة الزمر

অর্থাৎ, ঘোষণা করে দাও (আমার এ কথা), হে আমার দাসগণ! তোমরা যারা নিজেদের প্রতি যুলুম করেছ, তারা আল্লাহর করুণা হতে নিরাশ হয়ো না; নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত পাপ মাফ ক'রে দেবেন। নিশ্চয় তিনিই চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (যুমার ঃ ৫৩)

৪। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ} [الشورى: ١٩]

অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর দাসদের প্রতি অতি স্নেহশীল। (শূরা ঃ ১৯)

৫। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى} [الضحى:٥]

অর্থাৎ, অচিরেই তোমার প্রতিপালক তোমাকে (এমন কিছু) দান করবেন, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হবে।(যুহা ঃ ৫)

যেহেতু মহানবী ﷺ এতে সন্তুষ্ট হবেন না যে, তাঁর উম্মতের কেউ জাহান্নামে থেকে যাক।

৬। অনেকে বলেছেন, সবচেয়ে আশাপ্রদ আয়াত হল ঋণের আয়াত, কুরআন কারীমের সবচেয়ে লম্বা আয়াত। মহান আল্লাহ তাতে মুসলিমের মালধন রক্ষার বিশেষ ব্যবস্থার কথা বড় সূক্ষ্মতার সাথে বর্ণনা করেছেন। সুতরাং যে আল্লাহ মুসলিম বান্দার পার্থিব কোন হক বা স্বার্থ নষ্ট হয়ে যাক---তা চান না, সেই আল্লাহ সেই বান্দার পারলৌকিক কোন স্বার্থ নষ্ট হোক---তা চাইতেই পারেন না।

৭। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ثُمَّ أَوْرَثْنَا الْكِتَابَ الَّذِينَ اصْطَفَيْنَا مِنْ عِبَادِنَا فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَ الْفَضْلُ الْكَبِيرُ. جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤاً وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ إِنَّ رَبَّنَا لَغَفُورٌ شَكُورٌ. الَّذِي أَحَلَّنَا دَارَ الْمُقَامَةِ مِنْ فَضْلِهِ لا يَمَسُّنَا فِيهَا نَصَبٌ وَلا يَمَسُّنَا فِيهَا لُغُوبٌ} [فاطر]

অর্থাৎ, অতঃপর আমি আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে গ্রন্থের অধিকারী করলাম যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের কেউ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেউ মিতাচারী এবং কেউ আল্লাহর নির্দেশে কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী। এটিই মহাঅনুগ্রহ। তারা প্রবেশ করবে স্থায়ী জান্নাতে, যেখানে তাদের স্বর্ণ-নির্মিত কঙ্কণ ও মুক্তা দ্বারা অলংকৃত করা হবে এবং যেখানে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ হবে রেশমের। তারা বলবে, 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর; যিনি আমাদের দুঃখ-দুর্দশা দূরীভূত করেছেন; নিশ্চয়ই আমাদের প্রতিপালক বড় ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী; যিনি নিজ অনুগ্রহে, আমাদেরকে স্থায়ী আবাস দান করেছেন; যেখানে আমাদেরকে কোন প্রকার ক্লেশ স্পর্শ করে না এবং স্পর্শ করে না কোন প্রকার ক্লান্তি।' (ফাত্বির ঃ ৩২-৩৫)

উক্ত প্রথম আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ কুরআন দান ক'রে এই উম্মতকে মনোনীত করেছেন। আর তাদেরকে তিনি তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন,

(ক) নিজের প্রতি অত্যাচারী ঃ যে আল্লাহর আনুগত্য করে, কিন্তু কখনো কখনো অবাধ্যতাও ক'রে ফেলে। এরা হল তারা, যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَآخَرُونَ اعْتَرَفُواْ بِذُنُوبِهِمْ خَلَطُواْ عَمَلاً صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا عَسَى اللّهُ أَن يَتُوبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (١٠٢) سورة التوبة

অর্থাৎ, আরো কতক লোক আছে যারা নিজেদের অপরাধসমূহ স্বীকার করেছে, যারা ভালো আমলের সাথে মন্দ আমল মিশ্রিত করেছে। আশা রয়েছে যে, আল্লাহ তাদের তওবা কবুল করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অতিশয় ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। (তাওবাহ ঃ ১০২)

(খ) মিতাচারী ঃ যে আল্লাহর আনুগত্য করে এবং তাঁর অবাধ্যাচরণ করে না। তবে সে অতিরিক্ত (নফল) ইবাদত দ্বারা তাঁর নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয় না।

(গ) কল্যাণকর কাজে অগ্রগামী ঃ যে যাবতীয় আদেশ ও নিষেধ পালন ক'রে আল্লাহর আনুগত্য করে এবং তাঁর অবাধ্যাচরণ করে না। পরন্তু সে অতিরিক্ত (নফল) ইবাদত দ্বারা তাঁর নৈকট্য লাভ করতে সক্ষম হয়।

অতঃপর তিনি তিন প্রকার বান্দাকেই জান্নাতের ওয়াদা দিয়েছেন। {جَنَّاتُ عَدْنٍ يَدْخُلُونَهَا} তে বহুবচনের 'ওয়াও' বর্ণটি এ কথার দলীল যে, পূর্বোক্ত তিন শ্রেণীর বান্দাই জান্নাতের অধিকারী হবে। তার মানে (তাওহীদবাদী) মুসলিমদের প্রত্যেকেই জান্নাত লাভ করবে। যেহেতু তার পরবর্তী আয়াতে কাফেরদের কথা বলা হয়েছে,

{وَالَّذِينَ كَفَرُوا لَهُمْ نَارُ جَهَنَّمَ لا يُقْضَى عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا كَذَلِكَ نَجْزِي كُلَّ كَفُورٍ (٣٦) وَهُمْ يَصْطَرِخُونَ فِيهَا رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ أَوَلَمْ نُعَمِّرْكُم مَّا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَن تَذَكَّرَ وَجَاءكُمُ النَّذِيرُ فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِن نَّصِيرٍ} (٣٧)

অর্থাৎ, পক্ষান্তরে যারা অবিশ্বাস করে, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আগুন। ওদের মৃত্যুর আদেশ দেওয়া হবে না যে ওরা মরবে এবং ওদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবে না। এভাবে আমি প্রত্যেক অবিশ্বাসীকে শাস্তি দিয়ে থাকি। সেখানে তারা আর্তনাদ ক'রে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে (এখান হতে) বের কর, আমরা সৎকাজ করব; পূর্বে যা করতাম তা করব না।' আল্লাহ বলবেন, 'আমি কি তোমাদেরকে এত দীর্ঘ জীবন দান করিনি যে, তখন কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে উপদেশ গ্রহণ করতে পারত? তোমাদের নিকট তো সতর্ককারীও এসেছিল। সুতরাং শাস্তি আস্বাদন কর; সীমালংঘনকারীদের কোন সাহায্যকারী নেই।' (ফাত্বির ঃ ৩৬-৩৭)

৮। মহান আল্লাহর বাণী,

{وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُلاَتُ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ} (٦) سورة الرعد

অর্থাৎ, মঙ্গলের পূর্বে তারা তোমাকে অমঙ্গল ত্বরান্বিত করতে বলে; অথচ তাদের পূর্বে এর বহু দৃষ্টান্ত গত হয়েছে। নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক মানুষের সীমালংঘন সত্ত্বেও তাদের প্রতি ক্ষমাশীল এবং নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক শাস্তি দানেও কঠোর। (রা'দ ঃ ৬)

এ কথা বিদিত যে, মহান আল্লাহর ক্ষমা ও দয়া না হলে কোন মানুষই বেহেশ্ত যেতে পারবে না।

৯। মহান আল্লাহর বাণী,

{وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ} (٣٠) سورة الشورى

অর্থাৎ, তোমাদের যে বিপদ-আপদ ঘটে, তা তো তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল এবং তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা ক'রে দেন। (শূরা ঃ ৩০)

আলী ﷺ বলেছেন, এটি কুরআনের সবচেয়ে বেশি আশাপ্রদ আয়াত। যেহেতু তিনি বিপদাপদ দিয়ে আমার গোনাহের কাফ্ফারা করেন এবং অনেক গোনাহ তিনি এমনিই মাফ ক'রে দেন। সুতরাং কাফ্ফারা ও ক্ষমার পরে আর কোন্ গোনাহ অবশিষ্ট থাকবে? (আইসারুত তাফাসীর ৪/৬১৩)

১০। মহান আল্লাহর বাণী,

{وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي}

অর্থাৎ, আরো (স্মরণ কর) যখন ইব্রাহীম বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! কীভাবে তুমি মৃতকে জীবিত কর, আমাকে দেখাও।' তিনি বললেন, 'তুমি কি এ বিশ্বাস কর না?' সে বলল, 'অবশ্যই (বিশ্বাস করি)। কিন্তু আমার মনকে প্রবোধ দানের জন্য (দেখতে চাই)!'

(বাক্বারাহ ঃ ২৬০)

যেহেতু মহান আল্লাহ ইব্রাহীম ﷺ-এর এই শ্রেণীর সন্দেহকে ক্ষমা ক'রে দিয়েছেন। আমাদের মনে এই শ্রেণীর সন্দেহ তো আসতেই পারে। মহান আল্লাহ আমাদেরকেও ক্ষমা করবেন। তবে 'অবশ্যই' বলে ঈমান রাখতে হবে।

১১। মহান আল্লাহর বাণী,

{ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ} (١١) سورة محمد

অর্থাৎ, এটা এ জন্য যে, আল্লাহ বিশ্বাসীদের অভিভাবক এবং অবিশ্বাসীদের কোন অভিভাবক নেই। (মুহাম্মাদ ঃ ১১)

'মাওলা' মানে অভিভাবক, সাহায্যকারী, যে ভালবাসে। সুতরাং তিনি বিশ্বাসী তথা ঈমানদারদেরকে ভালবাসেন। অবিশ্বাসী তথা কাফেরদেরকে ভালবাসেন না।

উক্ত আয়াতে পরিত্রাণের আশা এইভাবে পাওয়া যায় যে, মহান আল্লাহ বলেছেন, 'আল্লাহ মু'মিনদের অভিভাবক।' তিনি বলেননি, 'আল্লাহ যাহেদ, আবেদ বা অলীদের অভিভাবক।' সুতরাং পাপী হলেও যদি কারো আক্বীদাহ সঠিক থাকে এবং তাওহীদ অবশিষ্ট থাকে তথা শির্ক না থাকে, তাহলে বাঁচার আশা করা যায়।

১২। মহান আল্লাহর বাণী,

{أَنَّ الْعَذَابَ عَلَى مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّى} (٤٨) سورة طـه

অর্থাৎ, শাস্তি তার জন্য, যে মিথ্যাজ্ঞান করে ও মুখ ফিরিয়ে নেয়।' (ত্বা-হা ঃ ৪৮)

তাওহীদবাদীদের জন্য এ আয়াত বড় আশাব্যঞ্জক। যেহেতু তারা মিথ্যাজ্ঞান করে না এবং মুখ ফিরিয়েও নেয় না।

১৩। মহান আল্লাহর বাণী,

{فَهَلْ يُهْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ} (٣٥) سورة الأحقاف

অর্থাৎ, সত্যত্যাগী সম্প্রদায় ব্যতীত অন্য কাউকেও ধ্বংস করা হবে না। (আহক্বাফ ঃ ৩৫)

যারা সত্যত্যাগী বা ফাসেক নয়, তারা ধ্বংস হবে না---এ কথা অবশ্যই মু'মিনদের জন্য বড় আশাপ্রদ।

১৪। মহান আল্লাহর বাণী,

{وَأَقِمِ الصَّلاَةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ }

অর্থাৎ, নামায কায়েম কর দিবসের দু'প্রান্তে ও রাত্রির কিছু অংশে; নিঃসন্দেহে পুণ্যরাশি পাপরাশিকে মুছে ফেলে; এটা হচ্ছে উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ। (হূদ ঃ ১১৪)

নামাযীদের জন্য এ আয়াত অত্যন্ত আশাপ্রদ।

আনাস ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! আমি দণ্ডনীয় অপরাধ ক'রে ফেলেছি; তাই আমার উপর দণ্ড প্রয়োগ করুন।' ইতিমধ্যে

নামাযের সময় হল। সেও আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে নামায পড়ল। নামায শেষ ক'রে পুনরায় সে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! নিশ্চয় আমি দন্ডনীয় অপরাধ ক'রে ফেলেছি; তাই আমার উপর আল্লাহর কিতাবে ঘোষিত দন্ড প্রয়োগ করুন।' তিনি বললেন, "তুমি কি আমাদের সাথে নামায আদায় করেছ?" সে বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "নিশ্চই তোমার অপরাধ ক্ষমা ক'রে দেওয়া হয়েছে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

অবশ্য উক্ত হাদীসে 'দন্ডনীয় অপরাধ' বলতে সেই অপরাধ উদ্দেশ্য নয়, যাতে শরীয়তে নির্ধারিত দন্ড আছে; যেমন মদ্যপান, ব্যভিচার প্রভৃতি। কেননা এমন দন্ডনীয় অপরাধ নামায পড়লেই ক্ষমা হয়ে যাবে না। যেমন সে দন্ড প্রয়োগ না করাও শাসকের জন্য বৈধ নয়।

আবু উযমান ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা একটি গাছের নিচে আমি সালমান ﷺ-এর সাথে (বসে) ছিলাম। তিনি গাছের একটি শুষ্ক ডাল ধরে হিলিয়ে দিলেন। এতে ডালের সমস্ত পাতাগুলি ঝড়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, 'হে আবু উযমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না কি যে, কেন আমি এরূপ করলাম?' আমি বললাম, 'কেন করলেন?' তিনি বললেন, 'একদা আমিও আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে গাছের নিচে ছিলাম। তিনি আমার সামনে অনুরূপ করলেন; গাছের একটি শুষ্ক ডাল ধরে হিলিয়ে দিলেন। এতে তার সমস্ত পাতা খসে পড়ল। অতঃপর বললেন, "হে সালমান! তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা করবে না কি যে, কেন আমি এরূপ করলাম?" আমি বললাম, কেন করলেন? তিনি উত্তরে বললেন, "মুসলিম যখন সুন্দরভাবে ওযু করে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়ে তখন তার পাপরাশি ঠিক ঐভাবেই ঝরে যায়, যেভাবে এই পাতাগুলো ঝরে গেল। আর তিনি উক্ত আয়াত পাঠ করলেন। *(আহমাদ, নাসাঈ, ত্বাবারানী, সহীহ তারগীব ৩৫৬নং)*

মানুষের মনে আশা থাকলে উদ্যম জন্মে এবং তা পূরণের জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস চালিয়ে যেতে হয়। আশাবাদিতার মানে এই নয় যে, মানুষ বাস্তবকে অগ্রাহ্য ও অস্বীকার করবে, কাজ না ক'রে বসে থাকবে; বরং আশাবাদিতা হল হতাশার অন্ধকার অগ্রাহ্য ক'রে আশার আলো জ্বালিয়ে কাজের পথে অগ্রসর হওয়া।

হৃদয় সবচেয়ে বেশি পবিত্র কখন হয়?

চারিত্রিক বিষয়ে মানুষ যত নেক ও সৎ হবে, তার হৃদয় তত শুদ্ধ, পরিষ্কার ও পবিত্র হবে। পরিবেশে চরিত্র তথা হৃদয় অপবিত্র হয় অবৈধ নারীর প্রতি আকর্ষণের কারণে। সুতরাং এই আকর্ষণ যাতে না বাড়ে মহান আল্লাহ তার ব্যবস্থা করেছেন। চোখের আকর্ষণ যাতে সৃষ্টি না হয়, তার জন্য তিনি অপরের গৃহ-প্রবেশের সময় অনুমতি নেওয়ার বিধান দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (٢٧) فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلُوهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِن قِيلَ لَكُمُ ارْجِعُوا

فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكَى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (٢٨) سورة النـــور

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে ও তাদেরকে সালাম না দিয়ে প্রবেশ করো না। এটিই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। যদি তোমরা গৃহে কাউকেও না পাও, তাহলে তোমাদেরকে যতক্ষণ না অনুমতি দেওয়া হয়, ততক্ষণ ওতে প্রবেশ করবে না। যদি তোমাদেরকে বলা হয়, 'ফিরে যাও' তবে তোমরা ফিরে যাবে; এটিই তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে আল্লাহ সবিশেষ অবহিত। (নূর ঃ ২৭-২৮)

চোখাচোখির ঘর্ষণের ফলে সৃষ্ট আকর্ষণ বন্ধ করার লক্ষ্যে তিনি বলেছেন,

{قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ}

অর্থাৎ, বিশ্বাসীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের যৌনাঙ্গকে সাবধানে সংযত রাখে; এটিই তাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। ওরা যা করে, নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে অবহিত। (নূর ঃ ৩০)

অনুরূপ নির্দেশ দিয়েছেন নারীদেরকেও। যাতে তাদের আচরণ কোন পুরুষের হৃদয়ে কালিমা লেপন না ক'রে বসে। তিনি পরবর্তী আয়াতে বলেছেন,

{وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاء بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُوْلِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاء وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِن زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ}

অর্থাৎ, বিশ্বাসী নারীদেরকে বল, তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে ও তাদের লজ্জাস্থান রক্ষা করে। তারা যা সাধারণতঃ প্রকাশ থাকে তা ব্যতীত তাদের সৌন্দর্য যেন প্রদর্শন না করে, তারা তাদের বক্ষঃস্থল যেন মাথার কাপড় দ্বারা আবৃত রাখে। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভ্রাতা, ভ্রাতুষ্পুত্র, ভগিনী পুত্র, তাদের নারীগণ, নিজ অধিকারভুক্ত দাস, যৌনকামনা-রহিত পুরুষ অথবা নারীদের গোপন অঙ্গ সম্বন্ধে অজ্ঞ বালক ব্যতীত কারও নিকট তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন এমন সজোরে পদক্ষেপ না করে, যাতে তাদের গোপন আভরণ প্রকাশ পেয়ে যায়। হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সকলে আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। (নূর ঃ ৩১)

হৃদয়ের পবিত্রতা বজায় রাখার জন্যই পর্দার বিধান এসেছে। এসেছে অপরের বাড়ি প্রবেশ তথা সে বাড়ি মহিলাদের সাথে আচরণের নানা নিয়ম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَن يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرَ نَاظِرِينَ إِنَاهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي

مِنكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا} (٥٣) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের অনুমতি না দেওয়া হলে তোমরা আহার্য প্রস্তুতির জন্য অপেক্ষা না ক'রে ভোজনের জন্য নবী-গৃহে প্রবেশ করো না। তবে তোমাদেরকে আহবান করা হলে তোমরা প্রবেশ কর এবং ভোজন-শেষে তোমরা চলে যাও; তোমরা কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না। কারণ এ নবীর জন্য কষ্টদায়ক; সে তোমাদেরকে উঠে যাবার জন্য বলতে সংকোচ বোধ করে। কিন্তু আল্লাহ সত্য বলতে সংকোচবোধ করেন না। তোমরা তার পত্নীদের নিকট হতে কিছু চাইলে পর্দার অন্তরাল হতে চাও। এ বিধান তোমাদের এবং তাদের হৃদয়ের জন্য অধিকতর পবিত্র। তোমাদের কারও পক্ষে আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেওয়া অথবা তার মৃত্যুর পর তার পত্নীদেরকে বিবাহ করা কখনও সংগত নয়। নিশ্চয় আল্লাহর দৃষ্টিতে এ ঘোরতর অপরাধ। (আহ্যাব ঃ ৫৩)

বিবাহ ও দাম্পত্যের মাধ্যমে পবিত্র থাকে নারী-পুরুষের চরিত্র ও মন। তাই বিবাহ-ব্যবস্থাকে সহজ করতে মানুষের কাছে এসেছে নানা নির্দেশ। তারই একটি নির্দেশ হল,

{وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلاَ تَعْضُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْاْ بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (٢٣٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, আর তোমরা যখন স্ত্রীদের (রজয়ী) তালাক দাও এবং তারা তাদের ইদ্দত (নির্দিষ্ট সময়) পূর্ণ করে, তখন তারা যদি বিধিমত পরস্পর সম্মত হয়, তাহলে স্ত্রীগণ নিজেদের স্বামীদেরকে পুনর্বিবাহ করতে চাইলে তাদেরকে বাধা দিও না। এতদ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস করে তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। এ তোমাদের জন্য শুদ্ধতম ও পবিত্রমত। বস্তুতঃ আল্লাহ জানেন তোমরা জান না। (বাক্বারাহ ঃ ২৩২)

যে মানুষের চরিত্র ও মন পবিত্র ও পরিচ্ছন্ন, সে মানুষ নিশ্চিন্ত থাকতে পারে যে, তাকে নোংরা ও ময়লা কাপড়ের মতো ধোপাবাড়ি গিয়ে পাথরের উপর আঘাত খেতে হবে না।

সবচেয়ে বড় সুখী দুনিয়াদার

আখেরী যামানায় কিয়ামতের পূর্ব মুহূর্তে শরয়ী দৃষ্টিতে অপদার্থ ও হীন মানুষেরা সবচেয়ে বেশি সুখী হবে। অবৈধ অর্থে তাদের বিলাসবহুল বাড়ি-গাড়ি হবে। শরীয়তে যা করা হারাম, তা ক'রে অর্থোপার্জন ক'রে পৃথিবীর প্রভাবশালী ব্যক্তি হবে তারা। মান-যশহীন লোকেরা মানুষদের নেতা ও শাসক হবে। দ্বীন না মানার ফলে দ্বীনদার সম্মানী ব্যক্তিবর্গকে দুনিয়ার ব্যাপারে কোন গুরুত্ব দেওয়া হবে না। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(لاَ تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَكُوْنَ أَسْعَدَ النَّاسِ بِالدُّنْيَا لُكَعُ بنُ لُكَع).

অর্থাৎ, কিয়ামত কায়েম হবে না, যে পর্যন্ত না দুনিয়ার ব্যাপারে সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি হবে অপদার্থ ব্যক্তি। (আহমাদ, তিরমিযী, সঃ জামে' ৭৪৩১নং)

তিনি আরো বলেছেন,

(يُوْشِكُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى الدُّنْيَا لُكَعُ بنُ لُكَع).

অর্থাৎ, অতি নিকটে অপদার্থ লোক পৃথিবীতে ক্ষমতাসীন হবে। (সিঃ সহীহাহ ১৫০৫নং)

(إِنَّهَا سَتَأْتِي عَلَى النَّاسِ سِنُونَ خَدَّاعَةٌ يُصَدَّقُ فِيهَا الْكَاذِبُ وَيُكَذَّبُ فِيهَا الصَّادِقُ وَيُؤْتَمَنُ فِيهَا الْخَائِنُ وَيُخَوَّنُ فِيهَا الْأَمِينُ وَيَنْطِقُ فِيهَا الرُّوَيْبِضَةُ).

"মানুষের নিকট এমন ধোকাব্যঞ্জক যুগ আসবে, যাতে মিথ্যাবাদীকে সত্যবাদীরূপে এবং সত্যবাদীকে মিথ্যাবাদীরূপে পরিগণিত করা হবে। যখন খেয়ানতকারীকে আমানতদার মনে করা হবে এবং আমানতদার আমানতে খেয়ানত করবে। যখন জনসাধারণের ব্যাপারে তুচ্ছ লোক মুখ চালাবে।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৩৬৫০ নং)*

"সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে! ততদিন কিয়ামত কায়েম হবে না, যতদিন না অশ্লীলতা ও কৃপণতা ব্যাপক হবে, খিয়ানতকারীকে আমানতদার এবং আমানতদারকে খিয়ানতকারী বিবেচনা করা হবে, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন লোক ধ্বংস হয়ে যাবে এবং হীন ও নীচ লোক প্রকাশ (প্রাধান্য ও নেতৃত্ব) পাবে।" *(সিঃ সহীহাহ ৩২১১নং)*

প্রিয় পাঠক! নবুঅতের এ ভবিষ্যদ্বাণী কি সত্য নয়? বর্তমান রাজনীতির প্রেক্ষাপটে এ সকল কথা কি বাস্তব নয়?

সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত ও সর্বশ্রেষ্ঠ আবেদ

সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হল দুআ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَفْضَلُ الْعِبَادَةِ الدُّعَاء).

অর্থাৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত হল দুআ। (হাকেম, সঃ জামে' ১১২২নং)

তিনি আরো বলেছেন,

(الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَة).

অর্থাৎ, দুআই হল ইবাদত। (আবূ দাঊদ ১৩২৯, তিরমিযী ২৯৬৯, ইবনে মাজাহ ৩৮২৮নং)

আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ}

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমার কাছে দুআ কর, আমি তোমাদের দুআ কবুল করব। যারা অহংকারে আমার ইবাদতে বিমুখ হয়, তারা লাঞ্ছিত হয়ে

জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (মু'মিন ঃ ৬০)

নামায দ্বীনের খুঁটি, আর নামাযের পুরোটাই হল দুআ। তার ৮ জায়গাতে আছে প্রার্থনামূলক দুআ এবং বাকী জায়গাগুলিতে আছে যিক্‌রমূলক দুআ। এই জন্য স্বালাতের আসল মানেও দুআ।

পক্ষান্তরে মহান আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ আবেদ হল প্রশংসাকারিগণ। যারা অধিকাধিক আল্লাহর প্রশংসা করে। সুখে-দুঃখে তাঁর প্রশংসা ক'রে থাকে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ أَفْضَلَ عِبَادِ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْحَمَّادُوْنَ).

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আল্লাহর সর্বশ্রেষ্ঠ আবেদ হবে প্রশংসাকারিগণ। (ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ১৫৮৪নং)

মহান আল্লাহ নিজের প্রশংসা নিজে করেছেন। তাই তাঁর প্রশংসকারীকেও তিনি পছন্দ করেন। তিনি বান্দাকে প্রশংসা করতে আদেশ দিয়েছেন। মহানবী ﷺ বলেন, "নিশ্চয় আল্লাহ পছন্দ করেন যে, বান্দা খাবার খেলে তার উপর সে (আল-হামদু লিল্লাহ বলে) তাঁর প্রশংসা করবে এবং পানীয় পান করলে সে তাঁর প্রশংসা করবে।" *(মুসলিম ২৭৩৪নং)*

কোন নিয়ামতের উপর প্রশংসা করলে মহান আল্লাহ সেই নিয়ামতে বৃদ্ধি দান করেন। যেহেতু প্রশংসা হল কৃতজ্ঞতার মূল। মহান আল্লাহ বলেন,

{نِعْمَةً مِّنْ عِندِنَا كَذَلِكَ نَجْزِي مَن شَكَرَ} (٣٥) سورة القمر

অর্থাৎ, (লূত পরিবারকে আমি উদ্ধার করেছিলাম ভোর রাতে) আমার বিশেষ অনুগ্রহ স্বরূপ; যারা কৃতজ্ঞ, আমি এভাবেই তাদেরকে পুরস্কৃত ক'রে থাকি। (ক্বামার ঃ ৩৫)

আর দুঃখে-শোকে প্রশংসা করলে, তবেই আসল প্রশংসা হয়। নচেৎ সুখে প্রশংসা তো সবাই করে। সেই জন্য দুঃখের সময় প্রশংসাকারীর বিশেষ মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেন, "যখন কোন বান্দার সন্তান মারা যায়, তখন মহান আল্লাহ স্বীয় ফিরিশ্তাদেরকে বলেন, 'তোমরা আমার বান্দার সন্তানের জীবন হনন করেছ কি?' তাঁরা বলেন, 'হ্যাঁ।' তিনি বলেন, 'তোমরা তার হৃদয়ের ফলকে হনন করেছ?' তাঁরা বলেন, 'হ্যাঁ।' তিনি বলেন, 'সে সময় আমার বান্দা কী বলেছে?' তারা বলে, 'সে আপনার হাম্‌দ (প্রশংসা) করেছে ও ইন্না লিল্লাহি অইন্না ইলাইহি রা-জিঊন (অর্থাৎ, আমরা তোমার এবং তোমার কাছেই অবশ্যই ফিরে যাব) পাঠ করেছে।' মহান আল্লাহ বলেন, 'আমার (সন্তানহারা) বান্দার জন্য জান্নাতের মধ্যে একটি গৃহ নির্মাণ কর, আর তার নাম রাখ, 'বায়তুল হাম্‌দ' (প্রশংসাভবন)।" *(আহমাদ, তিরমিযী ১০২১নং)*

সবচেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত

প্রত্যেক ইবাদতই মহান মা'বূদের নিকট পছন্দনীয়, মর্যাদাপূর্ণ। কিন্তু তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি মর্যাদাপূর্ণ ইবাদত কোন্‌টি? বান্দার নিকট থেকে তিনি বেশি কোন্ জিনিস পছন্দ করেন।

মহান আল্লাহ চান, বান্দা তাঁকে ডাকুক, তার ডাক তাঁকে খুব ভাল লাগে। সে চাইলে তিনি খুব খুশি হন। বরং সে তাঁর কাছে না চাইলে তিনি তার প্রতি রাগান্বিত হন। তিনি চান বান্দা তার দুঃখে-শোকে, আপদে-বিপদে, প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে সর্বদা কেবল তাঁকেই আহবান করুক, তাঁর কাছেই আবেদন জানাক, তাঁর কাছেই প্রার্থনা করুক, যা চাওয়ার তাঁর কাছেই চাক।

এই জন্যই তাঁর নিকট সব চাইতে মর্যাদাপূর্ণ জিনিস হল দুআ। মহানবী ﷺ বলেন,

(لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمَ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ).

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট দুআ অপেক্ষা অন্য কোন জিনিস অধিক মর্যাদাপূর্ণ নয়। (তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সঃ তারগীব ১৬২৯নং)

দুআতে রয়েছে মহান আল্লাহর পরাক্রমশালিতা এবং দুআকারীর অক্ষমতার বিকাশ। দুআ দ্বারা তকদীরও খন্ডন হয়।

মহান আল্লাহ বান্দাকে দুআ করতে আদেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

{وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا} (١٨٠) سورة الأعراف

অর্থাৎ, উত্তম নামসমূহ আল্লাহরই। সুতরাং তোমরা সে সব নামেই তাঁকে ডাকো। (আ'রাফ ঃ ১৮০)

তিনি ছাড়া অন্য কাউকে আহবান করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন,

{وَلاَ تَدْعُ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَنفَعُكَ وَلاَ يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ} (١٠٦)

অর্থাৎ, আর আল্লাহকে ছেড়ে এমন কিছুকে আহবান করো না, যা না তোমার কোন উপকার করতে পারে, না কোন ক্ষতি করতে পারে। বস্তুতঃ যদি এইরূপ কর, তাহলে তুমি অবশ্যই যালেমদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাবে। (ইউনুস ঃ ১০৬)

যেহেতু "দুআই হল ইবাদত।" (আহমাদ, সুনানে আরবাআহ, সঃ জামে' ৩৪০৭নং) তাই মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ}

(٦٠) سورة غافر

অর্থাৎ, তোমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা আমাকে ডাকো, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা অহংকারে আমার উপাসনায় বিমুখ, ওরা লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। (মু'মিন ঃ ৬০)

সুখে-দুঃখে সর্বদা আল্লাহকে ডাকা, লাঞ্ছনা ও বঞ্চনায় তাঁর কাছে প্রার্থনা করা, নিরাশায় আশায় বুক বেঁধে তাঁর কাছে আবেদন জানানো, দ্বীন ও দুনিয়ার সার্বিক নিরাপত্তা চেয়ে তাঁর কাছে দুআ করা উচিত বান্দার। বান্দা যা চায়, তা পেল অথবা না-ই পেল, চাওয়ার ফলে তিনি তো খোশ হবেন। তাঁকে খোশ করাটাও কি কম বড় কথা?

সর্বাধিক কবুলযোগ্য দুআ

আবূ উমামাহ رضي الله عنه হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন্ দুআ সর্বাধিক শোনা (কবূল করা) হয়?' তিনি বললেন,

((جَوْفَ اللَّيْلِ الآخِرِ، وَدُبُرَ الصَّلَواتِ المَكْتُوبَاتِ)) .

অর্থাৎ, রাত্রির শেষভাগে এবং ফরয নামাযসমূহের শেষাংশে। *(তিরমিযী ৩৪৯৯, নাসাঈ কুবরা ৯৯৩৬, মুস্বান্নাফ আব্দুর রায্যাক ৩৯৪৮, সঃ তারগীব ১৬৪৮-নং)*

মহান আল্লাহর সাধারণ ওয়াদা হল,

{ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ} (٦٠) سورة غافر

অর্থাৎ, তোমরা আমাকে ডাক আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। (মু'মিন ঃ ৬০)

{وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُواْ لِي وَلْيُؤْمِنُواْ بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ} (١٨٦) سورة البقرة

অর্থাৎ, আর আমার বান্দাগণ যখন আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞাসা করে, তখন তুমি বল, আমি তো কাছেই আছি। যখন কোন আহবানকারী আমাকে ডাকে, তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব তারাও আমার ডাকে সাড়া দিক এবং আমাতে বিশ্বাস স্থাপন করুক, যাতে তারা ঠিক পথে চলতে পারে। (বাক্বারাহ ঃ ১৮৬)

তবুও কিছু সময় এমন আছে, যে সময়ে দুআ করলে কবুল হওয়ার আশা বেশি করা যায়। উক্ত হাদীসে দু'টি সময়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম সময়টির ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই যে, তা হল রাত্রির শেষ তৃতীয়াংশ তাহাজ্জুদের সময়।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ তাআলা প্রত্যহ রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে নীচের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, "কে আমাকে ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব। এবং কে আমার নিকট ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করব।" *(বুখারী, মুসলিম, সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১২২৩নং)*

কিন্তু মতভেদ হল দ্বিতীয় সময়টি নিয়ে। 'দুবুরাস স্বালাওয়াত' বলতে ফরয নামাযের সালাম ফেরার আগে, না সালাম ফেরার পরে?

আরবীতে 'দুবুর' মানে পাছা, শেষাংশ, পশ্চাৎ। তাহলে 'দুবুরাস স্বালাওয়াত' বা নামাযসমূহের পাছা, শেষাংশ বা পশ্চাৎ বলতে কোন্ সময়কে বুঝায়?

কোন জিনিসের পাছা বলতে কি তার নিজের শেষাংশকে বুঝায়, নাকি তার পিছনের বাইরের অংশকে বুঝায়?

'বাসের পিছনে ইমাম সাহেব আছেন' মানে কি বাসের ভিতরে, নাকি বাসের বাইরে রাস্তায়?

উভয়ই বুঝা যেতে পারে। তেমনি 'দুবুরুস স্বালাত' মানে নামাযের পশ্চাতে ভিতরে-বাইরে উভয় বুঝা যেতে পারে।

তা যদি হয়, তাহলে এ সন্দেহের নিরসন হবে কীভাবে? জানব কীভাবে, দুআ কবূল হওয়ার সে সময় সালাম ফেরার আগে, না পরে?

কুরআনের একটি আয়াত যেমন অন্য একটি আয়াতের ব্যাখ্যা করে, তেমনি একটি হাদীস অন্য হাদীসের ব্যাখ্যা করে। সুতরাং আপনি অন্যান্য হাদীস থেকে নির্ধারণ করতে পারেন, উক্ত হাদীসে 'দুবুর' বা পশ্চাতের অর্থ নামাযের শেষাংশে সালাম ফেরার আগে, নাকি নামাযের পরে বা সালাম ফেরার পরে।

নামাযের সালাম ফেরার পরে কি করা উচিত, সে ব্যাপারে আল্লাহর এক নির্দেশ হল,

{فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ ......} (١٠٣) سورة النساء

"অতঃপর যখন তোমরা নামায সমাপ্ত করবে, তখন আল্লাহর যিক্র কর----।" *(নিসা ঃ ১০৩)*

তাইতো আল্লাহর নবী ﷺ-এর আমল ও অভ্যাস ছিল সালাম ফিরার পর আল্লাহর যিক্র করা।

মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ "আল্লা-হুম্মা আন্তাস সালাম--- " বলার মত সময়ের চেয়ে অধিক সময় সালাম ফেরার পর বসতেন না। *(মুসলিম, মিশকাত ৯৬০ নং)*

সাওবান (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন নামায শেষ করতেন, তখন তিনবার ইস্তিগফার করে "আল্ল-হুম্মা আন্তাস সালাম---- " বলতেন।

আব্দুল্লাহ বিন যুবাইর (রাঃ) বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ যখন সালাম ফিরতেন, তখন উঁচু শব্দে বলতেন, "লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু ---।" *(মুসলিম, মিশকাত৯৬৩ নং)*

সালাম ফেরা হলে তিনি মহিলাদের জন্য একটু অপেক্ষা করতেন, যাতে তারা পুরুষদের আগেই মসজিদ ত্যাগ করতে পারে। অতঃপর তিনি উঠে যেতেন। *(বুখারী ৮৩৭নং)*

সামুরাহ বিন জুনদুব رضي الله عنه বলেন, ফযরের নামায শেষ ক'রে আল্লাহর নবী ﷺ আমাদের দিকে ফিরে বসে বলতেন, "গত রাত্রে তোমাদের মধ্যে কে স্বপ্ন দেখেছে?" অতঃপর কেউ দেখলে সে বর্ণনা করত। নচেৎ তিনি নিজে স্বপ্ন দেখলে তা বর্ণনা করতেন। *(বুখারী,মিশকাত ৪৬২১ নং)*

পক্ষান্তরে সালাম ফেরার পূর্বে তিনি (প্রার্থনামূলক) দুআ পড়তে আদেশ দিয়ে বলেন, "এরপর (তাশাহহুদের পর) তোমাদের যার যা ইচ্ছা ও পছন্দ সেই মত দুআ বেছে নিয়ে দুআ করা উচিত।" *(বুখারী ৮৩৫, মুসলিম,মিশকাত ৯০৯ নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الآخِرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ مِنْ أَرْبَعٍ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَمِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ وَمِنْ شَرِّ الْمَسِيحِ الدَّجَّالِ [ثُمَّ يَدْعُو لِنَفْسِهِ بِمَا بَدَا لَهُ])).

অর্থাৎ, যখন তোমাদের মধ্যে কেউ (শেষ) তাশাহহুদ সম্পন্ন করবে, তখন সে যেন আল্লাহর নিকট চারটি জিনিস থেকে পানাহ চায়; জাহান্নামের আযাব, কবরের আযাব, দাজ্জালের ফিতনা এবং জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে। *(মুসলিম, আবূ আওয়ানাহ, আবূ দাউদ ৯৮৩নং, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, প্রমুখ, মিশকাত ৯৪০নং)* "এরপর সে ইচ্ছামত

নিজের জন্য দুআ করবে।” (নাসাঈ ১৩১০, বাইহাক্বীর সুনানে কুবরা ২৬৯৯, সুগরা ৪৫০, হাকেম ৯৯০, ইবনে আবী শাইবাহ ৩০২৬নং)

সালাম ফিরার পূর্বে তাশাহহুদের পর তিনি নিজেও বিবিধ প্রকার দুআ পড়ে প্রার্থনা করেছেন। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৯৩৯নং)*

পরন্তু যদিও আলোচ্য হাদীসে ‘দুবুর’ শব্দের অর্থ সালাম ফেরার পরে ধরে নেওয়া যায়, তবুও তাতে হাত তুলে জামাআতী মুনাজাত প্রমাণ হয় না। যেহেতু শব্দাবলীতে হাত তুলে দুআর কথা নেই। তাছাড়া নামাযের পর মহানবী ﷺ অধিকাংশ যিক্‌র পাঠ করেছেন। কখনো কখনো দুআ করলেও হাত তুলে করেননি। সুতরাং ফরয নামাযের পর মুনাজাতীদের মুনাজাত-প্রীতি বিদআত বৈ কিছু নয়।

(সবিস্তার দ্রঃ ‘স্বালাতে মুবাশ্‌শির’ ও ‘বিতর্কিত মুনাজাত’)

কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে, এতদ্‌সত্ত্বেও দাদুপন্থী গোঁড়ারা নিজেদের ফতোয়া ও অভ্যাসগত আমল বর্জন করতে পারছে না, কেবল তাদের নিজেদের ‘মান’ ও ‘প্রেস্টিজ’ বজায় রাখার মানসে। পরন্তু যে তাদের ভুল প্রমাণ ক’রে তাদেরকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে চাচ্ছে, তার প্রতি তারা খাপ্পা হয়ে ব্যক্তিগত জীবনের রটনাকৃত অপবাদ আরোপ ক’রে হেয় প্রতিপন্ন করতে চাচ্ছে। আলাইহিম মিনাল্লাহি মা য়্যাস্তাহিক্কুন।

সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ

দুআ এক প্রকার ইবাদত। বরং দুআই হল আসল ইবাদত। দুআ মানে ডাকা ও আহবান করা। এই জন্য মুসলিম সকল প্রকার দুআ কেবল আল্লাহর জন্যই নিবেদন করে।

দুআ সাধারণতঃ দুই প্রকার। (১) দুআয়ে মাসআলাহ ও (২) দুআয়ে যিক্‌র। দুআয়ে মাসআলায় থাকে প্রার্থনা ও চাওয়া। দুনিয়া ও আখেরাতের কোন কিছু চাওয়ার অর্থ। কিন্তু দুআয়ে যিক্‌রে প্রার্থনা বা চাওয়ার কোন অর্থ থাকে না। তাতে কেবল আল্লাহর স্মরণ বা প্রশংসা থাকে।

দুআয়ে মাসআলা বা প্রার্থনামূলক দুআসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ হল নিম্নরূপ ঃ-

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْمُعَافَاةَ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةَ.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ইহকালে ও পরকালে বিপদমুক্তি চাচ্ছি। (ইবনে মাজাহ ৩৮৫১নং)

অথবা

اَللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ العَفوَ والعَافيةَ فِي الدُنيا والآخِرة.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট ইহকালে ও পরকালে ক্ষমা ও নিরাপত্তা চাচ্ছি। (আল-আদাবুল মুফরাদ, আলবানী ৬৩৭নং)

এই চাওয়া ও পাওয়া সর্বশ্রেষ্ঠ কেন? যেহেতু এই পাওয়াতে রয়েছে ইহ-পরকালের সুখ ও শান্তি।

দুনিয়ার সংসারে মানুষ অনিরাপত্তায় ভুগলে মনে সুখ থাকে না। কিছু না কিছু ভয় থাকলে

জীবনে শান্তি থাকে না।

মানুষের ভয় ঃ চোর-ডাকাত, সন্ত্রাসী-আততায়ী, দুশমন-অত্যাচারী প্রভৃতির ভয় মানুষের সুনিদ্রা কেড়ে নেয়।

জ্বিন-ভূতের ভয় মানুষের জীবনে আতঙ্ক আনয়ন করে।

হিংস্র জীব-জন্তুর ভয় মানুষের মন থেকে নিরাপত্তা হরণ করে।

প্রাকৃতির দুর্যোগ ও দুর্ঘটনার আশঙ্কা মানুষের হৃদয়ে দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা সৃষ্টি করে।

শারীরিক নানা রোগ-যন্ত্রণা মানুষকে অতিষ্ঠ ক’রে তার জীবন দুর্বিষহ ক’রে তোলে।

সুতরাং উক্ত প্রার্থনা যদি মহান আল্লাহ মঞ্জুর ক’রে নেন, তাহলে দুনিয়ার প্রকৃত সুখ ও শান্তি লাভ হয়ে থাকে।

বলা বাহুল্য, উক্ত প্রার্থনার মানে হবে, হে আল্লাহ!------

তুমি আমাকে চোর-ডাকাত, সন্ত্রাসী-আততায়ী, দুশমন-অত্যাচারী প্রভৃতির ভয় থেকে নিরাপত্তা দান কর।

শয়তান জ্বিন থেকে আমাকে নিরাপত্তা দাও।

প্রাকৃতির দুর্যোগ ও দুর্ঘটনার আশঙ্কা থেকে আমাকে নিরাপদ কর।

শারীরিক নানা রোগ-যন্ত্রণার কবল থেকে রক্ষা পেতে আমার নিরাপত্তা বিধান কর।

পক্ষান্তরে পরকালের চিন্তাও আসল চিন্তা। মরণের পর কবরের আযাব। কিয়ামতের মাঠে হাশরের আযাব। হিসাব-নিকাশের ভয়। পুলসিরাত পার হওয়ার ভয়। জাহান্নামের বিভীষিকাময় আগুনের ভয়। এ সকল ভয় থেকে যদি মহান আল্লাহ নিরাপত্তা দান করেন, তাহলে আর কীসের দুশ্চিন্তা? মহান আল্লাহর ক্ষমা ও নিরাপত্তা লাভ হলেই তো মহালাভ, ইচ্ছাসুখের জান্নাত লাভ। তাই তো এ দুআ সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ। তাই তো মহানবী ﷺ-এর চাচা আব্বাস দুআ শিখতে চাইলে, তিনি তাঁকে ঐ দুআই শিখিয়েছিলেন। (তিরমিযী ৩৫১৪নং, আল-আদাবুল মুফরাদ ২৫৩পৃঃ)

মহানবী ﷺ নিজেও প্রত্যেক সকাল-সন্ধ্যায় ঐ প্রার্থনা করতেন। (আহমাদ, ৪৭৮৫, আবূ দাঊদ ৫০৭৬, নাসাঈ কুবরা ১০৪০১নং)

আর দুআয়ে যিক্‌রের দুআসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ হল নিম্নরূপ ঃ-

لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

‘লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুওয়া আলা কুল্লি শাইইন ক্বাদীর।’ (আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই। তিনি একক, তাঁর কোন শরীক নেই। তাঁরই সারা রাজত্ব এবং তাঁরই সকল প্রশংসা। আর তিনি সর্ব বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান।)”

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي : لاَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ).

অর্থাৎ, “শ্রেষ্ঠ দুআ আরাফার দিনের দুআ; আমি ও আমার পূর্বের নবীগণ যা বলেছেন,

তার মধ্যে শ্রেষ্ঠ কথা, 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ........।" *(তিরমিযী ৩৫৮৫নং)*

যেহেতু এই দুআতে রয়েছে মহান আল্লাহর একত্ববাদের ঘোষণা, তাঁর সার্বভৌমত্বের ঘোষণা, তাঁর প্রশংসার দ্যোতনা, তার সর্ব বস্তুর উপর সর্ব ক্ষমতার ব্যঞ্জনা।

এই দুআ পড়া হয় যুল-হজ্জের নয় তারীখে আরাফাতের ময়দানে। সারা বিশ্ব থেকে সমবেত হাজীগণ এই দিনে এক লেবাসে, এক ভাষায় শরীকবিহীন আল্লাহর উক্ত গুণাবলী বর্ণনা ক'রে থাকেন। সমস্ত আম্বিয়ায়ে কিরাম (আলাইহিমুস সালাম) ঐ দুআ পড়ে উক্ত ঘোষণা দিয়েছেন। সারা বিশ্বের মুসলিমরাও ঐ শ্রেষ্ঠতম দুআ পড়ে উক্ত ঘোষণা দিয়ে থাকে। অবশ্য প্রকৃত মুসলিম তারাই, যারা ঐ ঘোষণা, দ্যোতনা ও ব্যঞ্জনা অনুসারে কাজ ক'রে থাকে। প্রকৃত মুসলিম তারা, যারা আল্লাহর সাথে কোনদিন কোন কিছুকে শরীক করে না।

তদনুরূপ যে দুআয় মহান আল্লাহর প্রশংসা থাকে, সে দুআও সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« أَفْضَلُ الذِّكْرِ لا إلهَ إلاَّ الله وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحمْدُ لله».

অর্থাৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র হল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আর সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ হল, 'আল-হামদু লিল্লাহ'। (তিরমিযী ৩৩৮৩, ইবনে মাজাহ ৩৮০০নং)

যেহেতু যিকরমূলক এই দুআয় রয়েছে মহান আল্লাহর প্রশংসা। আর অনেক সময় প্রশংসার অর্থেই বুঝা যায়, প্রশংসাকারী কিছু প্রার্থনা করছে। বান্দা আল্লাহর নিকট থেকে সব কিছু পেয়েছে। সুতরাং সকল নিয়ামতের উপর তাঁর প্রশংসা হয়। আর প্রশংসা হল কৃতজ্ঞতার মূল। প্রশংসায় থাকে প্রশংসিতের প্রতি শুকরিয়ার বহিঃপ্রকাশ। সুতরাং নিয়ামতের প্রশংসা করলে নিয়ামত বৃদ্ধিলাভ করে। যেহেতু মহান আল্লাহর ওয়াদা,

{لَئِن شَكَرْتُمْ لأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ} (٧) سورة إبراهيم

অর্থাৎ, তোমরা কৃতজ্ঞ হলে তোমাদেরকে অবশ্যই অধিক দান করব, আর অকৃতজ্ঞ হলে অবশ্যই আমার শাস্তি হবে কঠোর।' (ইব্রাহীম ঃ ৭)

আর মহানবী ﷺ বলেছেন, "নিশ্চয় আল্লাহ তাআলা ঐ বান্দার প্রতি সন্তুষ্ট হন, যে খাবার খায়, অতঃপর তার উপর আল্লাহর প্রশংসা করে অথবা পানি পান করে, অতঃপর তার উপর আল্লাহর প্রশংসা করে।" *(মুসলিম)*

অবশ্য 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলে সূরা ফাতিহা উদ্দিষ্ট হতে পারে। যেহেতু তার শুরু হল 'আল-হামদু লিল্লাহ' দিয়ে। আর তাতে যে দুআ আছে, তার চাইতে শ্রেষ্ঠ, পরিপূর্ণ ও ব্যাপক দুআ আর কী হতে পারে?

তাছাড়া তা হল মহা কুরআন, আল-কুরআনের ভূমিকা ও সারাংশ, মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ সূরা, নামাযীর নামাযের রুক্‌ন।

সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র

যিক্‌র মানে আল্লাহর স্মরণ। আর আল্লাহর স্মরণ হয় দুইভাবে ঃ মনে ও মুখে। এইভাবে শরীয়তে পাঁচ প্রকার যিক্‌র পাওয়া যায় ঃ-

১। শরীয়তের কোন আদেশ মানতে গিয়ে আল্লাহর স্মরণ।
২। শরীয়তের কোন নিষেধ মানতে গিয়ে আল্লাহর স্মরণ।
৩। নির্দিষ্ট অবস্থা ও উপলক্ষ্যে নির্দিষ্ট বাক্য দ্বারা আল্লাহর স্মরণ।
৪। নির্দিষ্ট সংখ্যায় নির্দিষ্ট বাক্য দ্বারা আল্লাহর স্মরণ।
৫। অনির্দিষ্টভাবে মহান আল্লাহর সাধারণ স্মরণ।

মুখে যে সকল যিক্‌র করা হয়, তার মধ্যে কুরআন তিলাঅত, তাসবীহ-তাহলীল, ইল্‌মী আলোচনা ইত্যাদি আছে। তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র হল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', যেমন সে কথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« أَفْضَلُ الذِّكْرِ لاَ إلهَ إلاَّ الله وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحمْدُ لله».

অর্থাৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র হল, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আর সর্বশ্রেষ্ঠ দুআ হল, 'আল-হামদু লিল্লাহ'। (তিরমিযী ৩৩৮৩, ইবনে মাজাহ ৩৮০০নং)

কেন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' সর্বোত্তম যিক্‌র?

যেহেতু 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হল ইসলামের মূলমন্ত্র, কালেমায়ে তাওহীদ। এ বাক্য ইসলামে তথা জান্নাতে প্রবেশ করার চাবিকাঠি। এ বাক্য ঈমান ও কুফরীর মাঝে পার্থক্য সূচিতকারী।

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' দিয়ে হৃদয় পবিত্র হয়। আত্মার মলিনতার প্রক্ষালন হয়। কুপ্রবৃত্তির শিরশ্ছেদন হয়, যা আসলে মনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেবতা। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'র পানি দিয়েই নানা কুসংস্কার ও বাতিল মা'বূদদের নোংরামি ও অপবিত্রতা থেকে মনের আসন পবিত্র হয়।

তবে জরুরী হল, তার অর্থ জানতে হবে এবং শর্ত মানতে হবে। তা না হলে মুখের বুলি আওড়ে কোন ফল ফলবে না।

সবচেয়ে অক্ষম ব্যক্তি

যে কাজ ভারী লাগে, সে কাজ করতে অধিকাংশ মানুষ অক্ষম হয়। যে কাজে কষ্ট আছে, সে কাজ করতে অনেক মানুষ শৈথিল্য ও আলস্য প্রকাশ করে। তাদেরকে অবশ্যই অক্ষম বলা চলে। কিন্তু যে কাজ ভারী নয়, কষ্টের নয়, যে কাজে অর্থ বা শ্রম কিছুও ব্যয় করতে হয় না, সে কাজ করতে কেউ অক্ষমতা দেখালে, সে নিশ্চয় সবচেয়ে বড় অক্ষম। কে সেই ব্যক্তি?

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَعْجَزُ النَّاسِ مَنْ عَجَزَ فِي الدُّعَاءِ، وَأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بِالسَّلامِ).

অর্থাৎ, সবচেয়ে বেশি অক্ষম সেই ব্যক্তি, যে দুআ করতে অক্ষম হয়। আর সবচেয়ে বড় কৃপণ সেই ব্যক্তি, যে সালাম দিতে কার্পণ্য করে। (ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সঃ জামে' ১০৪৪নং)

যেহেতু যে জিনিসের অভাব আছে এবং তা চাইলে পাওয়া যাবে, সে জিনিস না চাইলে অক্ষমতাই প্রকাশ হয়। মহান আল্লাহ বলেছেন, "তোমরা আমার কাছে দুআ কর, আমি তা কবূল করব।" (সূরা মু'মিন ঃ ৬০) কিন্তু সে কথায় প্রত্যয় রেখে যে ব্যক্তি মহাদাতা মহান বাদশার কাছে চায় না, সে বড় অক্ষম বৈকি?

হ্যাঁ, অনেক সময় মানুষ যা চায়, তা পায় না। তা পেতে সে জলদিবাজি করে। এই জন্য অনেকে দুআ করা ও চাওয়া ছেড়ে দেয়।

রসূল ﷺ বলেন, "বান্দার দুআ কবুল হয়েই থাকে যতক্ষণ সে কোন পাপের অথবা জ্ঞাতিবন্ধন টুটার জন্য দুআ না করে এবং (দুআর ফল লাভে) শীঘ্রতা না করে।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! শীঘ্রতা কেমন?' বললেন, "এই বলা যে, 'দুআ করলাম, আরো দুআ করলাম। অথচ কবুল হতে দেখলাম না।' ফলে সে তখন আক্ষেপ করে এবং দুআ করাই ত্যাগ করে বসে।" *(মুসলিম ৪/২০৯৬)*

দুআ সত্বর কবূল হয় না বলে পুনরায় বা বারবার দুআ করতে অক্ষমতা প্রদর্শন করে। অথচ তা উচিত নয়। যেহেতু দুআ একটি ইবাদত। চাওয়া জিনিস না পাওয়া গেলে, ইবাদত তো হবে।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "যে কোন মুসলিম এমন দুআ করবে, যাতে কোন পাপ নেই এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করার কথা নেই, তাকে আল্লাহ তিনটির মধ্যে একটি দান করবেন ঃ হয় তার দুআ সত্বর কবুল করা হবে। না হয় তা আখেরাতের জন্য জমা রাখা হবে। না হয় অনুরূপ কোন অমঙ্গল থেকে তাকে বাঁচিয়ে নেওয়া হবে।" সাহাবীগণ বললেন, 'তাহলে আমরা বেশি বেশি দুআ করব।' তিনি বললেন, "আল্লাহও বেশি বেশি দান করবেন।" (আহমাদ, বায্যার, আবূ য়্যা'লা, হাকেম, সঃ তারগীব ১৬৩৩নং)

সুতরাং দুআয় কোন প্রকার প্রবঞ্চনা নেই। আর যাতে প্রবঞ্চনা নেই, কেবল লাভই আছে, যাতে কেবল আয় আছে, কোন ব্যয় নেই, তা করতে অক্ষমতা প্রকাশ করা মোটেই উচিত নয়।

সর্বশ্রেষ্ঠ তাবীয

লোকে 'তাবীয' বলতে সাধারণতঃ মাদুলি, কবচ ইত্যাদি বুঝে। কিন্তু সে অর্থে তাবীয ব্যবহার আসলে শির্ক। অবশ্য কুরআনী আয়াত দ্বারা লিখিত তাবীয শির্ক না হলেও ব্যবহার বৈধ নয়।

তবে শরীয়তের পরিভাষায় 'তাবীয' হল দুআ। দুআ পড়ার মাধ্যমে নিজেকে অথবা অপরকে জ্বিন-শয়তান, রোগ-বালা বা যাদু ইত্যাদি থেকে আল্লাহর আশ্রয় দেওয়া। আর যে

ব্যক্তি আল্লাহর আশ্রয় পেয়ে যায়, সে কি কোনভাবে বিপদগ্রস্ত হয়? কক্ষনই না।

নানা বালা-মুসীবত ও বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার বহু তাবীয বা দুআ আছে। সে সব দুআর মধ্যে কুরআনী দুআ সবচেয়ে উত্তম। মহান আল্লাহ আমাদেরকে বহু দুআ শিক্ষা দিয়েছেন তাঁর কুরআনে। আম্বিয়া (আলাইহিমুস সালাম)গণের বহু দুআ বর্ণিত আছে তাতে। সেসব দুআ ব্যবহার করলে মুসলিম প্রভূত কল্যাণ লাভ করতে পারে।

কুরআনী তাবীয বা দুআসমূহের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ দুআ হল সূরা ফালাক্ব ও নাস। মহানবী ﷺ বলেছেন,

ألا أخبرك بأفضل ما تعوذ به المتعوذون : {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ} و {قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ}.

অর্থাৎ, তাবীয ব্যবহারকারীরা যে সকল দুআ দিয়ে তাবীয ব্যবহার করে, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ তাবীয সম্বন্ধে বলে দেব না কি? সূরা ফালাক্ব ও নাস। (নাসাঈ, ত্বাবারানী, সঃ জামে' ২৫৯৩, ৭৮৩৯নং)

উক্ববাহ বিন আমের ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ একদা আমাকে বললেন, "তুমি কি দেখনি, আজ রাত্রে আমার উপর কতকগুলি আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে; যার অনুরূপ আর কিছু দেখা যায়নি? (আর তা হল,) 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস।" *(মুসলিম ৮১৪ নং, তিরমিযী)*

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (সূরা ফালাক্ব ও নাস অবতীর্ণ হবার পূর্ব পর্যন্ত নিজ ভাষাতে) জিন ও বদ নজর থেকে (আল্লাহর) আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। পরিশেষে যখন উক্ত সূরা দু'টি অবতীর্ণ হল, তখন ঐ সূরা দু'টি দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা করতে লাগলেন এবং অন্যান্য সব পরিহার করলেন।' *(তিরমিযী)*

আব্দুল্লাহ ইবনে খুবাইব ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাকে বললেন, "সকাল-সন্ধ্যায় 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' (সূরা ইখলাস) এবং 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব' ও 'কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস' তিনবার ক'রে পড়। তাহলে প্রতিটি (ক্ষতিকর) জিনিস থেকে নিরাপত্তার জন্য যথেষ্ট হবে।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী হাসান সহীহ)*

মুআয বিন আব্দুল্লাহ বিন খুবাইব তাঁর পিতার নিকট হতে বর্ণনা করে বলেন, তাঁর পিতা বলেছেন, একদা আমরা বৃষ্টিময় ঘোর অন্ধকার রাত্রে আল্লাহর রসূল ﷺ-কে খুঁজতে বের হলাম। উদ্দেশ্য ছিল, তিনি আমাদের নামাযের ইমামতি করবেন। আমরা তাঁকে পেয়ে নিলে তিনি বললেন, "বল।" আমি কিছুই বললাম না। পুনরায় তিনি বললেন, "বল।" আমি কিছুই বললাম না। তিনি আবার বললেন, "বল।" এবারে আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! কী বলব?' তিনি বললেন, "কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ, কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক ও কুল আউযু বিরাব্বিন্নাস' সকাল সন্ধ্যায় তিনবার ক'রে বল; প্রত্যেক জিনিস থেকে তাই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে।" *(আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, সহীহ তারগীব ৬৪৩ নং)*

কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে, সর্বশ্রেষ্ঠ জিনিস ছেড়ে অজ্ঞরা সর্বনিকৃষ্ট শির্কী তাবীয ব্যবহার ক'রে নিজেদের পরকাল বরবাদ করে। তারা তাবীয মুখে পড়তে আলস্য প্রদর্শন করে এবং তা গলায় লটকে অথবা হাতে বা কোমরে বেঁধে অথবা বিছানা বা বালিশের নিচে রেখে

অথবা বাড়ির দরজা ও জানালায় লিখে রেখে বালা-মুসীবত থেকে মুক্তি পেতে চায়। অথচ সে পথ ও পদ্ধতি আসলে মুক্তি ও রক্ষার নয়, বরং তা ধ্বংসের ও সর্বনাশের।

মুখে পড়লে অনেকের তাতে একীন থাকে না। কিন্তু হাতে বাঁধলে ভাবে, এ্যাটম বোম বাঁধা আছে। তখন তার মনে জোর থাকে, বুকে সাহস থাকে। শয়তান তার মনে আশ্বাস দেয়। আর তাতেই তো তার লাভ। সুতরাং আল্লাহরই পানাহ।

সর্বশ্রেষ্ঠ শতাব্দী

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যে শতাব্দীতে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ থাকবেন, সেই শতাব্দীই হবে সর্বশ্রেষ্ঠ শতাব্দী। যে সময়ে মহান আল্লাহর সঙ্গে মানুষের যোগাযোগ, নিশ্চয় সে সময় সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। যে যুগে মানুষের কোন সমস্যার সমাধান নিয়ে মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অহী অবতীর্ণ হয়, নিশ্চয় সে যুগ সর্বশ্রেষ্ঠ যুগ। যে কালে মহান আল্লাহর বিধান মানুষের জন্য অবতীর্ণ হয়ে পরিপূর্ণতা পায়, নিশ্চয় সে কাল সর্বশ্রেষ্ঠ কাল।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(خَيْرُ الْقُرُونِ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ).

অর্থাৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ শতাব্দী আমার শতাব্দী। অতঃপর তার পরবর্তী শতাব্দী। অতঃপর তার পরবর্তী শতাব্দী (এর লোকেরা)। (তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ৬৯৯নং)

সর্বশ্রেষ্ঠ সময়

ইবাদতের সর্বশ্রেষ্ঠ সময় সেই সময়, যে সময়ে মন বসে, মনোযোগিতা বিক্ষিপ্ত হয় না, যখন চারিদিক নিঃঝুম-নিস্তব্ধ থাকে, যখন কোন অবাঞ্ছিত শব্দ কানে আসে না, যখন পরিবেশের প্রায় সকল মানুষ মিষ্টি ঘুমে বিভোর থাকে, পরিমন্ডলের প্রায় সকল মানুষ জ্ঞানহারা থাকে, যখন অন্ধকার ও একাকীত্বে মন আধ্যাত্মিকতায় পরিপূর্ণ থাকে, তখন ইবাদত ও দুআয় মন বসে, মহান প্রতিপালককে প্রাণভরে ডাকতে তৃপ্তি লাভ হয়, তখনই বান্দার মনে হয়, এই হল আল্লাহকে ডাকার সর্বশ্রেষ্ঠ সময়। আর তা হল রাতের শেষ তৃতীয়াংশ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَفْضَلُ السَّاعَاتِ جَوْفُ اللَّيْلِ الأَخِيرِ).

অর্থাৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ সময় হল শেষ রাত্রির মধ্যকাল। (ত্বাবারানী, সঃ জামে' ১১০৬নং)

সে সময় সর্বশ্রেষ্ঠ হবে না কেন? সে সময়ে যে মহান আল্লাহ নিচের আসমানে নেমে আসেন। তাঁর জন্য যেমন শোভনীয়, তেমনভাবে নেমে আসেন। রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাআলা প্রত্যহ রাত্রের শেষ তৃতীয়াংশে নীচের আসমানে অবতরণ করেন এবং বলেন, "কে আমাকে ডাকে? আমি তার ডাকে সাড়া দেব। কে আমার নিকট প্রার্থনা করে? আমি তাকে দান করব। এবং কে আমার নিকট ক্ষমা চায়? আমি তাকে ক্ষমা করব।" (বুখারী, মুসলিম, সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১২২৩নং)

সুতরাং এ সময়ে দুআ কবুল হয়। মনের আকুল আবেদন মঞ্জুর হয়। মনের আকুতি বিশ্ব প্রভুর দরবারে পৌঁছে যায়।

এই সময়কে যে কাজে লাগায়, মহান আল্লাহ তাকে ভালোবাসেন। মহানবী ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তিকে আল্লাহ ভালোবাসেন, তাদের প্রতি (সন্তুষ্ট হয়ে) হাসেন এবং তাদের কারণে খুশী হন; (প্রথম) সেই ব্যক্তি যার নিকট স্বদলের পরাজয় প্রকাশ পেলে নিজের জান দিয়ে আল্লাহ আয্যা অজাল্লার ওয়াস্তে যুদ্ধ করে। এতে সে হয় শহীদ হয়ে যায়, নতুবা আল্লাহ তাকে সাহায্য (বিজয়ী) করেন ও তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হন। তখন আল্লাহ বলেন, 'আমার এই বান্দাকে তোমরা লক্ষ্য কর, আমার জন্য নিজের প্রাণ দিয়ে কেমন ধৈর্য ধরেছে?'

(দ্বিতীয়) সেই ব্যক্তি যার আছে সুন্দরী স্ত্রী এবং নরম ও সুন্দর বিছানা। কিন্তু সে (এ সব ত্যাগ করে) রাত্রে উঠে নামায পড়ে। এর জন্য আল্লাহ বলেন, 'সে নিজের প্রবৃত্তিকে দমন ক'রে আমাকে স্মরণ করছে, অথচ ইচ্ছা করলে সে নিদ্রা উপভোগ করতে পারত।'

আর (তৃতীয়) সেই ব্যক্তি যে সফরে থাকে। তার সঙ্গে থাকে কাফেলা। কিছু রাত্রি জাগরণ করে সকলে ঘুমে ঢলে পড়ে। কিন্তু সে শেষরাত্রে উঠে কষ্ট ও আরামের সময় নামায পড়ে।" *(ত্বাবারানী কাবীর, সহীহ তারগীব ৬২৩ নং)*

প্রবৃত্তি দলনে অধিক সহায়ক সময়

প্রবৃত্তি দলনে অধিক সহায়ক হল রাত্রির নিস্তব্ধতা। যখন ব্রেনের কাজে মন বসে, চিন্তাশক্তিতে খোরাক মেলে। ইবাদতে তৃপ্তি আসে। পড়াশোনায় মনোযোগিতা আসে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْءًا وَأَقْوَمُ قِيلًا} (٦) سورة المزمل

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই রাত্রিজাগরণ প্রবৃত্তি দলনে অধিক সহায়ক এবং স্পষ্ট উচ্চারণের অধিক অনুকূল। (মুয্যাম্মিল ঃ ৬)

রাতের নির্জন পরিবেশে নামাযী তাহাজ্জুদের নামাযে যে কুরআন পাঠ করে তার অর্থসমূহ অনুধাবন করার ব্যাপারে (মুখ বা) কানের সাথে অন্তরের বড়ই মিল থাকে।

দিনের তুলনায় রাতে কুরআন পাঠ বেশী পরিষ্কার হয় এবং মনোনিবেশ করার ব্যাপারে বড়ই প্রভাবশালী হয়। কারণ, তখন অন্য সকল শব্দ নিশ্চুপ-নীরব হয়। পরিবেশ থাকে নিঝুম-নিস্তব্ধ। এই সময় নামাযী যা কিছু পড়ে, তা পশুপক্ষী বা কল-কারখানার নানা শব্দের গোলযোগ ও মানুষের হৈ-হট্টগোল থেকে সুরক্ষিত থাকে এবং তার মাঝে নামাযী তৃপ্তি লাভ করে ও অন্তরের অন্তস্তলে তার প্রভাব ও প্রতিক্রিয়া অনুভব করে।

তাছাড়া দিনে নানা ব্যস্ততাও থাকে। আর ব্যস্ততায় হৃদয়-মন বিক্ষিপ্ত থাকে। ধ্যান ও চিন্তার জন্য পরিবেশ প্রতিকূল থাকে। একাগ্রতার অনুকূল থাকে না ব্যগ্রতার পরিমন্ডল। তাই পরবর্তী আয়াতে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ لَكَ فِي اَلنَّهَارِ سَبْحًا طَوِيلًا} (٧) سورة المزمل

অর্থাৎ, দিবাভাগে তোমার জন্য রয়েছে দীর্ঘ কর্মব্যস্ততা। (মুয্যাম্মিল ঃ ৭)

যাঁরাই জীবনে বড় হয়েছেন, তাঁরাই নির্জন পরিবেশে ধ্যান ও গবেষণা করেছেন। রাত্রির পরিবেশকে চিন্তার কাজে ব্যবহার করেছেন। যাঁরাই মহান আল্লাহর নৈকট্য চেয়েছেন, তাঁরাই রাত্রির নির্জনতা ও নিস্তব্ধতাকে কাজে লাগিয়েছেন। বেহেশ্ত লাভে সফল সংযমী ব্যক্তিবর্গের প্রশংসা ক'রে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ} (١٧) سورة الذاريات

অর্থাৎ, তারা রাত্রির সামান্য অংশই নিদ্রায় অতিবাহিত করত। (যারিয়াত ঃ ১৭)

যারা বিজ্ঞানী হতে চায়, তাদের পুরো রাত ঘুমালে চলে না। যারা ফকীহ বা বড় আলেম হতে চায়, তাদের পুরো রাত ঘুমিয়ে কাটালে সফলতা আসে না। যারা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে চায়, তাদের রাতে সুদীর্ঘ সময় নিদ্রার কোলে মাথা রাখলে চলে না। যেহেতু রাতেই মহান আল্লাহ বান্দার নিকটবর্তী হন; বিশেষ ক'রে রাতের শেষ তৃতীয়াংশে।

মুআয ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-এর সাথে কোন এক সফরে ছিলাম; একদা আমাদের চলাকালীন সকাল বেলায় তাঁর নিকটে আমি এসে বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন আমলের কথা বলে দিন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম হতে দূরে রাখবে। তিনি উত্তরে বললেন, "তুমি তো এক বিরাট বিষয়ে প্রশ্ন করেছ। তবে আল্লাহ যার জন্য সহজ করেন, তা তার জন্য সহজ; তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তাঁর সাথে কাউকেও শরীক করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমযানের রোযা পালন করবে ও হজ্জ করবে।"

অতঃপর তিনি বললেন, "তোমাকে মঙ্গলের দরজাসমূহের কথা বলে দেব না কি? রোযা হল ঢাল, সদকাহ পাপমোচন করে যেমন পানি আগুন নির্বাপিত করে। আর মধ্য রাত্রিতে মানুষের নামায।" অতঃপর তিনি এই আয়াত তেলাঅত করলেন,

{تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ} (١٦)

অর্থাৎ, তারা শয্যা ত্যাগ করে আকাঙ্ক্ষা ও আশংকার সাথে তাদের প্রতিপালককে ডাকে এবং আমি তাদেরকে যে রুযী প্রদান করেছি, তা হতে তারা দান করে। (সাজদাহ ঃ ১৬, *তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

নবী ﷺ বলেছেন, "হে লোক সকল! তোমরা ব্যাপকভাবে সালাম প্রচার কর, (ক্ষুধার্তকে) অন্নদান কর এবং লোকে যখন রাতে ঘুমিয়ে থাকবে তখন নামায পড়। তাহলে তোমরা নিরাপদে ও নির্বিঘ্নে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" (তিরমিযী

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যখন কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে রাতে জাগিয়ে উভয়ে নামায পড়ে অথবা তারা উভয়ে দু' রাকআত ক'রে নামায আদায় করে, তবে তাদেরকে (অতীব) যিক্রকারী ও যিক্রকারিণীদের দলে লিপিবদ্ধ করা হয়।" *(আবূ দাঊদ)*

মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি এক রাতে একশ'টি আয়াত পাঠ করবে, সে ব্যক্তির আমলনামায় ঐ রাত্রির কিয়াম (নামাযের) সওয়াব লিপিবদ্ধ করা হবে।" *(আহমদ, নাসাঈ, দারেমী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৬৪৪ নং)*

অনেক মানুষ আছে, যারা রাত্রি জাগরণ করে, কিন্তু কোন উপকারী কাজে নয়; বরং

বিলাস ও মনোরঞ্জনের কাজে। তারা রাত জেগে না কোন দ্বীনের কাজ করে, আর না কোন দুনিয়ার কাজ। তারা উভয়ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত।

বছরের শ্রেষ্ঠতম দিন

মহান আল্লাহর সৃষ্টিতেই বছরে রয়েছে ১২টি মাস। মাসগুলির মধ্যে রয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ মাস রমযান। কেবল এই মাসের নামই উল্লিখিত হয়েছে আল-কুরআনে। এই মাসেই রয়েছে বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ রাত্রিসমূহ, এ মাসের শেষ দশকের রাত্রিসমূহ। এই দশকেই রয়েছে বছরের সর্বশ্রেষ্ঠ রজনী, মহিয়সী গরিয়সী রজনী, শবেকদর। যে রজনী হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

কিন্তু দিনগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল যিল-হজ্জ মাসের প্রথম দশদিন। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَا مِنْ أَيَّامٍ ، العَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّام)) يعني أَيَّامَ العَشرِ . قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ؟ قَالَ : ((وَلاَ الجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ ، إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ ، فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيءٍ)). رواه البخاري

"এই দিনগুলির (অর্থাৎ, যুল হিজ্জার প্রথম দশ দিনের) তুলনায় এমন কোন দিন নেই, যাতে কোন সৎকাজ আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়।" লোকেরা বলল, 'আল্লাহর পথে জিহাদও নয় কি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদও নয়। তবে কোন (মুজাহিদ) ব্যক্তি যদি তার জান-মালসহ বের হয়ে যায় এবং তার কোন কিছুই নিয়ে আর ফিরে না আসে।" (অর্থাৎ শাহাদত বরণ করে, তাহলে হয়তো তার সমান হতে পারে।) (বুখারী)

তিনি আরো বলেছেন,

((أفضلُ أيامِ الدُّنيا أيامُ العَشْرِ)).

অর্থাৎ, দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল, (যিল-হজ্জের প্রথম) দশদিন। *(বাযযার, সঃ জামে' ১১৩৩নং)*

মহান আল্লাহ এই দিনগুলির কসম খেয়েছেন আল-কুরআনে। (ফাজ্র ঃ ২ আয়াত) এই দিনগুলির মধ্যে রয়েছে বড় মাহাত্ম্যপূর্ণ আরাফার দিন। যেদিন রোযা রাখলে ২ বছরের গোনাহ মাফ হয়ে যায়!

তবে এই দিনগুলির মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল কুরবানীর দিন। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

((أَعْظَمُ الأَيَّامِ عِندَ اللَّهِ يَوْمُ النَّحْرِ ثُمَّ يَوْمُ القَرِّ)).

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট মহানতম দিন কুরবানীর দিন। অতঃপর স্থিরতার (কুরবানীর পরের) দিন। (আহমাদ, আবূ দাঊদ ৫/১৭৪, হাকেম, মিশকাত ২/৮১০)

কুরবানীর দিন এক মহান দিন। এই দিনকে 'হজ্জে আকবার' এর দিন বলা হয়। *(আবূ দাঊদ ৫/৪২০, ইবনে মাজাহ ২/১০১৬)*

তাই এই দিন সারা বছরের শ্রেষ্ঠতম দিন।

সপ্তাহের শ্রেষ্ঠতম দিন

সপ্তাহান্তে সর্বশ্রেষ্ঠ দিনটি হল মুসলিমদের সাপ্তাহিক ঈদের দিন। আর সেটা হল জুমআর দিন শুক্রবার। এ দিনের ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ مِنْ أَفْضَلِ أَيَّامِكُمْ يومَ الجُمُعَةِ ، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلاةِ فِيهِ ، فَإِنَّ صَلاتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ عَلَيَّ)). قَالَ : قَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَكَيفَ تُعْرَضُ صَلاتُنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَمْتَ ؟! قَالَ : يَقُولُ بَلِيتَ . قَالَ : ((إِنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَى الأَرْضِ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاءِ)) . رواه أَبُو داود

অর্থাৎ, তোমাদের দিনগুলির মধ্যে সর্বোত্তম দিন হচ্ছে জুমআর দিন। সুতরাং ঐ দিন তোমরা আমার উপর অধিকমাত্রায় দরূদ পড়। কেননা, তোমাদের দরূদ আমার কাছে (ফিরিশ্‌তা মারফৎ) পেশ করা হয়। লোকেরা বলল, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনি তো (মারা যাওয়ার পর) পচে-গলে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবেন। সে ক্ষেত্রে আমাদের দরূদ কীভাবে আপনার কাছে পেশ করা হবে?' তিনি বললেন, "আল্লাহ পয়গম্বরদের দেহসমূহকে খেয়ে ফেলা মাটির উপর হারাম ক'রে দিয়েছেন।" (বিধায় তাঁদের শরীর আবহমান কাল ধরে অক্ষত থাকবে।) *(আবু দাঊদ, বিশুদ্ধ সানাদ)*

তিনি আরো বলেছেন,

((خَيْرُ يومٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الجُمُعَةِ : فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الجَنَّةَ ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا)). رواه مسلم

অর্থাৎ, যার উপর সূর্য উদিত হয়েছে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দিন হল জুমআর দিন। এই দিনে আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে, এই দিনে তাঁকে বেহেশ্তে স্থান দেওয়া হয়েছে এবং এই দিনেই তাঁকে বেহেশ্ত থেকে বের ক'রে দেওয়া হয়েছে। *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেন, "জুমআর দিন সকল দিনের সর্দার এবং আল্লাহর নিকট সবার চেয়ে মহান দিন। এমনকি এ দিনটি আল্লাহর নিকট আযহা ও ফিতরের দিন থেকেও শ্রেষ্ঠ। এই দিনে রয়েছে ৫টি বিশেষ বৈশিষ্ট্য; এই দিনে আল্লাহ আদমকে সৃষ্টি করেছেন, এই দিনে তাঁকে পৃথিবীতে অবতারণ করেছেন, এই দিনে তাঁর ইন্তিকাল হয়েছে, এই দিনে এমন একটি মুহূর্ত আছে, যদি কোন মুসলিম বান্দা সে মুহূর্তে আল্লাহর নিকট কোন কিছু বৈধ জিনিস প্রার্থনা করে, তাহলে আল্লাহ তাকে তা দিয়ে থাকেন। এই দিনে কিয়ামত সংঘটিত হবে। আর প্রত্যেক নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশ্তা, আকাশ, পৃথিবী, বাতাস, পর্বত, সমুদ্র এই দিনকে ভয় করে। (ভয় করে না কেবল জ্বিন ও ইনসান।)" *(ইবনে মাজাহ ১০৮৪নং)*

এই দিনে বা তার রাতে কেউ মারা গেলে কবরের আযাব থেকে রেহাই পায়। মহানবী ﷺ বলেন, "যে মুসলিম জুমআর দিন অথবা রাতে মারা যায়, আল্লাহ তাকে কবরের ফিতনা থেকে বাঁচান।" *(আহমাদ, তিরমিযী, সঃ জামে' ৫৭৭৩নং)*

অবশ্যই উক্ত দিবারাত্রিগুলি শ্রেষ্ঠ হল তার জন্য, যে তাতে আমল করে।

শ্রেষ্ঠতম রাত্রি

বছরের শ্রেষ্ঠতম রাত্রি হল রমযানের শেষ দশকের রাত্রিগুলি। মহানবী ﷺ রমযানের শেষ দশকে ইবাদত করতে যে মেহনত ও চেষ্টা করতেন, মাসের অন্যান্য দিনগুলিতে তা করতেন না। *(মুসলিম ১১৭৫নং)*

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, রমযানের শেষ দশক এসে উপস্থিত হলে আল্লাহর রসূল ﷺ (ইবাদতের জন্য) নিজের কোমর (লুঙ্গি) বেঁধে নিতেন, সারারাত্রি জাগরণ করতেন এবং আপন পরিজনকেও জাগাতেন।" *(বুখারী ২০২৪নং, আহমাদ ৬/৪১, আবূ দাউদ ১৩৭৬, নাসাঈ ১৬৩৯, ইবনে মাজাহ ১৭৬৮, ইবনে খুযাইমা ২২১৪নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি নিজে সারারাত্রি জাগরণ করতেন এবং আপন পরিজনকেও জাগাতেন। ইবাদতে মেহনত করতেন এবং কোমর (বা লুঙ্গি) বেঁধে নিতেন। *(মুসলিম ১১৭৪নং)*

কিন্তু উক্ত রজনীগুলির মধ্যে একটি মহিয়সী রজনী আছে, যাকে শবেকদর বলা হয়।

১। শবেকদরের রয়েছে বিশাল মর্যাদা ও মাহাত্ম্য। মহান আল্লাহ এই রাতে কুরআন অবতীর্ণ করেছেন এবং সে রাতের মাহাত্ম্য ও ফযীলত বর্ণনা করার জন্য কুরআন মাজীদের পূর্ণ একটি সূরা অবতীর্ণ করেছেন এবং সেই সূরার নামকরণও হয়েছে তারই নামে। মহান আল্লাহ বলেন,

((إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِيْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ))

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমি ঐ কুরআনকে শবেকদরে অবতীর্ণ করেছি। তুমি কি জান, শবেকদর কী? শবেকদর হল হাজার মাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। *(সূরা ক্বাদ্‌রঃ ১-৩)*

এক হাজার মাস সমান ৩০ হাজার রাত্রি। অর্থাৎ এই রাতের মর্যাদা ৩০,০০০ গুণ অপেক্ষাও বেশী! সুতরাং বলা যায় যে, এই রাতের ১টি তসবীহ অন্যান্য রাতের ৩০,০০০ তসবীহ অপেক্ষা উত্তম। অনুরূপ এই রাতের ১ রাকআত নামায অন্যান্য রাতের ৩০,০০০ রাকআত অপেক্ষা উত্তম।

বলা বাহুল্য, এই রাতের আমল শবেকদর বিহীন অন্যান্য ৩০ হাজার রাতের আমল অপেক্ষা অধিক শ্রেষ্ঠ। সুতরাং যে ব্যক্তি এই রাতে ইবাদত করল, আসলে সে যেন ৮৩ বছর ৪ মাস অপেক্ষাও বেশী সময় ধরে ইবাদত করল।

২। শবেকদরের রাত হল মুবারক রাত, অতি বর্কতময়, কল্যাণময় ও মঙ্গলময় রাত।

৩। এই রাত সেই ভাগ্য-রাত; যাতে প্রত্যেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় স্থিরীকৃত হয়। *(দুখানঃ ৪)*

৪। এটা হল সেই রাত; যে রাতে প্রত্যেক কাজের জন্য ফিরিশ্তাকুল তাঁদের প্রতিপালকের আদেশে অবতীর্ণ হন। অর্থাৎ, যে কাজের ফায়সালা ঐ রাতে করা হয় তা কার্যকরী করার জন্য তাঁরা অবতরণ করেন।

৫। এ রাত হল সালাম ও শান্তির রাত। (সূরা ক্বাদ্‌র)

৬। এ রাত্রি হল কিয়াম ও গোনাহ-খাতা মাফ করাবার রাত্রি। মহানবী ﷺ বলেন, "যে

ব্যক্তি ঈমান রেখে ও নেকী লাভের আশা করে শবেকদরের রাত্রি কিয়াম করে (নামায পড়ে), সে ব্যক্তির পূর্বেকার গোনাহসমূহ মাফ হয়ে যায়।" *(বুখারী ৩৫, মুসলিম ৭৬০ নং)*

কিন্তু তুলনামূলকভাবে মর্যাদায় তার চাইতেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ রাত রয়েছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَلاَ أُنَبِّئُكُمْ لَيْلَةً أَفْضَلَ مِنْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ حَارِسٌ حَرَسَ فِي أَرْضِ خَوْفٍ لَعَلَّهُ أَنْ لاَ يَرْجِعَ إِلَى أَهْلِهِ).

অর্থাৎ, আমি কি তোমাদেরকে এমন এক রাত্রির কথা বলে দেব না, যা শবেকদর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? (এমন রাত্রি যাতে) কোন মুজাহিদ প্রতিরক্ষার কাজে ত্রাসভরা স্থানে পাহারা দেয়, সম্ভবতঃ সে নিজ পরিবারে ফিরে আসে না। *(হাকেম, সিঃ সহীহাহ ২৮১১নং)*

এ হল সেই মুজাহিদ, যে নিজের জীবনকে বিপন্ন ক'রে দেশের মানুষকে রক্ষা করে। তার মর্যাদা বিশাল।

মহানবী ﷺ বলেন, "এক দিবারাত্রির (শত্রুবাহিনীর অনুপ্রবেশকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে) প্রতিরক্ষা-কার্য এক মাসের রোযা ও নামাযের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। (ঐ প্রতিরক্ষা কাজে রত ব্যক্তি) যদি মারা যায়, তাহলে তার সেই আমল জারী থেকে যায়; যা সে জীবিতাবস্থায় করত, তার জন্য তার রুজী জারী করা হয়; আর (কবরের) যাবতীয় ফিতনা থেকে সে নিরাপত্তা লাভ করে।" *(মুসলিম ১৯১৩ নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি (শত্রু সীমান্তে) প্রতিরক্ষার কাজে রত থাকা অবস্থায় আল্লাহর রাস্তায় মারা যাবে, সে ব্যক্তির জন্য আল্লাহ তার সেই আমল জারী রাখবেন; যা সে জীবিতাবস্থায় করত, তার রুজীও জারী করা হবে, (কবরের) সকল প্রকার ফিতনা হতে সে নিরাপদে থাকবে, আর আল্লাহ তাকে মহাত্রাস থেকে নির্বিঘ্নে রেখে কিয়ামতের দিন পুনরুত্থিত করবেন।" *(বাইহাক্বী, সহীহুল জামে' ৬৫৪৪ নং)*

ইসলাম ও মুসলিমদের সবচেয়ে বড় শত্রু কারা?

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُواْ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُواْ الَّذِينَ قَالُوَاْ إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لاَ يَسْتَكْبِرُونَ} (٨٢) المائدة

অর্থাৎ, অবশ্যই বিশ্বাসীদের প্রতি শত্রুতায় মানুষের মধ্যে ইয়াহুদী ও অংশীবাদীদেরকেই তুমি সর্বাধিক উগ্র দেখবে এবং মানুষের মধ্যে যারা বলে, 'আমরা খ্রিষ্টান', তাদেরকেই তুমি বন্ধুত্বের ব্যাপারে বিশ্বাসীদের নিকটতর দেখবে। কারণ, তাদের মধ্যে অনেক পন্ডিত ও সংসার বিরাগী আছে। আর তারা অহংকারও করে না। (মায়িদাহ ঃ ৮২)

ঐতিহাসিকভাবে এবং বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রমাণিত যে, ইয়াহুদীদের মধ্যে একগুঁয়েমি, হঠকারিতা, হক থেকে বিমুখতা, দাম্ভিকতা ও গর্ব এবং জ্ঞানী ও ঈমানদারদেরকে অবজ্ঞা করার প্রবণতা ব্যাপক প্রচলিত। আর এ জন্যেই নবীগণকে হত্যা ও তাঁদেরকে মিথ্যাজ্ঞান

করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। এমনকি কয়েক বার তারা মহানবী ﷺ-কে হত্যা করার কুচক্রান্ত করে। তাঁকে যাদু করে এবং বিভিন্নভাবে ক্ষতি সাধন করার মতো জঘন্য অপচেষ্টাও করে।

অনুরূপ কুকীর্তি মুশরিকদেরও। তারাও নবীকে হত্যার অপচেষ্টা করে। দেশ থেকে বিতাড়িত করে এবং তারপরেও তাঁর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে।

পক্ষান্তরে খ্রিষ্টানদের মধ্যে জ্ঞান ও বিনয় আছে। আর এই জন্যই ইয়াহুদীদের মতো তাদের হঠকারিতা ও দাম্ভিকতা ছিল না। এ ছাড়া খ্রিষ্টান ধর্মে নম্রতা, উদারতা ও ক্ষমাশীলতার শিক্ষার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মান আছে। এমনকি তাদের ধর্মগ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে যে, কেউ যদি তোমার ডান গালে চড় মারে, তাহলে তার সামনে বাম গাল বাড়িয়ে দাও। অর্থাৎ ঝগড়া-বিবাদ করো না। এই কারণে ইয়াহুদীদের তুলনায় খ্রিষ্টানরা মুসলিমদের নিকটতর। খ্রিষ্টানদের এই প্রশংসা ইয়াহুদীদের মোকাবেলায় করা হয়েছে। নচেৎ ইসলাম-বিদ্বেষের অভ্যাস কম-বেশী তাদের মধ্যেও আছে। যেমন এ কথা ক্রুস ও ক্রিসেন্টের বহু শতাব্দী-ব্যাপী যুদ্ধ-বিগ্রহ থেকে স্পষ্ট এবং যা অদ্যাবধি চলে আসছে। আর বর্তমানে ইয়াহুদী-খ্রিষ্টান উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টা ইসলামের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে সরগরম। এই কারণেই কুরআনে উভয় সম্প্রদায়ের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করতে নিষেধ করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللّهَ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (٥١) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা ইহুদী ও খ্রিষ্টানদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তারা একে অপরের বন্ধু। তোমাদের মধ্যে কেউ তাদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করলে, সে তাদেরই একজন গণ্য হবে। নিশ্চয় আল্লাহ অত্যাচারী সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (মায়িদাহ ঃ ৫১)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الَّذِينَ اتَّخَذُواْ دِينَكُمْ هُزُوًا وَلَعِبًا مِّنَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَالْكُفَّارَ أَوْلِيَاء وَاتَّقُواْ اللّهَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ} (٥٧) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের পূর্বে যাদেরকে কিতাব দেওয়া হয়েছে, তাদের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্মকে হাসি-তামাসা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে, তাদেরকে ও অবিশ্বাসীদেরকে তোমরা বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও, তাহলে আল্লাহকে ভয় কর। (মায়িদাহ ঃ ৫৭)

মানবতার ইতিহাসে বৃহত্তম ফিতনা

শেষ যামানায় দাজ্জালের ফিতনা প্রাদুর্ভূত হবে। কিয়ামতের পূর্ব লক্ষণসমূহের মধ্যে এটি একটি লক্ষণ। তার নানা ফিতনা হবে এবং তাতে অধিকাংশ মানুষ কবলিত হবে।

প্রকাশ পাওয়ার পরই দাজ্জাল খোদায়ী দাবী করবে। বিভিন্ন অলৌকিক শক্তি প্রদর্শনের

ফলে মানুষ তার ধোঁকায় পড়বে। বড় তীব্র গতিতে সারা পৃথিবী ভ্রমণ করবে। তবে মক্কা মুকার্রামা ও মদীনা নববীয়ায় সে প্রবেশ করতে সক্ষম হবে না। কারণ, নগরীদ্বয়ের প্রতি প্রবেশ-পথে ফিরিশ্তার কড়া পাহারা থাকবে। *(মুসলিম ২৯৪৩নং)*

লোকে তার সঙ্গে জান্নাত-জাহান্নাম এবং পানি ও আগুন দেখবে। কিন্তু আসলে তার জান্নাতই জাহান্নাম, জাহান্নামই জান্নাত এবং পানিই আগুন ও আগুনই পানি থাকবে।

শয়তানের দল তার সহায়তা করবে। খোদায়ী দাবীর সত্যতায় সে মানুষের মৃত পিতা-মাতাকে জীবিত করে দেখাতে চাইবে। শয়তান তার পিতা-মাতার রূপ নিয়ে দেখা দিয়ে মানুষকে (পুত্রকে) দাজ্জালের অনুসরণ করতে বলবে। তখন অনেকে তাকে 'আল্লাহ' বলে বিশ্বাস ক'রে নেবে। *(সঃ জামে' ৭৭৫২নং)*

সেই সময় আল্লাহ পাক বান্দার নিকট হতে এমন কঠিন পরীক্ষা নেবেন, যাতে প্রকৃত মুমিন ব্যতীত কেউই দাজ্জালের ফিতনার জাল থেকে নিস্তার পাবে না। সে মেঘকে বর্ষণের আদেশ করলে বৃষ্টি হবে, ফসল ফলবে, পশুকে ডাক দিলে পশু তার অনুসরণ করবে, মাটিকে আদেশ দিলে তার খনিজ পদার্থ বহির্গত করবে। মানুষকে হত্যা ক'রে পুনরায় জীবিত করবে। তখন বহু মানুষ ধোঁকায় পড়ে তাকে 'আল্লাহ' বলে স্বীকার ক'রে নেবে। কিন্তু মু'মিন কোনদিন তা করবে না। যার ফলে মু'মিনকে হত্যা করে দাজ্জাল তার জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে। অথচ সে জাহান্নাম প্রকৃতপক্ষে জান্নাতই হবে। *(মুসলিম ২১৩৭নং)*

পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবীই তার ঐ ভয়ানক ফিতনা থেকে নিজ নিজ উম্মতকে সতর্ক ক'রে গেছেন।

বলা বাহুল্য, মানবতার ইতিহাসে তার ফিতনা সবচেয়ে বড় ফিতনা হবে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(مَا بَيْنَ خَلْقِ آدَمَ إِلَى قِيَامِ السَّاعَةِ أَمرٌ أَكْبَرُ مِنَ الدَّجَّالِ).

অর্থাৎ, আদমের জন্মলগ্ন থেকে নিয়ে কিয়ামত সংঘটিত হওয়া পর্যন্ত দাজ্জালের (ফিতনা-ফাসাদ) অপেক্ষা অন্য কোন বিষয় (বড় বিপজ্জনক) হবে না।" *(মুসলিম ৭৫৮৩নং)*

লোকেরা দাজ্জালের ভয়ে ভীত হয়ে পালিয়ে গিয়ে পর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করবে।" *(ঐ ৭৫৮০নং)*

সে ফিতনা এত ভয়ঙ্কর বলেই তার কবলে যাতে মুসলিম পতিত না হয়, তার জন্য মহানবী ﷺ প্রত্যেক নামাযের শেষাংশে দুআ করতে আদেশ করেছেন।

তিনি বলেছেন, "যখন তোমাদের কেউ (নামাযের মধ্যে) তাশাহহুদ (অর্থাৎ, আত্-তাহিয়্যাত) পড়বে, তখন সে এ চারটি জিনিস হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করবে; বলবে, 'আল্লা-হুম্মা ইন্নী আউযু বিকা মিন আযা-বি জাহান্নাম, অমিন আযা-বিল ক্বাব্র, অমিন ফিতনাতিল মাহয়্যা অলমামা-ত, অমিন শার্রি ফিতনাতিল মাসীহিদ্ দাজ্জা-ল।'

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি জাহান্নাম ও কবরের আযাব থেকে, জীবন ও মৃত্যুর ফিতনা থেকে এবং কানা দাজ্জালের ফিতনার অনিষ্ট থেকে তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা

করছি।" *(মুসলিম ১৩৫২নং)*

এ তো গেল আসল দাজ্জালের কথা। এ ছাড়া নকল দাজ্জালও আছে পৃথিবীতে। নবুঅতের মিথ্যা দাবীদার, গায়বী খবরের মিথ্যা দাবীদার, সত্যের অপলাপকারী ভন্ড আলেম, ভন্ড ইসলামী চিন্তাবিদ ও বুযুর্গ প্রভৃতির ফিতনাও কম নয়।

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর ফিতনা

পুরুষের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর ফিতনা

রূপ-গুণ-ধন দেখে অনেক তরুণী গায়ে পড়া হয়ে পুরুষকে প্রেমের জালে অতঃপর চিরতরে মনের জেলে বন্দী করতে চায়। সে ক্ষেত্রে প্রশ্রয় দিয়ে কোনক্রমেই ফিতনায় পড়া উচিত নয়। অফিসে মহিলা সহকর্মী অথবা প্রাইভেট সেক্রেটারী, চাষ বা বাড়ির কাজে মহিলা কর্মী বা পরিচারিকা, পরের বাড়ি কাজ করার সময় মালিকের বাড়ির মহিলা, টিউশনি করতে গিয়ে গায়ে-পড়া ছাত্রী, বেপর্দা একান্নবর্তী অথবা পাশাপাশি বাড়িতে বাস করতে গিয়ে উপযাচিকা মহিলার ফিতনায় পড়তে হয় পুরুষকে।

অবৈধ নারী-প্রেম থেকে অনেকে বাঁচতে পারলেও অতিরিক্ত স্ত্রী-প্রেমে অনেকে ফেঁসে যায়। তার ছত্রিশ ছলা-কলার ফলে সে হকচ্যুত হয়। যেমন মায়ের উপর তাকে প্রাধান্য দেয়, তার প্রেমজালে আবদ্ধ থেকে জিহাদ, ইল্ম-অনুসন্ধান তথা আরো অনেক ফরয কাজে পিছপা হয়। স্ত্রীর তাবেদারী করে; এমনকি হারাম কাজেও তার প্রতিবাদহীন আনুগত্য করে! তার কারণে তাকে ঈর্ষাহীন 'দাইয়ুস' হতে হয়।

অবৈধ প্রেম-ঘটিত ফিতনার কারণে পিতা ও স্বামীর মান-সম্মান চলে যায়। কত বড় বড় মানীর মানহানি হয় তার পরিবারের কোন মহিলা-ঘটিত অবৈধ গোপন প্রেম-লীলায়।

অবৈধ প্রণয়-ঘটিত কারণে ব্যভিচার হয়।

লুকোচুরি প্রণয়-ঘটিত কারণে ভ্রূণহত্যা হয়।

বিবাহ-বহির্ভূত প্রণয়-ঘটিত কারণে খুনাখুনি ও দাঙ্গা-হত্যা হয়।

অবৈধ প্রণয়-ঘটিত কারণে আত্মহত্যা হয়।

অবৈধ প্রণয়-ঘটিত কারণে থানা-পুলিশ ও কোর্ট-কাছারি হয়।

অবৈধ প্রণয়-ঘটিত কারণে কত সুখী সংসারের ফুল-বাগানে আগুন লেগে যায়।

অবৈধ প্রণয়-ঘটিত কারণে কত শিশু-সন্তানের জীবনে দুর্দিন নেমে আসে।

এই শ্রেণীর ফিতনা পুরুষের পক্ষ থেকে ঘটলেও নারীর তুলনায় তা বড় নয়। নারীর ছলনা ও চক্রান্তের ব্যাপারে যুলাইখার স্বামীর ভাষায় কুরআন বলেছে,

{إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ} (٢٨) سورة يوسف

অর্থাৎ, নিশ্চয় তোমাদের ছলনা বিরাট! (ইউসুফ ঃ ২৮)

এদের ছলনা ও চক্রান্তে ফেঁসে যাওয়ার আশঙ্কায় ইউসুফ নবী ﷵ আল্লাহর কাছে দুআ ক'রে বলেছিলেন,

{رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَإِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُن مِّنَ

الْجَاهِلِينَ } (٣٣) سورة يوسف

অর্থাৎ, হে আমার প্রতিপালক! এই মহিলারা আমাকে যার প্রতি আহবান করছে, তা অপেক্ষা কারাগার আমার কাছে অধিক প্রিয়। তুমি যদি তাদের ছলনা হতে আমাকে রক্ষা না কর, তাহলে আমি তাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত হব। *(ইউসুফ ঃ ৩৩)*

মহানবী ﷺ নারীদেরকে সম্বোধন ক'রে বলেছেন, "বুদ্ধি ও ধর্মে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিচক্ষণ ব্যক্তির উপর তোমাদের চাইতে আর কাউকে বেশি প্রভাব খাটাতে দেখিনি।" *(বুখারী-মুসলিম)*

আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَّكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ} (١٤) سورة التغابن

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে কেউ কেউ তোমাদের শত্রু, অতএব তাদের সম্পর্কে তোমরা সতর্ক থেকো। *(তাগাবুন ১৪ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(مَا تَرَكْتُ بَعْدِى فِتْنَةً هِىَ أَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ).

অর্থাৎ, আমার গত হওয়ার পরে পুরুষের পক্ষে নারীর চেয়ে অধিকতর ক্ষতিকর কোন ফিতনা অন্য কিছু ছেড়ে যাচ্ছি না। *(আহমাদ, বুখারী ৫০৯৬, মুসলিম ২৭৪০নং, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)*

তিনি আরো বলেন, "দুনিয়া হল সুমিষ্ট ও শ্যামল। নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে তাতে খলীফা বানিয়েছেন, যাতে তিনি দেখে নেন যে, তোমরা কেমন আমল কর। অতএব তোমরা দুনিয়া ও নারীর ব্যাপারে সতর্কতা অবলম্বন কর। আর জেনে রেখো যে, বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা যা ছিল, তা ছিল নারীকে কেন্দ্র ক'রে।" *(আহমাদ, মুসলিম ২৭৪২, তিরমিযী ২১৯১, ইবনে মাজাহ ৪০০০ নং)*

দ্বীনের জন্য সবচেয়ে বেশি ক্ষতিকর ফিতনা কী? এ ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেন,

(تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى بِضْعٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً، أَعْظَمُهَا فِتْنَةً عَلَى أُمَّتِي قَوْمٌ يَقِيسُونَ الأُمُورَ بِرَأْيِهِمْ، فَيُحِلُّونَ الْحَرَامَ وَيُحَرِّمُونَ الْحَلالَ).

"আমার উম্মত সত্তরাধিক (তিয়াত্তর) ফির্কায় বিভক্ত হবে। এদের মধ্যে আমার উম্মতের জন্য সবচেয়ে বড় ফিতনা (ও ক্ষতি)র কারণ হবে একটি এমন সম্প্রদায়, যারা নিজ রায় দ্বারা সকল ব্যাপারকে 'কিয়াস' (অনুমান) করবে; আর এর ফলে তারা হালালকে হারাম এবং হারামকে হালাল করবে।" *(আল-ইবানাহ, ইবনে বাত্ত্বাহ ১/৩৭৪, হাকেম ৪/৪৩০, মাজমাউয যাওয়াইদ ১/১৭৯)*

সর্বাধিক পথভ্রষ্ট কারা?

যারা সঠিক পথ হারায়, তারাই পথভ্রষ্ট। 'স্বিরাত্বে মুস্তাক্বীম' থেকে যারা যত দূরে সরে যায়, তারা তত বেশি পথভ্রষ্ট। অনেকে জেনেশুনে পথচ্যুত হয়, অনেকে না জেনে ভুল পথে যায়। যারা জেনেশুনে ভ্রান্ত পথের পথিক হয় অথবা অহংকার, হিংসা বা ঔদ্ধত্যবশতঃ

সঠিক পথ অবলম্বন করে না, তারাই সর্বাধিক পথভ্রষ্ট।

আসুন! আমরা কুরআন থেকে কিছু ভ্রষ্ট লোকেদের কথা জানি, যারা কুরআনের ভাষায় সর্বাধিক পথভ্রষ্ট।

মহান আল্লাহ বলেন,

{قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُم بِشَرٍّ مِّن ذَلِكَ مَثُوبَةً عِندَ اللّهِ مَن لَّعَنَهُ اللّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَّكَاناً وَأَضَلُّ عَن سَوَاء السَّبِيلِ} (٦٠) سورة المائدة

অর্থাৎ, বল, 'আমি কি তোমাদেরকে এ অপেক্ষা নিকৃষ্ট পরিণামের সংবাদ দেব, যা আল্লাহর নিকট আছে? যাকে আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যার উপর তিনি ক্রোধান্বিত, যাদের কতককে তিনি বানর ও কতককে শূকর বানিয়েছেন এবং যারা তাগূত (গায়রুল্লাহ)র উপাসনা করে, মর্যাদায় তারাই নিকৃষ্ট এবং সরল পথ হতে সর্বাধিক বিচ্যুত।' (মায়িদাহ ঃ ৬০)

অর্থাৎ, হে আহলে কিতাব! তোমরা আমাদের প্রতি যে বৈরীভাব পোষণ করছ, তার কারণ তো এটা ছাড়া আর কিছুই নয় যে, আমরা আল্লাহর উপর, কুরআনের উপর এবং কুরআনের পূর্বে অবতীর্ণ সমুদয় কিতাবের উপর ঈমান এনেছি। এটাও কি কোন দোষের কথা? অর্থাৎ, এটা কোন দোষ ও নিন্দার কারণ হতে পারে না; যেমনটি তোমাদের মনে হয়েছে। অবশ্য আমরা তোমাদেরকে বলে দিই, (আল্লাহর নিকট) অধিক নিকৃষ্ট ও পথভ্রষ্ট এবং ঘৃণার পাত্র ও তিরস্কারযোগ্য লোক কারা? এরা তারাই, যাদের প্রতি আল্লাহ অভিসম্পাত করেছেন, যাদের উপর তিনি রাগান্বিত হয়েছেন, আর তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যককে বানর ও শূকরে পরিণত করেছেন এবং যারা তাগূত (গায়রুল্লাহ)এর পূজা করেছে। সুতরাং এই আয়নায় তোমরা নিজেদের চেহারা দেখে নাও। আর বল যে, যাদের ইতিহাস এই, তারা কারা? তারা কি তোমরাই নও? (আহসানুল বায়ান)

মহান আল্লাহ ইয়াহুদী সম্বন্ধে বলেছেন, "রসূল না পাঠালে ওদের কৃতকর্মের জন্য ওদের কোন বিপদ হলে ওরা বলত, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদের নিকট কোন রসূল প্রেরণ করলে না কেন? করলে, আমরা তোমার আয়াতসমূহ মেনে চলতাম এবং আমরা বিশ্বাসী হতাম।' অতঃপর যখন আমার নিকট হতে ওদের নিকট সত্য আগমন করল, তখন ওরা বলতে লাগল, 'মূসাকে যেরূপ দেওয়া হয়েছিল ও (মুহাম্মাদ)কে সেরূপ দেওয়া হল না কেন?' কিন্তু পূর্বে মূসাকে যা দেওয়া হয়েছিল তা কি ওরা অস্বীকার করেনি? ওরা বলেছিল, 'উভয়ই যাদু, একটি অপরটির সমর্থক।' এবং বলেছিল, 'আমরা উভয়কে প্রত্যাখ্যান করি।' (ত্বাহা ঃ ১৩৪, ক্বাস্বাস ঃ ৪৮)

মহান আল্লাহ নবী ﷺ-কে বলেন,

{قُلْ فَأْتُوا بِكِتَابٍ مِّنْ عِندِ اللَّهِ هُوَ أَهْدَى مِنْهُمَا أَتَّبِعْهُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ (٤٩) فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءهُمْ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ} (٥٠) سورة القصص

অর্থাৎ, বল, তোমরা সত্যবাদী হলে আল্লাহর নিকট হতে এক গ্রন্থ আনয়ন কর, যা পথনির্দেশে এ দু'টি হতে উৎকৃষ্ট হবে; আমি সে গ্রন্থ অনুসরণ করব। অতঃপর ওরা যদি তোমার আহবানে সাড়া না দেয়, তাহলে জানবে ওরা তো কেবল নিজেদের খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে। আল্লাহর পথনির্দেশ অমান্য ক'রে যে ব্যক্তি নিজ খেয়াল-খুশীর অনুসরণ করে, তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে? নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়কে পথনির্দেশ করেন না। (ক্বাস্বাস্ব ঃ ৪৭-৫০)

যে ব্যক্তি নতুন গাড়ি কিনে প্রস্তুতকারকের দেওয়া 'গাইড-বুক' অনুসারে তেলের জায়গায় তেল এবং পানির জায়গায় পানি না ঢেলে নিজের খেয়াল-খুশী মতো ইঞ্জিনের যেখানে-সেখানে তেল-পানি ঢালে, তার গাড়ি কি চলতে পারে? অনুরূপ যে মানুষ সৃষ্টিকর্তার দেওয়া 'গাইড-বুক' অনুযায়ী নিজের জীবন পরিচালনা না ক'রে নিজের মন ও মেজাজ মতো পরিচালনা করে, তার জীবন কি সচল হতে পারে?

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لاَّ يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لاَّ يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لاَّ يَسْمَعُونَ بِهَا أُوْلَئِكَ كَالأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُوْلَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ} (١٧٩)

অর্থাৎ, আর আমি তো বহু জ্বিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি; তাদের হৃদয় আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা দর্শন করে না এবং তাদের কর্ণ আছে, কিন্তু তা দিয়ে তারা শ্রবণ করে না। এরা চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায়; বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত! তারাই হল উদাসীন। (আ'রাফ ঃ ১৭৯)

অন্তর, চোখ, কান---এগুলি মহান আল্লাহ এই জন্য দান করেছেন, যাতে মানুষ তার দ্বারা উপকৃত হয়ে নিজ প্রভুকে চিনতে পারে, তার নিদর্শনসমূহ লক্ষ্য করে এবং সত্যের বাণী মন দিয়ে শোনে। কিন্তু যে ব্যক্তি ঐ সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা উপকার নেয় না, যেন উপকার না নেওয়ার কারণে সে পশুর মত; বরং তার থেকেও অধম। কারণ পশুরা নিজের লাভ-নোকসান কিছুটা বুঝে। উপকারী জিনিস দ্বারা উপকার নেয় এবং ক্ষতিকারক জিনিস হতে দূরে থাকে। কিন্তু আল্লাহর হিদায়াত হতে বিমুখতা প্রকাশকারী ব্যক্তির মধ্যে এই পার্থক্য করার শক্তিই শেষ হয়ে যায় যে, কোনটি তার জন্য লাভদায়ক, আর কোনটি ক্ষতিকারক। আর সেই কারণেই পরবর্তী বাক্যে তাদেরকে 'গাফিল' বা 'উদাসীন' বলা হয়েছে। (আহসানুল বায়ান)

যারা নিজেদের খেয়াল-খুশি অনুসারে চলে, তারাও সর্বাধিক পথভ্রষ্ট। মাতাল যেমন অপরকে 'মাতাল' বলে, তেমনি তারা আবার সঠিক পথের পথিকদেরকে 'পথভ্রষ্ট' মনে করে!

মহান আল্লাহ এই শ্রেণীর কাফেরদের সম্বন্ধে বলেছেন, "ওরা যখন তোমাকে দেখে, তখন ওরা তোমাকে কেবল উপহাসের পাত্ররূপে গণ্য করে এবং বলে, 'এই কি সেই; যাকে আল্লাহ রসূল করে পাঠিয়েছেন? সে তো আমাদের দেবতাগণ থেকে আমাদেরকে দূরে সরিয়েই দিত; যদি না আমরা তাদের আনুগত্যে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত থাকতাম।'

{وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا} (٤٢) سورة الفرقان

যখন ওরা শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে, তখন ওরা জানবে কে সর্বাধিক পথভ্রষ্ট।

তুমি কি দেখ না তাকে, যে তার কামনা-বাসনাকে উপাস্যরূপে গ্রহণ করে? তবুও কি তুমি তার কর্মবিধায়ক হবে।

{أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا} (٤٤)

তুমি কি মনে কর যে, ওদের অধিকাংশ শোনে ও বুঝে? ওরা তো পশুরই মতো; বরং ওরা আরও বেশি পথভ্রষ্ট। (ফুরক্বান ঃ ৪১-৪৪)

যে দুনিয়াতে সত্য দেখা হতে, বুঝা হতে এবং কবুল করা হতে নিজেকে বঞ্চিত রাখে, সেও সর্বাধিক বেশি পথভ্রষ্ট। সে আখেরাতে অন্ধ হবে এবং প্রতিপালকের বিশেষ অনুগ্রহ ও দয়া থেকে বঞ্চিত থাকবে। তিনি বলেছেন,

{وَمَن كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً} (٧٢) سورة الإسراء

অর্থাৎ, যে লোক ইহলোকে অন্ধ, সে লোক পরলোকেও অন্ধ এবং অধিকতর পথভ্রষ্ট। (বানী ইস্রাঈল ঃ ৭২)

যারা কুরআনকে বিশ্বাস করে না, পরন্তু তার বিরুদ্ধে নানা আপত্তিমূলক প্রশ্ন উত্থাপন করে, তারাও সর্বাধিক পথভ্রষ্ট। অবশ্যই। যারা রোড-ম্যাপকে অগ্রাহ্য করে, তারা ভীষণভাবে সঠিক রোড-হারা হয়। যে পর্যটকরা অজানা-অচেনা জায়গায় গাইড-বুককে অমান্য করবে, তারা তো অচিরেই ভ্রষ্টতার অকূল পাথারে গিয়ে ঠাঁই লাভ করবেই।

মহান আল্লাহ বলেছেন, "অবিশ্বাসীরা বলে, 'সমগ্র কুরআন তার নিকট একেবারে অবতীর্ণ করা হল না কেন?' এ আমি তোমার নিকট এভাবেই (কিছু কিছু ক'রে) অবতীর্ণ করেছি এবং ক্রমে ক্রমে স্পষ্টভাবে আবৃত্তি করেছি তোমার হৃদয়কে শক্ত ও দৃঢ় করার জন্য। ওরা তোমার নিকট কোন সমস্যা উপস্থিত করলেই আমি তোমাকে ওর সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা দান করি।" (ফুরক্বান ঃ ৩২-৩৩)

অর্থাৎ, আমি অবস্থা অনুসারে ও প্রয়োজন মত এই কুরআন দীর্ঘ ২৩ বছরে কিছু কিছু ক'রে অবতীর্ণ করেছি। যাতে হে নবী! তোমার ও ঈমানদারদের অন্তর সুদৃঢ় হয় এবং যাতে তাদের সুন্দরভাবে মুখস্থ হয়ে যায়। যেমন অন্যত্র বলা হয়েছে,

{وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً}

অর্থাৎ, আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি খন্ড-খন্ডভাবে, যাতে তুমি তা মানুষের কাছে পাঠ করতে পার ক্রমে ক্রমে এবং আমি তা যথাযথভাবে অবতীর্ণ করেছি। *(বানী ঈস্রাইল ঃ ১০৬)*

বস্তুতঃ এই কুরআন বৃষ্টির পানির মত। বৃষ্টি হলে মৃত পৃথিবী তার জীবন ফিরে পায়। আর এই উপকার তখনই সাধিত হয়, যখন প্রয়োজন ও পরিমাণ মত বৃষ্টি হয়। বছরের সমস্ত পানি একবারে বর্ষণ হলে এ উপকার সম্ভব নয়।

অথবা কুরআন হল ডাক্তারের দেওয়া ওষুধের মতো। যা এক সাথে নয়, বরং ক্রমে-ক্রমে সেবন করতে হয়। কিন্তু যেমন তাওরাত, ইঞ্জীল, যাবূর একেবারে অবতীর্ণ হয়েছিল, তেমনি তারা কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার কথা ভেবেছিল। অথচ তা ছিল নিছক একটা আপত্তিমূলক অভিযোগ।

কুরআন সম্বন্ধে ভ্রষ্ট কাফেরদের উক্ত আপত্তিমূলক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পর মহান আল্লাহ তাদের শাস্তিমূলক অবস্থার কথা বলেছেন,

{الَّذِينَ يُحْشَرُونَ عَلَى وُجُوهِهِمْ إِلَى جَهَنَّمَ أُوْلَئِكَ شَرٌّ مَّكَانًا وَأَضَلُّ سَبِيلًا} (٣٤) الفرقان

অর্থাৎ, যাদেরকে মুখে ভর দিয়ে চলা অবস্থায় একত্রিত করা হবে ও জাহান্নামের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে, ওদেরই স্থান হবে অতি নিকৃষ্ট এবং ওরাই সবচেয়ে বেশি পথভ্রষ্ট। *(ফুরক্বান ঃ ৩৪)*

অবিশ্বাসীরা কুরআনকে আল্লাহর বাণী বলে স্বীকার তো করে না, পরন্তু তার বিরুদ্ধাচরণ করে। সুতরাং তারাই যে সবচেয়ে বেশি পথভ্রষ্ট, তাতে সন্দেহ কী? মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ ثُمَّ كَفَرْتُم بِهِ مَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ هُوَ فِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ} (٥٢)

অর্থাৎ, বল, 'তোমরা ভেবে দেখেছ কি, যদি এ (কুরআন) আল্লাহর নিকট হতে (অবতীর্ণ) হয়ে থাকে এবং তোমরা তা প্রত্যাখ্যান কর, তবে যে ব্যক্তি ঘোর বিরুদ্ধাচরণে লিপ্ত আছে তার অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত আর কে?'

আমি ওদের জন্য আমার নিদর্শনাবলী বিশ্বজগতে ব্যক্ত করব এবং ওদের নিজেদের মধ্যেও; ফলে ওদের নিকট স্পষ্ট হয়ে উঠবে যে, এ (কুরআন) সত্য। এ কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রতিপালক সর্ববিষয়ের প্রত্যক্ষদর্শী? *(হা-মীম সাজদাহ ঃ ৫২-৫৩)*

আর এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা সর্বাধিক পথভ্রষ্ট। তারা হল গায়রুল্লাহর পূজারী। তারা বিপদে-আপদে এমন কিছুকে আহবান করে, যারা কস্মিনকালেও সাড়া দেবে না, দিতে পারে না। কেবল ধারণার বশবর্তী হয়ে তাদেরকে 'রক্ষাকর্তা বা ত্রাণকর্তা' বলে মান্য করে। তারা মনে করে 'রনে-বনে, জলে-জঙ্গলে' সর্বত্র তারা তাদেরকে বিপদে সাহায্য করে। অথচ এমন ধারণা শুধুই ভ্রষ্টতা নয়, বরং ভ্রষ্টতার একশেষ।

মহান আল্লাহ বলেছেন, "বল, 'তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাকো, তাদের কথা ভেবে দেখছ কি? তারা পৃথিবীতে কী সৃষ্টি করেছে আমাকে দেখাও অথবা আকাশমন্ডলীতে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে কি? এর পূর্ববর্তী কোন কিতাবে অথবা পরম্পরাগত জ্ঞান থাকলে, তা তোমরা আমার নিকট উপস্থিত কর; যদি তোমরা সত্যবাদী হও।'

{وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَومِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ} (٥) سورة الأحقاف

অর্থাৎ, সে ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক বিভ্রান্ত কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে, যা কিয়ামত দিবস পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দেবে না? আর তারা তাদের ডাক সম্বন্ধে অবহিতও নয়। যখন কিয়ামতের দিন মানুষকে একত্রিত করা হবে, তখন তারা তাদের শত্রু হয়ে দাঁড়াবে এবং তাদের উপাসনাকে অস্বীকার করবে। (আহক্বাফ ঃ ৪-৬)

মহান আল্লাহ আরো বলেছেন,

{إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلاَلاً بَعِيدًا } (١١٦) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা ক'রে দেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শির্ক) করে, সে ভীষণভাবে পথভ্রষ্ট হয়। (নিসা ঃ ১১৬)

বিভ্রান্ত ও ভ্রষ্ট মানুষরা কি সত্যই জ্ঞানী মানুষ? অবশ্যই নয়। যারা সর্বাধিক পথভ্রষ্ট, তারা বিজ্ঞানী হলেও জ্ঞানী কোনমতেই নয়।

সবচেয়ে বড় যালেম কে?

পৃথিবীর বুকে মনুষ্য সমাজে যুলুম, অন্যায় ও অত্যাচার বহু প্রকার আছে। যাকে সাধারণতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ-

১। স্রষ্টা ও প্রতিপালকের অধিকারে অন্যায়াচরণ ও যুলুম। আর তা হয়, তাঁর আসনে অন্য কাউকে আসীন ক'রে। তাঁর সাথে কোন প্রকার কোন কিছুকে শরীক ক'রে।

২। মানুষের অধিকারে অন্যায়াচরণ ও যুলুম। আর তা হয়, অপরের অধিকার হরণ ক'রে অপরের প্রতি অত্যাচার ক'রে ইত্যাদি।

৩। নিজের প্রতি অন্যায়াচরণ ও যুলুম। আর তা হয়, কোন পাপ বা অপরাধ ক'রে, যার ফলে তাকে শাস্তি ভোগ করতে হয়।

যারা বড়র হক্কে অন্যায় করে, তাদের আচরণ বড় অন্যায়। এই জন্য লুক্বমান হাকীম তাঁর ছেলেকে উপদেশ দিয়ে বলেছিলেন,

{يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (١٣) لقمان

অর্থাৎ, 'হে বৎস! আল্লাহর সঙ্গে শির্ক করো না। নিশ্চয় শির্ক বড় অন্যায়।' *(লুক্বমান ঃ ১৩)*

কিন্তু সবচেয়ে বড় যালেম কারা? আমরা তাই দেখব কুরআনী আয়াত ও হাদীসের আলোকে।

১। যারা মসজিদে আসতে মানুষকে বাধা দেয় অথবা মসজিদের ধ্বংস কামনা করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَن يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُوْلَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَن يَدْخُلُوهَا إِلاَّ خَآئِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ} (١١٤) البقرة

অর্থাৎ, যে আল্লাহর মসজিদসমূহে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় ও তার ধ্বংস-সাধনে প্রয়াসী হয়, তার থেকে বড় সীমালংঘনকারী (যালেম) আর কে হতে পারে? অথচ ভীত-সন্ত্রস্ত অবস্থায় ছাড়া তাদের জন্য মসজিদে প্রবেশ করা সঙ্গত (বৈধ) নয়। তাদের জন্য ইহকালে লাঞ্ছনা ভোগ ও পরকালে মহা শাস্তি রয়েছে। (বাক্বারাহ ঃ ১১৪)

২। যারা সত্য সাক্ষ্য গোপন করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن كَتَمَ شَهَادَةً عِندَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ} (١٤٠) سورة البقرة

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত সাক্ষ্য-প্রমাণ যে গোপন করে, তার অপেক্ষা অধিকতর সীমালংঘনকারী (যালেম) আর কে হতে পারে? আর তোমরা যা কর, সে সম্বন্ধে

আল্লাহ বেখবর নন। (বাক্বারাহ ঃ ১৪০)

৩। যারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যারোপ করে এবং তাঁর আয়াতকে মিথ্যাজ্ঞান করে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لاَ يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ } (٢١) الأنعام

অর্থাৎ, আর যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর আয়াতসমূহকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তার থেকে অধিক যালেম (অত্যাচারী) আর কে? যালেমরা অবশ্যই সফলকাম হবে না। (আন্আম ঃ ২১)

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أُوْلَئِكَ يُعْرَضُونَ عَلَى رَبِّهِمْ وَيَقُولُ الأَشْهَادُ هَؤُلاء الَّذِينَ كَذَبُواْ عَلَى رَبِّهِمْ أَلاَ لَعْنَةُ اللّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ} (١٨) سورة هود

অর্থাৎ, আর ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী কে হবে, যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে? ঐ লোকদেরকে তাদের প্রতিপালকের সামনে পেশ করা হবে এবং সাক্ষী (ফিরিশ্তা)গণ বলবে, 'এরা ঐ লোক যারা নিজেদের প্রতিপালক সম্বন্ধে মিথ্যা বলেছিল। জেনে রেখো, এমন অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ।' (হূদ ঃ ১৮)

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءهُ أَلَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوًى لِّلْكَافِرِينَ} (٦٨) سورة العنكبوت

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে অথবা তাঁর নিকট হতে আগত সত্যকে মিথ্যাজ্ঞান করে, তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? অবিশ্বাসীদের আশ্রয়স্থল কি জাহান্নামে নয়? (আনকাবূত ঃ ৬৮)

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ } (٧) سورة الصف

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি ইসলামের দিকে তাকে আহবান করা সত্ত্বেও আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে, তার অপেক্ষা অধিক যালেম আর কে? আল্লাহ যালেম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না। (স্বাফ্ ঃ ৭)

৪। যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা বলে এবং দাবী করে যে, তাদের নিকট 'অহী' হয়! অথবা আল্লাহ তাদের সঙ্গে কথা বলেন! মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوْحِيَ إِلَيَّ وَلَمْ يُوحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَن قَالَ سَأُنزِلُ مِثْلَ مَا أَنَزلَ اللّهُ وَلَوْ تَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلآئِكَةُ بَاسِطُواْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُواْ أَنفُسَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُنتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ} (٩٣) سورة الأنعام

অর্থাৎ, আর যে আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা বলে, 'আমার নিকট প্রত্যাদেশ (অহী) হয়', যদিও তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় না এবং যে বলে, 'আল্লাহ যা অবতীর্ণ

করেছেন, আমিও ওর অনুরূপ অবতীর্ণ করব', তার চেয়ে বড় যালেম আর কে? যদি তুমি দেখতে পেতে (তখনকার অবস্থা), যখন (ঐ) যালেমরা মৃত্যু যন্ত্রণায় থাকবে, আর ফিরিশ্তাগণ হাত বাড়িয়ে বলবে, 'তোমাদের প্রাণ বের কর। আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি প্রদান করা হবে; কারণ তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তাঁর আয়াত গ্রহণে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে।' (আন্আম ঃ ৯৩)

৫। যারা কুরআন দ্বারা উপদেশপ্রাপ্ত হয়েও মুখ ফিরিয়ে নেয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا وَإِن تَدْعُهُمْ إِلَى الْهُدَى فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا} (٥٧) الكهف

অর্থাৎ, কোন ব্যক্তিকে তার প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী স্মরণ করিয়ে দেয়ার পর সে যদি তা হতে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার কৃতকর্মসমূহ ভুলে যায়, তবে তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি; যেন তারা কুরআন বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে বধিরতা সৃষ্টি করেছি। তুমি তাদেরকে সৎপথে আহবান করলেও তারা কখনো সৎপথ পাবে না। (কাহফ ঃ ৫৭)

{وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ} (٢٢) السجدة

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি তার প্রতিপালকের আয়াতসমূহ দ্বারা উপদেশ প্রাপ্ত হয়, অতঃপর তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, তার অপেক্ষা অধিক সীমালংঘনকারী আর কে? আমি অবশ্যই অপরাধীদের নিকট থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করব। (সাজদাহ ঃ ২২)

৬। যারা ছবি বা মূর্তি নির্মাণ করে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((قَالَ اللّهُ تَعَالَى : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي ؟ فَلْيَخْلُقُوا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوا حَبَّةً ، أَوْ لِيَخْلُقُوا شَعِيرَةً)). متفق عليه

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা বলেন, "তার চাইতে বড় যালেম কে আছে, যে আমার সৃষ্টির অনুরূপ সৃষ্টি তৈরী করতে চায়? সুতরাং তারা একটি ধূলিকণা বা পিঁপড়ে সৃষ্টি করুক অথবা একটি শস্যদানা সৃষ্টি করুক অথবা একটি যবদানা সৃষ্টি করুক।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

সর্বপ্রকার যালেমগণ নিজ নিজ শাস্তি অবশ্যই ভোগ করবে, আজ অথবা কাল। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلاَ تَحْسَبَنَّ اللّهَ غَافِلاً عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأَبْصَارُ} (٤٢)

তুমি কখনো মনে করো না যে, সীমালংঘনকারী (যালেম)রা যা করে, সে বিষয়ে আল্লাহ উদাসীন। আসলে তিনি সেদিন পর্যন্ত তাদেরকে অবকাশ দেন যেদিন সকল চক্ষু স্থির হয়ে যাবে। (ইব্রাহীম ঃ ৪২)

সবচেয়ে বেশি স্বৈরাচারী মানুষ

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ أَعْتَى النَّاسِ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ مَنْ قَتَلَ فِي حَرَمِ اللَّهِ أَوْ قَتَلَ غَيْرَ قَاتِلِهِ أَوْ قَتَلَ بِذُحُولِ الْجَاهِلِيَّةِ).

অর্থাৎ, আল্লাহ আয্‌যা অজাল্লার সবচেয়ে বেশি অবাধ্য মানুষ সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর হারাম-সীমানার ভিতরে খুন করেছে অথবা যে তার খুনী নয়, তাকে খুন করেছে অথবা জাহেলী যুগের খুনের বদলা নিতে খুন করেছে। *(আহমাদ ৬৭৫৭, আঃ রায্‌যাক ৯১৮৮নং)*

যেহেতু এর প্রত্যেকটিই শরীয়তে পৃথক পৃথক ভীষণ পাপাচরণ। একে তো খুন, তার উপর এমন জায়গায় খুন, যা হারাম, নিষিদ্ধ বা পবিত্র জায়গা এবং এমন লোককে খুন, যে আসলে খুনী নয়।

হারামে যুদ্ধ-বিগ্রহ বৈধ নয়। তবে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের কথা ব্যতিক্রম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُم مِّنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلاَ تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاء الْكَافِرِينَ}

অর্থাৎ, আর যেখানে পাও, তাদেরকে হত্যা কর এবং যেখান থেকে তোমাদেরকে বহিষ্কার করেছে, তোমরাও সেখান থেকে তাদেরকে বহিষ্কার কর। ফিতনা (অশান্তি, শির্ক বা ধর্মদ্রোহিতা) হত্যা অপেক্ষাও গুরুতর। আর মাসজিদুল হারামের (কা'বা শরীফের) নিকট তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করো না; যতক্ষণ না তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা কর। এটাই তো অবিশ্বাসীদের প্রতিফল। (বাক্বারাহ ঃ ১৯১)

হারাম সীমানায় রক্তপাত ঘটানো তো দূরের কথা, সেখানে কোন পাপাচারের ইচ্ছাই করা যাবে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاء الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ وَمَن يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ} (٢٥) سورة الحج

অর্থাৎ, যারা অবিশ্বাস করে এবং মানুষকে নিবৃত্ত করে আল্লাহর পথ হতে ও 'মাসজিদুল হারাম' হতে; যাকে আমি করেছি স্থানীয় ও বহিরাগত সবারই জন্য সমান। আর যে ওতে সীমালংঘন ক'রে পাপকার্যের ইচ্ছা করে, তাকে আমি আস্বাদন করাবো মর্মন্তুদ শাস্তি। (হাজ্জ ঃ ২৫)

মহানবী ﷺ বিদায়ী হজ্জের ভাষণে বলেছেন, "নিশ্চয় যামানা (কাল) নিজের ঐ অবস্থায় ফিরে এল যেদিন আল্লাহ তাআলা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন। (অর্থাৎ, দুনিয়া সৃষ্টি করার সময় যেরূপ বছর ও মাসগুলো ছিল, এখন পুনর্বার সে পুরাতন অবস্থায় ফিরে

এল এবং আরবের মুশরিকরা যে নিজেদের মন মতো মাসগুলোকে আগে-পিছে করেছিল, তা এখন থেকে শেষ ক'রে দেওয়া হল।) বছরে বারটি মাস; তার মধ্যে চারটি হারাম (সম্মানীয়) মাস। তিনটি পরস্পর ঃ যুল ক্বা'দাহ, যুলহিজ্জাহ ও মুহার্রাম। আর (চতুর্থ হল) মুযার গোত্রের রজব; যা জুমাদা ও শা'বান এর মধ্যে রয়েছে। এটা কোন্ মাস?" আমরা বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক জ্ঞাত।' অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়তো তার নাম ব্যতীত অন্য নাম বলবেন। তিনি বললেন, "এটা যুল-হিজ্জাহ নয় কি?" আমরা বললাম, 'অবশ্যই।' অতঃপর তিনি বললেন, "এটা কোন্ শহর?" আমরা বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক জ্ঞাত।' অতঃপর তিনি কিছুক্ষণ নীরব থাকলেন। এমনকি আমরা ধারণা করলাম যে, তিনি হয়তো তার নাম ব্যতীত অন্য নাম বলবেন। তিনি বললেন, "এ শহর (মক্কা) নয় কি?" আমরা বললাম, 'অবশ্যই।' তিনি বললেন, "আজ কোন্ দিন?" আমরা বললাম, 'আল্লাহ ও তাঁর রসূল সর্বাধিক জ্ঞাত।' অতঃপর তিনি চুপ থাকলেন। আমরা ভাবলাম, তিনি হয়তো এর অন্য নাম বলবেন। অতঃপর তিনি বললেন, "এটা কি কুরবানীর দিন নয়?" আমরা বললাম, 'অবশ্যই।' অতঃপর তিনি বললেন, "নিশ্চয় তোমাদের রক্ত, তোমাদের মাল এবং তোমাদের সম্ভ্রম তোমাদের (আপসের মধ্যে) এ রকমই হারাম (ও সম্মানীয়) যেমন তোমাদের এ দিনের সম্মান তোমাদের এ শহরে এবং তোমাদের এ মাসে রয়েছে। শীঘ্রই তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের সাথে মিলিত হবে। অতঃপর তিনি তোমাদেরকে তোমাদের আমল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করবেন। সুতরাং তোমরা আমার পর এমন কাফের হয়ে যেও না যে, তোমরা এক অপরের গর্দান মারবে। শোনো! উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিতকে (এ সব কথা) পৌঁছে দেয়। কারণ, যাকে পৌঁছাবে সে শ্রোতার চেয়ে অধিক স্মৃতিধর হতে পারে।" অবশেষে তিনি বললেন, "সতর্ক হয়ে যাও! আমি কি পৌঁছে দিলাম?" আমরা বললাম, 'হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

খুনের বদলে খুন ইসলামের বিধান। তাতে আছে মানুষের জীবন। তবে সে বদলা বা প্রতিশোধ নেবে প্রশাসন। কিন্তু অনেক মানুষ সে বদলা নিজের হাতে নিতে চায় এবং অনেক সময় তার বাপ বা ভাইয়ের খুনীকে না পেয়ে তার কোন আত্মীয়কে খুন করে। এ কাজ চরম অন্যায় ও স্বৈরাচারিতা।

অনুরূপ জাহেলী যুগে বহু অনর্থক খুনাখুনি হয়েছে। ইসলাম আসার পর সে খুনাখুনি বন্ধ করা হয়েছে। মহানবী ﷺ উক্ত বিদায়ী হজ্জের ভাষণের একাংশে বলেছিলেন,

(أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ تَحْتَ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ مَوْضُوعَةٌ).

অর্থাৎ, জাহেলী যুগের প্রত্যেকটি বিষয় আমার পদতলে পিষ্ট করলাম এবং জাহেলী যুগের সমস্ত খুনও (আমার পদতলে পিষ্ট করলাম)। (মুসলিম ৩০০৯নং)

তা সত্ত্বেও যদি কেউ জাহেলী যুগের প্রতিশোধ নিতে কাউকে খুন করে, তাহলে তার সে কাজও বড় স্বৈরাচারিতা।

সবচেয়ে বড় আবেদ

সবচেয়ে বড় আবেদ কে? কীভাবে সবচেয়ে বড় আবেদ হওয়া যায়?

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(كُنْ وَرِعاً تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ).

অর্থাৎ, তুমি সংযমী হও, তাহলে সবচেয়ে বড় আবেদ লোক হবে। (ইবনে মাজাহ ৪২১৭, সঃ জামে' ৪৫৮০নং)

অন্য এক বর্ণনায় বলেছেন,

(اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ).

অর্থাৎ, নিষিদ্ধ ও হারাম জিনিস থেকে বেঁচে থাক, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় আ'বেদ (ইবাদতকারী) গণ্য হবে। (আহমাদ, তিরমিযী ২৩০৫, সঃ জামে ১০০নং)

সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ মানুষ

যে মানুষ অল্পে তুষ্ট, যে মানুষ যা পেয়েছে, তাই নিয়ে সন্তুষ্ট, সেই মানুষই সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(وَكُنْ قَنِعاً تَكُنْ أَشْكَرَ النَّاسِ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِناً ، وَأَحْسِنْ مُجَاوَرَةَ مَنْ جَاوَرَكَ تَكُنْ مُسْلِماً ، وَأَقِلَّ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ).

অর্থাৎ, তুমি অল্পে তুষ্ট হও, তাহলে সবচেয়ে বড় কৃতজ্ঞ লোক হবে। মানুষের জন্য তাই পছন্দ কর, যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মু'মিন গণ্য হবে। প্রতিবেশীর সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মুসলিম বিবেচিত হবে। আর হাসি কম কর, কারণ অধিক হাসি অন্তরকে মেরে দেয়। (ইবনে মাজাহ ৪২১৭, সঃ জামে' ৪৫৮০নং)

যে ব্যক্তি মানুষের শুকরিয়া আদায় করে, সে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতিও কৃতজ্ঞ। নিয়ামত আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। কিন্তু তাতে কোন মানুষ কারণ বা মাধ্যম হলে সেও কৃতজ্ঞতা পাওয়ার অধিকারী হয়। সুতরাং মানুষের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করলে তবেই আল্লাহর কৃতজ্ঞতা স্বীকার হয় এবং যে যত বেশি মানুষের প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, সে তত বেশি আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ বিবেচিত হয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَشْكَرُ النَّاسِ للهِ أَشْكَرُهُمْ لِلنَّاسِ).

অর্থাৎ, আল্লাহর প্রতি সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ লোক সেই ব্যক্তি, যে মানুষের প্রতি সবচেয়ে বেশি কৃতজ্ঞ লোক। (সঃ জামে' ১০০৮নং)

উক্ত হাদীসটি আসলে দুর্বল। তবে কাছাকাছি অর্থের সহীহ হাদীসে আছে,

(لاَ يَشْكُرُ اللهَ مَنْ لاَ يَشْكُرُ النَّاسَ).

অর্থাৎ, সে আল্লাহর শুক্র আদায় করে না, যে ব্যক্তি (উপকারী) মানুষের শুক্র আদায় করে না। *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৯৭৩নং)*

উপকারী বা দাতা মানুষের শুকরিয়া বা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন হবে পাঁচটি কাজ করলে।

(১) দাতার দান ও অবদানের কথা মনের গভীরে স্বীকার করতে হবে। সেটা নিজের প্রাপ্য অধিকার মনে করলে হবে না। অথবা সে নিজের পকেট থেকে দিচ্ছে না অথবা সে সেটা ফেলে দিত, তাই দিয়েছে অথবা কোন স্বার্থ বা মতলব আছে, তাই দিয়েছে ইত্যাদি মনে করা যাবে না।

(২) সে কথা প্রকাশ ও প্রচারের মাধ্যমে দাতার প্রশংসা করতে হবে। আত্মীয়-স্বজনদের কাছে তার নাম করতে হবে। তবে গর্ব করা হবে না এবং মিথ্যা প্রশংসা করাও যাবে না।

(৩) দাতার প্রতি বিনয়ী হতে হবে। যেহেতু প্রত্যেক গ্রহীতা দাতার দাসে পরিণত হয়। মানুষ যার খাবে, তাকে তো আর দাঁত দেখাতে পারে না।

(৪) দাতার প্রতি মহব্বত বাড়বে। প্রত্যেক দান প্রতিদান চায়। আর প্রতিদান হল, তার প্রতি গ্রহীতার বর্ধমান প্রেম।

(৫) দাতার আনুগত্য ও সন্তুষ্টির পথে তার দেওয়া জিনিস ব্যয় করতে হবে। যেমন, টেপ দিলে কুরআন শুনতে হবে এবং গান-বাজনা শোনা চলবে না। টাকা দিলে ভালো পথে ব্যয় করতে হবে, খারাপ পথে নয়।

এমনটি না করলে কৃতজ্ঞতা হয় না, কৃতঘ্নতা হয়। নিমকহালালি হয় না, নিমকহারামি হয়।

দাতার নিকট থেকে দান পেয়ে বিনিময়ে অনুরূপ কিছু প্রতিদান দেওয়া কর্তব্য। মহানবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তিকে কোন উপহার দান করা হয়, সে ব্যক্তির উচিত, দেওয়ার মত কিছু পেলে তা দিয়ে তার প্রতিদান (প্রত্যুপহার) দেওয়া। দেওয়ার মত কিছু না পেলে দাতার প্রশংসা করা উচিত। কারণ, যে ব্যক্তি (দাতার) প্রশংসা করে, সে তার কৃতজ্ঞতা (বা শুকরিয়া) আদায় ক'রে দেয়, আর যে ব্যক্তি (উপহার) গোপন করে (প্রতিদান দেয় না বা শুক্র আদায় করে না), সে কৃতঘ্নতা (বা নাশুক্রী) করে। আর যে ব্যক্তি এমন কিছু প্রকাশ করে, যা তাকে দেওয়া হয়নি, সে ব্যক্তি দু'টি মিথ্যা লেবাস পরিধানকারীর মতো।" *(তিরমিযী, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৯৫৪নং)*

একজন স্বামী তার স্ত্রীকে ভালোবাসে। ভালোবাসার বিনিময়ে তাকে ভালোবাসা দেওয়া উচিত। স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করা স্বামীর জন্য ওয়াজেব। আর ওয়াজেব বলে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করা উচিত নয়। উচিত নয় এই মনে রাখা যে, তার অধিকার ও পাওনা আছে বলেই স্বামী তাকে দিচ্ছে। উচিত নয়, দানে সামান্য ত্রুটি হলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আল্লাহ তাবারাকা অতাআলা সেই মহিলার প্রতি চেয়েও দেখবেন না, যে তার স্বামীর কৃতজ্ঞতা আদায় করে না; অথচ সে তার মুখাপেক্ষিণী।" *(নাসাঈ, ত্বাবারানী, বাযযার, হাকেম ২/১৯০, বাইহাকী ৭/২৯৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৯নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হল মহিলা।"

সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, তা কী জন্য হে আল্লাহর রসূল? বললেন, "তাদের কুফরীর জন্য।" তাঁরা বললেন, আল্লাহর সাথে কুফরী? তিনি বললেন, "(না, তারা স্বামীর কুফরী (অকৃতজ্ঞতা) ও নিমকহারামি করে। তাদের কারো প্রতি যদি তুমি সারা জীবন এহসানী কর, অতঃপর সে যদি তোমার নিকট সামান্য ত্রুটি লক্ষ্য করে, তাহলে ব'লে বসে, 'তোমার নিকট কোন মঙ্গল দেখলাম না আমি!" *(বুখারী, মুসলিম)*

পক্ষান্তরে স্বামী-সুখ পেয়ে যদি কোন স্ত্রী স্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞ না হয়ে কেবল আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞ হয়, অনুরূপ কোন দাতা বা উপকারীর উপকার পেয়ে যদি কোন গ্রহীতা তার কৃতজ্ঞতা স্বীকার না ক'রে কেবল আল্লাহরই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাহলে আসলে কিন্তু আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় হয় না। আল্লাহর নিয়ামত যার মাধ্যমে পাওয়া গেছে, তার শুকরিয়া আদায় ক'রে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলে তবেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় হয়।

সন্তান যদি সুখের জন্য পিতামাতার প্রতি অকৃতজ্ঞ হয়, তাহলে সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করলেও তা অপ্রকাশ থেকে যায়। এই জন্য মহান আল্লাহ বলেছেন

{وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ} (١٤) سورة لقمان

অর্থাৎ, আমি তো মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচরণের নির্দেশ দিয়েছি। জননী কষ্টের পর কষ্ট বরণ ক'রে সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে এবং তার স্তন্যপান ছাড়াতে দু বছর অতিবাহিত হয়। সুতরাং তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতা-মাতার প্রতি কৃতজ্ঞ হও। আমারই নিকট (সকলের) প্রত্যাবর্তন। (লুক্বমানঃ ১৪)

সাধারণতঃ কারো মেয়ের বিয়ে লাগিয়ে দিয়ে যদি সে সুখিনী হয়, তাহলে তার বাড়ির লোকে বলে 'আল্লাহ সুখ দিয়েছে।' আর দুঃখিনী হলে বলে, 'অমুক আমার মেয়েকে পানিতে ফেলে দেওয়া করালো!'

কাউকে বিদেশে আনলে অতঃপর তার কাজ ও বেতন ভাল হলে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা করে। তখন যে আনে, তাকে ভুলে যায়। আর ভাল না হলে বলে, 'না দেখে, না শুনে অমুক আমাকে ফাঁসিয়ে দিল!' এমন চরিত্রের লোকেরা যে আসলে অকৃতজ্ঞ, তা বলাই বাহুল্য।

সবচেয়ে বড় ধনী

এমনিতে মানুষের প্রকৃতি হল, দশ হলে বিশ, নব্বই হলে একশ' কখন হবে, কীভাবে হবে?

রসূল ﷺ বলেছেন, "আদম সন্তানের মালিকানায় যদি সোনার একটি উপত্যকাও হয়; তবুও সে অনুরূপ আরো একটির মালিক হওয়ার অভিলাষী থাকবে। পরন্তু একমাত্র মাটিই আদম সন্তানের চোখ (পেট) পূর্ণ করতে পারে। অবশ্য যে ব্যক্তি তওবা করবে, আল্লাহ তার তওবা গ্রহণ করবেন।" *(বুখারী ৬৪৩৭, মুসলিম ১০৪৯নং)*

কত পরিমাণ ধন হলে ধনী হওয়া যায়, তার কোন সীমাবদ্ধতা নেই। সুতরাং অল্প পরিমাণ ধন নিয়েও ধনী হওয়া যায়। যেহেতু ধনী হওয়ার ব্যাপারটা মনের ব্যাপার।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلَا تُكْثِرْ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ)

অর্থাৎ, নিষিদ্ধ ও হারাম জিনিস থেকে বেঁচে থাক, তাহলে তুমি মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় আ'বেদ (ইবাদতকারী) গণ্য হবে। আল্লাহ যা তোমাকে দিয়েছেন, তাতেই পরিতুষ্ট থাক, তবে তুমিই মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বড় ধনী হবে। প্রতিবেশীর প্রতি অনুগ্রহ কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মু'মিন বিবেচিত হবে। মানুষের জন্যও তা-ই পছন্দ কর, যা তুমি নিজের জন্য পছন্দ কর, তাহলে তুমি একজন (খাঁটি) মুসলিম গণ্য হবে। আর খুব বেশী হাসবে না, কারণ, অধিক হাসি অন্তরকে মেরে দেয়। *(আহমাদ, তিরমিযী ২৩০৫, সঃ জামে ১০০নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً ، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ)). رواه مسلم

"সে ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে পরিমিত রুযী দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে তাকে তুষ্ট করেছেন।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন,

((طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ لِلإِسْلاَمِ ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافاً وَقَنِعَ)). رواه الترمذي

"তার জন্য শুভ সংবাদ যাকে ইসলামের পথ দেখানো হয়েছে, পরিমিত জীবিকা দেওয়া হয়েছে এবং সে (যা পেয়েছে তাতে) পরিতুষ্ট আছে।" *(তিরমিযী)*

ভাগ্য ও ভাগে যা পড়েছে, তা নিয়েই সন্তুষ্ট থাকলে ধনী হয়ে সংসার করা যায়। যেহেতু মনের ধনীই বড় ধনী।

জীবনের সবচেয়ে চাহিদা মিটবার নয়, সব চাওয়া পাওয়ার নয়, সব আশা পূর্ণ হওয়ার নয়, তবুও যেটুকু মিটে, যেটুকু পাওয়া যায়, যেটুকু পূরণ হয়, সেটুকু নিয়েই সন্তুষ্ট হলে সুখী হওয়া যায়।

যতটুকু চায় ততটুকু ধন না পেয়ে, মনে মনে যেমন জীবন-সাথী চায় তেমন না পেয়ে, যেমন সন্তান কামনা করে তেমন না পেয়ে মানুষ যদি হা-হুতাশ করতে থাকে, অতি পাওয়ার লালসায় মনের মধ্যে দুরাশা, আকাঙ্ক্ষা, হিংসা বা ঈর্ষা ইত্যাদি পোষণ করে, তাহলে সে কখনও সুখী হতে পারে না।

সুতরাং নিজের ভাগ্য ও ভাগ নিয়ে তুষ্ট হলে মনের সুখী হওয়া যায়। যেহেতু মনের ধনই হল সবচেয়ে বড় ধন। মহানবী ﷺ বলেছেন, "বিষয় সম্পদের আধিক্য ধনবত্তা নয়, প্রকৃত ধনবত্তা হল অন্তরের ধনবত্তা।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

পক্ষান্তরে আল্লাহর সঠিক ইবাদত ক'রে যারা তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে, তারাও বড় ধনী হয় দুনিয়াতে। যেহেতু তার মন ধনবত্তায় পরিপূর্ণ থাকে। সে আখেরাতের ধন-চিন্তায় থাকলে মহান আল্লাহ তার দুনিয়ার ধন-চিন্তা দূর ক'রে দেন। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তির প্রধান চিন্তা (লক্ষ্য) ইহলৌকিক সুখভোগ (দুনিয়াদারীই) হয়,

আল্লাহ তার প্রচেষ্টাকে তার প্রতিকূলে বিক্ষিপ্ত ক'রে দেন, তার দারিদ্র্যকে তার দুই চক্ষুর সামনে ক'রে দেন, আর দুনিয়ার সুখসামগ্রী তার ততটুকুই লাভ হয় যতটুকু তার ভাগ্যে লেখা থাকে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তির উদ্দেশ্য (ও পরম লক্ষ্য) পারলৌকিক সুখভোগ (আখেরাতই) হয়, আল্লাহ তার প্রচেষ্টাকে তার অনুকূলে ঐকান্তিক ক'রে দেন। তার অন্তরে অমুখাপেক্ষিতা (ধনবত্তা) ভরে দেন। আর অনিচ্ছা সত্ত্বেও দুনিয়ার (সুখসামগ্রী) তার নিকট এসে উপস্থিত হয়।" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, বাইহাক্বী, সিলসিলাহ সহীহাহ ৯৫০ নং)*

সবচেয়ে বড় আমানত

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যৌন মিলন-রহস্য সবচেয়ে বড় আমানত।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

(إِنَّ أَعْظَمَ الأَمَانَةِ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الرَّجُلَ يُفْضِى إِلَى امْرَأَتِهِ وَتُفْضِى إِلَيْهِ ثُمَّ يَنْشُرُ سِرَّهَا).

"কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট মানের দিক থেকে সবচেয়ে জঘন্য মানের এক ব্যক্তি হল সে, যে স্বামী স্ত্রী-মিলন করে এবং যে স্ত্রী স্বামী-মিলন করে, অতঃপর একে অন্যের মিলন-রহস্য (অপরের নিকট) প্রচার করে।" *(মুসলিম ১৪৩৭, আবূ দাউদ ৪৮৭০নং)*

স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেম-ভালবাসার ফলে একে অন্যের সকল রহস্য জানতে পারে। বিশেষ ক'রে যৌন-সংক্রান্ত সকল রহস্য ও ভেদ উভয়ের জানা। আর তা হল পরস্পরের কাছে রাখা পরস্পরের আমানত। তাতে খিয়ানত বৈধ নয়। বৈধ নয় বিবাহ-বন্ধনে থাকা অবস্থায়, বৈধ নয় বিবাহ-বিচ্ছেদ অথবা মরণ দ্বারা পৃথক হওয়ার পরে।

সবচেয়ে বড় অপরাধী মুসলিম

সঊদী আরবে বসবাসরত অবস্থায় সপরিবারে আমাদের চিকিৎসা ফ্রি ছিল। পরবর্তীতে আইন হল, পরিবারের চিকিৎসায় খরচ লাগবে। তবে আমাদের চিকিৎসা চলতে লাগল। কিন্তু আমরা চাইলাম, আমাদের পরিবারের চিকিৎসাও ফ্রি হোক। গণ্যমান্য লোকজনের মাধ্যমে উপর মহলে আবেদন জানানো হল। সেখান হতে যে প্রত্যুত্তর এল, তাতে আমাদের নিজেদের চিকিৎসাটাও বন্ধ হয়ে গেল। ফলে নিজেদের দোষে সবটা চাইতে গিয়ে সবটাই হারাতে হল।

অনুরূপই ধর্ম বিষয়ে অতিরিক্ত ও অনর্থক প্রশ্ন করা বৈধ নয়। বৈধ ছিল না হারাম-হালালের বিধান অবতীর্ণ হওয়ার সময়ে। যেহেতু তাতে মুসলিমের কষ্টই বৃদ্ধি হয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ أَعْظَمَ الْمُسْلِمِينَ جُرْمًا مَنْ سَأَلَ عَنْ شَيْءٍ لَمْ يُحَرَّمْ فَحُرِّمَ مِنْ أَجْلِ مَسْأَلَتِهِ).

অর্থাৎ, মুসলিমদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অপরাধী হল সেই ব্যক্তি, যে এমন কোন জিনিসের ব্যাপারে প্রশ্ন করল, যা হারাম ছিল না। অতঃপর তার প্রশ্ন করার ফলে তা হারাম ক'রে দেওয়া হল। (বুখারী ৭২৮৯, মুসলিম ৬২৬৫নং)

আবূ হুরাইরা ﷺ বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের সামনে ভাষণ দানকালে বললেন, "হে লোক সকল! আল্লাহ তোমাদের উপর (বায়তুল্লাহর) হজ্জ ফরয করেছেন, অতএব তোমরা হজ্জ পালন কর।" একটি লোক বলে উঠল, 'হে আল্লাহর রসূল! প্রতি বছর তা করতে হবে কি?' তিনি নিরুত্তর থাকলেন এবং লোকটি শেষ পর্যন্ত তিনবার জিজ্ঞাসা করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "যদি আমি বলতাম, হ্যাঁ। তাহলে (প্রতি বছরে) হজ্জ ফরয হয়ে যেত। আর তোমরা তা পালন করতে অক্ষম হতে।" অতঃপর তিনি বললেন, "তোমরা আমাকে (আমার অবস্থায়) ছেড়ে দাও, যতক্ষণ আমি তোমাদেরকে (তোমাদের স্ব স্ব অবস্থায়) ছেড়ে রাখব। কেননা, তোমাদের পূর্বেকার জাতিরা অতি মাত্রায় জিজ্ঞাসাবাদ ও তাদের পয়গম্বরদের বিরোধিতা করার দরুন ধ্বংস হয়েছে। সুতরাং আমি যখন তোমাদেরকে কোন কিছু করার আদেশ দেব, তখন তোমরা তা সাধ্যমতো পালন করবে। আর যা করতে নিষেধ করব, তা থেকে বিরত থাকবে।" *(মুসলিম)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন, "মহান আল্লাহ অনেক জিনিস ফরয করেছেন তা নষ্ট করো না, অনেক সীমা নির্ধারিত করেছেন তা লংঘন করো না, অনেক জিনিসকে হারাম করেছেন, তাতে লিপ্ত হয়ে তার (মর্যাদার পর্দা) ছিন্ন করো না। আর তোমাদের প্রতি দয়া ক'রে---ভুলে গিয়ে নয়---বহু জিনিসের ব্যাপারে নীরবতা অবলম্বন করেছেন, সে ব্যাপারে তোমরা অনুসন্ধান করো না।" *(দারাক্বুত্বনী প্রমুখ)*

এমন অনর্থক বিষয়েও প্রশ্ন করা বৈধ নয়, যার উত্তর খোদ প্রশ্নকারীকেই খারাপ লাগবে। যেমন কোন মুসলিম যদি তার মুশরিক অবস্থায় মৃত বাপ-দাদার অবস্থান সম্বন্ধে প্রশ্ন করে, তাহলে সুনিশ্চিতভাবে তার উত্তর তাকে খারাপ লাগবে। তাই কুরআনে এমন প্রশ্ন করতেও নিষেধ করা হয়েছে,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَسْأَلُواْ عَنْ أَشْيَاء إِن تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ} (١٠١) سورة المائدة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা সে সব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা প্রকাশিত হলে তোমাদেরকে খারাপ লাগবে। (মায়িদাহ ঃ ১০১)

অনাবশ্যক প্রশ্ন করা, জেনেশুনে অন্যের বিদ্যা মাপা, দ্বীন বিষয়ে নানা 'ক্রিটিসাইজ' করা মোটেই বৈধ নয়। মহানবী ﷺ বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের জন্য (তিনটি কর্মকে) হারাম করেছেন; মায়ের অবাধ্যাচরণ করা, অধিকার প্রদানে বিরত থাকা ও অনধিকার কিছু প্রার্থনা করা এবং কন্যা জীবন্ত প্রোথিত করা। আর তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন (তিনটি কর্ম); ভিত্তিহীন বাজে কথা বলা (বা জনরবে থাকা), অধিক (অনাবশ্যক) প্রশ্ন করা (অথবা প্রয়োজনের অধিক যাঞ্ছা করা) এবং ধন-মাল বিনষ্ট (অপচয়) করা।" *(বুখারী ৫৯৭৫নং ও মুসলিম)*

অবশ্য প্রয়োজনীয় প্রশ্ন ক'রে দ্বীনের মসলা জেনে নেওয়া জরুরী। সে ক্ষেত্রে কোন বড় আলেমকে প্রশ্ন না ক'রে নিজের খেয়ালমতে আমল ক'রে যাওয়া বিপজ্জনক। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَاسْأَلُواْ أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لاَ تَعْلَمُونَ} (٤٣) سورة النحل، الأنبياء ٧

অর্থাৎ, তোমরা যদি না জান, তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞাসা কর। *(নাহল ঃ ৪৩, আম্বিয়া ঃ ৭)*

সবচেয়ে বড় মিথ্যারোপ

সবচেয়ে বড় যালেম সে, যে সবচেয়ে বড় কিছুর প্রতি মিথ্যারোপ করে; আল্লাহর প্রতি, তাঁর রসূলের প্রতি ইত্যাদি। কিন্তু সবচেয়ে বড় মিথ্যারোপটা কী?

মহানবী ﷺ বলেন,

(إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ فِرْيَةً لَرَجُلٌ هَجَا رَجُلاً فَهَجَا الْقَبِيلَةَ بِأَسْرِهَا وَرَجُلٌ انْتَفَى مِنْ أَبِيهِ وَزَنَّى أُمَّهُ).

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বড় মিথ্যা অপবাদদাতা সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি (ব্যঙ্গ-কাব্যে) কোন ব্যক্তির দোষ বর্ণনা করতে গিয়ে তার গোটা গোত্রের দোষ বর্ণনা করে এবং সেই ব্যক্তি, যে নিজের পিতা অস্বীকার ক'রে মাকে ব্যভিচারিণী বানায়!" *(ইবনে মাজাহ ৩৭৬১নং)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((أَعْظَمُ النّاسِ فِرْيَةً اثْنانِ شاعرٌ يَهْجُو القَبِيلَةَ بأسْرِها ورَجُلٌ انْتَفَى مِنْ أبِيهِ)).

অর্থাৎ, সবচেয়ে বড় মিথ্যারোপকারী লোক দুই ব্যক্তি ঃ (ব্যঙ্গ-কাব্যের) এমন কবি, যে গোটা গোত্রের দোষ বর্ণনা করে এবং সেই ব্যক্তি, যে নিজের পিতাকে অস্বীকার করে। (সঃ জামে' ১০৬৬নং)

বড় মিথ্যারোপ কোন ব্যক্তির কুকর্ম দেখে তার দেশ, জাতি, সমাজ, গ্রাম, জামাআত বা বংশকে কুকর্মশীল ধারণা ও প্রচার করা। একটা ভাত টিপে দেখে গোটা হাঁড়ির ভাতের অনুমান করা যায়, যেহেতু সকল চাল এক রূপ। কিন্তু দু-একটি ব্যক্তির চরিত্র বিচার ক'রে গোটা দেশ বা জাতির চরিত্র বিচার করা সম্ভব নয়। যেহেতু সকল ব্যক্তিত্ব এক রূপ নয়। যারা করে, তারা সবচেয়ে বড় মিথ্যারোপকারী।

মহানবী ﷺ আরো বলেছেন,

((إنَّ مِنْ أعْظَمِ الفِرَى أَنْ يَدَّعِيَ الرَّجُلُ إِلَى غيرِ أَبِيهِ ، أَوْ يُرِيَ عَيْنَهُ مَا لَمْ تَرَ ، أَوْ يَقُولَ عَلَى رَسُولِ اللّهِ ﷺ مَا لَمْ يَقُلْ)).

"সবচেয়ে বড় মিথ্যারোপ হল সেই ব্যক্তির কাজ, যে অপরের বাপকে নিজ বাপ বলে দাবি করে অথবা তার চক্ষুকে তা দেখায় যা সে (বাস্তবে) দেখেনি। (অর্থাৎ, স্বপ্ন দেখার মিথ্যা দাবি করে।) অথবা আল্লাহর রসূল ﷺ যা বলেননি, তা তাঁর প্রতি মিথ্যাভাবে আরোপ করে।" *(বুখারী)*

কোনও কারণে নিজের বাপকে বাপ বলে অস্বীকার করা এবং অন্যের বাপকে বাপ বলে দাবী করা সবচেয়ে বড় সত্যের অপলাপ তো বটেই, তাতে রয়েছে বড় তিরস্কার।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে, অথচ সে জানে যে, সে তার বাপ নয় সে ব্যক্তির জন্য জান্নাত হারাম।" *(বুখারী ৬৭৬৬, ৬৭৬৭, মুসলিম*

৬৩নং, আবূ দাউদ, ইবনে মাজাহ)

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে দাবী করে, সে ব্যক্তি জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ তার সুগন্ধি ৫০০ বছরের দূরবর্তী স্থান থেকেও পাওয়া যাবে।" *(আহমাদ ২/১৭১, ইবনে মাজাহ ২৬১১, সহীহুল জামে' ৫৯৮৮নং)*

তিনি আরো বলেন, "সে ব্যক্তি পরের বাপকে নিজের বাপ বলে দাবী করে অথবা তার (স্বাধীনকারী) প্রভু ছাড়া অন্য প্রভুর প্রতি সম্বন্ধ জুড়ে, সে ব্যক্তির উপর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহর অবিরাম অভিশাপ।" *(আবূ দাউদ, সহীহুল জামে' ৫৯৮৭নং)*

মুসলিম শরীফের এক বর্ণনায় আছে যে, "এমন ব্যক্তির উপর আল্লাহ, ফিরিশ্তামন্ডলী এবং সমগ্র মানবমন্ডলীর অভিশাপ। আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার নিকট থেকে কোন নফল অথবা ফরয ইবাদতই গ্রহণ করবেন না।" *(মুসলিম ১৩৭০নং)*

এ সবের অর্থ সম্বোধনে 'বাপ' বলা নয়। এ সবের অর্থ হল, নিজের বাপকে অস্বীকার করা এবং কোন স্বার্থে অন্য কোন পুরুষকে নিজের 'বাপ' বলে দাবী করা। নিজের বংশকে অস্বীকার ক'রে অন্য বংশের সূত্র জুড়ে নেওয়া। যেহেতু মহানবী ﷺ আরো বলেন, অজ্ঞাত বংশের সম্বন্ধ দাবী করা অথবা ছোট বা নীচু হলে তা অস্বীকার করা মানুষের জন্য কুফরী।" *(আহমাদ প্রমুখ, সহীহুল জামে' ৪৪৮৬নং)*

কোন সম্মানিত ব্যক্তিকে বা শ্বশুরকে 'আব্বা' বলে সম্বোধন করায় কোন দোষ নেই। যেমন দোষ নেই নিজের ছেলে ছাড়া অন্য কোন স্নেহভাজনকে 'বেটা' বলে সম্বোধন করা। এ সম্বোধনে উদ্দেশ্য থাকে পিতার মতো শ্রদ্ধা এবং পুত্রের মতো স্নেহ প্রকাশ। পিতৃতুল্যকে 'পিতা' বলা এবং পুত্রতুল্যকে 'বেটা' বলা, তদনুরূপ মাতৃতুল্যকে 'মাতা' বা 'মা' বলা এবং কন্যাতুল্যকে 'বেটি' বলায় কোন বংশীয় সম্বন্ধ উদ্দিষ্ট থাকে না। সুতরাং তা হারাম নয়।

সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা

মিথ্যা বলা মহাপাপ। মিথ্যা বলার আচরণ সাধারণতঃ মুনাফিকদের। কোন মু'মিন মিথ্যাবাদী হতে পারে না।

অনেকে সরাসরি মিথ্যা বলে, ব্যবসায়ীরা ব্যবসা-বাণিজ্যে মিথ্যা বলে, রাজনীতিকরা রাজনীতিতে মিথ্যা বলে, অনেকে মিথ্যা স্বপ্ন বর্ণনা করে, অনেকে মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে, সাংবাদিকরা সংবাদে মিথ্যা বলে, মায়েরা শিশুদের সাথে মিথ্যা বলে, রসিকরা অপরকে হাসানোর জন্য মিথ্যা বলে, অতিবাদীরা অতিরঞ্জনে মিথ্যা বলে, কিন্তু সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা কী?

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الحَدِيثِ)) . متفق عَلَيْهِ

অর্থাৎ, তোমরা কুধারণা থেকে নিজেদেরকে বাঁচিয়ে রাখ। কারণ কুধারণা সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। *(বুখারী ও মুসলিম)*

বাস্তবের বিপরীত যে কথা বলা হয়, সে কথাই মিথ্যা কথা হয়। সুতরাং কুধারণা ক'রে

আন্দাজে-অনুমানে যে কথা বলা হয়, তা বাস্তববিরোধী হলে তাও মিথ্যা কথা। তবে তা সবার চাইতে বড় মিথ্যা কথা।

কুধারণার ফলেই মানুষ মানুষকে ভুল বুঝে ভালোকে মন্দ জ্ঞান করে। আর তার ফলেই কত সুখের সংসারের ফুল-বাগানে আগুন লাগে! মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ} (١٢) سورة الحجرات

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমরা বহুবিধ ধারণা হতে দূরে থাক; কারণ কোন কোন ধারণা পাপ। (হুজুরাত ঃ ১২)

ইসলামের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ

ইসলামের সব কাজই সুন্দর, সব কাজই শ্রেষ্ঠ। তবুও কিছু কাজকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। কখনো কখনো সেই সর্বশ্রেষ্ঠ কাজ করার জন্য কাজীকে সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম বলা হয়েছে অথবা ঐ কাজকে সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলাম বলা হয়েছে। সেই শ্রেণীর কাজ কিছু নিম্নরূপ ঃ-

১। অন্নদান করা

২। পরিচিত-অপরিচিত সকল মুসলিমকে সালাম দেওয়া

আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনে আ'স ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, 'ইসলামের কোন্ কাজটি সর্বোত্তম?' তিনি জবাব দিলেন,

((تُطْعِمُ الطَّعَامَ ، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَى مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ)). متفقٌ عَلَيْهِ

"তুমি অন্নদান করবে এবং পরিচিত ও অপরিচিত সবাইকে সালাম দেবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

৩। মুসলিম জনগণকে নিজের জিভ ও হাত থেকে নিরাপদে রাখা

আবূ মূসা ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! সর্বোত্তম মুসলমান কে?' তিনি বললেন,

((مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ)). متفق عَلَيْهِ

"যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমরা নিরাপদ থাকে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

৪। দ্বীনী জ্ঞান রাখার সাথে চরিত্র সুন্দর করা

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(خَيرُكُم إِسْلاماً أَحَاسِنُكُم أَخلاقاً إذا فَقُهوا).

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে ইসলামে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে, যে তোমাদের মধ্যে চরিত্রে সবার চেয়ে সুন্দর; যদি দ্বীনী জ্ঞান রাখে। (বুখারীর আল-আদাবুল মুফরাদ ২৮৫, সঃ জামে' ৩৩১২নং)

৫। একনিষ্ঠতা ও উদারতা

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَفْضَلُ الإِسْلامِ الحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ).

অর্থাৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ ইসলাম হল একনিষ্ঠতা ও উদারতা। (ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সঃ জামে' ১০৯০নং)

৬। সুন্দরভাবে ঋণ পরিশোধ করা

আবু রাফে' ﷺ হতে বর্ণিত, আল্লাহর রসূল ﷺ এক ব্যক্তির নিকট হতে একটি তরুণ উট ধার নিয়েছিলেন। অতঃপর যখন তাঁর নিকট সদকার উট এল তখন তিনি আবু রাফে'কে ঐ লোকটির তরুণ উট পরিশোধ করে দিতে আদেশ করলেন। আবু রাফে' তাঁর নিকট এসে বললেন, 'সপ্তবর্ষীয় বাছাই করা ভালো ভালো উট ছাড়া অন্য কিছু পেলাম না।' নবী ﷺ বললেন,

(أَعْطِهِ فَإِنَّ خَيْرَ الْمُسْلِمِينَ أَحْسَنُهُمْ قَضَاءً).

"ঐটাই ওকে দিয়ে দাও। কারণ, মুসলিমদের মধ্যে উত্তম ব্যক্তি সে, যে পরিশোধ করায় উত্তম।" *(নাসাঈ ৪৬১৭নং)*

সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্য

ইসলামের সকল কাজই পুণ্যের। যাতে আল্লাহর সন্তুষ্টি আছে, সে কাজেই নেকী আছে। যে গুপ্ত ও প্রকাশ্য কথা বা কাজকে মহান আল্লাহ পছন্দ করেন, তা করলেই সওয়াব হয়। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্য, নেকী বা সওয়াবের কাজ কী?

সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্য হল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আবূ যার্র ﷺ বলেন, একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে অসিয়ত করুন।' তিনি বললেন, "তুমি কোন পাপকর্ম ক'রে ফেললে তার পরেই পুণ্যকর্ম কর, যা ঐ পাপকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেবে।" আমি বললাম, "হে আল্লাহর রসূল! 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' কি পুণ্যাবলীর পর্যায়ভুক্ত?" তিনি বললেন,

« هِيَ أَفْضَلُ الحَسَنَاتِ»

"তা হল সর্বশ্রেষ্ঠ পুণ্য।" (আহমাদ ৫/ ১৬৯, সহীহ তারগীব ৩১৬২নং)

কেন হবে না? 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যে ইসলামের মূলমন্ত্র। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' যে কলেমায়ে ত্বাইয়েবাহ ও সৎ বাক্য, যার উদাহরণ বর্ণনা ক'রে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللّهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاء (٢٤) تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ} (٢٥)

অর্থাৎ, তুমি কি লক্ষ্য কর না, আল্লাহ কীভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎবাক্যের উপমা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ; যার মূল সুদৃঢ় ও যার শাখা-প্রশাখা আকাশে বিস্তৃত। যা তার প্রতিপালকের অনুমতিক্রমে সব সময়ে ফল দান করে। আর আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা বর্ণনা ক'রে থাকেন, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। (ইব্রাহীম ঃ ২৪-২৫)

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' ঈমানের সর্বোত্তম শাখা বা ঈমান বৃক্ষের কান্ড।

মহানবী ﷺ বলেন, "ঈমানের সত্তর অথবা ষাঠের বেশী শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম (শাখা) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন (শাখা) রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক

জিনিস (পাথর কাঁটা ইত্যাদি) দূরীভূত করা। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা।” (বুখারী-মুসলিম)

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র।

জাবের ﷺ বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, “সর্বশ্রেষ্ঠ যিক্‌র হচ্ছে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।” *(তিরমিযী)*

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ মানুষের জান ও মালকে হারাম ক’রে দেয়।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলল এবং আল্লাহ ব্যতীত অন্যান্য উপাস্যকে অস্বীকার করল, তার মাল ও রক্ত হারাম হয়ে গেল ও তার (অন্তরের) হিসাব আল্লাহর দায়িত্বে।” *(মুসলিম)*

মিক্বদাদ ইবনে আসওয়াদ ﷺ বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বললাম, “আপনি বলুন, যদি আমি কোন কাফেরের সম্মুখীন হই এবং পরস্পর লড়াইয়ে লিপ্ত হই, অতঃপর সে তরবারি দিয়ে আমার হাত কেটে দেয়, তারপর আমার (পাল্টা) আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সে একটি গাছের আশ্রয় নিয়ে বলে, ‘আমি আল্লাহর ওয়াস্তে ইসলাম গ্রহণ করলাম।’ তার এ কথা বলার পর হে আল্লাহর রসূল! আমি কি তাকে হত্যা করব?” তিনি বললেন, “তাকে হত্যা করো না।” আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! সে আমার একটি হাত কেটে ফেলবে, কাটার পর সে ঐ বাক্য বলবে তাও?’ তিনি বললেন, “তুমি তাকে হত্যা করো না। যদি তুমি তাকে হত্যা কর, তাহলে (মনে রাখ) সে তোমার সেই মর্যাদা পেয়ে যাবে, যাতে তুমি তাকে হত্যা করার পূর্বে ছিলে। আর তুমি তার ঐ বাক্য বলার পূর্বের অবস্থায় উপনীত হবে।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

উসামা ইবনে যায়দ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদেরকে জুহাইনা গোত্রের এক শাখা হুরাকার দিকে পাঠালেন। অতঃপর আমরা সকাল সকাল পানির ঝর্নার নিকট তাদের উপর আক্রমণ করলাম। (যুদ্ধ চলাকালীন) আমি ও একজন আনসারী তাদের এক ব্যক্তির পিছনে ধাওয়া করলাম। যখন আমরা তাকে ঘিরে ফেললাম, তখন সে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলল। আনসারী থেমে গেলেন, কিন্তু আমি তাকে আমার বল্লম দিয়ে গেঁথে দিলাম। এমনকি শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা ক’রে ফেললাম। অতঃপর যখন আমরা মদীনা পৌঁছলাম, তখন নবী ﷺ-এর নিকট এ খবর পৌঁছল। তিনি বললেন, “হে উসামা! তার ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার পরেও কি তুমি তাকে হত্যা করেছ?” আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! সে প্রাণ বাঁচানোর জন্য এরূপ করেছে।’ পুনরায় তিনি বললেন, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলার পরও তুমি তাকে খুন করেছ?” তিনি আমার সামনে এ কথা বারবার বলতে থাকলেন। এমনকি আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম যে, যদি আজকের পূর্বে আমি ইসলাম গ্রহণ না করতাম (অর্থাৎ, এখন আমি মুসলমান হতাম)। *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, রসূল ﷺ বললেন, “সে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ বলেছে, অথচ তুমি তাকে হত্যা করেছ?” আমি বললাম, ‘হে আল্লাহর রসূল! সে কেবলমাত্র অস্ত্রের ভয়ে এই (কলেমা) বলেছে।’ তিনি বললেন, “তুমি কি তার অন্তর চিরে দেখেছিলে যে, সে এ (কলেমা) অন্তর থেকে বলেছিল কি না?” অতঃপর এ কথা পুনঃ পুনঃ বলতে থাকলেন।

এমনকি আমি আকাঙ্ক্ষা করলাম যে, যদি আমি আজ মুসলমান হতাম।

জুনদুব ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ মুসলমান মুজাহিদীনের একটি দল এক মুশরিক সম্প্রদায়ের দিকে পাঠালেন। তাদের পরস্পরের মধ্যে মুকাবেলা হল। মুশরিকদের মধ্যে একটি লোক ছিল সে যখন কোন মুসলিমকে হত্যা করার ইচ্ছা করত, তখন সুযোগ পেয়ে তাঁকে হত্যা ক’রে দিত। (এ অবস্থা দেখে) একজন মুসলিম (তাকে খুন করার জন্য) তার অমনোযোগিতার সুযোগ গ্রহণ করলেন। আমরা পরস্পরের মধ্যে বলাবলি করছিলাম যে, উনি হলেন উসামা ইবনে যায়দ। (অতঃপর যখন সুযোগ পেয়ে) উসামা তরবারি উত্তোলন করলেন, তখন সে বলল, ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’। কিন্তু তিনি তাকে হত্যা ক’রে দিলেন। অতঃপর (মুসলমানদের যুদ্ধে জয়ী হওয়ার সংবাদ নিয়ে) সুসংবাদবাহী রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর নিকট এল। তিনি তাকে (যুদ্ধের ব্যাপারে) জিজ্ঞাসা করলেন। সে তাঁকে (সমস্ত) সংবাদ দিল। এমনকি শেষ পর্যন্ত সে ঐ ব্যক্তিরও খবর অবহিত করল। তিনি উসামাকে ডেকে জিজ্ঞাসা ক’রে বললেন, “তুমি কেন তাকে হত্যা করেছ?” উসামা বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! সে মুসলমানদেরকে খুবই কষ্ট দিয়েছে এবং অমুক অমুককে হত্যাও করেছে।’ উসামা কিছু লোকের নামও নিলেন। ‘(এ দেখে) আমি তার উপর হামলা করলাম। অতঃপর সে যখন তরবারি দেখল, তখন বলল, “লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।” রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, “তুমি তাকে হত্যা ক’রে দিয়েছ?” তিনি বললেন, ‘জী হ্যাঁ।’ তিনি বললেন, “কিয়ামতের দিন যখন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ আসবে, তখন তুমি কী করবে?” উসামা বললেন, ‘হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার জন্য (আল্লাহর কাছে) ক্ষমা প্রার্থনা করুন।’ তিনি বললেন, “কিয়ামতের দিন যখন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ আসবে, তখন তুমি কী করবে?” (তিনি বারংবার এ কথা বলতে থাকলেন এবং) এর চেয়ে বেশী কিছু বললেন না, “কিয়ামতের দিন যখন ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ আসবে, তখন তুমি কী করবে?” *(মুসলিম)*

সাত আসমান-যমীন অপেক্ষা ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র ওজন বেশি।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, “একদা নূহ ﷺ তাঁর ছেলেকে অসিয়ত ক’রে বললেন, --- আমি তোমাকে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ (বলার) আদেশ করছি। যেহেতু যদি সাত আসমান এবং সাত যমীনকে দাঁড়িপাল্লার এক পাল্লায় রাখা হয় এবং ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’কে অপর পাল্লায় রাখা হয়, তাহলে ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’র পাল্লা বেশী ভারী হবে। যদি সাত আসমান এবং সাত যমীন নিরেট গোলাকার বস্তু হয়, তাহলেও ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ তা চূর্ণবিচূর্ণ ক’রে দেবে।---” *(আহমাদ২/ ১৭০, ত্বাবরানী, বাযযার, মাজমাউয যাওয়াইদ ৪/২ ১৯)*

‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পাঠকারীর জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম হয়ে যায়।

ইত্‌বান ইবনে মালিক ﷺ বলেন, একদা নবী ﷺ নামায পড়ানোর উদ্দেশ্যে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, “মালেক ইবনে দুখ্‌শুম কোথায়!” একটি লোক বলে উঠল, ‘সে তো একজন মুনাফিক; আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসে না।’ নবী ﷺ বললেন, “ও কথা বলো না। তুমি কি মনে কর না যে, সে (কলেমা) ‘লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ’ পড়েছে এবং সে তার দ্বারা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করতে চায়? যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করার উদ্দেশ্যে

(কলেমা) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে, আল্লাহ তার উপর জাহান্নামের আগুন হারাম ক'রে দেন।" *(বুখারী + মুসলিম)*

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠকারীর জন্য রয়েছে সুখময় বেহেশ্ত।

আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে বসেছিলাম। আমাদের সঙ্গে আবূ বাক্র ও উমার (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)ও লোকেদের একটি দলে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের মধ্য থেকে উঠে (কোথাও) গেলেন। তারপর তিনি আমাদের নিকট ফিরে আসতে বিলম্ব করলেন। সুতরাং আমরা ভয় করলাম যে, আমাদের অবর্তমানে তিনি (শত্রু) কবলিত না হন। অতঃপর আমরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে (সভা থেকে) উঠে গেলাম। সর্বপ্রথম আমিই ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। সুতরাং আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর খোঁজে বের হলাম। এমনকি শেষ পর্যন্ত এক আনসারীর বাগানে এলাম। (অতঃপর) তিনি দীর্ঘ হাদীস বর্ণনা করলেন, যাতে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন, "তুমি যাও! অতঃপর (এ বাগানের বাইরে) যার সাথেই তোমার সাক্ষাৎ ঘটবে, যে হৃদয়ের দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর সাক্ষ্য দেবে, তাকে তুমি জান্নাতের সুসংবাদ দিয়ে দাও।" *(মুসলিম)*

মুআয ﷺ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "যে ব্যক্তির শেষ কথা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' হবে (অর্থাৎ এই কালেমা পড়তে পড়তে যার মৃত্যু হবে), সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।" *(আবূ দাউদ, হাকেম)*

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠকারী কাবীরা গোনাহর জন্য জাহান্নামে গেলেও তার বদৌলতে একদিন না একদিন সেখান থেকে মুক্তি পেয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "(পরকালে) আল্লাহ বলবেন, সেই ব্যক্তিকে জাহান্নাম থেকে বের কর, যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার হৃদয়ে যবের দানা পরিমাণ মঙ্গল (ঈমান) আছে। সেই ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে বের কর, যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার হৃদয়ে গমের দানা পরিমাণ মঙ্গল (ঈমান) আছে। আর সেই ব্যক্তিকেও জাহান্নাম থেকে বের কর, যে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে এবং তার হৃদয়ে অণু পরিমাণ মঙ্গল (ঈমান) আছে।" *(আহমাদ ৩/২৭৬, তিরমিযী ২৫৯৩নং, এ হাদীসের মূল রয়েছে সহীহায়নে)*

'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'ই মুসলিম বান্দার প্রথম ও শেষ কথা। এই জন্যই সে আল্লাহ ছাড়া সকল প্রকার কল্পিত 'ইলাহ'কে অস্বীকার করে। সকল প্রকার ইবাদত ও উপাসনা কেবল তাঁরই জন্য নিবেদন করে। কোন মূর্তি বা মাযারের নিকট সে মাথা ঝুঁকায় না। যে জিনিস আল্লাহ ছাড়া অন্যের দেওয়ার ক্ষমতা নেই, সে জিনিস আল্লাহ ছাড়া অন্যের নিকট চায় না। আর সে কথার স্বীকৃতি দিয়ে প্রত্যেক নামাযে সে ঘোষণা করে,

{إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ} (٥) سورة الفاتحة

অর্থাৎ, আমরা কেবল তোমারই ইবাদত করি এবং কেবল তোমারই কাছে সাহায্য চাই। (সূরা ফাতিহা)

সবচেয়ে বেশি বড় পুণ্যকর্ম

সবচেয়ে বেশি পিতৃ-মাতৃ-ভক্তির পরিচয়

মহান আল্লাহ পিতামাতার সেবাযত্ন করা এবং বিশেষ ক'রে তাদের বৃদ্ধাবস্থায় তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করা সন্তানের উপর ফরয করেছেন।

আব্দুল্লাহ ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, আমি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞেস করলাম, 'কোন্ আমল আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়?' তিনি বললেন, "যথা সময়ে নামায আদায় করা।" আমি বললাম, 'তারপর কোন্টি?' তিনি বললেন, "পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা।" আমি বললাম, 'তারপর কোন্টি?' তিনি বললেন, "আল্লাহর পথে জিহাদ করা।" (বুখারী ও মুসলিম)

আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনুল আস ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর নবীর নিকট এসে বলল, 'আমি আপনার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কাছে নেকী পাওয়ার উদ্দেশ্যে হিজরত এবং জিহাদের বায়আত করছি।' নবী ﷺ বললেন, "তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কি কেউ জীবিত আছে?" সে বলল, 'জী হ্যাঁ; বরং দু'জনই জীবিত রয়েছে।' রসূল ﷺ বললেন, "তুমি আল্লাহ তাআলার কাছে নেকী পেতে চাও?" সে বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও এবং উত্তমরূপে তাদের খিদমত কর।" *(বুখারী, আর শব্দগুলি মুসলিমের)*

উভয়ের অন্য এক বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে জিহাদ করার অনুমতি চাইল। তিনি বললেন, "তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছে?" সে বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "অতএব তুমি তাদের (সেবা করার) মাধ্যমে জিহাদ কর।"

কিন্তু যার পিতামাতা জীবিত নেই, সে কী করতে পারে?

ইবনে উমার ﷺ কর্তৃক বর্ণিত, নবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ أَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الْوَلَدِ أَهْلَ وُدِّ أَبِيهِ).

"যার সাথে পিতার মৈত্রী সম্পর্ক ছিল, তা অক্ষুণ্ন রাখা সবচেয়ে বড় পুণ্যের কাজ।"

আব্দুল্লাহ ইবনে দীনার আব্দুল্লাহ ﷺ ইবনে উমার ﷺ থেকে বর্ণনা করেছেন, এক বেদুঈন মক্কার পথে তাঁর সাথে মিলিত হল। অতঃপর আব্দুল্লাহ ইবনে উমার তাকে সালাম দিলেন এবং তিনি যে গাধার উপর সওয়ার ছিলেন তার উপর চাপিয়ে নিলেন। আর যে পাগড়ী তাঁর মাথায় ছিল, তিনি তা তাকে দিয়ে দিলেন।

ইবনে দীনার বলেন, আমরা বললাম, 'আল্লাহ আপনার মঙ্গল করুন, এরা তো বেদুঈন, এরা তো স্বল্পেই তুষ্ট হয় (ফলে এর সাথে এত কিছু করার কী প্রয়োজন)?'

আব্দুল্লাহ ইবনে উমার ﷺ বললেন, 'এর পিতা উমার ইবনে খাত্তাব ﷺ-এর বন্ধু ছিলেন। আর আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "পিতার বন্ধুর সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা সবচেয়ে বড় নেকী।"

অন্য এক বর্ণনায় বর্ণিত, ইবনে উমারের মক্কা যাওয়ার সময় তার সাথে একটি গাধা থাকত। তিনি যখন উটের উপরে চেপে বিরক্ত হয়ে পড়তেন, তখন (এক ঘেঁয়েমি কাটানোর জন্য) ঐ গাধার উপর চেপে বিশ্রাম নিতেন। তাঁর একটি পাগড়ী ছিল, তিনি তা মাথায় বাঁধতেন। একদিন তিনি গাধার উপর সওয়ার ছিলেন, এমতাবস্থায় এক বেদুঈন তাঁর পাশ দিয়ে অতিক্রম করল। তিনি বললেন, 'তুমি কি অমুকের পুত্র অমুক নও?' সে বলল, 'অবশ্যই!' অতঃপর তিনি তাকে গাধাটি দিয়ে বললেন, 'এর উপর আরোহণ কর' এবং তাকে পাগড়ীটি দিয়ে বললেন, 'এটি তোমার মাথায় বাঁধ।' (এ দেখে) তাঁকে তাঁর কিছু সাথী-সঙ্গী বলল, 'আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন! আপনি এই বেদুঈনকে ঐ গাধাটি দিয়ে দিলেন, যার উপর চড়ে আপনি বিশ্রাম নিতেন এবং তাকে ঐ পাগড়ীটিও দিলেন, যেটি আপনি নিজ মাথায় বাঁধতেন?' তিনি বললেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি, "পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধুদের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখা সবচেয়ে বড় নেকীর কাজ।" আর এর পিতা (আমার পিতা) উমার ؓ-এর বন্ধু ছিলেন।

বলা বাহুল্য, পিতার ইন্তিকালের পর পিতার (সৎ) বন্ধুর সাথে শ্রদ্ধা-ভালোবাসার সম্পর্ক কায়েম রাখা সব চাইতে বড় পিতৃভক্তির পরিচয় এবং সব চাইতে বড় নেকির কাজ। পিতার স্ত্রী অর্থাৎ সৎ মাকে শ্রদ্ধা করা এবং তার সাথে সদ্ব্যবহার করাও এই মহাপুণ্যের অন্তর্ভুক্ত।

যেমন মাতার ইন্তিকালের পর মাতার (সৎ) বন্ধু (সখী)র সাথে শ্রদ্ধা-ভালোবাসার সম্পর্ক কায়েম রাখা সব চাইতে বড় মাতৃভক্তির পরিচয় এবং সব চাইতে বড় নেকির কাজ। মাতার স্বামী অর্থাৎ সৎ বাপকে শ্রদ্ধা করা এবং তার সাথে সদ্ব্যবহার করাও এই মহাপুণ্যের অন্তর্ভুক্ত।

পক্ষান্তরে কোন স্বার্থে পিতামাতার শত্রুদের হাতে হাত মিলানো, তাদের দুশমনদের সাথে সম্প্রীতির বন্ধন কায়েম করা এর পরিপন্থী কর্ম।

কিন্তু দুনিয়ার বুকে কিছু চতুর মানুষ আছে, যারা স্বার্থের খাতিরে সৎ-অসৎ সকলের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। যারা ভালো ও মন্দ উভয়কেই সমান চোখে দেখে। তা না হলে তাদের কায়েমি স্বার্থে আঘাত পড়ে। যাদের মন বলে,

'এক হাতে মোর কোরান শরীফ
মদের গ্লাস অন্য হাতে,
পুণ্য-পাপের সৎ-অসতের
দোস্তি সমান আমার সাথে।'

কিন্তু আরবী কবি বলেন,

تودّ عدوّي ثم تزعم أنني ... صديقك ليس النوك عنك بعازب

وليس أخي من ودني رأى عينه ... ولكن أخي من ودني وهو غائب

অর্থাৎ, তুমি আমার শত্রুকে ভালোবাসবে অথচ ধারণা করবে যে, আমি তোমার বন্ধু। আহাম্মকি তোমার নিকট থেকে দূর নয়।

সে আমার ভাই নয়, যে আমার চোখের সামনে আমাকে ভালবাসে। বরং সেই হল আমার

ভাই, যে অনুপস্থিত থেকেও আমাকে ভালবাসে।

মোটকথা, পিতামাতা যাদের সাথে আল্লাহর ওয়াস্তে বিদ্বেষ পোষণ ক'রে গেছে, তাদের সাথে সন্তানের সম্প্রীতির সেতু স্থাপন করা, তাদের মরণের পর তাদের প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তির পরিচয় নয়।

সর্বশ্রেষ্ঠ নামায

ফরয নামাযসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামায হল আসর অথবা ফজরের নামায। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى وَقُومُواْ لِلّهِ قَانِتِينَ} (٢٣٨) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা নামাযসমূহের প্রতি যত্নবান হও; বিশেষ ক'রে মধ্যবর্তী নামাযের প্রতি। আর আল্লাহর সম্মুখে বিনীতভাবে খাড়া হও। (বাক্বারাহ ঃ ২৩৮)

ফরয নামাযের পর নফল নামাযের মধ্যে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ নামায হল তাহাজ্জুদের নামায। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

« أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ ».

"রমযান মাসের রোযার পর সর্বোত্তম রোযা হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহার্রামের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হচ্ছে রাতের (তাহাজ্জুদের) নামায।" *(মুসলিম)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেছেন, "আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম নামায, দাউদ عليه السلام-এর নামায এবং আল্লাহর নিকট সর্বোত্তম রোযা, দাউদ عليه السلام-এর রোযা; তিনি অর্ধরাতে নিদ্রা যেতেন এবং রাতের তৃতীয় ভাগে ইবাদত করার জন্য উঠতেন। অতঃপর রাতের ষষ্ঠাংশে আবার নিদ্রা যেতেন। (অনুরূপভাবে) তিনি একদিন রোযা রাখতেন ও একদিন রোযা ত্যাগ করতেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

সর্বশ্রেষ্ঠ নফল নামায, যা মানুষ স্বগৃহে পড়ে। অবশ্য ফরয নামায জামাআতে আদায় করা ওয়াজেব। অনুরূপ যে নামায মসজিদে আদায় করতে হয়, সে কথা ভিন্ন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ الْمَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ).

অর্থাৎ, ফরয নামায ছাড়া মানুষের শ্রেষ্ঠতম নামায হল তার স্বগৃহে পড়া নামায। (বুখারী ৭৩১নং)

তিনি আরো বলেছেন, "তোমরা কিছু (সুন্নত) নামায নিজ নিজ ঘরে আদায় কর এবং ঘরকে কবর বানিয়ে নিয়ো না।" (বুখারী ১১৮৭নং)

সর্বশ্রেষ্ঠ কোন্ নামায? যে নামাযের ক্বিরাআত লম্বা হয়, সেই নামায সর্বশ্রেষ্ঠ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« أَفْضَلُ الصَّلاَةِ طُولُ الْقُنُوتِ ».

অর্থাৎ, দীর্ঘ কিয়ামযুক্ত নামায সর্বশ্রেষ্ঠ। (মুসলিম ১৮০৪নং)

জামাআতের নামাযসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নামায হল জুমআর দিনের ফজরের নামায। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَوَاتِ صَلاةُ الصُّبْحِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِي جَمَاعَةٍ).

অর্থাৎ, সবচেয়ে উত্তম নামায হল জুমআর দিন ফজরের জামাআত সহকারে নামায। *(বাইহাক্বী ৩০৪৫, বায্যার ১২৭৯, সিঃ সহীহাহ ১৫৬৬নং)*

সবচেয়ে ভারী নামায

নামায কোন মু'মিনের জন্য ভারী হয় না। অবশ্য যথাসময়ে নামায আদায় করা কারো জন্য যে আদৌ কঠিন নয়, তা নয়। নামাযের যত্ন নেওয়া সাধারণ মানুষের জন্য ভারী কাজ, কিন্তু বিনয়ী-নম্র মানুষের জন্য তা সহজ এবং নামায তাদের হৃদয়ের প্রশান্তির উপকরণ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ } (٤٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে এ কঠিন। (বাক্বারাহ ঃ ৪৫)

এই বিনীত লোক কারা? এরা সেই লোক যারা কিয়ামতের উপর পূর্ণ বিশ্বাস রাখে। অর্থাৎ, কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাস সৎকর্মসমূহকে সহজতর ক'রে দেয় এবং আখেরাত থেকে উদাসীনতা মানুষকে আমলহীন; বরং বদ আমলের অভ্যাসী বানিয়ে দেয়। এই লোক তারা, যারা মহান আল্লাহর প্রতি অগাধ ভক্তি ও ভালোবাসা রাখে, তাঁর ভয় তাদেরকে বিনয়ী বানিয়ে রাখে। তারা হল প্রকৃত মু'মিন, তারা নামাযে তৃপ্তি পায়, সান্ত্বনা পায়, শান্তি পায়। তাদের মন মসজিদের সাথে লটকে থাকে।

পক্ষান্তরে নামধারী মুসলিমদের জন্য নামায খুবই ভারী জিনিস। মুনাফিকদের পক্ষে নামায বড় অবাঞ্ছিত জিনিস। তারা নামায পড়ে তাদের সময় নষ্ট করতে চায় না। লোক-সমাজের খাতিরে যদিও তা পড়ে, তবুও উদাসীনতা ও শৈথিল্যের সাথে। আর সে নামাযে কি তারা মহান আল্লাহকে স্মরণ করে? যাঁর প্রতি বিশ্বাসই সুদৃঢ় নয়, তাঁকে কি যথানিয়মে স্মরণ করা যায়?

কক্ষনই না। সে কথা অন্তর্যামী সৃষ্টিকর্তা বলেই দিয়েছেন।

{إِنَّ الْمُنَافِقِينَ يُخَادِعُونَ اللّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلاَةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآؤُونَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُونَ اللّهَ إِلاَّ قَلِيلاً} (١٤٢) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় মুনাফিক (কপট) ব্যক্তিরা আল্লাহকে প্রতারিত করতে চায়। বস্তুতঃ তিনিও তাদেরকে প্রতারিত করে থাকেন এবং যখন তারা নামাযে দাঁড়ায় তখন শৈথিল্যের সাথে নিছক লোক-দেখানোর জন্য দাঁড়ায় এবং আল্লাহকে তারা অল্পই স্মরণ ক'রে থাকে। (নিসা ঃ ১৪২)

আর তার ফলে তাদের সে নামায কি মহান প্রতিপালকের দরবারে গৃহীত হবে। আদৌ না। তাদের অন্তর যেহেতু বিশ্বাসী নয়, সেহেতু তাদের কোন ইবাদতই গ্রহণযোগ্য হবে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَا مَنَعَهُمْ أَن تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقَاتُهُمْ إِلاَّ أَنَّهُمْ كَفَرُواْ بِاللّهِ وَبِرَسُولِهِ وَلاَ يَأْتُونَ الصَّلاَةَ إِلاَّ وَهُمْ كُسَالَى وَلاَ يُنفِقُونَ إِلاَّ وَهُمْ كَارِهُونَ} (٥٤) سورة التوبة

অর্থাৎ, আর তাদের দান-খয়রাত গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে কুফরী করেছে, আর তারা নামাযে শৈথিল্যের সাথেই উপস্থিত হয় এবং তারা অনিচ্ছাকৃতভাবেই দান ক'রে থাকে। (তাওবাহ ঃ ৫৪)

সুতরাং এমন নামাযীর জন্য সর্বনাশ। যারা বাধ্য হয়ে মনের বিরুদ্ধে গিয়ে নামায নষ্ট ক'রে পড়ে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ (٤) الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلاتِهِمْ سَاهُونَ (٥) الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ} (٦)

অর্থাৎ, সুতরাং পরিতাপ (দুর্ভোগ, সর্বনাশ বা দোযখের ওয়াইল নামক উপত্যকা) সেই নামায আদায়কারীদের জন্য; যারা তাদের নামাযে অমনোযোগী। যারা লোক প্রদর্শন (ক'রে তা) করে। (মাঊন ঃ ৪-৬)

মহানবী ﷺ বলেছেন, "এটা তো মুনাফিকের নামায; যে সূর্যের অপেক্ষা ক'রে যখন তা হলুদ হয়ে শয়তানের দুই শিঙের মাঝে আসে, তখন সে উঠে (কাকের বা মুরগীর দানা খাওয়ার মত) চার রাকআত ঠকাঠক পড়ে নেয়। যার মধ্যে সে আল্লাহর যিক্র কমই করে থাকে।" *(মুসলিম, আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, মিশকাত ৫৯৩নং)*

মুনাফিকদের জন্য সব নামাযই ভারী। কিন্তু তাদের কাছে সবচেয়ে বেশি ভারী নামায হল দু'টি ঃ ফজর ও এশা। যেহেতু এশার সময় ঘুম তাড়তে কষ্ট হয়, আর ফজরের সময় ঘুম ছাড়তে কষ্ট হয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لَيْسَ صَلاَةٌ أَثْقَلَ عَلَى الْمُنَافِقِينَ مِنْ صَلاَةِ الفَجْرِ وَالعِشَاءِ ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهِمَا لأَتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْواً)). متفقٌ عَلَيهِ

মুনাফিক (কপট)দের উপর ফজর ও এশার নামায অপেক্ষা অধিক ভারী নামায আর নেই। যদি তারা এর ফযীলত ও গুরুত্ব জানত, তাহলে হামাগুড়ি দিয়ে বা পাছার ভরে অবশ্যই (মসজিদে) উপস্থিত হত। (বুখারী ও মুসলিম)

যদিও বর্তমানে অনেকের নিকট এশার নামায ঘুমের জন্য ভারী নয়, তবুও পার্থিব কাজ তথা নানা প্রচার মাধ্যমে নানা চিত্তাকর্ষী প্রোগ্রাম ছেড়ে নামায পড়তে যাওয়াটা তাদের জন্য বড় কষ্টকর। আর তারই ফলে অধিক রাত্রি জাগরণ ক'রে ফজরের সময় উঠে জামাআতে নামায পড়া আরো বেশি কষ্টকর।

আল্লাহর নিকট মহিলার সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয় নামায

মহিলার সর্বশ্রেষ্ঠ মসজিদ কী?

মহিলার কোন্ নামায মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়?

মহিলা পর্দার সাথে সুগন্ধি ব্যবহার না ক'রে মসজিদে গিয়ে নামায আদায় করতে পারে। তাতে নানা উপকারও আছে। আর সেই জন্য তাদেরকে মসজিদ যেতে কেউ বাধা দিতে পারে না। তবে পুরুষদের মতো জামাআত-সহকারে নামায আদায় করা তাদের উপর ওয়াজেব নয়। বরং স্বগৃহে নামায পড়াটাই তাদের জন্য বেশি উত্তম।

যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন, "মহিলা স্বগৃহে থেকে তার রবের অধিক নিকটবর্তী থাকে।" *(ইবনে খুযাইমা, ইবনে হিব্বান, ত্বাবারানী, সঃ তারগীব ৩৩৯, ৩৪১নং)*

ইবনে মাসঊদ ﷺ বলেন, "মহিলা তার ঘরে থেকে রবের ইবাদত করার মতো ইবাদত আর অন্য কোথাও করতে পারে না।" *(ত্বাবারানী, সঃ তারগীব ৩৪৮-নং)*

বরং স্বগৃহের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অন্দর মহলে নামায পড়াই হল উত্তম। মহানবী ﷺ বলেন, "মহিলাদের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মসজিদ তার গৃহের ভিতরের কক্ষ।" *(আহমাদ, হাকেম ১/২০৯, বাইহাক্বী, সঃ জামে' ৩৩২৭নং)*

তিনি মহিলাদেরকে সম্বোধন ক'রে বলেন, "তোমাদের খাস কক্ষের নামায সাধারণ কক্ষে নামায অপেক্ষা উত্তম, তোমাদের সাধারণ কক্ষের নামায বাড়ির ভিতরে কোন জায়গায় নামায অপেক্ষা উত্তম এবং তোমাদের বাড়ির ভিতরের নামায মসজিদে জামাআতে নামায অপেক্ষা উত্তম।" *(আহমাদ, ত্বাবারানী, বাঃ, সঃ জামে' ৩৮৪৪নং)*

মহিলার সবচেয়ে গোপন নামায, মহান আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়। মহানবী বলেছেন,

(ما صلَّتِ امرأَةٌ مِنْ صَلاةٍ أَحَبَّ إلى اللهِ مِنْ أَشدِّ مكان في بَيْتِها ظُلْمةً).

অর্থাৎ, মহিলা স্বগৃহের সবচেয়ে বেশি অন্ধকারময় কক্ষে পড়া নামায ছাড়া এমন কোন নামায পড়েনি, যা আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় হতে পারে। (ত্বাবারানী, সঃ তারগীব ৩৪৭নং)

উল্লেখ্য যে, সাহাবিয়া উম্মে হুমাইদ উক্ত হাদীস শোনার পর থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তিনি তাঁর বাড়ির সব চাইতে অধিক অন্দর ও অন্ধকার কামরাতে নামায পড়েছেন।

মহানবী ﷺ বলেন, "মহিলা হল গোপন জিনিস। বাইরে বের হলে শয়তান তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে নির্নিমেষ তাকিয়ে দেখতে থাকে।" *(ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযাইমা, সঃ তারগীব ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪২নং)*

এ তো ইবলীস জিনের কথা। পক্ষান্তরে বর্তমান যুগের দ্বীনহীন যুবকদল; যারা মহিলার

জন্য হাজার শয়তান অপেক্ষা বেশী ক্ষতিকর, তাদের লোলুপ দৃষ্টি থেকে গোপনে থাকা নারীর একান্ত কর্তব্য।

কিন্তু যে মহিলাকে যেখানে-সেখানে এমনিই দেখা যায়, সেই বেপর্দা মহিলার ব্যাপারে ধারণা কী? যাদের হাটে-বাজারে যেতে বাধা নেই, তাদের কি মসজিদে যেতে বাধা থাকতে পারে?

নামাযের সর্বশ্রেষ্ঠ কাতার, সর্বনিকৃষ্ট কাতার

মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাআত-সহকারে নামায আদায় করা পুরুষের জন্য ওয়াজেব। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, বহু পুরুষ নারীসুলভ ঘরকুনো মন নিয়ে স্বগৃহের কোণে নামায সেরে নেয়। যেমন যারা মসজিদে উপস্থিত হয়ে নামায আদায় করে, তাদের অনেকেই সামনে কাতারে না দাঁড়িয়ে পিছনের কাতারে মুখ লুকায়!

অথচ পুরুষের জন্য প্রথম কাতারে দাঁড়িয়ে নামায পড়া উত্তম। সকলের জন্য প্রথম কাতার যথেষ্ট নয় ঠিকই, কিন্তু সকলের মনে প্রথম কাতারে দাঁড়ানোর নিয়ত, কামনা ও প্রয়াস থাকা উচিত।

মহানবী ﷺ বলেন,

(خَيْرُ صُفُوفِ الرِّجَالِ أَوَّلُهَا ، وَشَرُّهَا آخِرُهَا ، وَخَيْرُ صُفُوفِ النِّسَاءِ آخِرُهَا ، وَشَرُّهَا أَوَّلُهَا).

অর্থাৎ, পুরুষদের সর্বশ্রেষ্ঠ কাতার হল প্রথম কাতার এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাতার হল সর্বশেষ কাতার। আর মহিলাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কাতার হল সর্বশেষ কাতার এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাতার হল প্রথম কাতার। *(মুসলিম ১০১৩, সুনানে আরবাআহ, মিশকাত ১০৯২নং)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "লোকে যদি আযান ও প্রথম কাতারের মাহাত্ম্য জানত, অতঃপর তা লাভের জন্য লটারি করা ছাড়া আর অন্য কোন উপায় না পেত, তাহলে তারা লটারিই করত।" *(বুখারী ৬১৫, মুসলিম ৪৩৭নং)*

তিনি বলেছেন, "অবশ্যই আল্লাহ প্রথম কাতার ও সামনের কাতারসমূহের প্রতি রহমত বর্ষণ করেন এবং ফিরিশ্তাগণ তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনার দুআ ক'রে থাকেন।" *(আহমাদ, সঃ তারগীব ৪৮৯নং)*

পার্থিব ও সাংসারিক ব্যাপারে প্রত্যেক উন্নয়নশীল পুরুষ চায়, সে সবার আগে হবে। কিন্তু আখেরাত ও দ্বীনের ব্যাপারে তা চায় না। পরকালের উন্নয়ন-প্রতিযোগিতায় সে যেন অংশগ্রহণই করতে চায় না। পিছে থাকতে চায় অথবা অগ্রসর হতে আলস্য ঘিরে ধরে, হয়তো এই কারণে যে, তার ঈমান পরিপক্ব নয়। কিন্তু এই পশ্চাদপসরণের শাস্তি আছে মহান আল্লাহর কাছে।

একদা মহানবী ﷺ নামাযের কাতার বাঁধার সময় সাহাবাদেরকে পশ্চাদ্পদ হতে দেখে বললেন, "তোমরা অগ্রসর হও এবং আমার অনুসরণ কর। আর তোমাদের পিছনের লোক তোমাদের অনুসরণ করুক। এক শ্রেণীর লোক পিছনে থাকতে চাইবে, ফলে আল্লাহ তাদেরকে (নিজ রহমত থেকে) পিছনে ফেলে দেবেন।" *(মুসলিম, মিশকাত ১০৯০নং)*

তিনি আরো বলেছেন, “কোন সম্প্রদায় প্রথম কাতার থেকে পিছনে সরে আসতে থাকলে অবশেষে আল্লাহ তাদেরকে জাহান্নামে পশ্চাদ্বর্তী ক'রে দেবেন।” (অর্থাৎ, জাহান্নামে আটকে রেখে সবার শেষে জান্নাত যেতে দেবেন, আর সে প্রথম দিকে জান্নাত যেতে পারবে না।) *(আউনুল মা'বূদ ২/২৬৪নং, আবূ দাউদ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, সহীহ তারগীব ৫০৭নং)*

পক্ষান্তরে মহিলাদের জন্য মসজিদে উপস্থিত হয়ে জামাআত-সহকারে নামায আদায় করা ওয়াজেব নয়। তবে তা চাইলে করতে পারে। আর সে ক্ষেত্রে তাদের জন্য প্রথম কাতার উত্তম নয়। বরং সর্বশেষ কাতার উত্তম। যেহেতু মসজিদে পুরুষ-মহিলাদের মাঝে পর্দা না থাকলে দেখাদেখি ও চোখাচোখি হতেই পারে। সুতরাং পিছনে দাঁড়ালে পুরুষদের চোরা চাহনির শিকার হওয়া থেকে বাঁচা যায়। আর পুরুষ প্রথম কাতারে দাঁড়ালে আচমকা দৃষ্টি পড়ার আশঙ্কা থেকে রক্ষা পায়। আর এই জন্যই মহানবী ﷺ বলেছেন, “পুরুষদের সর্বশ্রেষ্ঠ কাতার হল প্রথম কাতার এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাতার হল সর্বশেষ কাতার। আর মহিলাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কাতার হল সর্বশেষ কাতার এবং সবচেয়ে নিকৃষ্ট কাতার হল প্রথম কাতার।”

ইসলামের শুরুর দিকে (পর্দার বিধান অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে) ইসলামের আহকাম অজানা কিছু নওমুসলিম অথবা মুনাফিক পিছনের কাতারে দাঁড়িয়ে রুকূর সময় বগলের ফাঁক দিয়ে তাকিয়ে প্রথম কাতারের মহিলা দেখার চেষ্টা করত। এ কারণেই মহানবী ﷺ উক্ত হাদীস বলেছিলেন এবং সে বিষয়ে কুরআনী সতর্কবাণীও অবতীর্ণ হয়েছিল। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ} (٢٤) سورة الحجر

অর্থাৎ, অবশ্যই আমি তোমাদের অগ্রগামীদেরকে জানি এবং অবশ্যই জানি তোমাদের পশ্চাদ্গামীদেরকেও। (হিজ্র ঃ ২৪, সিঃ সহীহাহ ২৪৭২নং)

কোন্ নামাযীর সওয়াব সবার চাইতে বেশি?

নামায সঠিকভাবে পড়লে তার পূর্ণ সওয়াব পাওয়া যায়। পুরুষ জামাআত-সহকারে পড়লে ২৫ থেকে ২৭ গুণ সওয়াব বেশি পায়। কিন্তু তার থেকেও বেশি সওয়াব কে পায়?

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْراً فِي الصَّلاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشىً ، فَأَبْعَدُهُمْ ، وَالَّذِي يَنْتَظِرُ الصَّلاَةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإمَامِ أَعظَمُ أَجْراً مِنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ)). متفقٌ عَلَيْهِ

অর্থাৎ, (মসজিদে জামাআতসহ) নামায পড়ার ক্ষেত্রে, সেই ব্যক্তি সর্বাধিক বেশী নেকী পায়, যে ব্যক্তি সব চাইতে দূর-দূরান্ত থেকে আসে। আর যে ব্যক্তি (জামাআতের সাথে) নামাযের অপেক্ষা না করেই একা নামায পড়ে শুয়ে যায়, তার চাইতে সেই বেশী নেকী পায়, যে নামাযের জন্য প্রতীক্ষা করে ও ইমামের সাথে জামাআত সহকারে নামায আদায় করে।” *(বুখারী, মুসলিম)*

বনু সালেমাহ মসজিদের নিকট স্থান পরিবর্তন করার ইচ্ছা করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর কাছে এই সংবাদ পৌঁছল। সুতরাং তিনি তাদেরকে বললেন, “আমি খবর পেয়েছি যে, তোমরা স্থান পরিবর্তন ক'রে মসজিদের নিকট আসার ইচ্ছা করছ?” তারা বলল, 'হ্যাঁ, হে আল্লাহর রসূল! আমরা এর ইচ্ছা করেছি।' তিনি বললেন, “হে বনূ সালেমাহ! তোমরা তোমাদের (বর্তমান) গৃহেই থাকো; তোমাদের পদচিহ্নসমূহ লিপিবদ্ধ হবে। তোমরা আপন গৃহেই থাকো; তোমাদের পদচিহ্নসমূহ লেখা হবে।” *(মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “নিশ্চয় তোমাদের প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে একটি মর্যাদা বৃদ্ধি হবে।” *(মুসলিম)*

উবাই ইবনে কা'ব ؓ বলেন যে, একটি লোক ছিল। আমি জানি না যে, অন্য কারো বাড়ি তার বাড়ির চেয়ে দূরে ছিল। তা সত্ত্বেও তার কোন নামায ছুটত না। অতঃপর তাকে বলা হল অথবা আমি (কা'ব) তাকে বললাম যে, 'তুমি যদি একটি গাধা কিনে আঁধারে ও ভীষণ রোদে তার উপর সওয়ার হয়ে আসতে, (তাহলে তা তোমার পক্ষে ভাল হত?)' সে বলল, 'আমি এটা পছন্দ করি না যে, আমার বাড়ি মসজিদ সংলগ্নে হোক। কারণ আমি তো এই চাই যে, (দূর থেকে) আমার পায়ে হেঁটে মসজিদ যাওয়া এবং ওখান থেকেই পুনরায় বাড়ী ফিরা, সবকিছু যেন আমার নেকীর খাতায় লেখা যায়।' রাসূলুল্লাহ ﷺ (তার কথা শুনে) বললেন, “আল্লাহ তাআলা এ সমস্ত তোমার জন্য একত্র ক'রে দিয়েছেন।” *(মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “নিশ্চয় তোমার জন্য সেই সওয়াবই রয়েছে, যার তুমি আশা করেছ।”

নবী ﷺ বলেছেন, “যে ব্যক্তি বাড়ি থেকে ওযূ ক'রে আল্লাহর কোন ঘরের দিকে এই উদ্দেশ্যে যাত্রা করে যে, আল্লাহর নির্ধারিত কোন ফরয ইবাদত (নামায) আদায় করবে, তাহলে তার কৃত প্রতিটি দুই পদক্ষেপের মধ্যে একটিতে একটি ক'রে গুনাহ মিটাবে এবং অপরটিতে একটি ক'রে মর্যাদা উন্নত করবে।” *(মুসলিম)*

এত কিছুর পরেও কি তার সওয়াব অন্য সব নামাযীর তুলনায় বেশি হবে না?

সবচেয়ে বড় চোর

চোর বহু রকমের আছে দুনিয়ায়। বিভিন্ন দামী জিনিস চুরি হয়ে থাকে। স্বর্ণ চুরি, অর্থ চুরি থেকে মাটি চুরি ও পুকুর চুরিও হয়ে থাকে। লেখা চুরি, উত্তর চুরি, বিদ্যা চুরি, বুদ্ধি চুরি, ফসল চুরি, পশু চুরি, মড়া চুরিও হয়ে থাকে।

চোরও বিভিন্ন ধরনের আছে, গাঁটকাটা চোর, ছিঁচকে চোর, সিঁদেল চোর, ভদ্র চোর প্রভৃতি।

সমাজে যেমন ধন-চোর আছে, তেমনি আছে মন-চোর। যেমন কাম-চোর আছে, তেমনি আছে নাম-চোর। চুরি ক'রে যেমন দেখা হয়, তেমনি চুরি ক'রে শোনাও হয়। ধর্মে ফাঁকিবাজ ধর্ম-চোরেরও অভাব নেই ধার্মিকদের ভিতরে। বিদআতী কুরআনখানির সময় যেমন কুরআন-চোর আছে, তেমনি নামাযীদের মধ্যে আছে নামায-চোর।

কিন্তু শত শ্রেণীর চোরদের মধ্যে সবচেয়ে বড় চোর কে?

এ প্রশ্নের উত্তরে মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِيْ يَسْرِقُ مِنْ صَلاَتِه).

অর্থাৎ, সবচেয়ে নিকৃষ্ট চোর হল সেই ব্যক্তি, যে তার নামায চুরি করে।

লোকেরা বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! নামায কীভাবে চুরি করবে?' বললেন, "পূর্ণরূপে রুকূ ও সিজদাহ না ক'রে।" *(ইবনে আবী শাইবাহ ২৯৬০নং, ত্বাবারানী, হাকেম)*

তিনি আরো বলেছেন,

(أَسْرَقُ النَّاسِ الذِي يَسْرِقُ صَلاتَهُ لا يُتِمُّ رُكُوعَها ولا سُجُودَها وأَبْخَلُ النَّاسِ مَنْ بَخِلَ بالسَّلامِ).

অর্থাৎ, সবচেয়ে বড় চোর হল সেই ব্যক্তি, যে নিজের নামায চুরি করে। নামাযের রুকূ ও সিজদাহ ঠিকমতো করে না। আর সবচেয়ে বড় কৃপণ হল সেই ব্যক্তি, যে সালাম দিতে কার্পণ্য করে। (ত্বাবারানী, সঃ জামে' ৯৬৬নং)

এই শ্রেণীর নামায-চোরেরা বড় ফাঁকিবাজ। কেবল কর্তব্য পালন ক'রে 'ওঠ-বস' করে। এদের পায়ে যেন স্প্রিং লাগানো থাকে। তাই চটাচট্ ঠকাঠক্ রুকূ-সিজদা করে। এদের তসবীহর 'সু-সু' ছাড়া অন্য কিছু বুঝা যায় না। অনেকের 'রব্বানা অলাকাল হাম্দ' সিজদায় শোনা যায়, সিজদার তসবীহ বৈঠকে শোনা যায়। এরা আল্লাহকে ফাঁকি দেয়, কিন্তু মানুষের চোখেও ধরা খেয়ে যায়।

এরা রুকূর সময় পিঠ সমতল করে না। সিজদার সময় জড়সড় হয়। মাটিতে ঠিকমতো কপাল-নাক ঠেকায় না। আবার অনেকের সামনের দিকে ওজন বেশি হয়ে গেলে পিছন দিকের পা উপরে উঠে যায়।

চোরের মাল যেমন বাটপাড়ে খায়, তাদের নামায তেমনি শয়তানে খায়। চোরের উপর বাটপাড়ি করে শয়তান। এদের জাতও যায়, পেটও ভরে না। খায়, কিন্তু তৃপ্ত হয় না।

মহানবী ﷺ এক নামাযীকে দেখলেন, সে পূর্ণরূপে রুকূ করে না, আর সিজদাহ করে ঠক্ঠক ক'রে। বললেন, "যদি এই ব্যক্তি এই অবস্থায় মারা যায়, তাহলে সে মুহাম্মাদের মিল্লত ছাড়া অন্য মিল্লতে থাকা অবস্থায় মারা যাবে। ঠক্ঠক্ ক'রে নামায পড়ছে; যেমন কাক ঠক্ঠক্ করে রক্ত ঠুকরে খায়! যে ব্যক্তি পূর্ণরূপে রুকূ করে না এবং ঠক্ঠক্ করে সিজদাহ করে, সে তো সেই ক্ষুধার্ত মানুষের মতো, যে একটি অথবা দু'টি খেজুর খায়, যাতে তার ক্ষুধা মেটে না।" *(আবূ য়্যা'লা, আজুরী, বাইহাক্বী, ত্বাবারানী, যিয়া, ইবনে আসাকির, ইবনে খুযাইমা, সিফাতু সালাতিন নাবী ১৩১পৃঃ)*

একদা তিনি নামায পড়তে পড়তে দৃষ্টির কোণে দেখলেন যে, এক ব্যক্তি তার রুকূ ও সিজদায় মেরুদন্ড সোজা করে না। নামায শেষ ক'রে তিনি বললেন, "হে মুসলিম দল! সেই নামাযীর নামায হয় না, যে রুকূ ও সিজদায় তার মেরুদন্ড সোজা করে না।" *(ইবনে আবী শাইবাহ ২৯৫৭, ইবনে মাজাহ, আহমাদ, সিঃ সহীহাহ ২৫৩৬ নং)*

তিনি আরো বলেন, "সে নামাযীর নামায যথেষ্ট নয়, যে রুকূ ও সিজদায় তার পিঠ সোজা করে না।" *(আবূ দাঊদ ৮৫৫নং, আবূ আওয়ানাহ)*

সুতরাং মুসলিম সাবধান! নামাযী হওয়া সত্ত্বেও 'চোর' নাম নেবেন না।

সর্বশ্রেষ্ঠ রোযা

সর্বশ্রেষ্ঠ নফল রোযা হল মুহার্রম মাসে রাখা রোযা। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَّهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ ».

"রমযান মাসের রোযার পর সর্বোত্তম রোযা হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহার্রামের রোযা। আর ফরয নামাযের পর সর্বোত্তম নামায হচ্ছে রাতের (তাহাজ্জুদের) নামায।" *(মুসলিম)*

যদি কেউ বেশি রোযা রাখতে চায়, তাহলে তার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ রোযা হল দাঊদী রোযা, একদিন ছেড়ে পরদিন রোযা। মহানবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর নিকট প্রিয়তম রোযা হচ্ছে দাউদ ﷺ-এর রোযা এবং আল্লাহর নিকট প্রিয়তম নামায হচ্ছে দাউদ ﷺ-এর নামায। তিনি মধ্য রাতে শুতেন এবং তার তৃতীয় অংশে নামায পড়তেন এবং তার ষষ্ঠ অংশে ঘুমাতেন। তিনি একদিন রোযা রাখতেন ও একদিন রোযা ছাড়তেন।" (বুখারী, মুসলিম)

সর্বশ্রেষ্ঠ হজ্জ

হজ্জ ইসলামের একটি স্তম্ভ। সামর্থ্যবান ব্যক্তির জন্য জীবনে একবার হজ্জ করা ফরয এবং কবুল হলে হাজী জন্মদিনের শিশুর মতো নিষ্পাপ হয়ে যায়। (আল্লাহর নিকট) গৃহীত হজ্জের প্রতিদান জান্নাত ব্যতীত কিছু নয়। *(বুখারী ১৬৮৩, মুসলিম ১৩৪৯নং)*

কিন্তু কোন্ হজ্জ সর্বশ্রেষ্ঠ?

সে যুগের হজ্জ ছিল বড় কষ্টের। পানির বড় অভাব ছিল। সফরে বড় পরিশ্রম ছিল। উটের পিঠে চড়ে দিনের পর দিন সফর করতে হতো। কিন্তু আজ আর সে কষ্ট নেই। পানির অভাব নেই। আধুনিক যানবাহনে হজ্জের ব্যবস্থা হওয়ার ফলে সফরে কোন কষ্ট নেই। মিনায় আছে আগুন-নিরোধক তাঁবুর ব্যবস্থা। তাতে আছে কুলার লাগানো। বরং মক্কা থেকে মিনা যেতে ছায়া ও পাখা-ওয়ালা রাস্তা আছে। মিনা থেকে আরাফাত যেতে-আসতে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত গাড়ি ও ট্রেনের ব্যবস্থা আছে। খাবারেরও কোন কষ্ট নেই। যথাস্থানে খাদ্য বিক্রয় হয়, বিনামূল্যে বিতরণ হয়। তুলনামূলক বহু আরামের হজ্জ।

তবুও তাওয়াফ-সাঈ ও পাথর মারতে, তালবিয়াহ পড়তে ও কুরবানী করতে বড় কষ্ট স্বীকার করতে হয়। সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ হজ্জ হল সেই হজ্জ, যাতে হাজী জোরে-শোরে তালবিয়াহ পাঠ করে এবং কুরবানী করে। মহানবী ﷺ সেই কথাই বলেছেন,

(أَفْضَلُ الحَجِّ الْعَجُّ وَالثَّجُّ).

(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, হাকেম প্রমুখ, সঃ জামে' ১১০১নং)

সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ

'জিহাদ' বলতে আমরা বুঝি আল্লাহর পথে রক্তারক্তি বা খুনাখুনি। কিন্তু তার ব্যাপক অর্থ হল সংগ্রাম, প্রচেষ্টা ইত্যাদি। বলা বাহুল্য, ইসলামে এমনও জিহাদ আছে, যাতে কোন প্রকার অস্ত্রের ব্যবহার নেই।

যেমন রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "আমার পূর্বে আল্লাহ যে কোন নবীকে যে কোন উম্মতের মাঝে পাঠিয়েছেন তাদের মধ্যে তাঁর (কিছু) সহযোগী ও সঙ্গী হত। তারা তাঁর সুন্নতের উপর আমল করত এবং তাঁর আদেশের অনুসরণ করত। অতঃপর তাদের পরে এমন অপদার্থ লোক সৃষ্টি হল যে, তারা যা বলত, তা করত না এবং তারা তা করত, যার আদেশ তাদেরকে দেওয়া হতো না। সুতরাং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ হাত দ্বারা জিহাদ করবে, সে মু'মিন। যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ অন্তর দ্বারা জিহাদ করবে, সে মু'মিন। এবং যে ব্যক্তি তাদের বিরুদ্ধে নিজ জিভ দ্বারা জিহাদ করবে, সে মু'মিন। আর এর পর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান নেই।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি সরঞ্জাম দিয়ে আল্লাহর পথে কোন মুজাহিদ প্রস্তুত ক'রে দিল, নিঃসন্দেহে সে ব্যক্তি স্বয়ং জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের পরিবারে উত্তমরূপে প্রতিনিধিত্ব করল, নিঃসন্দেহে সেও জিহাদ করল।" *(বুখারী মুসলিম)*

আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ইবনুল আস ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি আল্লাহর নবীর নিকট এসে বলল, 'আমি আপনার সঙ্গে আল্লাহ তাআলার কাছে নেকী পাওয়ার উদ্দেশ্যে হিজরত এবং জিহাদের বায়আত করছি।' নবী ﷺ বললেন, "তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কি কেউ জীবিত আছে?" সে বলল, 'জী হ্যাঁ; বরং দু'জনই জীবিত রয়েছে।' রসূল ﷺ বললেন, "তুমি আল্লাহ তাআলার কাছে নেকী পেতে চাও?" সে বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে তুমি তোমার পিতা-মাতার নিকট ফিরে যাও এবং উত্তমরূপে তাদের খিদমত কর।" *(বুখারী, মুসলিম)*

উভয়ের অন্য এক বর্ণনায় আছে, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে জিহাদ করার অনুমতি চাইল। তিনি বললেন, "তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছে?" সে বলল, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "অতএব তুমি তাদের (সেবা করার) মাধ্যমে জিহাদ কর।"

মা আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করাকে সর্বোত্তম কাজ মনে করি, তাহলে কি আমরা জিহাদ করব না?' তিনি বললেন, "কিন্তু (মহিলাদের জন্য) সর্বোত্তম জিহাদ হচ্ছে 'মাবরূর' (বিশুদ্ধ বা গৃহীত) হজ্জ।" *(বুখারী)*

অনুরূপ সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হল মানুষের মনের বিরুদ্ধে জিহাদ। মানুষের মন সাধারণতঃ মন্দপ্রবণ। অসৎ কামনা ও বাসনার দিকে ধাবিত হয় উল্কার মতো। সুতরাং তা দমন করা আদৌ সহজ ব্যাপার নয়। তার জন্য জিহাদ করতে হয় মানুষকে। এই জন্য মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَفْضَلُ الْجِهَادِ أَنْ يُجَاهِدَ الرَّجُلُ نَفْسَهُ وَهَوَاه).

অর্থাৎ, মানুষের মন ও কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে জিহাদ হল সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ। (সঃ জামে' ১০৯৯নং)

একইভাবে যালেম বাদশার সামনে হক কথা বলাও সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ। যেহেতু মানুষ সাধারণতঃ ক্ষমতাসীন অত্যাচারী শাসকের সামনে অত্যাচার বা প্রাণের ভয়ে হক কথা বলতে ভয় পায়। তাই যে সে ক্ষেত্রেও ভয় পায় না, সে সর্বশ্রেষ্ঠ মুজাহিদ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ).

অর্থাৎ, অত্যাচারী রাজার কাছে হক কথা বলা সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ। *(আবূ দাঊদ ৪৩৪৪, তিরমিযী ২১৭৪, নাসাঈ ৪২০৯, ইবনে মাজাহ ৪০১১নং)*

এ ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই যে, মুসলিমদের রক্ত-পিপাসু কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ উত্তম আমল। আবূ যার্র ﷺ বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল ﷺ কোন্ আমল সর্বোত্তম?' তিনি বললেন, "আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা ও তাঁর পথে জিহাদ করা।" *(বুখারী-মুসলিম)*

একদা নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন্ জিহাদ সর্বশ্রেষ্ঠ?' উত্তরে তিনি বললেন, "নিজের জান-মাল দিয়ে মুশরিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা।" (আবূ দাঊদ ১১৯৬, নাসাঈ ২৫২৬নং)

কিন্তু সর্বোত্তম জিহাদ হল, শহীদের জিহাদ। মহানবী ﷺ বলেন, "কিয়ামতে আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ জিহাদ হল তাদের, যারা প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে এবং মুখ ফিরিয়ে পেছনে দেখেও না। পরিশেষে তারা নিহত হয়। তারা বেহেশ্তের কক্ষে গড়াগড়ি দেবে। প্রতিপালক তাদেরকে দেখে হাসবেন। আর যে সম্প্রদায়কে দেখে তিনি হাসবেন, তাদের কোন হিসাব হবে না।" (ত্বাবারানী, সঃ তারগীব ১৩৭২নং)

এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, 'কোন্ জিহাদ সর্বশ্রেষ্ঠ?' উত্তরে তিনি বললেন, "যাতে তোমার ঘোড়ার পা কেটে ফেলা হয় এবং তোমার রক্ত বহানো হয়।" (ইবনে হিব্বান, সঃ তারগীব ১৩৬৫নং)

সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أفْضَلُ الشُّهَدَاءِ مَنْ سُفِكَ دَمُهُ وَعُقِرَ جَوَادُهُ).

অর্থাৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ হল সে, যার রক্ত বহানো হয় এবং তার ঘোড়ার পা কেটে ফেলা হয়। (ত্বাবারানী, সঃ জামে' ১১০৮নং)

মহানবী ﷺ বলেন,

(أفْضَلُ الشُّهَدَاءِ الَّذِينَ يُقاتِلُونَ في الصَّفِّ الأَوَّلِ فلا يَلْفِتُونَ وُجُوهَهُمْ حَتَّى يُقْتَلُوا أُولَئِكَ يَتَلبَّطُونَ

في الغُرَفِ العُلَى مِنَ الجنَّةِ يَضْحَكُ إليْهِمْ رَبُّكَ فإذا ضَحِكَ رَبُّكَ إلى عَبْدٍ في مَوْطِنٍ فلا حِسابَ عَلَيْهِ).

অর্থাৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ শহীদ হল তারা, যারা প্রথম সারিতে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করে এবং মুখ ফিরিয়ে পেছনে তাকায় না। পরিশেষে তারা নিহত হয়। তারা বেহেশ্তের কক্ষে গড়াগড়ি দেবে। প্রতিপালক তাদেরকে দেখে হাসবেন। আর যে সম্প্রদায়কে দেখে তিনি হাসবেন, তাদের কোন হিসাব হবে না। (আহমাদ, ত্বাবারানী, সঃ জামে' ১১০৭নং)

শহীদদের সর্দার

শহীদ তো অনেকে হয়েছেন এবং হবেন, কিন্তু (নবীর) পর সবচেয়ে বড় শহীদ কে? মহানবী ﷺ বলেছেন,

(سَيِّدُ الشُّهَدَاءِ حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ ، وَرَجُلٌ قَامَ إِلَى إِمَامٍ جائرٍ فَأَمَرَهُ وَنَهَاهُ فَقَتَلَهُ).

অর্থাৎ, শহীদদের সর্দার হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব এবং সেই ব্যক্তি, যে কোন স্বৈরাচারী শাসকের নিকট দাঁড়িয়ে তাকে (ভাল কাজের আদেশ) ও (মন্দ কাজে) নিষেধ করলে সে তাকে হত্যা করে। (তিরমিযী, হাকেম, সঃ তারগীব ২৩০৮নং)

ইসলামের ইতিহাসে উহুদের দিন ছিল মুসলিমদের জন্য আল্লাহর তরফ থেকে পরীক্ষা ও যাচাই-বাছাই করার দিন। যুদ্ধের প্রথম দিকে মুসলিম বাহিনীর বিজয় পরিলক্ষিত হলেও পরিশেষে তীরন্দাজ বাহিনীর নববী নির্দেশ লংঘন করার ফলে পিছন থেকে কাফেররা পাল্টা আক্রমণ চালালে মুসলিমগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েন। ফলে শত্রু আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে পৌঁছতে সক্ষম হয়। আঘাতে তাঁর নিচের চোয়ালের ডান দিকের (ঠিক মাঝের পার্শ্ববর্তী) দুটি দাঁত ভেঙ্গে যায় এবং তাঁর কপাল বিক্ষত হয়। চোট লাগে তাঁর চেহারায়। গালের উপরি অংশে শিরস্ত্রাণের দুটি কড়া ঢুকে যায়।। তা দাঁত দিয়ে তুলতে গিয়ে আবূ উবাইদা ؓ-এর মাঝের দাঁত দুটি ভেঙ্গে যায়।

এ যুদ্ধে মুসলিম বাহিনীর ৭০ জন লোক শহীদ হন। তাঁদের মধ্যে 'আসাদুল্লাহ' বা আল্লাহর সিংহ (মহানবী ﷺ-এর চাচা) হামযাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব ؓ অন্যতম। বলা হয় যে, শত্রুপক্ষের হিন্দ বিন্তে উৎবা তাঁর বুক চিরে কলিজা চিবিয়ে রাগ মিটায়। তা গিলে খাওয়ার ইচ্ছা থাকলেও না পেরে ফেলে দেয়। তাঁর নাক-কান কেটে হার বানিয়ে গলায় পরে!

ইসলাম যখন দুর্বল ছিল, হামযাহ ؓ তখন তার বিপুল সহযোগিতা করেছিলেন। বদর যুদ্ধে একাধিক দুশমন-নিধন ক'রে ইসলাম ও তার রসূলকে বিজয়ী করতে সাহায্য করেছিলেন। আর তারই প্রতিশোধ স্বরূপ বিশেষভাবে বিশেষ চুক্তিতে আবদ্ধ 'অহশী' ক্রীতদাস তাঁকে শহীদ করে। তাঁর মর্মান্তিক শাহাদতে মহানবী ﷺ ভীষণভাবে মর্মাহত হন। তিনি তাঁকে খেতাব দিয়ে বলেন, 'সাইয়িদুশ শুহাদা' বা শহীদদের সর্দার। অর্থাৎ, এই উম্মতের যত মুসলিম শহীদ হয়েছেন, তাঁদের সর্দার তিনি। অথবা উহুদে ৭০ জন শহীদদের সর্দার তিনি।

'হিন্দা খেয়েছে কলিজা চিবায়ে জিন্দা থেকেছি আমি,
তবুও যে মোর কলিজার জোশ যায়নিকো কভু থামি।
ঈমানের তেজে চির বলীয়ান আমি রে জিন্দা দিল,
আমার এ তেজ পারে না দমাতে শয়তান আজাজিল।'

সর্বশ্রেষ্ঠ দান

দান করার গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য ইসলামে অনেক। কিন্তু ইসলামে কোন্ দান সবচেয়ে উত্তম?

১। নিজের প্রয়োজন থাকা অবস্থায় মরণ আসার পূর্বে করা দান সর্বোত্তম দান।

আবূ হুরাইরাহ ؓ বলেন, এক ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে বলল, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন্ সাদ্‌কাহ নেকীর দিক দিয়ে সব থেকে বড়?' তিনি বললেন,

((أنْ تَصَدَّقَ وَأنتَ صَحيحٌ شَحيحٌ ، تَخشَى الفَقرَ وتَأمُلُ الغِنَى ، وَلاَ تُمهِلْ حَتَّى إِذَا بَلَغتِ الحُلقُومَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا ، وقَدْ كَانَ لِفُلانٍ)). مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

"তোমার সে সময়ের সাদকাহ করা (বৃহত্তম নেকীর কাজ) যখন তুমি সুস্থ থাকবে, মালের লোভ অন্তরে থাকবে, তুমি দরিদ্রতার ভয় করবে এবং ধন-দৌলতের আশা রাখবে। আর তুমি সাদকাহ করতে বিলম্ব করো না। পরিশেষে যখন তোমার প্রাণ কণ্ঠাগত হবে, তখন বলবে, 'অমুকের জন্য এত, অমুকের জন্য এত। অথচ তা অমুক (উত্তরাধিকারীর) হয়েই গেছে।" (বুখারী-মুসলিম)

মহান আল্লাহ এমন দানের প্রশংসা করেছেন আল-কুরআনে,

{لَيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّواْ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَالْمَلآئِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُواْ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاء والضَّرَّاء وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ} (١٧٧) سورة البقرة

অর্থাৎ, পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে তোমাদের মুখ ফেরানোতে কোন পুণ্য নেই; কিন্তু পুণ্য আছে আল্লাহ, পরকাল, ফিরিশ্তাগণ, সমস্ত কিতাব এবং নবীগণকে বিশ্বাস করলে এবং অর্থের প্রতি আসক্তি থাকা সত্ত্বেও আত্মীয়-স্বজন, পিতৃহীন, অভাবগ্রস্ত, (এতীম-মিসকীন) মুসাফির, সাহায্যপ্রার্থী (ভিক্ষুক)গণকে এবং দাস মুক্তির জন্য দান করলে, নামায যথাযথভাবে পড়লে ও যাকাত প্রদান করলে, প্রতিশ্রুতি পালন করলে এবং দুঃখ-দৈন্য, রোগ-বালা ও যুদ্ধের সময় ধৈর্যধারণ করলে। এরাই তারা যারা সত্যপরায়ণ এবং ধর্মভীরু। (বাক্বারাহ ঃ ১৭৭)

{وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا} (٨) سورة الإنسان

অর্থাৎ, আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, ইয়াতীম ও বন্দীকে অন্নদান করে। (দাহর ঃ ৮)

স্বল্প অর্থের মালিক হয়েও তা থেকে দান করার মাহাত্ম্য অনেক। একদা মহানবী ﷺ বললেন, "এক দিরহাম এক লক্ষ দিরহাম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।" এক ব্যক্তি বলল, 'তা কী ক'রে হয়, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "এক ব্যক্তির প্রচুর মাল আছে। সে তার এক কোণ নিয়ে ১ লাখ দিরহাম দান করে। আর অন্য এক ব্যক্তি মাত্র ২ দিরহামের মালিক। সে তা হতেই ১ দিরহাম দান করে।" *(নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সহীহ তারগীব ৮৮৩নং)*

২। স্বচ্ছলতা অবস্থায় দান, সর্বশ্রেষ্ঠ দান। যাতে দান ক'রে মানুষ অভাবগ্রস্ত না হয়ে যায়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((اليَدُ العُلْيَا خَيْرٌ مِنَ اليَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنىً ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّهُ)). رواه البخاري

অর্থাৎ, উপরের (দাতা) হাত নিচের (গ্রহীতা) হাত অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। যাদের ভরণ-পোষণ তোমার দায়িত্বে আছে তাদেরকে আগে দাও। প্রয়োজনের অতিরিক্ত সম্পদ থেকে সাদকাহ করা উত্তম। যে ব্যক্তি (হারাম ও ভিক্ষা করা থেকে পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন এবং যে পরমুখাপেক্ষিতা থেকে বেঁচে থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে অভাবশূন্য ক'রে দেন। *(বুখারী)*

৩। নিজের স্ত্রী-পরিজনের উপর ব্যয়িত অর্থ সওয়াবের দিক থেকে সবচেয়ে বড়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبيلِ اللّهِ ، وَدِينار أَنْفَقْتَهُ فِي رَقَبَةٍ ، وَدِينارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ ، وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ ، أَعْظَمُهَا أَجْراً الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ)). رواه مسلم

অর্থাৎ, এক দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) তুমি আল্লাহর পথে (জিহাদে) ব্যয় কর, এক দীনার ক্রীতদাস মুক্ত করার কাজে ব্যয় কর, এক দীনার কোন মিসকীনকে সদকাহ কর এবং এক দীনার তুমি পরিবার পরিজনের জন্য ব্যয় কর। এ সবের মধ্যে ঐ দীনারের বেশী নেকী রয়েছে, যেটি তুমি পরিবার-পরিজনের উপর ব্যয় করবে। *(মুসলিম)*

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, ফরয সাদকা নিজের সেই আত্মীয়কে দেওয়া যাবে না, যার ভরণ-পোষণ করা ফরয। যেমন নিজের মা-বাপ, ছেলে-মেয়ে বা স্ত্রীকে যাকাত দিয়ে কোন বিষয়ে সাহায্য করা যাবে না। বরং তাদের জন্য নিজের খাস মাল ব্যয় করতে হবে।

৪। জিহাদের জন্য কৃত দান সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ : دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ ، وَدينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى دَابَّتِهِ فِي سَبيلِ اللّه ، وَدِينارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى أَصْحَابِهِ فِي سَبيلِ اللّهِ)). رواه مسلم

অর্থাৎ, (সওয়াবের দিক দিয়ে) সর্বশ্রেষ্ঠ দীনার সেইটি, যে দীনারটি মানুষ নিজ সন্তান-সন্ততির উপর ব্যয় করে, যে দীনারটি আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদে) তার সওয়ারীর উপর ব্যয় করে এবং সেই দীনারটি যেটি আল্লাহর পথে তার সঙ্গীদের পিছনে খরচ করে।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন,

((أَفْضَلُ الصَّدَقَاتِ ظِلُّ فُسْطَاطٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَمَنِيحَةُ خَادِمٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ ، أَوْ طَرُوقَةُ فَحلٍ فِي سَبِيلِ اللّهِ)). رواه الترمذي

অর্থাৎ, সর্বোত্তম সাদকাহ আল্লাহর রাহে তাঁবুর ছায়ার ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া, (যার দ্বারা মুজাহিদ উপকৃত হয়)। আর আল্লাহর রাস্তায় কোন খাদেম দান করা (যার দ্বারা মুজাহিদ সেবা গ্রহণ করে। কিংবা আল্লাহর পথে (গর্ভধারণের উপযুক্ত হৃষ্টপুষ্ট) উটনী দান করা, (যার দুধ দ্বারা মুজাহিদ উপকৃত হয়)। *(তিরমিযী)*

৫। এমন নিকটাত্মীয়কে দান, যে মনে মনে শত্রুতা পোষণ করে।

নিকটাত্মীয় বা রক্তের সম্পর্কের সবচেয়ে নিকতম যারা, তাদেরকে দান করা ভাল। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা দাতার গোপন শত্রু, যারা সামনে প্রশংসা করে, পিছনে নিন্দা গায়। যারা দাতার সাথে 'উপরে উপরে সালামাল্কি, ভিতরে ভিতরে হারামজাদকি'র চাল চালে। যারা দাতার পিছনে গীবত করে, চুগলখোরি করে। যারা দাতার প্রতি মনের ভিতরে তুষের আগুনের মতো হিংসা চেপে রাখে। যারা দাতার সুনামে জ্বলে ওঠে এবং বদনামে খোশ হয়। তাদেরকে দান করা সর্বশ্রেষ্ঠ দান। যে দাতা পারে কবির মতো নিজের কুৎসিত প্রতিপক্ষের দানে সুন্দর প্রতিদান দিতে, তার দান সর্বোৎকৃষ্ট দান। কবি বলেছেন,

"আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা, আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
যে মোরে করিল পথের বিবাগী ;
পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি ;
দীঘল রজনী তার তরে জাগি ঘুম যে হরেছে মোর ;
আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা, আমি বাঁধি তার ঘর।
আমার এ কূল ভাঙিয়াছে যেবা আমি তার কূল বাঁধি,
যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি ;
যে মোরে দিয়েছে বিষ-ভরা বাণ,
আমি দেই তারে বুকভরা গান ;
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম ভর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
মোর বুকে যেবা বিঁধেছে আমি তার বুক ভরি,
রঙিন ফুলের সোহাগ-জড়ানো ফুল-মালঞ্চ ধরি।......"

যে দুশমনি করে, সে হাজার নিকটাত্মীয় হলেও তাকে ক্ষমা ক'রে দান দেওয়া সহজ ব্যাপার নয়। যে অপমান পাওয়ার যোগ্য, তাকে দান দেওয়া সত্যই মহৎ দান। সত্যই সে

দাতা মহান। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ أَفْضَلَ الصَّدَقَةِ الصَّدَقَةُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الْكَاشِحِ).

অর্থাৎ, নিশ্চয় সর্বশ্রেষ্ঠ সাদকা সেই সাদকা, যা শত্রুতাপোষণকারী নিকটাত্মীয়কে করা হয়। (আহমাদ ২৩৫৩০, হাকেম ১৪৭৫, ত্বাবারানী, বাইহাক্বী, দারেমী ১৬৭৯নং)

এ বড় উদারতার নীতি। যে নীতি প্রয়োগ করতে আদেশ দিয়ে মহানবী ﷺ বলেছেন, "তোমার সঙ্গে যে আত্মীয়তা ছিন্ন করেছে, তুমি তার সাথে তা বজায় কর, তোমাকে যে বঞ্চিত করেছে, তুমি তাকে প্রদান কর এবং যে তোমার প্রতি অন্যায়াচরণ করেছে, তুমি তাকে ক্ষমা ক'রে দাও।" (আহমাদ, হাকেম, ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ৮৯১নং)

নিঃসন্দেহে এ নীতি, এ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ নীতি। কবি বলেছেন,

'যে তোমাকে ডাকে না হে, তারে তুমি ডাকো ডাকো,
তোমা হতে দূরে যে যায়, তারে তুমি রাখো রাখো।'

৬। পানি দান করা।

পানি একটি বড় নিয়ামত। 'জলের অপর নাম জীবন।' তাই পানি দান করা মানে, জীবন দান করা। তাই যেখানে পানি নেই, সেখানে পানি দান, পিপাসায় পানি দান, সর্বশ্রেষ্ঠ দান।

কুয়া খুঁড়ে দেওয়া, কল ক'রে দেওয়া অথবা অন্য কোনভাবে বিনামূল্যে পানির ব্যবস্থা ক'রে দেওয়ার মাহাত্ম্য দান হিসাবে সর্বশ্রেষ্ঠ।

সা'দ বিন উবাদাহ ﷺ বলেন, একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন্ দান সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ?' তিনি উত্তরে বললেন, "পানি পান করানো।" *(আবু দাউদ, সহীহ ইবনে মাজাহ ২৯৭১ নং)*

অন্য বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! উম্মে সা'দ (আমার মা) মারা গেছে। (আমি তার তরফ থেকে দান করতে চাই।) অতএব কোন্ দান সবচেয়ে উত্তম হবে?' তিনি বললেন, "পানি।"

বর্ণনাকারী বলেন, সুতরাং সা'দ ﷺ একটি কুয়া খনন ক'রে বললেন, 'এটি উম্মে সা'দের।' *(সহীহ আবু দাউদ ১৪৭৪ নং)*

পানি দান সর্বশ্রেষ্ঠ বলেই, তা কুকুরকে দান করে একজন বেশ্যাও ক্ষমা লাভ করতে পারে! "কোন এক সময় একটি কুকুর একটি কূপের চারিপাশে ঘোরা-ফিরা করছিল। পিপাসা তাকে মৃতপ্রায় ক'রে তুলেছিল। পিপাসায় সে ভিজে মাটি চাঁটছিল। (এই অবস্থায়) হঠাৎ বনী ঈস্রাঈলের বেশ্যাদের মধ্যে এক বেশ্যা তাকে দেখতে পেল। অতঃপর সে তার চামড়ার মোজা খুলে তাতে (কূপ থেকে) পানি উঠিয়ে তাকে পান করাল। সুতরাং এই আমলের কারণে তাকে ক্ষমা করা হল।" (বুখারী, মুসলিম)

৭। সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা করা।

দান বা সাদকা কেবল অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়। বরং অন্য সৎকর্ম করেও সাদকা করা যায়। মহানবী ﷺ বলেন, "প্রত্যহ সকালে তোমাদের প্রত্যেক অস্থি-গ্রন্থির উপর (তরফ থেকে) দাতব্য সদকাহ রয়েছে; সুতরাং প্রত্যেক তাসবীহ হল সদকাহ,

প্রত্যেক তাহমীদ (আল হামদু লিল্লা-হ পাঠ) সদকাহ, প্রত্যেক তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ) সদকাহ, প্রত্যেক তকবীর (আল্লা-হু আকবার পাঠ) সদকাহ, সৎকাজের আদেশকরণ সদকাহ এবং মন্দ কাজ হতে নিষেধকরণও সদকাহ। আর এসব থেকে যথেষ্ট হবে চাশ্তের দুই রাকআত নামায।" (মুসলিম ৭২০ নং)

মোটকথা, প্রত্যেকটি তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ বলা) এক একটি সদকাহ স্বরূপ। প্রত্যেকটি তাকবীর (আল্লাহু আকবার বলা) এক একটি সদকাহ স্বরূপ, প্রত্যেকটি তাহলীল (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা) এক একটি সদকাহ স্বরূপ এবং প্রত্যেকটি তাহমীদ (আলহামদু লিল্লাহ বলা) এক একটি সদকাহ স্বরূপ। সৎকাজের আদেশ একটি সদকাহ, মন্দ কাজে বাধা দান একটি সদকাহ, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা একটি সদকাহ এবং স্ত্রী-মিলন করাও একটি সদকাহ! মিষ্টিমুখে মুসলিম ভায়ের সাথে সাক্ষাৎ করলে সদকাহ করা হয়। *(মুসলিম, মিশকাত ১৮৯৪নং)* ন্যায় বিচার করে দিলে সদকাহ করা হয়, কাউকে নিজের সওয়ারীতে চড়িয়ে নিলে সদকাহ করা হয়। ভালো কথা বললে সদকাহ করা হয় এবং নামাযের জন্য প্রত্যেক পদক্ষেপ হয় সদকাহ স্বরূপ। *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ১৮৯৬নং)*

কিন্তু এই শ্রেণীর কর্মাবলীর মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা কর্মের মাধ্যমে কৃত সাদকা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ).

অর্থাৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ সাদকা হল আপোসের মাঝে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠা করা। *(ত্বাবারানী, বাযযার, সিঃ সহীহাহ ২৬৩৯নং)*

বরং নফল নামায-রোযা ও সাদকা অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হল আপোসের মাঝে সদ্ভাব সৃষ্টি করার কর্ম। একদা মহানবী ﷺ বললেন, "আমি তোমাদেরকে এমন উচ্চ মর্যাদার কথা বলে দেব না কি, যা নামায, রোযা ও সাদকা অপেক্ষা উত্তম?" লোকেরা বলল, 'অবশ্যই।' তিনি বললেন, "আপোসে সদ্ভাব রাখা। আর সদ্ভাব নষ্ট হওয়াটাই সর্বনাশা।" *(তিরমিযী ২৫০৯নং)*

সংসারে ও পরিবারে যে ফুলের মালা ছিন্ন হয়ে যায়, সে মালাকে পুনরায় গেঁথে ফেলা অবশ্যই মহৎ কাজ। কিন্তু যে ফুল পচে যায়, সে ফুলকে মালায় গেঁথে গোটা মালাটাকে ঘৃণ্য করা মোটেই ভাল কাজ নয়। সদ্ভাব সৃষ্টি ও বজায় করা ভাল, তবে অন্যায়ের সাথে আপোস অথবা অপরাধীর সাথে সদ্ভাব নিশ্চয়ই এর পর্যায়ভুক্ত নয়।

সদ্ভাব যারা নষ্ট করে, তারা নিশ্চয় সর্বনাশী লোক। তরকারির মসলা নিয়ে বহু ভোজ-অনুষ্ঠানে আহূতদের মাঝে তর্কাতর্কি করতে খুব কম দেখা যায়, কিন্তু দ্বীনের মসলা নিয়ে পরিবার ও জামাআতের মাঝে কলহ ক'রে সদ্ভাব নষ্ট করতে দেখা যায় খুব বেশি। আপোসের সদ্ভাব ভেস্তে যাক, তাদের মনে 'নেতাভাব'টা তো অক্ষুণ্ণ থাক। নেতৃত্ব ও যশের লোভ তাদের মাঝে সদ্ভাবের অভাব সৃষ্টি করে। তাদের 'আমিত্ব' নষ্ট করে ভ্রাতৃত্ব, আত্মীয়তা ও বন্ধুত্ব, নষ্ট করে দ্বীন ও ধর্ম।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ছাগলের পালে দু'টি ক্ষুধার্ত নেকড়ে বাঘকে ছেড়ে দিলে ছাগলের যতটা ক্ষতি করে, তার চেয়ে মানুষের সম্পদ ও সম্মানের প্রতি লোভ-লালসা তার দ্বীনের জন্য বেশী ক্ষতিকারক।" *(তিরমিযী)*

সর্বশ্রেষ্ঠ হিজরত

আল্লাহর রাস্তায় হিজরত করার সওয়াব অবিদিত নয়। আল্লাহর জন্য এবং তাঁর দ্বীন পালন করার জন্য স্বদেশ ত্যাগ করার মাহাত্ম্য অনেক। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَالَّذِينَ هَاجَرُواْ فِي اللّهِ مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُواْ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَلَأَجْرُ الآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ} (٤١) سورة النحل

অর্থাৎ, যারা অত্যাচারিত হবার পর আল্লাহর পথে হিজরত (স্বদেশ ত্যাগ) করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়ায় উত্তম আবাস প্রদান করব। আর পরকালের পুরস্কারই অধিক বড়; যদি তারা জানত! (নাহল ঃ ৪১)

{وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ} (٥٨) سورة الحج

অর্থাৎ, যারা হিজরত করেছে আল্লাহর পথে এবং পরে (শত্রুর হাতে) নিহত হয়েছে অথবা মৃত্যুবরণ করেছে তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন। আর নিশ্চয় আল্লাহ; তিনিই তো সর্বোৎকৃষ্ট রুযীদাতা। (হাজ্জ ঃ ৫৮)

কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ হিজরত (ত্যাগ) কী?

সর্বশ্রেষ্ঠ হিজরত (ত্যাগ) হল, মহান আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তু ত্যাগ করা। এ কথাই বলেছেন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ ﷺ। (আবূ দাউদ ১৪৪৯, নাসাঈ ২৫২৬, হাকেম, সঃ তারগীব ১৩১৮নং)

রূপকার্থে প্রকৃত মুহাজির সম্বন্ধে আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "আমি কি তোমাদেরকে 'মুমিন' কে---তা বলে দেব না? (প্রকৃত মুমিন হল সেই), যার (অত্যাচার) থেকে লোকেরা নিজেদের জান-মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। (প্রকৃত) মুসলিম হল সেই ব্যক্তি, যার জিভ ও হাত হতে লোকেরা শান্তি লাভ করতে পারে। (প্রকৃত) মুজাহিদ হল সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর আনুগত্য করতে নিজের মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করে। আর (প্রকৃত) মুহাজির (হিজরতকারী) হল সেই ব্যক্তি, যে সমস্ত পাপাচরণকে হিজরত (বর্জন) করে।" *(আহমাদ ৬/২১, প্রমুখ, সিলসিলাহ সহীহহাহ ৫৪৯নং)*

সর্বশ্রেষ্ঠ রুযী

দুনিয়ার বুকে ভাগ্য অনুযায়ী মানুষ এক এক শ্রেণীর রুযী পেয়ে থাকে। কেউ পায় পর্যাপ্ত রুযী, কেউ পায় অপর্যাপ্ত। কেউ পায় এমন রুযী, যাতে তার যথেষ্ট হয়। আবার কেউ যথেষ্ট রুযী না পেয়ে একবেলা খেয়ে অন্য বেলায় উপবাস করে। এ মহান আল্লাহরই বিলি-বন্টন। তিনি বলেছেন,

{إِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا} (٣٠) سورة الإسراء

অর্থাৎ, তোমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং যার জন্য ইচ্ছা তা হ্রাস করেন; নিশ্চয় তিনি তাঁর দাসদেরকে ভালভাবে জানেন ও দেখেন। (বানী ইস্রাঈল ঃ ৩০)

{لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} (١٢)

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই নিকট। তিনি যার প্রতি ইচ্ছা, তার রুযী বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন। নিশ্চয়ই তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত। (শূরা ঃ ১২)

{أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ} (٣٧)

অর্থাৎ, ওরা কি লক্ষ্য করে না যে, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা তার রুযী বর্ধিত করেন অথবা তা হ্রাস করেন। এতে অবশ্যই বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে। (রূম ঃ ৩৭)

{قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاء وَيَقْدِرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} (٣٦) سورة سبأ

অর্থাৎ, তুমি বল, 'আমার প্রতিপালক যার জন্য ইচ্ছা তার রুযী বর্ধিত করেন অথবা তা সীমিত করেন; কিন্তু অধিকাংশ লোক এ বোঝে না।' (সাবা' ঃ ৩৬)

রুযী-রুটীর সংকীর্ণতা নিশ্চয়ই ভালো নয়। যেমন ভালো নয় ধন-সম্পদের প্রাচুর্য। যেহেতু ধন দিয়ে ও না দিয়ে মহান আল্লাহ বান্দার মন পরীক্ষা করেন। প্রাচুর্যের অহংকার মানুষকে অন্ধ ক'রে তুলতে পারে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاء إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ} (٢٧) سورة الشورى

অর্থাৎ, আল্লাহ তাঁর সকল দাসকে রুযীতে প্রাচুর্য দিলে তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করত; কিন্তু তিনি যে পরিমাণ ইচ্ছা সে পরিমাণই দিয়ে থাকেন। তিনি তাঁর দাসদেরকে সম্যক জানেন এবং দেখেন। (শূরা ঃ ২৭)

সুতরাং মাঝামাঝি রুযী অবশ্যই উত্তম। যথেষ্ট পরিমাণ রুযীই সর্বশ্রেষ্ঠ রুযী। এ কথা বলেছেন, আমাদের প্রিয় নবী ﷺ,

(خَيْرُ الرِّزْقِ الْكَفَافُ).

অর্থাৎ, যথেষ্ট পরিমাণের রুযী সর্বশ্রেষ্ঠ। (সিঃ সহীহাহ ১৮৩৪নং)

প্রয়োজন পরিমাণ রুযীর মালিকই দুনিয়ায় প্রকৃত সুখী। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ أَصْبَحَ مِنْكُمْ آمِناً فِي سِربِهِ ، مُعَافَىً فِي جَسَدِهِ ، عِنْدَهُ قُوتُ يَوْمِهِ ، فَكَأَنَّمَا حِيزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا)). رواه الترمذي

"তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি তার ঘরে অথবা গোষ্ঠীর মধ্যে নিরাপদে ও সুস্থ শরীরে সকাল করেছে এবং তার কাছে একদিনের খাবার আছে, তাকে যেন পার্থিব সমস্ত সম্পদ দান করা হয়েছে।" *(তিরমিযী)*

তিনি আরো বলেছেন,

((قَدْ أَفْلَحَ مَنْ أَسْلَمَ ، وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً ، وَقَنَّعَهُ اللهُ بِمَا آتَاهُ)). رواه مسلم

"সে ব্যক্তি সফলকাম, যে ইসলাম গ্রহণ করেছে, তাকে পরিমিত রুযী দেওয়া হয়েছে এবং আল্লাহ তাকে যা দিয়েছেন তাতে তাকে তুষ্ট করেছেন।" *(মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন,

((طُوبَى لِمَنْ هُدِيَ لِلإِسْلاَمِ ، وَكَانَ عَيْشُهُ كَفَافاً وَقَنِعَ)). رواه الترمذي

"তার জন্য শুভ সংবাদ যাকে ইসলামের পথ দেখানো হয়েছে, পরিমিত জীবিকা দেওয়া হয়েছে এবং সে (যা পেয়েছে তাতে) পরিতুষ্ট আছে।" *(তিরমিযী)*

অবশ্যই রুযী লাভের স্বাচ্ছন্দ্যে শর্ত হল, যা পাওয়া গেছে, তাতেই পরিতুষ্টি প্রকাশ। নচেৎ হৃদয়ে পাওয়া জিনিস নিয়ে পরিতৃপ্তি ও পরিতুষ্টি না থাকলে সাত-রাজার-ধন পেয়েও দরিদ্র-কাঙ্গাল হয়ে জীবনযাপন করতে হয় মানুষকে।

পরিমিত জীবিকা সর্বশ্রেষ্ঠ বলেই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি এই বলে প্রার্থনা করেছেন,

((اللَّهُمَّ اجْعَلْ رِزْقَ آلِ مُحَمَّدٍ قُوتاً)). متفقٌ عَلَيْهِ

রাসূলুল্লাহ ﷺ দু'আ করতেন, "হে আল্লাহ! মুহাম্মাদ ﷺ-এর পরিবার-পরিজনের জন্য প্রয়োজনীয় জীবিকা প্রদান কর।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

সর্বশ্রেষ্ঠ উপার্জন, সর্বোৎকৃষ্ট আহার

সর্বশ্রেষ্ঠ উপার্জন হল নিজ পরিশ্রমের উপার্জন। সবচেয়ে বেশি পবিত্র আহার হল, নিজের হাতে উপার্জিত অর্থে ক্রীত আহার।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(مَا أَكَلَ أَحَدٌ طَعَامًا قَطُّ خَيْرًا مِنْ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ وَإِنَّ نَبِيَّ اللَّهِ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَام كَانَ يَأْكُلُ مِنْ عَمَلِ يَدِهِ).

"নিজের হাতের উপার্জন থেকে উত্তম খাবার কেউ কখনো খায়নি। আল্লার নবী দাউদ عليه السلام নিজ হাতের উপার্জন থেকে খেতেন।" *(বুখারী ২০৭২নং)*

তিনি আরো বলেন,

(إِنَّ أَطْيَبَ مَا أَكَلْتُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ وَإِنَّ أَوْلَادَكُمْ مِنْ كَسْبِكُمْ).

"তোমরা যে খাদ্য ভক্ষণ কর তার মধ্যে সবচেয়ে উত্তম খাদ্য হল তোমাদের নিজের হাতে কামাই করা খাদ্য। আর তোমাদের সন্তানগণ তোমাদের উপার্জিত ধনের পর্যায়ভুক্ত।" (আহমাদ, তিরমিযী ১৩৫৮, নাসাঈ, বাইহাক্বী, সহীহুল জামে' ১৫৬৬ নং)

মহানবী ﷺ বলেন, "সবচেয়ে পবিত্র উপার্জন হল, যা মানুষের নিজ হাতের কাজ এবং সদুপায়ে ব্যবসার মাধ্যমে করা হয়।" (আহমাদ ১৫৮৩৬নং প্রমুখ)

অবশ্য কেউ যদি অপরের নিকট পরিশ্রমের কাজ ক'রে বেতনভোগী হয়, তাহলে তাতে শর্ত হল, সে যেন নিজ কর্তব্যে মালিকের হিতাকাঙ্ক্ষী হয় এবং কাজে কোন প্রকার ফাঁকি না

দেয়।

মহানবী ﷺ বলেন,

(خَيْرُ الْكَسْبِ كَسْبُ يَدِ الْعَامِلِ إِذَا نَصَحَ).

"শ্রেষ্ঠ উপার্জন হল (শ্রমজীবীর) হাতের উপার্জন; যদি সে (তার কাজে) হিতাকাঙ্ক্ষী হয়।" *(আহমাদ, সহীহুল জামে' ৩২৮৩নং)*

মহানবী ﷺ বলেন,

(إِنَّ اللهَ تَعَالَى يُحِبُّ إِذَا عَمِلَ أَحَدُكُمْ عَمَلاً أَنْ يُتْقِنَهُ).

"অবশ্যই আল্লাহ পছন্দ করেন যে, তোমাদের কেউ কোন কাজ করলে সে যেন তা নৈপুণ্যের সাথে করে।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১১১৩নং)*

শর্ত পালন না হলে সর্বোৎকৃষ্ট খাদ্য সর্বনিকৃষ্ট খাদ্যে পরিণত হয়ে যাবে।

সর্বনিকৃষ্ট উপার্জন

« شَرُّ الْكَسْبِ مَهْرُ الْبَغِيِّ وَثَمَنُ الْكَلْبِ وَكَسْبُ الْحَجَّامِ ».

অর্থাৎ, সবচেয়ে নিকৃষ্ট উপার্জন হল বেশ্যার বিনিময়, কুকুরের মূল্য এবং হাজামের কামাই। (মুসলিম ৪০৯৪নং)

রাসূলুল্লাহ ﷺ কুকুরের মূল্য, ব্যভিচারের বিনিময় এবং গণকের পারিতোষিক গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। *(বুখারী ও মুসলিম)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "মদের মূল্য হারাম, ব্যভিচারের উপার্জন হারাম, কুকুরের মূল্য হারাম, তবলা হারাম---।" *(ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৮০৬নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, আমাদের প্রিয় নবী ﷺ কুকুরের মূল্য, বেশ্যাবৃত্তির কামাই ও গণকের উপার্জন গ্রহণ ও ভক্ষণ করতে নিষেধ করেছেন। *(সহীহুল জামে' ৬৯৫১নং)*

তিনি বেশ্যাবৃত্তির মাধ্যমে কামানো অর্থকে 'খাবীষ' বা অপবিত্র বলেছেন। *(সহীহুল জামে' ৩০৭৭নং)*

কখনো বলেছেন ঐ উপার্জন হল হারাম। *(সহীহুল জামে' ৩০৭৬নং)*

তিনি বলেছেন, "বেশ্যাবৃত্তির অর্থ হালাল নয়।" *(আবূ দাউদ ৩৪৮৪নং)*

শুধু মহিলা বেশ্যাই নয়, বরং পুরুষ যৌনকর্মীরও (!) যৌনকর্মের মাধ্যমে এবং বেশ্যা-দালালের দালালি-কর্মের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ সবচেয়ে বেশি নিকৃষ্ট।

অবশ্য দূষিত রক্ত নির্গমনকারী হাজামের উপার্জন হারাম বা অপবিত্র নয়। যেহেতু মহানবী ﷺ নিজে দূষিত রক্ত বের করিয়ে হাজ্জামকে তার পারিশ্রমিক প্রদান করেছেন। যদি তার কামাই অপবিত্র হত, তাহলে তিনি তা প্রদান করতেন না। *(আবূ দাউদ ৩৪২৩নং)*

যেমন যে কুকুর পাহারা, শিকার ও অপরাধী অন্বেষণের কাজে লাগে, সেই প্রশিক্ষিত কুকুরের মূল্য হারাম নয়।

বাড়ির সর্বশ্রেষ্ঠ মাল

একটি বাড়িতে টাকা-পয়সা থেকে আরম্ভ ক'রে বিভিন্ন ধরনের মাল-ধন থাকে। আর সে সবের হিফাযতের দায়িত্ব থাকে স্ত্রীর উপর; বিশেষ ক'রে স্বামী যখন বাড়ির বাইরে থাকে। মাল যেহেতু স্বামীর, সেহেতু তা খরচ করার জন্য তার অনুমতি চাই, চাহে সে তা নিজের প্রয়োজনে খরচ করুক অথবা অন্য কাউকে দান করুক।

অনেকে ধারণা করে, খাবার নগণ্য মাল। অতএব তা স্বামীর বিনা অনুমতিতেও দান করা চলবে। কিন্তু সে ধারণা ঠিক নয়। যেহেতু আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(وَلا تُنْفِقَنَّ امْرَأَةٌ شَيْئًا مِنْ بَيْتِهَا إِلا بِإِذْنِ زَوْجِهَا).

"স্বামীর অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রী যেন স্বামীর ঘরের কিছু অবশ্যই খরচ না করে।" বলা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! খাবারও না?' তিনি বললেন,

(ذَلِكَ أَفْضَلُ أَمْوَالِنَا).

"তা তো আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ মাল।" *(তিরমিযী, সহীহ তারগীব ৯৩১নং)*

সবচেয়ে প্রিয় খাবার

মানুষের নিকট নয়, মহান আল্লাহর নিকট মানুষের সবচেয়ে প্রিয় খাবার কোন্টা? যে খাবারে অনেক হাত পড়ে।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَحَبُّ الطَّعَامِ إِلَى اللهِ مَا كَثُرَتْ عَلَيهِ الأَيدِي).

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট প্রিয়তম খাবার হল সেটা, যার উপর অনেক হাত পড়ে। (আবূ য়্যা'লা, ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ৮৯৫নং)

মহান আল্লাহ একই খাবারে বেশি হাত পড়াকে পছন্দ করেন। (সিঃ সহীহাহ ৬৬৪নং) তিনি চান, মানুষ এক সঙ্গে জামাআতবদ্ধভাবে একই প্লেট থেকে আহার করুক।

জামাআতবদ্ধভাবে এক পাত্রে আহার করলে খাবার কম থাকলেও তাতে বর্কত হবে। মহানবী ﷺ বলেন, "একজনের খাবার ২ জনের জন্য, ২ জনের খাবার ৪ জনের জন্য এবং ৪ জনের খাবার ৮ জনের জন্য যথেষ্ট।" *(মুসলিম ২০৫৯নং প্রমুখ)*

তিনি বলেন, "তোমরা এক সাথে খাও এবং পৃথক পৃথক খেয়ো না। একজনের খাবার ২ জনের জন্য যথেষ্ট।" *(ইবনে মাজাহ ৩২৮৬, সহীহুল জামে' ৪৫০০নং)*

একদা সাহাবাগণ বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা খাই, কিন্তু পরিতৃপ্ত হই না। (তার কারণ কী?)' তিনি বললেন, "সম্ভবতঃ তোমরা পৃথক পৃথক খাও।" তাঁরা বললেন, 'জী হ্যাঁ।' তিনি বললেন, "তাহলে তোমরা খাবারে এক সাথে বস এবং আল্লাহর নাম নাও, তাহলে তোমাদের খাবারে বর্কত হবে।" *(আহমাদ ১৫৬৪৮, আবূ দাঊদ ৩৭৬৪, ইবনে মাজাহ ৩২৮৬, সহীহুল জামে' ১৪২নং)*

এক সাথে এক পাত্রে খাওয়া হল সম্প্রীতির পরিচয়। মুসলিমদের পারস্পরিক সম্প্রীতি অবশ্যই মহান আল্লাহর কাছে প্রিয় জিনিস।

সর্বনিকৃষ্ট খাদ্য

নবী ﷺ বলেন,

((شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الوَلِيمَةِ ، يُمْنَعُهَا مَنْ يَأتِيهَا ، وَيُدْعَى إِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا ، وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللهَ وَرَسُولَهُ)). رواه مسلم

((بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الوَلِيمَةِ يُدْعَى إِلَيْهَا الأَغْنِيَاءُ ويُتْرَكُ الفُقَرَاءُ)).

"সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার ঐ অলীমার খাবার, যাতে যে (স্বয়ং) আসে তাকে (অর্থাৎ, মিসকীনকে) বাধা দেওয়া হয় এবং যাকে আহবান করা হয় সে (অর্থাৎ, ধনী) আসতে অস্বীকার করে। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করল না, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করল।" *(মুসলিম)*

বুখারী-মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে যে, 'অলীমার খাবার নিকৃষ্ট খাবার, যাতে বিত্তশালীদেরকে ডাকা হয় এবং দরিদ্রদেরকে ছেড়ে দেওয়া হয়।'

দুনিয়ার একটা নীতিই হল, 'তেলো মাথায় ঢালো তেল, রুখু মাথায় ভাঙ্গো বেল।' অনেক ধনী মানুষ বেছে বেছে কেবল ধনীদেরকে তাদের খুশীতে নিমন্ত্রণ করে। অনেক দরিদ্রও তাই করে। যাদের নিকট থেকে উপহার-সামগ্রী পাওয়া যাবে অথবা নিমন্ত্রণের বদলে নিমন্ত্রণ পাওয়া যাবে, লোকেরা সাধারণতঃ তাদেরকেই দাওয়াত দিয়ে খানা খাওয়ায়। বিনা স্বার্থে গরীবদেরকে দাওয়াত করে না। অথচ আল্লাহর নেক বান্দাগণের একটি মহৎ গুণ হল,

{وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا (٨) إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاء وَلَا شُكُورًا } (٩) سورة الإنسان

অর্থাৎ, আহার্যের প্রতি আসক্তি সত্ত্বেও তারা অভাবগ্রস্ত, অনাথ ও বন্দীকে অন্নদান করে। (তারা বলে,) 'শুধু আল্লাহর মুখমন্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের উদ্দেশ্যে আমরা তোমাদেরকে অন্নদান করি, আমরা তোমাদের নিকট হতে প্রতিদান চাই না, কৃতজ্ঞতাও নয়। (দাহর ঃ ৮-৯)

কিন্তু অধিকাংশ মানুষই দুনিয়া চায়। আর আল্লাহ বলেছেন,

{مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ} (٢٠) سورة الشورى

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি পরলোকের ফসল কামনা করে, আমি তার জন্য পরলোকের ফসল বর্ধিত করে দিই এবং যে কেউ ইহলোকের ফসল কামনা করে, আমি তাকে তারই কিছু দিই, আর পরলোকে এদের জন্য কোন অংশ থাকবে না। (শূরা ঃ ২০)

দুনিয়াদারির এমন রীতি, যে রীতিতে যাদের খাবারের প্রয়োজন নেই, তাদেরকে খাওয়ানো হয় এবং যাদের খাবারের প্রয়োজন আছে, তাদেরকে বঞ্চিত করা হয়, সে রীতির সে খাবার সবচেয়ে নিকৃষ্ট খাবার। জেনেশুনে এমন খাবারে অংশগ্রহণ করা বৈধ নয়।

ঈমানের সবচেয়ে মজবুত হাতল

কোন জিনিসের হাতল মজবুত না হলে, তা ধারণ করলে যেমন ভেঙ্গে যাওয়ার পূর্ণ আশঙ্কা থাকে অথবা হাতল মজবুত না হলে কেউ নিজেকে বাঁচানোর জন্য কেউ ধারণ করলে যেমন পড়ে পাওয়ার আশঙ্কা থাকে, তেমনি ঈমানের হাতল মজবুত না হলে বিপদ অনিবার্য।

ঈমানের সবচেয়ে বেশি মজবুত হাতলের ব্যাপারে মহানবী ﷺ আমাদেরকে বলেছেন,

(أَوْثَقُ عُرَى الإِيمانِ المَوَالاةَ في الله والمعاداة في الله والحبُّ في الله والبُغْضُ في الله عَزَّوَجَلَّ).

"ঈমানের সবচেয়ে মজবুত হাতল হল আল্লাহর ওয়াস্তে বন্ধুত্ব করা এবং আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা করা, আল্লাহর ওয়াস্তে ভালবাসা এবং আল্লাহর ওয়াস্তে ঘৃণা করা।" *(ত্বাবারানী, সঃ জামে' ২৫৩৯নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(إنَّ أَوْثَقَ عُرَى الإِسْلام أَنْ تُحِبَّ في الله وتُبْغِضَ في الله).

অর্থাৎ, ইসলামের সবচেয়ে মজবুত হাতল এই যে, তুমি আল্লাহর ওয়াস্তে সম্প্রীতি স্থাপন করবে এবং আল্লাহর ওয়াস্তে বিদ্বেষ স্থাপন করবে। (আহমাদ, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, *সঃ জামে' ২০০৯নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে (কাউকে) ভালোবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে (কাউকে) ঘৃণাবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে (কিছু) প্রদান করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তেই (কিছু প্রদান করা হতে) বিরত থাকে, সে ব্যক্তি পূর্ণাঙ্গ ঈমান লাভ করেছে।" *(সহীহ আবু দাউদ ৩৯১০নং)*

এ তো প্রকৃতিগত ব্যাপার যে, আল্লাহতে বিশ্বাসী কোন মানুষ আল্লাহর কোন শত্রুকে ভালোবাসবে না। বরং সে ভালোবাসবে তাকে, যাকে মহান আল্লাহ ভালোবাসেন অথবা যে মহান আল্লাহকে ভালোবাসে। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভালোবাসে না অথবা তার বাহ্যিক কর্মগুণে বুঝা যায় যে, মহান আল্লাহ তাকে ভালোবাসে না, তাকে কোন মু'মিন ভালোবাসে না, ভালোবাসতে পারে না। নিকটাত্মীয় হলেও না। ঈমানের রীতি এটাই। ঈমানের আকর্ষণ ও বন্ধন এটাই। রক্তের বাঁধন অপেক্ষা ঈমানী বন্ধন বেশি মজবুত, বেশি পাকা।

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْ أَبْنَاءهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ} (٢٢) سورة المجادلة

অর্থাৎ, তুমি আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাসী এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না, যারা ভালবাসে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারীদেরকে; হোক না এই বিরুদ্ধাচারীরা তাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা অথবা তাদের জাতি-গোত্র। তাদের অন্তরে আল্লাহ ঈমান লিখে দিয়েছেন এবং তাদেরকে শক্তিশালী করেছেন তাঁর পক্ষ হতে রূহ (জ্যোতি ও বিজয়) দ্বারা। তিনি তাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে; যার নিম্নদেশে নদীমালা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে। আল্লাহ তাদের প্রতি প্রসন্ন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। তারাই আল্লাহর দল। জেনে রেখো যে, আল্লাহর দলই সফলকাম। (মুজাদালাহ ঃ ২২)

তিনি তাঁর দুশমনদেরকে ভালোবাসার পাত্র বানাতে নিষেধ করেছেন; যদিও তারা নিকটাত্মীয় হয়। তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (٢٣) قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ} (٢٤)

হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের পিতা ও ভ্রাতৃগণ যদি ঈমানের মুকাবিলায় কুফরীকে পছন্দ করে, তাহলে তাদেরকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করো না। তোমাদের মধ্যে যারা তাদেরকে অভিভাবক করবে, তারাই হবে অত্যাচারী। বল, তোমাদের পিতা, পুত্র, ভ্রাতা, স্ত্রী ও আত্মীয়গণ, অর্জিত ধনরাশি এবং সেই ব্যবসা-বাণিজ্য তোমরা যার অচল হওয়ার ভয় কর এবং প্রিয় বাসস্থানসমূহ যদি তোমাদের নিকট আল্লাহ, তাঁর রসূল ও আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ অপেক্ষা অধিকতর প্রিয় হয়, তাহলে আল্লাহর আদেশ আসা পর্যন্ত অপেক্ষা কর। বস্তুতঃ আল্লাহ সত্যত্যাগী সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেন না। (তাওবাহ ঃ ২৩-২৪)

ঈমানদারের নিকট ঈমান এমনই অমূল্য রতন যে, সে তার বিনিময়ে সব কিছুকে কুরবানী দিতে পারে। নিকটাত্মীয়, ধন-সম্পদ এবং পদ ও গদিকেও সে অনায়াসে বর্জন করতে পারে। যেহেতু ইহ-পরকালে নিষ্কৃতির জন্য ঈমানই হল সবচেয়ে মজবুত হাতল।

সর্বশ্রেষ্ঠ ঈমান, সর্বশ্রেষ্ঠ মু'মিন

ঈমান হল অন্তরে বিশ্বাস, মুখে স্বীকার ও কার্যে পরিণত করার নাম। ঈমানে সকল মু'মিন সমান হতে পারে না। ঈমানী উপাদান অনুসারে মু'মিনদের তারতম্যও স্বাভাবিক থাকে।

"ঈমানের সত্তর অথবা ষাঠের বেশী শাখা রয়েছে। তার মধ্যে সর্বোত্তম (শাখা) 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলা এবং সর্বনিম্ন (শাখা) রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক জিনিস (পাথর কাঁটা ইত্যাদি) দূরীভূত করা। আর লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখা।" *(বুখারী-মুসলিম)*

প্রধান শাখা বা কান্ডের সাথে যার শাখা-প্রশাখা যত বেশি, তার ঈমান তত বেশি এবং সে তত বেশি শ্রেষ্ঠ মু'মিন।

সর্বশ্রেষ্ঠ ঈমান হল ধৈর্যশীলতা ও উদারতা। এ কথা বলেছেন আমাদের নবী ﷺ,

(أَفْضَلُ الإِيمَانِ الصَّبْرُ وَالسَّمَاحَةُ).

(সিঃ সহীহাহ ১৪৯৫নং) আর এ কথা বিদিত যে, মানুষের জন্য প্রথম ফরয হল ইল্‌ম ও ঈমান। পরবর্তী ধাপের দ্বিতীয় ফরয আমল। পরবর্তী ধাপের তৃতীয় ফরয দাওয়াত ও তাবলীগ। আর পরবর্তী ধাপের চতুর্থ ফরয হল উক্ত তিন ধাপে ধৈর্য ধারণ করা।

যে মানুষ ধৈর্যশীল নয়, সে মানুষের পক্ষে ঈমান রাখা বড় কঠিন। আর যে মানুষ উদার না হয়ে গোঁড়া হয়, সে মানুষের পক্ষে হক গ্রহণ করা বড় কঠিন। সাধারণতঃ অনুদার গোঁড়া লোকেরা অহংকারী হয়। এরা অহমিকায় অপরকে তুচ্ছজ্ঞান করে এবং উন্নাসিকতায় হককে গ্রহণ না ক'রে প্রত্যাখ্যান করে। তাদের আমিত্বকে কেউ স্বীকার না করলে তারা তার মান-সম্ভ্রমকে শিকার করে এবং তাকে নিজেদের প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে। আর তখন প্রতিপক্ষকে 'ছোট' করার জন্য অপবাদ রচনা ক'রে রটনা করে। প্রতিপক্ষের বাবা তুলে গালাগালি করে, অথচ নিজেদের বাবাও যে তুচ্ছ, সে কথা তারা অহংকারে বিস্মৃত হয়। অপরের শ্রী, প্রসিদ্ধি ও প্রতিভা দেখে অন্তর-জ্বালায় পুড়ে মরে। সুতরাং আল্লাহ এমন গোঁড়াদের গোড়া কেটে ফেলুন। আমীন।

এমন গোঁড়াদের চরিত্র ও ব্যবহার সাধারণতঃ নোংরা হয়। কথা মিষ্ট হলেও তা মিছরির ছুরি হয়। কোন কোন জাহেল অথবা তোষামোদকারীর প্রশংসা শুনে তাদের মনের গর্ব আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হয়। নিজেদেরকে 'বিশাল পন্ডিত' ভেবে বসার পর কেউ তাদের ভুল ধরিয়ে দিলে, তা সংশোধনী মনে গ্রহণ না ক'রে গোঁড়ামি ও আমিত্বে পর্বতসম অবিচল থাকে। অতএব তারা কি আর ভাল চরিত্রের হতে পারে? অথচ "সর্বশ্রেষ্ঠ মু'মিন হল সে, যার চরিত্র হল সবার চেয়ে সুন্দর।"

মহানবী ﷺ বলেন, "ইসলামের দিক হতে শ্রেষ্ঠ মু'মিন সেই ব্যক্তি, যার জিহ্বা ও হস্ত হতে মুসলিমরা নিরাপদে থাকে। ঈমানের দিক থেকে শ্রেষ্ঠ মু'মিন সেই ব্যক্তি, যার চরিত্র সবার চেয়ে সুন্দর। শ্রেষ্ঠ মুহাজির (হিজরতকারী বা আল্লাহর জন্য স্বদেশত্যাগী) সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুসমূহকে ত্যাগ করে। আর শ্রেষ্ঠ জিহাদ সেই ব্যক্তির, যে আল্লাহর সন্তুষ্টিতে নিজের মনের বিরুদ্ধে জিহাদ করে।" *(ঐ ১১৪০নং)*

সর্বশ্রেষ্ঠ মু'মিন হওয়া অথবা পূর্ণাঙ্গ ঈমানের মু'মিন হওয়া সহজ কথা নয়।

'বড় হওয়া সংসারেতে কঠিন ব্যাপার,
সংসারে সে বড় হয়, বড় গুণ যার।'

এক ব্যক্তি হাসান বাসরী (রঃ)কে বলল, 'আপনি কি মু'মিন?' তিনি বললেন, 'যদি তোমার উদ্দেশ্য সেই শ্রেণীর মু'মিন হয়, যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُولُواْ آمَنَّا بِاللّهِ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ وَالأسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ}

অর্থাৎ, তোমরা বল, 'আমরা আল্লাহতে বিশ্বাস করি এবং যা আমাদের প্রতি এবং ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তার বংশধরগণের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং

যা মূসা ও ঈসাকে প্রদান করা হয়েছে এবং যা অন্যান্য নবীগণ তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে প্রদত্ত হয়েছে তাতেও (বিশ্বাস করি)। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং আমরা তাঁর কাছে আত্ম-সমর্পণকারী (মুসলিম)।' (বাক্বারাহ ঃ ১৩৬)

তাহলে হ্যাঁ, আমি মু'মিন। সেই ঈমান দিয়েই আমরা বিবাহ-সংসার করি এবং একে অন্যের ওয়ারেস হই।

আর যদি তোমার উদ্দেশ্য সেই শ্রেণীর মু'মিন হয়, যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ} (٢) سورة الأنفال

অর্থাৎ, বিশ্বাসী (মু'মিন) তো তারাই, যাদের হৃদয় আল্লাহকে স্মরণ করার সময় কম্পিত হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের নিকট পাঠ করা হয়, তখন তা তাদের বিশ্বাস (ঈমান) বৃদ্ধি করে এবং তারা তাদের প্রতিপালকের উপরই ভরসা রাখে। (আনফাল ঃ ২)

তাহলে আমি জানি না যে, আমি মু'মিন কি না। (মাস্বাবীহুত তানবীর ১/৪৯৮)

সবার চাইতে পরিপূর্ণ ঈমানের মু'মিন

ঈমানের সকল কাজ না করলে কেউ পরিপূর্ণ মু'মিন হতে পারে না। যেমন ঃ রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

"সেই প্রভুর কসম! যার হাতে আমার জীবন আছে, তোমরা কেউ ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ণ মু'মিন নও, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকটে তার পিতা-মাতা, সন্তান-সন্ততির চেয়ে অধিক প্রিয়তর না হতে পেরেছি।" *(বুখারী ১৪নং)*

"কোন বান্দা পূর্ণ মু'মিন নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত আমি তার নিকট তার পরিবার, ধনসম্পদ এবং সমস্ত মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয়তর না হই।" *(মুসলিম ৪৪নং)*

একদা মহানবী ﷺ উমার বিন খাত্তাব ﷺ-এর হাত ধরে ছিলেন। উমার ﷺ তাঁকে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আপনি আমার জীবন ছাড়া সকল জিনিস থেকে আমার নিকট প্রিয়তম।' এ কথা শুনে মহানবী ﷺ বললেন, "না। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে। যতক্ষণ না আমি তোমার নিকট তোমার জীবন থেকেও প্রিয়তম হতে পেরেছি (ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি মু'মিন হতে পারো না)। উমার ﷺ বললেন, 'এক্ষণে আপনি আমার জীবন থেকেও প্রিয়তম।' তখন তিনি বললেন, "এখন (তুমি মু'মিন) হে উমার!" (বুখারী)

তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর ওয়াস্তে অপরকে ভালোবাসে, আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে ঘৃণা করে, আল্লাহর ওয়াস্তে কাউকে কিছু দান করে এবং আল্লাহর ওয়াস্তেই কাউকে কিছু দেওয়া হতে বিরত থাকে সে ব্যক্তি পূর্ণ ঈমানের অধিকারী।" (আবূ দাঊদ, তিরমিযী)

"সে মু'মিন নয়, যে ভরপেট খায় অথচ তার পাশে তার প্রতিবেশী উপোস থাকে।" *(ত্বাবারানী, হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৫৩৮-২নং)*

"যে ব্যক্তির অনিষ্টকারিতা হতে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না সে ব্যক্তি মু'মিন নয়।" *(ত্বাবারানী, সঃ জামে' ৫৩৮০নং)*

"প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার কর, তুমি (পূর্ণ) মু'মিন হয়ে যাবে এবং মানুষের জন্য তাই পছন্দ কর যা তুমি নিজের জন্য কর, তাহলে (পূর্ণ) মুসলিম হয়ে যাবে।" *(তিরমিযী)*

কিন্তু এ সবের সাথে যার চরিত্র সুন্দর নয়, সে পরিপূর্ণ ঈমানের অধিকারী নয়। যেহেতু আমরা জানি,

'যদি ধন নাশ হয়, তায় কিবা আসে যায়,
যদি স্বাস্থ্য নাশ হয়, তবে কিছু হয় ক্ষয়,
হইলে চরিত্র নাশ সর্বনাশ হয়।'

খাওয়ারিযমী বলেছেন, 'মানুষের মাঝে চরিত্র থাকলে সে ১ নম্বর থাকে। অতঃপর তার মধ্যে রূপ থাকলে তার পাশে একটি শূন্য যোগ হয়ে ১০ হয়। অতঃপর তার ধনবত্তা থাকলে আরো একটি শূন্য যোগ হয়ে ১০০ হয়। অতঃপর তার কৌলিন্য থাকলে আরো একটি শূন্য যোগ হয়ে ১০০০ হয়। কিন্তু ১ সংখ্যাটি অর্থাৎ চরিত্র বাদ পড়লে মানুষের মূল্য চলে যায় এবং পাশের শূন্যগুলি অকেজো হয়ে অবশিষ্ট থাকে।'

এই জন্য মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِكُمْ).

"সবার চেয়ে পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি সে, যার চরিত্র সবার চেয়ে সুন্দর এবং তোমাদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি সেই, যে তোমাদের স্ত্রীদের নিকট উত্তম।" *(আহমাদ ১০১০৬, তিরমিযী ১১৬২, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ১২৩২নং)*

তিনি আরো বলেছেন,

(أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحَاسِنُهُمْ أَخْلاقًا ، الْمُوَطَّئُونَ أَكْنَافًا ، الَّذِينَ يَأْلَفُونَ وَيُؤْلَفُونَ ، وَلاَ خَيْرَ فِيمَنْ لا يَأْلَفُ وَلاَ يُؤْلَفُ).

অর্থাৎ, সবার চেয়ে পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি সে, যার চরিত্র সবার চেয়ে সুন্দর, সহজ-সরল। যারা অপরকে প্রীতির বাঁধনে জড়াতে পারে এবং নিজেরাও অপরের প্রীতির বাঁধনে জড়িত হয়। আর সেই ব্যক্তির মাঝে কোন মঙ্গল নেই, যে প্রীতির বাঁধনে কাউকে বাঁধতে পারে না এবং নিজেকেও অপরের প্রীতির বাঁধনে আনে না। (ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ৭৫১নং)

একজন মুজাহিদও ঈমানের দিক দিয়ে সবার চাইতে বেশি পরিপূর্ণ। আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন্ ব্যক্তি ঈমানের দিক দিয়ে সবার চাইতে বেশি পরিপূর্ণ?' তিনি বললেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে তার জান ও মাল দিয়ে যুদ্ধ করে এবং ঐ ব্যক্তি কোন গিরিপথে নির্জনে নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করে এবং লোকেদেরকে নিজের মন্দ আচরণ থেকে নিরাপদে রাখে।" *(হাকেম, সঃ তারগীব ২৭৩৪নং)*

সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান মু'মিন

একদা এক আনসারী সাহাবী আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন্ মু'মিন সর্বশ্রেষ্ঠ?' উত্তরে তিনি বললেন, "তাদের মধ্যে চরিত্রে যে সর্বশ্রেষ্ঠ।" সাহাবী বললেন, 'কোন্ মু'মিন সবচেয়ে বেশি বুদ্ধিমান?' তিনি বললেন,

(أَكْثَرُهُمْ لِلْمَوْتِ ذِكْرًا وَأَحْسَنُهُمْ لِمَا بَعْدَهُ اسْتِعْدَادًا أُولَئِكَ الْأَكْيَاسُ).

"তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে বেশি মরণকে স্মরণ করে এবং মরণের পরবর্তীকালের জন্য সবচেয়ে বেশি ভাল প্রস্তুতি নেয়। তারাই হল বুদ্ধিমান লোক।" *(ইবনে মাজাহ, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৩৮৪নং)*

অনেক প্রবাসী বিদেশে চাকরি করে, অনেকে ভ্রমণে যায়, অনেকে ব্যবসায় যায়। তাদের মধ্যে এমন অনেক লোক আছে, যারা প্রবাসে যা উপার্জন করে, প্রবাসেই সব খরচ ক'রে ফেলে। বিদেশে থেকে দেশের কথা ভুলেই যায়। যেখানে স্থায়ী বসবাস, সেখানে কিছু করতে হবে---সে কথা বিস্মৃত হয়। তারা কি বুদ্ধিমান?

পক্ষান্তরে আর এক শ্রেণীর প্রবাসী আছে, যারা বিদেশে প্রয়োজনানুপাতে খরচ করে এবং বাকী অর্থ দেশের জন্য সঞ্চয় করে, দেশের বাড়ি-ঘর সুন্দর করে। বিদেশে থেকে দেশের কথা বিস্মৃত হয় না। এরা কি আসল বুদ্ধিমান নয়?

যারা পার্থিব জগতের মাত্র কয়েকটি বছরের জন্য হাজার বছরের প্রস্তুতি নেয়, তারা বেশি জ্ঞানী, নাকি অনন্ত কালের জীবনের জন্য যারা প্রাণান্তকর প্রয়াস চালায় তারা বেশি জ্ঞানী?

অবশ্যই। যারা ইহকালে থেকে পরকালের পাথেয় সংগ্রহে নিরত থাকে, ইহকালের চাকচিক্যে ভুলে না গিয়ে পরকালের স্মরণ সর্বদা তাজা রাখে, পরলোকের জন্য সদা প্রস্তুত থাকে, তারাই এ পৃথিবীর প্রকৃত জ্ঞানী ও বুদ্ধিমান লোক।

বলাই বাহুল্য যে, এমন বুদ্ধিমান লোকেদের আমল ভাল হয়। তাদের সকল ইবাদত সুন্দর হয়। ইবাদতে ইখলাস, ঐকান্তিকতা, একাগ্রতা ও মনোনিবেশ যথেষ্ট বর্তমান থাকে।

তাই মরণকে স্মরণ করতে নির্দেশ দিয়ে আমাদের মহানবী ﷺ বলেছেন, "তুমি তোমার নামাযে মরণকে স্মরণ কর। কারণ, মানুষ যখন তার নামাযে মরণকে স্মরণ করে, তখন যথার্থই সে তার নামাযকে সুন্দর করে। আর তুমি সেই ব্যক্তির মত নামায পড়, যে মনে করে না যে, এ ছাড়া সে অন্য নামায পড়তে পারবে। তুমি প্রত্যেক সেই কর্ম থেকে দূরে থাক, যা ক'রে তোমাকে (অপরের নিকটে) ক্ষমা চাইতে হয়। *(মুসনাদে ফিরদাউস, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৪২১, সহীহুল জামে' ৮৪৯ নং)*

পরন্তু মু'মিন যে, সে বোকা হয় না, সে দ্বীনদারীর ব্যাপারে বুদ্ধিমান হয়। সদা সতর্ক ও সজাগ থাকে, যাতে কোন দুনিয়াদার বা শয়তানের হাতে তার পরকালের পুঁজি নষ্ট অথবা চুরি না হয়ে যায়। পরকালের পথে চলার সময় শয়তান তার পকেট মেরে ঈমান কেড়ে না নেয়।

সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন স্তরের মুসলিম

দুনিয়ার বুকে বহু দ্বীনদার মানুষ আছে, কিন্তু তারা সবাই একই স্তরের নয়। ঈমান, ইল্‌ম ও আমলের তারতম্যে মানুষ বিভিন্ন স্তরের হয়ে থাকে। কিন্তু সেই স্তরগুলি কী এবং সবচেয়ে উচ্চ স্তরের লোক কারা?

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((إنَّمَا الدُّنْيَا لأَرْبَعَةِ نَفَرٍ : عَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَالاً وَعِلماً ، فَهُوَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَيَصِلُ فِيهِ رَحِمَـهُ، وَيَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقّاً ، فَهذَا بِأَفضَلِ المَنَازِلِ . وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ عِلْماً، وَلَمْ يَرْزُقْهُ مَالاً ، فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ ، يَقُولُ : لَوْ أنَّ لِي مَالاً لَعَمِلتُ بِعَمَلِ فُلانٍ ، فَهُوَ بنِيَّتِهِ ، فأجْرُهُمَا سَوَاءٌ . وَعَبْدٍ رَزَقَهُ اللهُ مَـالاً ، وَلَم يَرْزُقْهُ عِلْماً ، فَهُوَ يَخبطُ فِي مَالِهِ بغَيرِ عِلْمٍ ، لاَ يَتَّقِي فِيهِ رَبَّهُ ، وَلاَ يَصِلُ فِيهِ رَحِمَهُ ، وَلاَ يَعْلَمُ للهِ فِيهِ حَقّاً ، فَهذَا بِأَخْبَثِ المَنَازِلِ . وَعَبْدٍ لَمْ يَرْزُقْهُ اللهُ مَالاً وَلاَ عِلْماً ، فَهُوَ يَقُولُ : لَوْ أنَّ لِي مَالاً لَعَمِلْتُ فِيهِ بعَمَلِ فُلاَنٍ ، فَهُوَ بنِيَّتِهِ ، فَوِزْرُهُمَا سَوَاءٌ)). رواه الترمذي

অর্থাৎ, দুনিয়ায় চার প্রকার লোক আছে;

(১) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন ও (ইসলামী) জ্ঞান দান করেছেন। অতঃপর সে তাতে আল্লাহকে ভয় করে এবং তার মাধ্যমে নিজ আত্মীয়তা বজায় রাখে। আর তাতে যে আল্লাহর হক রয়েছে তা সে জানে। অতএব সে (আল্লাহর কাছে) সবচেয়ে উৎকৃষ্ট স্তরে অবস্থান করবে।

(২) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ (ইসলামী) জ্ঞান দান করেছেন; কিন্তু মাল দান করেননি। সে নিয়তে সত্যনিষ্ঠ, সে বলে যদি আমার মাল থাকত, তাহলে আমি (পূর্বোক্ত) অমুকের মত কাজ করতাম। সুতরাং সে নিয়ত অনুসারে বিনিময় পাবে; এদের উভয়ের প্রতিদান সমান।

(৩) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ মাল দান করেছেন; কিন্তু (ইসলামী) জ্ঞান দান করেননি। সুতরাং সে না জেনে অবৈধরূপে নির্বিচারে মাল খরচ করে; সে তাতে আল্লাহকে ভয় করে না, তার মাধ্যমে নিজ আত্মীয়তা বজায় রাখে না এবং তাতে যে আল্লাহর হক রয়েছে তাও সে জানে না। অতএব সে (আল্লাহর কাছে) সবচেয়ে নিকৃষ্ট স্তরে অবস্থান করবে। আর

(৪) ঐ বান্দা, যাকে আল্লাহ ধন ও (ইসলামী) জ্ঞান কিছুই দান করেননি। কিন্তু সে বলে, যদি আমার নিকট মাল থাকত, তাহলে আমিও (পূর্বোক্ত) অমুকের মত কাজ করতাম। সুতরাং সে নিয়ত অনুসারে বিনিময় পাবে; এদের উভয়ের পাপ সমান। *(তিরমিযী ২৩২৫নং)*

সবচেয়ে বেশি সম্মানীয় ব্যক্তি

পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বেশি সম্মানীয় সেই ব্যক্তি, যার প্রয়োজনীয় পাঁচটি জিনিস পূর্ণরূপে সবার চাইতে বেশি বর্তমান আছে।

১। সুস্থ প্রাণ বা সুস্বাস্থ্য।
২। ঈমান বা দ্বীনদারী।
৩। জ্ঞান, শিক্ষা বা বুদ্ধিমত্তা।
৪। মান, সম্মান, বংশগৌরব।
৫। ধন, বিষয়-বিভব।

অবশ্য দুনিয়াদারদের নিকট দ্বীনদারীর কোন গুরুত্ব নেই। বরং বর্তমান বিশ্বে ধনবত্তাই সকল সম্মানের উৎস। আসলে তা ঠিক নয়। মহান আল্লাহর নিকট যে নিক্তি আছে, তাতে ওজন করলেই প্রকৃত সম্মানী বের হয়ে আসে। মহান আল্লাহর নিকট আরবী-আজমী, শ্বেতাঙ্গ-কৃষ্ণাঙ্গ, স্বদেশী-বিদেশী, সবল-দুর্বল, জ্ঞানী-বিজ্ঞানী, পরিচিত-অজ্ঞাতপরিচয় বা আমীর-গরীবের মাঝে কোন পার্থক্য নেই, কোন ভেদাভেদ নেই। তিনি সকল মানুষকে সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে। সুতরাং সকলেই সমানাধিকারের মানুষ। কিন্তু মানুষদের মধ্যে যদি শ্রেষ্ঠত্ব মাপতে চাওয়া হয়, তাহলে সেই নিক্তি দ্বারা মাপতে হবে, যা মহান আল্লাহ নির্ধারণ করেছেন। তিনি বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (١٣) سورة الحجرات

অর্থাৎ, হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরেরর সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক আল্লাহ-ভীরু। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন। (হুজুরাত ঃ ১৩)

মহানবী ﷺ বলেছেন, "লোকেরা যেন মৃত বাপ-দাদাদের নিয়ে ফখর করা অবশ্যই ত্যাগ করে। তারা তো জাহান্নামের কয়লা মাত্র। তা ত্যাগ না করলে তারা সেই গোবুরে পোকার চেয়েও নিকৃষ্ট হবে, যে নিজ নাক দ্বারা মল ঠেলে নিয়ে যায়। অবশ্যই আল্লাহ তোমাদের নিকট থেকে জাহেলিয়াতের গর্ব ও ফখর দূর করে দিয়েছেন। (মুসলিম) তো মুত্তাকী (সংযমশীল) মুমিন অথবা পাপাচারী বদমায়াশ। মানুষ সকলেই আদমের সন্তান এবং আদম মাটি হতে সৃষ্ট।" *(সহীহুল জামে' ৫৩৫৮-নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "হে লোক সকল! তোমাদের প্রতিপালক এক। তোমাদের পিতা এক। শোনো! আরবীর উপর অনারবীর এবং অনারবীর উপর আরবীর, কৃষ্ণকায়ের উপর শ্বেতকায়ের এবং শ্বেতকায়ের উপর কৃষ্ণকায়ের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে তো কেবল 'তাক্বওয়ার' কারণেই।" *(মুসনাদে আহমাদ ৫/৪১১, সিঃ সহীহাহ ২৭০০নং)*

বলা বাহুল্য, বংশের গৌরব কোন কাজের নয়। বংশ-মর্যাদা মহান আল্লাহর নিকট বিচার্য নয়। বিচার্য হল ঈমান ও আমল।

বংশ-মর্যাদা উপকারী হলে নূহ عليه السلام-এর ছেলে উপকৃত হত। দুনিয়ার আযাব হতে নবী নিজ ছেলেকে বাঁচাতে পারেননি। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْزِلٍ يَا بُنَيَّ ارْكَب مَّعَنَا وَلاَ تَكُن مَّعَ الْكَافِرِينَ (٤٢) قَالَ سَآوِي إِلَى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْمَاء قَالَ لاَ عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ إِلاَّ مَن رَّحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ (٤٣) وَنَادَى نُوحٌ رَّبَّهُ فَقَالَ رَبِّ إِنَّ ابُنِي مِنْ أَهْلِي وَإِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ وَأَنتَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ (٤٥) قَالَ يَا نُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ فَلاَ تَسْأَلْنِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنِّي أَعِظُكَ أَن تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٤٦) قَالَ رَبِّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَإِلاَّ تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُن مِّنَ الْخَاسِرِينَ} (٤٧) سورة هود

অর্থাৎ, আর সেই নৌকাটিই তাদেরকে নিয়ে পর্বততুল্য তরঙ্গের মধ্যে চলতে লাগল। নূহ স্বীয় পুত্রকে ডাকতে লাগল -- এবং সে ছিল ভিন্ন স্থানে -- (বলল), 'হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে সওয়ার হয়ে যাও এবং অবিশ্বাসীদের সঙ্গী হয়ো না।' সে বলল, 'আমি এমন কোন পাহাড়ে আশ্রয় গ্রহণ করব, যা আমাকে পানি হতে রক্ষা করবে।' সে বলল, 'আজ আল্লাহর শাস্তি হতে কেউই রক্ষাকারী নেই। তবে তিনি যার প্রতি দয়া করবেন, সে (রক্ষা পাবে)।' ইতিমধ্যে তাদের উভয়ের মাঝে একটি তরঙ্গ অন্তরাল হয়ে পড়ল। অতঃপর সে ডুবে যাওয়া লোকেদের অন্তর্ভুক্ত হল। আর বলা হল, 'হে ভূমি! তুমি নিজ পানি শুষে নাও এবং হে আকাশ! তুমি ক্ষান্ত হও।' তখন পানি কমে গেল ও নির্ধারিত কার্য সম্পন্ন হল। নৌকা জুদী (পাহাড়)-এর উপর এসে থামল। আর বলা হল, 'অন্যায়কারীরা আল্লাহর করুণা হতে দূর হোক।' আর নূহ নিজ প্রতিপালককে ডেকে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার এই পুত্রটি আমারই পরিবারভুক্ত। আর তোমার প্রতিশ্রুতি সত্য এবং তুমি সমস্ত বিচারকের শ্রেষ্ঠ বিচারক।' তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'হে নূহ! এই ব্যক্তি তোমার পরিবারভুক্ত নয়, সে অসৎকর্মপরায়ণ। অতএব তুমি আমার কাছে সে বিষয়ে আবেদন করো না, যে বিষয়ে তোমার কোনই জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি যে, তুমি অজ্ঞ লোকদের অন্তর্ভুক্ত হয়ো না।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমি তোমার নিকট এমন বিষয়ে আবেদন করা থেকে আশ্রয় চাচ্ছি, যে বিষয়ে আমার জ্ঞান নেই, আর তুমি যদি আমাকে ক্ষমা না কর এবং আমার প্রতি দয়া না কর, তবে আমি ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত হয়ে যাব।' *(হূদঃ ৪২-৪৭)*

বংশ-মর্যাদা বা আত্মীয়তার সম্পর্ক কাজে দিলে নূহ عليه السلام-এর স্ত্রী রক্ষা পেতেন।

লূত عليه السلام-এর স্ত্রী রেহাই পেতেন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَةَ نُوحٍ وَامْرَأَةَ لُوطٍ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتَاهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ} (١٠)

অর্থাৎ, আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য নূহ ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন; তারা ছিল আমার দাসদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ণ দাসের অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, ফলে তারা (নূহ ও লূত) তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারল না এবং তাদেরকে বলা হল, 'জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও তাতে প্রবেশ কর।' *(তাহরীমঃ ১০)*

রক্তের সম্পর্ক কোন কাজে এলে ইব্রাহীম عليه السلام-এর পিতা আযর জাহান্নাম থেকে নিষ্কৃতি লাভ করতেন। মহান আল্লাহ বলেন,

{قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَحْدَهُ إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ رَّبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ} (٤) سورة الممتحنة

অর্থাৎ, অবশ্যই তোমাদের জন্য ইব্রাহীম ও তার অনুসারীদের মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ; তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, 'তোমাদের সঙ্গে এবং তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার উপাসনা কর, তার সঙ্গে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে মানি না। তোমাদের ও আমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য সৃষ্টি হল শত্রুতা ও বিদ্বেষ, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছ।' তবে ব্যতিক্রম তার পিতার প্রতি ইব্রাহীমের উক্তি, 'আমি নিশ্চয়ই তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব এবং তোমার ব্যাপারে আমি আল্লাহর নিকট কোন অধিকার রাখি না।' (ইব্রাহীম ও তাঁর অনুসারিগণ বলেছিল,) 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা তো তোমারই উপর নির্ভর করেছি, তোমারই অভিমুখী হয়েছি এবং প্রত্যাবর্তন তো তোমারই নিকট। *(মুমতাহিনাহঃ ৪)*

কিন্তু মুশরিকের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা বৈধ নয়, তাহলে ইব্রাহীম عليه السلام কেন তাঁর পিতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন? মহান আল্লাহ বলেন,

{مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُواْ أَن يَسْتَغْفِرُواْ لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُواْ أُوْلِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ (١١٣) وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلاَّ عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأَوَّاهٌ حَلِيمٌ } (١١٤) سورة التوبة

অর্থাৎ, অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা নবী ও বিশ্বাসীদের জন্য সঙ্গত নয়; যদিও তারা আত্মীয়ই হোক না কেন, তাদের কাছে একথা সুস্পষ্ট হওয়ার পর যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। আর ইব্রাহীমের নিজ পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা তো কেবল সেই প্রতিশ্রুতির কারণে ছিল, যা সে তার সাথে করেছিল। অতঃপর যখন তার নিকট এ সুস্পষ্ট হল যে, সে (পিতা) আল্লাহর দুশমন, তখন সে তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন ক'রে নিল। বাস্তবিকই ইব্রাহীম ছিল অতিশয় কোমল হৃদয়, সহনশীল। *(তাওবাহঃ ১১৩-১১৪)*

এক সময় ইব্রাহীম عليه السلام-কে মহান আল্লাহ বললেন,

{إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ} (١٢٤) البقرة

অর্থাৎ,'আমি তোমাকে মানব-জাতির নেতা করব।' সে বলল, 'আমার বংশধরগণের মধ্য হতেও?' তিনি বললেন, 'আমার প্রতিশ্রুতি সীমালংঘনকারীদের প্রতি প্রযোজ্য নয়?' (বাক্বারাহ ঃ ১২৪)

'আমার প্রতিশ্রুতি সীমালংঘনকারীদের প্রতি প্রযোজ্য নয়' বলে মহান আল্লাহ যে বিষয়টি পরিষ্কার ক'রে দিয়েছেন তা হল এই যে, ইব্রাহীম ﷺ-এর ব্যক্তিত্ব এত উচ্চ এবং আল্লাহর নিকট তাঁর এত বড় মর্যাদা থাকা সত্ত্বেও তাঁর সন্তানাদির মধ্যে যারা অযোগ্য, যালিম ও মুশরিক হবে, তাদেরকে হতভাগ্য ও বঞ্চিত হওয়া থেকে কেউ রক্ষা করতে পারবে না। কেউ নবী-বংশে জন্মগ্রহণ করলেই যে তার কোন গুরুত্ব থাকবে, এখানে সে ধারণার মূল আল্লাহ কেটে দিয়েছেন। যদি ঈমান ও নেক আমল না থাকে, তাহলে পীরের বেটা ও রাজার বেটা হলেও আল্লাহর নিকট তার কোন মূল্য থাকবে না। নবী করীম ﷺ বলেছেন,

« وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ »

"যার আমল তাকে পিছিয়ে দেয়, তার বংশমর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারবে না।" *(মুসলিম)*

ইয়াকূব নবী ﷺ মিসর পাঠানোর সময় তাঁর ছেলেদেরকে বলেছিলেন,

{يَا بَنِيَّ لاَ تَدْخُلُواْ مِن بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُواْ مِنْ أَبْوَابٍ مُّتَفَرِّقَةٍ وَمَا أُغْنِي عَنكُم مِّنَ اللّهِ مِن شَيْءٍ إِنِ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ} (٦٧) سورة يوسف

অর্থাৎ, 'হে আমার পুত্রগণ! তোমরা (শহরের) এক দরজা দিয়ে প্রবেশ করো না; বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে আমি তোমাদের জন্য কিছু করতে পারি না। বিধান আল্লাহরই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করলাম এবং যারা নির্ভর করতে চায়, তারা আল্লাহরই উপর নির্ভর করুক।' *(ইউসুফ ঃ ৬৭)*

বংশ-মর্যাদা বা আত্মীয়তা কোন কাজে দিলে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী ﷺ নিজের স্নেহময়ী জননীর উপকার করতে পারতেন। একদা নবী ﷺ তাঁর আম্মার কবর যিয়ারত করতে গিয়ে তিনি কেঁদে ফেললেন এবং তাঁর আশে-পাশে সকলকে কাঁদিয়ে তুললেন। (কারণ, জিজ্ঞাসা করা হলে) তিনি বললেন, "আমি আল্লাহর নিকট আমার আম্মার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার অনুমতি চাইলাম। কিন্তু তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন না। অতঃপর আমি তাঁর নিকট তাঁর কবর যিয়ারত করতে অনুমতি চাইলে তিনি তাতে অনুমতি দিলেন। সুতরাং তোমরা কবর যিয়ারত কর। কারণ, তা মরণকে স্মরণ করিয়ে দেয়।" *(মুসলিম ৯৭৬, আবূ দাঊদ ৩২৩৪, নাসাঈ ২০৩৩, ইবনে মাজাহ ১৫৭২নং)*

তিনি নিজ জন্মদাতা পিতার উপকার সাধন করতেন। একদা এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-কে তার মুশরিক অবস্থায় মৃত পিতার বাসস্থান জানতে জিজ্ঞাসা করল, 'আমার আব্বা কোথায়?' উত্তরে তিনি বললেন, "জাহান্নামে।" লোকটি (মন খারাপ ক'রে) ফিরে যেতে লাগলে তিনি তাকে ডেকে বললেন,

« إِنَّ أَبِى وَأَبَاكَ فِى النَّارِ ».

অর্থাৎ, নিশ্চয় আমার আব্বা এবং তোমার আব্বা জাহান্নামে। *(মুসলিম ৫২১, আবূ দাঊদ ৪৭২০নং)*

মহান আল্লাহর আযাব থেকে রক্ষা পেতে আত্মীয়তা উপকারী হলে তিনি পালয়িতা চাচার উপকারে আসতেন। তাঁর যখন মৃত্যুর সময় হল, তখন মহানবী ﷺ তাঁকে বললেন, "চাচাজান! আপনি কলেমা 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে নিন। আমি আল্লাহর দরবারে আপনার জন্য সাক্ষ্য দেব। এই কলেমা দলীল স্বরূপ পেশ ক'রে আপনার পরিত্রাণের জন্য সুপারিশ করব।" কিন্তু পাশে বড় বড় কুরাইশের নেতা বসে ছিল। আবূ জাহ্ল, আব্দুল্লাহ বিন আবী উমাইয়া বলল, 'আপনি কি শেষ অবস্থায় বিধর্মী হয়ে মরবেন? আপনি কি আব্দুল মুত্তালিবের ধর্ম ত্যাগ করবেন?' যতবার মহানবী ﷺ তাঁর উপর পরিত্রাণের জন্য ঐ কালেমা পেশ করেন, ততবার তারা তা নাকচ ক'রে দেয়। ফলে কলেমা না পড়েই তাঁর জীবন-লীলা সাঙ্গ হয়। *(বুখারী-মুসলিম)*

বংশ-মর্যাদা বা আত্মীয়তা কিয়ামতে কোন প্রকার ফলপ্রসূ হলে মহানবী ﷺ পূর্ব থেকেই নিজের বংশের লোক তথা নিকটাত্মীয়কে সতর্ক করতেন না।

"হে কুরাইশদল! তোমরা আল্লাহর নিকট নিজেদেরকে বাঁচিয়ে নাও, আমি তোমাদের ব্যাপারে আল্লাহর নিকট কোন উপকার করতে পারব না। হে বানী আব্দুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর দরবারে তোমাদের কোন উপকার করতে পারব না। হে (চাচা) আব্বাস বিন আব্দুল মুত্তালিব! আমি আল্লাহর দরবারে আপনার কোন কাজে আসব না। হে আল্লাহর রসূলের ফুফু সাফিয়্যাহ! আমি আপনার জন্য আল্লাহর দরবারে কোন উপকারে আসব না। হে আল্লাহর রসূলের বেটী ফাতেমা! আমার কাছে যে ধন-সম্পদ চাইবে চেয়ে নাও, আমি আল্লাহর কাছে তোমার কোন উপকার করতে পারব না।" *(বুখারী-মুসলিম)*

কিয়ামতের দিন কোন আত্মীয় কোন আত্মীয়ের উপকার করতে পারবে না। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَإِذَا جَاءَتْ الصَّاخَّةُ (٣٣) يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣٤) وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ (٣٥) وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ (٣٦) لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ} (٣٧) سورة عبس

অর্থাৎ, অতঃপর যখন (কিয়ামতের) ধ্বংস-ধ্বনি এসে পড়বে। সেদিন মানুষ পলায়ন করবে আপন ভ্রাতা হতে এবং তার মাতা ও তার পিতা হতে, তার পত্নী ও তার সন্তান হতে। সেদিন তাদের প্রত্যেকের এমন গুরুতর অবস্থা হবে, যা নিজেকে সম্পূর্ণরূপে ব্যস্ত রাখবে। *(আ'বাসা ঃ ৩৩-৩৭)*

কেউ কারো উপকারে আসবে না সেদিন। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاتَّقُواْ يَوْماً لاَّ تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئاً وَلاَ يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلاَ تَنفَعُهَا شَفَاعَةٌ وَلاَ هُمْ يُنصَرُونَ} (١٢٣) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা সেই দিনকে ভয় কর, যেদিন কেউ কারো উপকারে আসবে না, কারো নিকট হতে কোন ক্ষতিপূরণ গৃহীত হবে না, কোন সুপারিশ কারো পক্ষে লাভজনক হবে না

এবং তারা কোন সাহায্যও পাবে না। (বাক্বারাহ ঃ ১২৩)

না কোন নিকটাত্মীয় কাজে আসবে, আর না কোন সন্তান-সন্ততি। তিনি বলেছেন,

{لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَفْصِلُ بَيْنَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ} (٣)

অর্থাৎ, তোমাদের আত্মীয়-স্বজন ও সন্তান-সন্ততি কিয়ামতের দিন কোনই কাজে আসবে না। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ফায়সালা ক'রে দেবেন। আর তোমরা যা কর, তিনি তা দেখেন। (মুমতাহিনাহ ঃ ৩)

না কোন পুত্র পিতার উপকারে আসবে, আর না পিতা কোন পুত্র-কন্যার উপকারে আসবে। আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَوْمًا لَّا يَجْزِي وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُم بِاللَّهِ الْغَرُورُ} (٣٣) لقمان

অর্থাৎ, হে মানুষ! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় কর এবং সেদিনকে ভয় কর, যেদিন পিতা সন্তানের কোন উপকারে আসবে না, সন্তানও তার পিতার কোন উপকারে আসবে না। আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। সুতরাং পার্থিব জীবন যেন তোমাদেরকে কিছুতেই প্রতারিত না করে এবং শয়তান যেন কিছুতেই আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদেরকে ধোঁকায় না ফেলে। *(লুক্বমান ঃ ৩৩)*

ঈমান ও আমল ছাড়া বাঁচার কোন উপায় নেই, ঈমান ও আমল ছাড়া মানুষের অন্য কোন মর্যাদা উপকারী নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُم بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِندَنَا زُلْفَى إِلَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ لَهُمْ جَزَاء الضِّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ آمِنُونَ} (٣٧) سورة سبأ

অর্থাৎ, তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি আমার নৈকট্য লাভের সহায়ক হবে না। তবে (নৈকট্য লাভ করবে) তারাই যারা বিশ্বাস করে ও সৎকাজ করে এবং তারা তাদের কাজের জন্য পাবে বহুগুণ পুরস্কার। আর তারা প্রাসাদসমূহে নিরাপদে বসবাস করবে। (সাবা' ঃ ৩৭)

সবচেয়ে বেশি সম্মানিত

সবচেয়ে বেশি সম্মানিত ব্যক্তি কে---সে সম্বন্ধে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (١٣) سورة الحجرات

অর্থাৎ, হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরেরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক আল্লাহ-ভীরু। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন। (হুজুরাত ঃ ১৩)

বলাই বাহুল্য যে, মুত্তাক্বী, পরহেযগার বা আল্লাহ-ভীরু ব্যক্তির চাইতে অধিক সম্মানিত আর কেউ হতে পারে না।

আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, রসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করা হল যে, 'হে আল্লাহর রসূল! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে?' তিনি বললেন, "তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে আল্লাহ-ভীরু।" অতঃপর তাঁরা (সাহাবীরা) বললেন, 'এ ব্যাপারে আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি না।' তিনি বললেন, "তাহলে ইউসুফ (সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি), যিনি স্বয়ং আল্লাহর নবী, তাঁর পিতা নবী, পিতামহও নবী এবং প্রপিতামহও নবী ও আল্লাহর বন্ধু।" তাঁরা বললেন, 'এটাও আমাদের প্রশ্ন নয়।' তিনি বললেন, "তাহলে তোমরা কি আমাকে আরবের বংশাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ? (তবে শোনো!) তাদের মধ্যে যারা জাহেলী যুগে ভাল, তারা ইসলামেও ভাল; যদি দ্বীনী জ্ঞান রাখে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন,

(يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا إِنَّ رَبَّكُمْ وَاحِدٌ وَإِنَّ أَبَاكُمْ وَاحِدٌ أَلَا لَا فَضْلَ لِعَرَبِيٍّ عَلَى أَعْجَمِيٍّ وَلَا لِعَجَمِيٍّ عَلَى عَرَبِيٍّ وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوَدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَ إِلَّا بِالتَّقْوَى).

অর্থাৎ, হে লোক সকল! শোনো, তোমাদের প্রতিপালক এক, তোমাদের পিতা এক। শোনো, আরবীর উপর অনারবীর এবং অনারবীর উপর আরবীর, কৃষ্ণকায়ের উপর শ্বেতকায়ের এবং শ্বেতকায়ের উপর কৃষ্ণকায়ের কোন শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা নেই। শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা আছে তো কেবল 'তাক্বওয়ার' কারণেই। *(মুসনাদে আহমাদ ৫/৪১১)*

সবচেয়ে বড় সৃষ্টি

এ পৃথিবী কত বিশাল! এই পৃথিবীর মতো প্রায় ১৩ লক্ষটি পৃথিবীকে পাশাপাশি রাখলে যে আয়তন হয়, তত বড় হল সূর্য, যে সূর্যকে আমরা আমাদের ভাত খাওয়ার প্লেটের মতো দেখি। সূর্য থেকে আয়তনে বড় আরো কত কোটি গ্রহ-নক্ষত্র আছে, তা অকল্পনীয়। আর এ সব আছে প্রথম আসমানের নিচে। তার উপরে ছয়টি আসমান। তার উপরে কুরসী। সেই কুরসী কত বিশাল!

মহান আল্লাহ সেই কুরসীর বিশালতা সম্বন্ধে বলেন,

{وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ}

অর্থাৎ, তাঁর কুরসী আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত। *(সূরা বাক্বারাহ ২৫৫ আয়াত)*

মহানবী ﷺ বলেন, "কুরসীর তুলনায় সাত আসমান হল ময়দানে পড়ে থাকা একটি বালার মতো। আর আরশের তুলনায় কুরসী হল ঐরূপ বালার মতো!" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১০৯নং)*

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, 'কুরসী হল মহান আল্লাহর পা রাখার জায়গা।' *(মুখতাসারুল উলু ১/৭৫)*

কুরসীর উপরে আছে মহান আল্লাহর মহাসন, আরশ। কত বিশাল সেই আরশ! সেই

আরশে আছেন মহান আল্লাহ। যিনি 'আকবার' বা সবচেয়ে বড়। তাঁর উপরে কিছু নেই।

আরশে মাজীদই হল সারা সৃষ্টির সর্বাধিক বড় সৃষ্টি।

সৃষ্টির সেরা

এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, মানুষই সকল সৃষ্টির সেরা জীব। সেই অর্থেই বলা যায়, 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নয়।' কিন্তু শ্রেষ্ঠত্বে সকল মানুষ তো আর সমান নয়। নানা গুণ ও চরিত্রের ফলে মানুষ ভালো-মন্দে ভাগ হয়ে গেছে। মানবিক শ্রেষ্ঠ গুণের যারা অধিকারী, তারাই শ্রেষ্ঠ মানুষ। সুতরাং মানুষের মধ্যে যারা সর্বশ্রেষ্ঠ, তারাই সৃষ্টির সেরা। সৃষ্টিকর্তা মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُوْلَئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ} (٧) سورة البينة

অর্থাৎ, নিশ্চয় যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে, তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। (বাইয়েনাহ ঃ ৭)

মু'মিন বা ঈমানদারদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হন তাদের সর্দারগণ। সুতরাং নবীগণ সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। আর নবীগণের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হলেন পাঁচজন ঃ নূহ, ইব্রাহীম, মূসা, ঈসা ও মুহাম্মাদ (আলাইহিমুস সালাম)। উক্ত পঞ্চজনের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হলেন শেষনবী মুহাম্মাদ ﷺ। তিনিই নবীকুল শিরোমণি। সুতরাং তিনিই হলেন সৃষ্টির সেরা সৃষ্টি। সর্বের সেরা মানুষ। তিনি বলেছেন,

« إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى كِنَانَةَ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ وَاصْطَفَى قُرَيْشًا مِنْ كِنَانَةَ وَاصْطَفَى مِنْ قُرَيْشٍ بَنِى هَاشِمٍ وَاصْطَفَانِى مِنْ بَنِى هَاشِمٍ ».

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ ইসমাঈলের বংশধর থেকে কিনানাকে মনোনীত করেছেন। কুরাইশকে মনোনীত করেছেন কিনানা থেকে। বানী হাশেমকে মনোনীত করেছেন কুরাইশ থেকে। আর আমাকে মনোনীত করেছেন বানী হাশেম থেকে। (মুসলিম ৬০৭৭নং)

তিনি আরো বলেছেন,

(أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْخَلْقَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ خَلْقِهِ، وَجَعَلَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ فِرْقَةٍ، وَخَلَقَ الْقَبَائِلَ فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِ قَبِيلَةٍ، وَجَعَلَهُمْ بُيُوتًا فَجَعَلَنِي فِي خَيْرِهِمْ بَيْتًا، فَأَنَا خَيْرُكُمْ بَيْتًا وَخَيْرُكُمْ نَفْسًا).

অর্থাৎ, আমি মুহাম্মাদ বিন আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল মুত্তালিব। মহান আল্লাহ সৃষ্টি রচনা ক'রে আমাকে সৃষ্টির সেরা (মানুষের) দলভুক্ত করেছেন। সৃষ্টিকে (আরব ও আজম) দুই দলে বিভক্ত করেছেন এবং আমাকে উত্তম দলে স্থান দিয়েছেন। তিনি বিভিন্ন গোত্র সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ গোত্রে জন্ম দিয়েছেন। বিভিন্ন বাড়ি সৃষ্টি করেছেন এবং আমাকে সর্বশ্রেষ্ঠ বাড়িতে প্রেরণ করেছেন। সুতরাং আমি বাড়ির দিক দিয়ে তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ব্যক্তির দিক দিয়েও তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ। (আহমাদ ১৭৮৮নং)

صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ

আমরা জানি, এ বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ নবী মুহাম্মাদ ﷺ। তাঁর পর অন্যান্য আম্বিয়াগণ। তাঁদের পর সাহাবাগণ। তাঁদের পর তাবেঈনগণ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(خَيْرُ النَّاسِ قَرْنِى ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ).

অর্থাৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ আমার শতাব্দীর মানুষ, অতঃপর তাদের পরবর্তী শতাব্দীর, অতঃপর তার পরবর্তী শতাব্দীর। (বুখারী-মুসলিম)

কিন্তু সাধারণ মানুষদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ কে? কোন্ বৈশিষ্ট্য ও গুণের মানুষকে সর্বোত্তম গণ্য করা যাবে?

১। যার বয়স বেশি এবং আমল ভাল

আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন্ মানুষ সর্বশ্রেষ্ঠ?' উত্তরে তিনি বললেন,

« مَنْ طَالَ عُمُرُه وَحَسُنَ عَمَلُهُ ».

অর্থাৎ, যার আয়ু দীর্ঘ হয় এবং আমল ভাল হয়। (আহমাদ ২০৪১৫, তিরমিযী ২৩২৯, দারেমী ২৭৪২নং)

তিনি আরো বলেন,

(أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِخِيَارِكُمْ؟ خِيَارُكُمْ أَطْوَلُكُمْ أَعْمَارًا وَأَحْسَنُكُمْ أَخْلَاقاً).

অর্থাৎ, আমি কি তোমাদেরকে তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লোকেদের কথা বলে দেব না? ..... তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ লোক তারা, যাদের আয়ু সবচেয়ে দীর্ঘ এবং চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর। (আহমাদ, সিঃ সহীহাহ ১২৯৮নং)

সাহাবী ত্বালহা ﷺ বলেন, 'বানী উযরার তিন ব্যক্তি নবী ﷺ-এর কাছে এসে ইসলাম গ্রহণ করল। অতঃপর তারা আমার তত্ত্বাবধানে বাস করতে লাগল। এক সময় নবী ﷺ যুদ্ধে কিছু লোক প্রেরণ করলেন। তাদের মধ্যে একজন লোক তাতে যোগদান ক'রে শহীদ হয়ে গেল। তারপর আরো এক অভিযানে লোক পাঠালে তাদের মধ্যে দ্বিতীয়জন যোগ দিয়ে শহীদ হয়ে গেল। আর তৃতীয়জন বিছানায় মৃত্যুবরণ করল।'

ত্বালহা বলেন, 'অতঃপর এক রাতে আমি ঐ তিনজনকে স্বপ্নে দেখি, ওদের মধ্যে যে বিছানায় মারা গেছে সে সবার আগে আছে, অতঃপর যে পরে শহীদ হয়েছে সে আছে এবং সর্বপ্রথম যে শহীদ হয়েছে সে সবার শেষে রয়েছে। এতে আমার সন্দেহ হলে আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট গিয়ে উল্লেখ করলে তিনি বললেন, "এতে আপত্তিকর কী আছে? আল্লাহর নিকট সেই মু'মিন অপেক্ষা উত্তম কেউ নয়, যাকে ইসলামে তার তসবীহ, তকবীর ও তহলীলের জন্য বেশি বয়স দেওয়া হয়।" *(মুসনাদে আহমাদ, সিঃ সহীহাহ ৬৫৪নং)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, তিনি বললেন, "(ওদের মধ্যে দীর্ঘজীবী ব্যক্তি যে) সে কি ঐ (দ্বিতীয় ব্যক্তির) পরে এক বছর বেশি জীবিত ছিল না?" সকলে বলল, 'অবশ্যই।' তিনি বললেন, "সে (ঐ বছরে) রমযান পেয়ে কি রোযা রাখেনি, এত এত নামায পড়েনি ও সিজদাহ করেনি?"

সকলে বলল, 'অবশ্যই।' তিনি বললেন, "তাই ওদের উভয়ের মধ্যে যে ব্যবধান রয়েছে, তা আসমান-যমীনের মধ্যবর্তীর দূরত্ব থেকেও বেশি!" *(আহমাদ, ইবনে মাজাহ)*

২। মু'মিন মুজাহিদ

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! কোন্ ব্যক্তি সর্বোত্তম?' তিনি বললেন, "ঐ মু'মিন, যে আল্লাহর পথে তার জান ও মাল দিয়ে যুদ্ধ করে।" সে বলল, 'তারপর কে?' তিনি বললেন, "তারপর ঐ ব্যক্তি, যে কোন গিরিপথে নির্জনে নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করে।"

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে আল্লাহকে ভয় করে এবং লোকেদেরকে নিজের মন্দ আচরণ থেকে নিরাপদে রাখে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(خَيْرُ النَّاسِ مَنْزِلَةً : رَجُلٌ عَلَى مَتْنِ فَرَسِهِ يُخِيفُ الْعَدُوَّ وَيُخِيْفُوْنَهُ).

অর্থাৎ, মর্যাদায় সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে, যে নিজ ঘোড়ার পিঠে সওয়ার হয়ে শত্রুকে ভয় দেখায় এবং শত্রুরাও তাকে ভয় দেখায়। (বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৪২৯১, সিঃ সহীহাহ ৩৩৩৩নং)

৩। উদারচিত্ত সত্যবাদী

এমন মানুষ, যে অহংকারী নয়, গোঁড়া নয়, হঠকারী নয়, পরশ্রীকাতর নয়, হিংসুক নয়। একদা মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লোক কে?' উত্তরে তিনি বললেন,

«كُلُّ مَخْمُومِ الْقَلْبِ، صَدُوقِ اللِّسَانِ».

"সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ লোক হল সেই, যার হৃদয় হল পরিষ্কার এবং জিভ হল সত্যবাদী।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'পরিষ্কার হৃদয়ের অর্থ কী?' বললেন,

«هُوَ التَّقِيُّ النَّقِيُّ. لاَ إِثْمَ فِيهِ وَلاَ بَغْيَ وَلاَ غِلَّ وَلاَ حَسَدَ».

"যে হৃদয় সংযমশীল, নির্মল, যাতে কোন পাপ নেই, অন্যায় নেই, ঈর্ষা ও হিংসা নেই।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'তারপর কে?' বললেন, "যে দুনিয়াকে ঘৃণা করে এবং আখেরাতকে ভালোবাসে।" জিজ্ঞাসা করা হল, 'তারপর কে?' বললেন, "সুন্দর চরিত্রের মুমিন।" (ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ৩২৯১নং)

৪। সমমর্মী

এমন মানুষ, যে নিজের কষ্ট অনুমান ক'রে অপরকে কষ্টদানে বিরত থাকে। নিজের জন্য যা পছন্দ করে, অপরের জন্যও তাই পছন্দ করে। সে যেমন চায় না, তার নিজের কোন অসুবিধা হোক, তেমনি সে অপরের জন্যও চায় না, তার কোন অসুবিধা হোক। তার একটি নমুনা বর্ণনা ক'রে মহানবী ﷺ বলেছেন,

(خِيَارُكُمْ أَلْيَنُكُمْ مَنَاكِبَ فِى الصَّلاَةِ).

অর্থাৎ, "তোমাদের মধ্যে উত্তম লোক তারাই, যারা নামাযের (কাতারের) মধ্যে

নিজেদের বাহুসমূহকে (পার্শ্ববর্তী নামাযীদের জন্য) নরম রাখে।" *(আবূ দাঊদ ৬৭২নং, ত্বাবারানী, প্রমুখ)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "ততক্ষণ পর্যন্ত তোমাদের কেউ প্রকৃত ঈমানদার হবে না; যতক্ষণ পর্যন্ত না সে তার ভায়ের জন্য তাই পছন্দ করবে, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন, "যে পছন্দ করে যে, তাকে জাহান্নাম থেকে দূরে রাখা হোক এবং জান্নাতে প্রবেশ করানো হোক, তার মরণ যেন এমন অবস্থায় হয় যে, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি ঈমান রাখে এবং অন্যের প্রতি এমন ব্যবহার দেখায়, যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।" *(মুসলিম)*

৫। আদর্শ আলেম-উলামা

সাধারণ মানুষের উপর আদর্শ আলেম-উলামার মর্যাদা, যেমন তারকারাজির উপর চাঁদের। যেহেতু তাঁরা নবী ﷺ-এর ওয়ারেস। আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ} (١١) سورة المجادلة

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদেরকে বহু মর্যাদায় উন্নত করবেন। আর তোমরা যা কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে সবিশেষ অবহিত। (মুজাদালাহ্ঃ ১১)

আবূ হুরাইরাহ ﷺ বলেন, একদা রসূল ﷺ-কে প্রশ্ন করা হল যে, 'হে আল্লাহর রসূল! মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি কে?' তিনি বললেন, "তাদের মধ্যে যে সবচেয়ে আল্লাহ-ভীরু।" অতঃপর তাঁরা (সাহাবীরা) বললেন, 'এ ব্যাপারে আমরা আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি না।' তিনি বললেন, "তাহলে ইউসুফ (সবচেয়ে সম্মানিত ব্যক্তি), যিনি স্বয়ং আল্লাহর নবী, তাঁর পিতা নবী, পিতামহও নবী এবং প্রপিতামহও নবী ও আল্লাহর বন্ধু।" তাঁরা বললেন, 'এটাও আমাদের প্রশ্ন নয়।' তিনি বললেন,

((فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ تَسْأَلُونِي؟ خِيَارُهُمْ فِي الجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِي الإِسْلامِ إِذَا فَقُهُوا)).

"তাহলে তোমরা কি আমাকে আরবের বংশাবলী সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করছ? (তবে শোনো!) তাদের মধ্যে যারা জাহেলী যুগে সবার চাইতে ভাল, তারা ইসলামেও সবার চাইতে ভাল; যদি দ্বীনের জ্ঞানী হয়।" *(বুখারী-মুসলিম)*

মহানবী ﷺ বলেন,

((خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ وَعَلَّمَهُ)). رواه البخاري

"তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সেই, যে নিজে কুরআন শিখে অপরকে শিক্ষা দেয়।" *(বুখারী)*

দ্বীনী শিক্ষকগণ সর্বশ্রেষ্ঠ বলেই তো গর্তের পিঁপড়া ও পানির মাছ পর্যন্ত তাঁদের জন্য দুআ করে! মহানবী ﷺ বলেছেন,

((فَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ، إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ حَتَّى

النَّمْلَةَ فِي جُحْرِهَا وَحَتَّى الحُوْتَ لَيُصَلُّونَ عَلَى مُعَلِّمِي النَّاسِ الخَيْرَ)). رواه الترمذي

অর্থাৎ, আলেমের ফযীলত আবেদের উপর ঠিক সেই রূপ, যেরূপ আমার ফযীলত তোমাদের উপর। নিশ্চয় আল্লাহ, তাঁর ফিরিশ্তাকুল, আসমান-যমীনের সকল বাসিন্দা এমনকি গর্তের মধ্যে পিঁপড়ে এবং (পানির মধ্যে) মাছ পর্যন্ত মানবমন্ডলীর শিক্ষাগুরুদের জন্য মঙ্গল কামনা ও নেক দুআ ক'রে থাকে। *(তিরমিযী)*

তিনি আরো বলেছেন,

((مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً يَبْتَغِي فِيهِ عِلْماً سَهَّلَ اللهُ لَهُ طَرِيقاً إِلَى الجَنَّةِ، وَإِنَّ المَلاَئِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ العِلْمِ رِضاً بِمَا يَصْنَعُ ، وَإِنَّ العَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الأَرْضِ حَتَّى الحِيتَانُ فِي المَاءِ ، وَفَضْلُ العَالِمِ عَلَى العَابِدِ كَفَضْلِ القَمَرِ عَلَى سَائِرِ الكَوَاكِبِ ، وَإِنَّ العُلَمَاءَ وَرَثَةُ الأَنْبِيَاءِ ، وَإِنَّ الأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَاراً وَلاَ دِرْهَماً وَإِنَّمَا وَرَّثُوا العِلْمَ ، فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ)).

رواه أَبُو داود والترمذي

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি এমন পথে গমন করে, যাতে সে জ্ঞানার্জন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম ক'রে দেন। আর ফিরিশ্তাবর্গ তালেবে ইলমের জন্য তার কাজে প্রসন্ন হয়ে নিজেদের ডানাগুলি বিছিয়ে দেন। অবশ্যই আলেম ব্যক্তির জন্য আকাশ-পৃথিবীর সকল বাসিন্দা এমনকি পানির মাছ পর্যন্ত ক্ষমা প্রার্থনা ক'রে থাকে। আবেদের উপর আলেমের ফযীলত ঠিক তেমনি, যেমন সমগ্র নক্ষত্রপুঞ্জের উপর পূর্ণিমার চাঁদের ফযীলত। উলামা সম্প্রদায় পয়গম্বরদের উত্তরাধিকারী। আর এ কথা সুনিশ্চিত যে, পয়গম্বরগণ কাউকে কোন রৌপ্য বা স্বর্ণ-মুদ্রার উত্তরাধিকারী বানিয়ে যাননি; বরং তাঁরা ইল্মের (দ্বীনী জ্ঞানভান্ডারের) উত্তরাধিকারী বানিয়ে গেছেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা অর্জন করল, সে পূর্ণ অংশ লাভ করল। *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী)*

তাঁরা সবার সেরা বলেই তো দুনিয়ার সব কিছু অভিশপ্ত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা অভিশপ্ত নন। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((أَلاَ إِنَّ الدُّنْيَا مَلْعُونَةٌ، مَلْعُونٌ مَا فِيهَا، إِلاَّ ذِكْرَ اللهِ تَعَالَى، وَمَا وَالاهُ، وَعَالِماً وَمُتَعَلِّماً)).

অর্থাৎ, শোনো! নিঃসন্দেহে দুনিয়া অভিশপ্ত। অভিশপ্ত তার মধ্যে যা কিছু আছে (সবই)। তবে আল্লাহর যিক্র এবং তার সাথে সম্পৃক্ত জিনিস, আলেম ও তালেবে-ইল্ম নয়। *(তিরমিযী, হাসান সূত্রে)*

৬। গরীব-দরদী

বহু মানুষ আছে, যারা গরীবদের খোঁজ-খবর রাখে, ক্ষুধার্তকে অন্নদান করে, সালামদাতার সালামের যথারীতি জবাব দান করে। এমন লোক হয় সামাজিক। গরীবরা তাকে ভালোবাসে, তার জন্য দুআ করে। তদনুরূপ তারা বিনয়ের সাথে প্রত্যেকের সালামের যথারীতি উত্তর দিয়ে সালাম বিনিময় করে। তার ফলে সকলের মাঝে সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্য বৃদ্ধি লাভ করে। আর তার জন্য সেই হয় সমাজে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(خَيْرُكُمْ مَنْ أَطْعَمَ الطَّعَامَ وَرَدَّ السَّلَامَ).

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি, যে অন্নদান করে এবং সালামের উত্তর দেয়।

(হাকেম, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, সঃ জামে' ৩৩১৮নং)

৭। কল্যাণময় ব্যক্তি

কিছু মানুষ আছে, যাদের অতিরিক্ত গুণ হল মানুষ তাদের কাছে গেলে আশাবাদী হতে পারে। তাদের কাছে কল্যাণের আশা করতে পারে এবং তাদের অকল্যাণ, অনিষ্ট বা ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা লাভ করতে পারে। এমন মানুষদেরকেও শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(خَيْرُكُمْ مَنْ يُرْجَى خَيْرُهُ وَيُؤْمَنُ شَرُّهُ وَشَرُّكُمْ مَنْ لَا يُرْجَى خَيْرُهُ وَلَا يُؤْمَنُ شَرُّهُ).

অর্থাৎ, তোমাদের মধ্যে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি সে, যার কাছে মঙ্গল আশা করা যায় এবং অমঙ্গলের ব্যাপারে নিরাপদ থাকা যায়। আর তোমাদের মধ্যে সবার চেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে, যার কাছে মঙ্গল আশা করা যায় না এবং অমঙ্গলের ব্যাপারে নিরাপদ থাকা যায় না। (আহমাদ ৮৮১২, তিরমিযী ২২৬৩, ইবনে হিব্বান ৫২৭নং)

৮। উত্তম স্বামী

প্রত্যেক বিবাহিত পুরুষই একজন স্বামী। কিন্তু আদর্শ স্বামী প্রত্যেকে হতে পারে না। আদর্শ হওয়ার জন্য অতিরিক্ত গুণ লাগে। আর যে স্বামী আদর্শ হয়ে তার স্ত্রীর কাছে 'ভাল' হয়, স্বামীর বহু গুপ্ত খবর জানার পরেও যে আদর্শ স্ত্রীর কাছে তার স্বামী 'ভাল'র সার্টিফিকেট পায়, সেই পুরুষ সমাজেও সর্বশ্রেষ্ঠ হয়। মহানবী ﷺ বলেন,

(أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنُهُمْ خُلُقًا، وَخَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ لأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لأَهْلِي).

"সবার চেয়ে পূর্ণ ঈমানদার ব্যক্তি সে, যার চরিত্র সবার চেয়ে সুন্দর এবং ওদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উত্তম ব্যক্তি সেই, যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম।" *(তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, সহীহুল জামে' ১২৩২নং)*

কিন্তু আদর্শ স্বামী কে?

আদর্শ স্বামী সে, যে দ্বীনদার। যে তার স্ত্রীকে যথার্থ অধিকার প্রদান করে। স্বামী বিবাহ-বন্ধনের সময় বা পূর্বে যে মোহর স্ত্রীকে প্রদান করবে বলে অঙ্গীকার করেছে তা পূর্ণভাবে আদায় করে এবং তা হতে স্ত্রীকে বঞ্চিতা করার জন্য কোন প্রকার টাল-বাহানা করে না। যেহেতু স্ত্রীকে তার নির্ধারিত মোহর অর্পণ করা ফরয।" *(নিসা ঃ ২৪)*

আর্থিক অবস্থানুযায়ী স্ত্রীর ভরণ-পোষণ করে। নিজে যা খায়, তাই তাকে খাওয়ায় এবং যা পরিধান করে, ঠিক সেই সমমানের লেবাস তাকেও পরিধান করায়। *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী)*

আদর্শ স্বামী নিজ স্ত্রীর সাথে সদ্ভাবে বাস করে। তার দু'-একটি গুণ অপছন্দ হলেও সদাচার ও সদ্ব্যবহার বন্ধ করে না। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَن تَكْرَهُواْ شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا}

"আর তাদের সাথে সদ্ভাবে জীবন-যাপন কর। তোমরা যদি তাদেরকে ঘৃণা কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা যা ঘৃণা করছ, আল্লাহ তার মধ্যেই প্রভূত কল্যাণ নিহিত রেখেছেন।" *(নিসা ঃ ১৯)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "কোন মু'মিন পুরুষ যেন কোন মু'মিন স্ত্রীকে ঘৃণা না করে। কারণ

সে তার একটা গুণ অপছন্দ করলেও অপর আর একটা গুণে মুগ্ধ হবে।” *(মুসলিম, মিশকাত ৩২৪০নং)*

আদর্শ স্বামী সর্বদা নিজের প্রেমকে স্ত্রীর মনের সিংহাসনে আসীন ক'রে রাখে। তাকে সুন্দর প্রেমময় নামে ডাকে। সে যা চায়, বৈধ কিছু হলে তাই তাকে সাধ্যমত প্রদান করে। হৃদয়ের বিনিময়ে হৃদয় এবং শক্তি নয়, বরং ভক্তি দ্বারাই সাথীর মন জয় করে।

কোন কারণে স্ত্রী রেগে গেলে ধৈর্য ধরে। মুর্খামি করলে সহ্য ক'রে নেয়। ভুল করলে ক্ষমা ক'রে দেয়। শরীয়তের বিধি-বিধান মানতে আদেশ ও সহযোগিতা করে।

স্ত্রী কোন ভাল কথা বললে উপেক্ষার কানে না শুনে আগ্রহের কানে শোনে, কোন উত্তম রায়-পরামর্শ দিলে তা সাদরে গ্রহণ করে।

যথাসময়ে তার সাথে হাসি-তামাসা করে, সব সময় পৌরুষ মেজাজ না রেখে কোন কোন সময় তার সাথে বৈধ খেলা খেলে, শরীরচর্চা বা ব্যায়ামাদি করে। প্রিয় নবী ﷺ স্ত্রী আয়েশার সাথে দৌড় প্রতিযোগিতা ক'রে একবার হেরেছিলেন ও পরে আর একবারে তিনি জিতেছিলেন। *(আহমাদ)*

তদনুরূপ আদর্শ স্বামী তার স্ত্রীকে বৈধ খেলা দেখতে সুযোগ দেয়। *(বুখারী, নাসাঈ)* তবে এসব কিছু করে একান্ত নির্জনে, পর্দা-সীমার ভিতরে।

স্ত্রী ভালো খাবার তৈরী করলে, সাজগোজ করলে বা কোন ভালো কাজ করলে তার প্রশংসা করে স্বামী। স্ত্রীর হৃদয়কে লুটে নেওয়ার জন্য ইসলাম মিথ্যা বলাকেও বৈধ করেছে। *(বুখারী, মুসলিম)* তবে যে মিথ্যা তার অধিকার হরণ করে ও তাকে ধোঁকা দেয়, সে মিথ্যা সে বলে না।

আদর্শ স্বামী স্ত্রীর গৃহস্থালি কর্মে সহায়তা করে। এতে স্ত্রীর মন স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেমে আরো পরিপূর্ণ হয়ে উঠে। প্রিয় নবী ﷺ; যিনি দুজাহানের বাদশাহ তিনিও সংসারের কাজ করতেন। স্ত্রীদের গৃহস্থালি কাজে সহায়তা করতেন, অতঃপর নামাযের সময় হলেই মসজিদের দিকে রওনা হতেন। *(বুখারী, তিরমিযী)* তিনি অন্যান্য মানুষের মত একজন মানুষ ছিলেন; স্বহস্তে কাপড় পরিষ্কার করতেন, দুধ দোয়াতেন এবং নিজের খিদমত নিজেই করতেন। *(সিঃ সহীহাহ ৬৭০নং)*

স্বামী যেমন স্ত্রীকে সুন্দরী দেখতে পছন্দ করে তেমনি স্ত্রীও স্বামীকে সুন্দর ও সুসজ্জিত দেখতে ভালোবাসে। এটাই হল মানুষের প্রকৃতি। সুতরাং আদর্শ স্বামীও স্ত্রীকে খোশ করার জন্য সাধ্যমতো সাজগোজ করে।

স্ত্রীর এঁটো বা উচ্ছিষ্ট খেতে আদর্শ স্বামী অপছন্দ করে না।

স্ত্রীকে তার নিকটাত্মীয়দের সাথে যথা নিয়মে দেখা-সাক্ষাৎ করতে বাধা দেয় না।

স্ত্রীকে বিভিন্ন উপলক্ষে (যেমন ঈদ, কুরবানী প্রভৃতিতে) ছোট-বড় উপহার দিয়ে তার মন জয় করে।

আদর্শ স্বামী নিজ স্ত্রীকে বিপদ-আপদ থেকে রক্ষা করে। এমনকি তাকে রক্ষা করতে গিয়ে যদি তার জীবনও চলে যায়, তাহলে সে শহীদের মর্যাদা পায়।

আদর্শ স্বামী নিজ স্ত্রীর ধর্ম, দেহ, যৌবন ও মর্যাদায় ঈর্ষাবান হয় এবং এ সবে কোন প্রকার

কলঙ্ক লাগতে দেয় না।

আদর্শ স্বামী ও স্ত্রী উভয়ের ইচ্ছা ও খুশীমতো একে অপরের দেহ ব্যবহার ও (বৈধভাবে) চির যৌনতৃপ্তি আস্বাদন করে।

অবশ্য সব স্ত্রীর কাছে আদর্শ স্বামী হওয়ার মাপকাঠি এক নয়। স্বাধীনতারও একটা সীমা আছে। যে স্ত্রী সেই সীমার বাইরে স্বাধীনতা চায়, সে স্ত্রীর কাছে তার স্বামী আদর্শ হতে পারে না। শরীয়ত-বিরোধী কাজে বাধা না পেয়ে যে স্ত্রী অতিরিক্ত ভালবাসা নিয়ে সংসার করে, তার স্বামীও আদর্শ নয়। যেমন একজন আদর্শচ্যুত স্ত্রীর কাছে তার স্বামী আদর্শ হতে পারে না।

৯। ঋণ পরিশোধকারী

অনেক মানুষ আছে, যারা ঋণ নেয়, কিন্তু যথাসময়ে পরিশোধ করে না। যা নেয়, তার অনুরূপ জিনিস পরিশোধ করে না। তারা কিন্তু ভাল লোক নয়। উপকারের বিনিময়ে উপকার করতে না পারলেও ক্ষতির খেয়াল রাখে না এমন লোকেরা। পক্ষান্তরে শ্রেষ্ঠ লোক হয় তারা,---

যারা ঋণ নিয়ে যথাসময়ে তা পরিশোধ ক'রে দেয় এবং তাতে কোন প্রকার টাল-বাহানা বা ছেঁচড়ামি করে না।

যা নিয়েছে, তার বেশি দিয়ে পরিশোধ করে।

যেমন নিয়েছে, তার থেকে ভাল জিনিস আদায় করে।

ঋণদাতার কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে।

আবূ হুরাইরা ؓ বলেন, একটি লোক নবী ﷺ-এর নিকট এসে রূঢ়ভাবে তাঁর কাছে পাওনা তলব করল। তখন সাহাবীগণ তাকে ভর্ৎসনা করতে চাইলেন। রাসূলুল্লাহ ﷺ তাদেরকে বললেন, “ওকে ছেড়ে দাও। কারণ হক (পাওনা)দারের কথা বলার অধিকার আছে।” তারপর বললেন, “ওকে ঠিক সেই বয়সের (উট) দিয়ে দাও যে বয়সের (উট) ওর ছিল।” তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! তার চেয়ে উত্তম (উট) বৈ পাচ্ছি না।' তিনি বললেন,

(أَعْطُوهُ فَإِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً).

“ওকে (ওটিই) দিয়ে দাও। কেননা, তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে ব্যক্তি উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ ক'রে থাকে।” (বুখারী ও মুসলিম ৪১৯২নং)

অন্য এক বর্ণনায় আছে, “সর্বশ্রেষ্ঠ আল্লাহর বান্দা” আর এক বর্ণনায় “সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ” হল সেই ব্যক্তি, যে ব্যক্তি উত্তমভাবে ঋণ পরিশোধ করে।

আর এক মরুবাসী (বেদুঈন) লোকের কাছে তিনি কিছু খেজুর ধার করেছিলেন। সে তাঁর নিকট নিজের পাওনা আদায় করতে এসে তাঁকে কটু কথা শুনাতে লাগল। এমনকি সে তাঁকে বলল, 'আপনি আমার ঋণ পরিশোধ না করলে, আমি আপনাকে মুশকিলে ফেলব!' এ কথা শুনে সাহাবাগণ তাকে ধমক দিলেন ও বললেন, 'আরে বেআদব! জান তুমি কার সাথে কথা বলছ?' লোকটি বলল, 'আমি আমার হক আদায় চাচ্ছি।' মহানবী ﷺ বললেন, “তোমরা হকদারের সঙ্গ দিলে না কেন?” অতঃপর তিনি খাওলাহ বিন্তে কাইসের নিকট বলে পাঠালেন যে, “যদি তোমার কাছে খেজুর থাকে, তাহলে আমাকে ধার দাও। অতঃপর

আমাদের খেজুর এলে তোমাকে পরিশোধ করে দেব।” খাওলাহ বললেন, ‘অবশ্যই দোব। আমার আব্বা আপনার জন্য কুরবান হোক, হে আল্লাহর রসূল!’ অতঃপর তিনি খেজুর দিলে মহানবী ﷺ লোকটির ঋণ পরিশোধ করলেন এবং আরো কিছু বেশী খেতে দিলেন। লোকটি বলল, ‘আপনি আমার হক পূরণ করলেন, আল্লাহ আপনার হক পূরণ করুক।’ মহানবী ﷺ বললেন, “ওরাই হল ভাল লোক, (যারা সুন্দরভাবে ঋণ পরিশোধ করে।) সে জাতি পবিত্র হবে না (বা না হোক), যে জাতির দুর্বল ব্যক্তি নিজ অধিকার অনায়াসে আদায় না করতে পেরেছে।” *(ইবনে মাজাহ ২৪২৬, বাযযার, ত্বাবারানী, আবূ য়্যা'লা, সহীহুল জামে' ২৪২১ নং)*

সুতরাং এর বিপরীত, যারা ঋণ নেওয়ার আগে খুব দাওয়াত খাওয়ায়, ঘন-ঘন ফোনে যোগাযোগ রাখে, মোসাহেবি ও চাটুকতা করে, অতঃপর দেওয়ার সময় দাওয়াতের কথা ভুলে যায়, ফোনে উত্তরও দেয় না, নানা মিথ্যা ওজর দিয়ে পাশ কাটতে চায়, যাদের মন নেওয়ার সময় খুশিখুশি, দেওয়ার সময় কষাকষি, তারা কোন্ শ্রেণীর মানুষ? (‘দেনা-পাওনা’ পড়ুন।)

১০। পরোপকারী

পরোপকারিতা পরার্থপর মানুষের একটি মহৎ গুণ। পরোপকার ক’রে সে মহা আনন্দ ও তৃপ্তিলাভ ক’রে থাকে। শায়খ আলী ত্বানত্বাবী বলেন, ‘সবচেয়ে বড় মধুর হল পরোপকারিতার স্বাদ।’

সত্য কথা এই যে, ‘পরের জন্য আত্মবিসর্জন ভিন্ন পৃথিবীতে স্থায়ী সুখের অন্য কোন মূল্য নেই।’

পরোপকারে উপকারী নিজেও উপকৃত হয়। দানের বিনিময়ে প্রতিদান পায়। তাই তো জ্ঞানিগণ বলেন,

‘মানুষ যা পেয়েছে, তার জন্য তাকে সম্মান জানানো হয় না, মানুষ পৃথিবীকে যা দিয়েছে, তার জন্যই তার সম্মান।’

‘জীবন একটি প্রতিধ্বনির মতো, যা দিই, তাই ফিরে পাই।’

‘জীবনের সুন্দরতম প্রাপ্তি হচ্ছে, আন্তরিকভাবে অপরকে সাহায্য করা। ফলে প্রকৃতপক্ষে আমরা নিজেদেরই সাহায্য করি।’

‘যা কিছু সুন্দর ও ভালো তা নিজস্ব নিয়মে ফিরে আসে। প্রতিদান পাওয়ার বাসনায় ভালো করার প্রয়োজন হয় না। প্রতিদান আপনিই পাওয়া যায়।’

‘রোপণ হল দুই প্রকার ঃ বৃক্ষ-রোপণ ও ইষ্ট-রোপণ। মাটিতে বৃক্ষ রোপণ করলে মানুষ উপকৃত হয়। আর মানব-মনের জমিতে ইষ্ট রোপণ করলেও মানুষ উপকৃত হয়। আর তাতে উপকৃত হয় খোদ রোপণকারীও।’

‘পরোপকার একটি বেড়ি, যা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ অথবা প্রতিদান ছাড়া ছাড়ানো যায় না।’

‘উপকৃত উপকারীর দাস।’

মুলহাব বিন আবী সাফরাহ বলেন, ‘আমি দেখে অবাক হই যে, লোকেরা নিজ মাল দিয়ে পরাধীন দাস ক্রয় করে, অথচ উপকারিতা দিয়ে স্বাধীন মানুষ ক্রয় করে না।’

পরের উপকার যে করে, সেই হয় সমাজে সুপরিচিত, পরম শ্রদ্ধেয় ও চির স্মরণীয় ব্যক্তি। কবি বলেছেন,

‘যা রাখি আমার তরে মিছে তারে রাখি,
আমিও রব না যবে সেও হবে ফাঁকি।
যা রাখি সবার তরে সেই শুধু রবে,
মোর সাথে ডোবে না সে, রাখে তারে সবে।’

এমন ব্যক্তিই হয় সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(خَيْرُ النَّاس أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاس)

অর্থাৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ সেই ব্যক্তি, যে মানুষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপকারী। (সঃ জামে' ৩২৮৯, দারাক্বুত্বনী, সিঃ সহীহাহ ৪২৬নং)

১১। সম্মানিত মু'মিন

সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হল, যে মু'মিন এবং তার পিতামাতা মু'মিন। অথবা তার পিতা মু'মিন ও এবং পুত্রও মু'মিন। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَفْضَلُ النَّاسِ مُؤْمِنٌ بَيْنَ كَرِيْمَيْنِ).

অর্থাৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হল সেই মু'মিন, যার অবস্থান দুই সম্ভ্রান্তের মাঝে। (ত্বাবারানী, সঃ জামে' ১১৩০নং)

অবশ্য অনেকে উক্ত হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেছেন,

সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হল সেই মু'মিন, যার অবস্থান দুই দানশীল পিতা ও মাতার মাঝে।

সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হল সেই মু'মিন, যার অবস্থান জিহাদে প্রস্তুত দুই ঘোড়ার মাঝে।

সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হল সেই মু'মিন, যার অবস্থান সেচক দুই উটের মাঝে। (যে ফিতনার ভয়ে লোকালয় থেকে দূরে থাকে। আল্লাহু আ'লাম। (দ্রঃ আল-ফাতহুর রাব্বানী ১/৯৫)

সর্বশ্রেষ্ঠ বংশ

যদিও ইসলামে বংশ-মর্যাদার স্বীকৃতি আছে। আর সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বংশ হল আমাদের মহানবী ﷺ-এর বংশ। তবুও ইসলামই হল সবচেয়ে বড় বংশ। যে মুসলিম চরিত্রে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, তার বংশ সবচেয়ে উচ্চ।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, “আল্লাহর নিকট সবচেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি সে, যে সবচেয়ে বেশী পরহেযগার। আর সবচেয়ে উচ্চ বংশীয় লোক সে, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর।” *(আল-আদাবুল মুফরাদ ৬৯৪নং)*

বলা বাহুল্য, যার চরিত্র সবচেয়ে সুন্দর, তারই বংশ সবার চাইতে কুলীন। অন্যথা চরিত্রহীনের বংশগৌরব কোন কাজের নয়।

মহানবী ﷺ বলেন, “যাকে তার আমল পশ্চাদ্বর্তী করেছে, তাকে তার বংশ অগ্রবর্তী করতে পারে না।” *(মুসলিম ২৬৯৯নং, আবু দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, হাকেম)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَى وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ} (١٣) سورة الحجرات

অর্থাৎ, হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরেরর সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তিই আল্লাহর নিকট অধিক মর্যাদাসম্পন্ন, যে অধিক আল্লাহ-ভীরু। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন। (হুজুরাত ঃ ১৩)

বলাই বাহুল্য যে, মুত্তাক্বী, পরহেযগার বা আল্লাহ-ভীরু ব্যক্তির চাইতে অধিক চরিত্রবান আর কেউ হতে পারে না।

অধিকাংশ মুনাফিক কোন্ শ্রেণীর মানুষ?

মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষদের মধ্য থেকে মুনাফিক হতে পারে। কিন্তু কোন্ শ্রেণীর মানুষদের মধ্য থেকে অধিকাংশ মুনাফিক বর্তমান থাকে?

আল্লাহর নবী ﷺ বলেছেন,

(أَكْثَرُ مُنَافِقِي أُمَّتِي قُرَّاؤُهَا).

অর্থাৎ, আমার উম্মতের মুনাফিকদের অধিকাংশ হল ক্বারীর দল। (আহমাদ, ত্বাবারানী, সঃ জামে' ১২০৩নং)

তা কেন?

যেহেতু হাফেয, ক্বারী ও আলেম কুরআন শিক্ষা ও তেলাঅত করবে কেবল আল্লাহর উদ্দেশ্যে। আর তাতে তারা আল্লাহর কাছে বিশাল মর্যাদার অধিকারীও হবে। কিন্তু তার পশ্চাতে যদি দুনিয়া উদ্দেশ্য হয়, অর্থোপার্জন ও সুনাম উদ্দেশ্য হয়, কুরআনের নির্দেশানুযায়ী আমল না হয়, কুরআনের যথার্থ হক আদায় না হয়, তাহলেই তাদের মুনাফিকী হয়। কুরআন পড়ে সমাজকে দেখায়, তারা আল্লাহর কাজ করছে, অথচ আসলে করছে নিজের পার্থিব সম্ভোগের ব্যবসাদারি। বাইরে এক, ভিতরে এক। অর্থলোভে বিদআতী কুরআন-খানী করে, মুশরিক ও কাফেরদের নামেও কুরআনখানী করে! তাই তো তাদেরকে 'মুনাফিক' বলে অভিহিত করা হয়েছে।

যে জিনিস দিয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনা করার কথা, সে জিনিস দিয়ে পার্থিব ধন, মান বা সুনাম কামনা করলে তার ফল হয় সম্পূর্ণ বিপরীত।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন যে, "কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোকেদের পূর্বে যে ব্যক্তির প্রথম বিচার হবে সে হচ্ছে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সুতরাং সে তা স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'ঐ নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী আমল ক'রে এসেছ?' সে বলবে 'আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য জিহাদ করেছি এবং অবশেষে শহীদ হয়ে

গেছি।' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে জিহাদ করেছ, যাতে লোকেরা তোমাকে বলে, অমুক একজন বীর পুরুষ। সুতরাং তা-ই বলা হয়েছে।' অতঃপর (ফিরিশ্তাদেরকে) আদেশ করা হবে এবং তাকে উবুড় ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

দ্বিতীয় হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যে ইল্‌ম শিক্ষা করেছে, অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাকে (পৃথিবীতে প্রদত্ত) তাঁর সকল নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'এই সকল নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী আমল ক'রে এসেছ?' সে বলবে, 'আমি ইল্‌ম শিখেছি, অপরকে শিখিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টিলাভের জন্য কুরআন পাঠ করেছি।' আল্লাহ বলবেন, 'মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে ইল্‌ম শিখেছ, যাতে লোকেরা তোমাকে আলেম বলে এবং এই উদ্দেশ্যে কুরআন পড়েছ, যাতে লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। আর (দুনিয়াতে) তা বলা হয়েছে।' অতঃপর (ফিরিশ্তাদেরকে) নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উবুড় ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার রুযীকে আল্লাহ প্রশস্ত করেছিলেন এবং সকল প্রকার ধন-দৌলত যাকে প্রদান করেছিলেন। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া সমস্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ প্রশ্ন করবেন, 'তুমি ঐ সকল নেয়ামতের বিনিময়ে কী আমল ক'রে এসেছ?' সে বলবে, 'যে সকল রাস্তায় দান করলে তুমি খুশী হও সে সকল রাস্তার মধ্যে কোনটিতেও তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে খরচ করতে ছাড়িনি।' তখন আল্লাহ বলবেন, 'মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এ জন্যই দান করেছিলে; যাতে লোকে তোমাকে দানবীর বলে। আর তা বলা হয়েছে।' অতঃপর (ফিরিশ্তাবর্গকে) হুকুম করা হবে এবং তাকে উবুড় ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। *(মুসলিম ১৯০৫ নং)*

জ্ঞানিগণ বলেন, 'আমলহীন আলেম ফলহীন গাছের মতো। জ্ঞান অর্জন খাদ্য গ্রহণের মত; কতটা খাওয়া হচ্ছে তার উপর স্বাস্থ্য নির্ভর করে না---কতটা হজম হচ্ছে তার উপর স্বাস্থ্য নির্ভর করে। মানুষের জ্ঞান প্লেন থেকে ঝাঁপ দিয়ে পড়া লোকেদের প্যারাশুটের মত, তা না খুললে কোন লাভ নেই।'

আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﵁-কে এক ব্যক্তি বলল, 'আমি এক রাকআতে মুফাসস্বাল (সূরা ক্বাফ থেকে সূরা নাস পর্যন্ত অংশ) পাঠ করি।' এ কথা শুনে তিনি বললেন, 'কবিতা আওড়ানোর মত পড়? কিছু সম্প্রদায় আছে যারা কুরআন পড়ে, কিন্তু তা তাদের কণ্ঠের নিচে নামে না। আসলে সেই কুরআন পাঠ কাজে দেবে, যা হৃদয়ে এসে গেঁথে যাবে এবং তা পাঠকারীকে উপকৃত করবে---।' *(বুখারী ৭৭৫, মুসলিম ৮২২নং)*

বেআমল হাফেয, ক্বারী ও আলেমের শাস্তিও কঠিন। আর সে শাস্তি শুরু হয় মধ্য-জগৎ থেকেই।

সামুরাহ ইবনে জুনদুব ﵁ বলেন, নবী ﷺ প্রায়ই তাঁর সাহাবীদেরকে বলতেন, "তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি?" রাবী বলেন, যার ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা সে

তাঁর কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করত। তিনি একদিন সকালে বললেন, "গতরাত্রে আমার কাছে দুজন আগন্তুক এল। তারা আমাকে উঠাল, আর বলল, 'চলুন।' আমি তাদের সাথে চলতে লাগলাম। অতঃপর আমরা কাত হয়ে শোয়া এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছলাম। দেখলাম, অপর এক ব্যক্তি তার নিকট পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করছে। ফলে তার মাথা ফাটিয়ে ফেলছে। আর পাথর গড়িয়ে সরে পড়ছে। তারপর আবার সে পাথরটির অনুসরণ ক'রে তা পুনরায় নিয়ে আসছে। ফিরে আসতে না আসতেই লোকটির মাথা আগের মত পুনরায় ভাল হয়ে যাচ্ছে। ফিরে এসে আবার একই আচরণ করছে; যা প্রথমবার করেছিল। (তিনি বলেন,) আমি সাথীদ্বয়কে বললাম, 'সুবহানাল্লাহ! এটা কী?' তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন।'

তারপর আরো অনেক দৃশ্য দেখলেন। পরিশেষে তিনি আগন্তুকদ্বয়কে বললেন, 'আমি রাতে অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার দেখতে পেলাম, এগুলোর তাৎপর্য কী?' তারা আমাকে বলল, 'আচ্ছা আমরা আপনাকে বলে দিচ্ছি। ঐ যে প্রথম ব্যক্তি, যার কাছে আপনি পৌঁছলেন, যার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে হল ঐ ব্যক্তি যে কুরআন গ্রহণ ক'রে---তা বর্জন করে। আর ফরয নামায ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকে।

এক বর্ণনায় আরো আছে, "যার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে দেখলেন, সে ছিল এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ কুরআন শিখিয়েছিলেন। কিন্তু সে (তা ভুলে) রাতে ঘুমিয়ে থাকত এবং দিনে তার উপর আমল করত না। অতএব এই আচরণ তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত করা হবে।......" *(বুখারী)*

কুরআনের ধারক ও বাহকদেরকে জেনে রাখা উচিত যে, কুরআন তাদের স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে দলীল স্বরূপ। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "পবিত্রতা অর্ধেক ঈমান। আর 'আলহামদু লিল্লাহ' (কিয়ামতে নেকীর) দাঁড়িপাল্লাকে ভরে দেবে এবং 'সুবহানাল্লাহ' ও 'আলহামদু লিল্লাহ' আসমান ও যমীনের মধ্যস্থিত শূন্যতা পূর্ণ ক'রে দেয়। নামায হচ্ছে জ্যোতি। সাদকাহ হচ্ছে প্রমাণ। ধৈর্য হল আলো। আর কুরআন তোমার স্বপক্ষে অথবা বিপক্ষে দলীল। প্রত্যেক ব্যক্তি সকাল সকাল স্বকর্মে বের হয় এবং তার আত্মার ব্যবসা করে। অতঃপর সে তাকে (শাস্তি থেকে) মুক্ত করে অথবা তাকে (আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত ক'রে) বিনাশ করে।" *(মুসলিম)*

উল্লেখ্য যে, হাদীসে উম্মতের অধিকাংশ যে ক্বারীদেরকে মুনাফিক বলা হয়েছে, তাতে বিশ্বাসগত মুনাফিক উদ্দিষ্ট নয়, বরং উদ্দিষ্ট হল কর্মগত মুনাফিক। অর্থাৎ, তাদের উক্ত কাজ হল মুনাফিকের কাজ। অন্যথা যে মুনাফিক কাফের, সে মুনাফিক উদ্দিষ্ট নয়।

মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি কুফরী কাদের মধ্যে?

মানুষকে যদি দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়, জনপদবাসী ও মরুবাসী, তাহলে দেখা যাবে যে, প্রথম শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ সভ্য এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকেরা সাধারণতঃ অসভ্য বেদুঈন

হয়। যারা বেদুঈন, তারা মনুষ্য-সমাজ থেকে দূরে বাস করে। জনবসতি হতে দূরে থেকে বিচ্ছিন্ন এলাকায় নিজ গবাদি পশুকে অবলম্বন বানিয়ে জীবন যাপন করে। সেই জন্য এরা সভ্যতার আলো ও সামাজিকতার শিক্ষা থেকে বঞ্চিত থাকে। সেই জন্য মহান আল্লাহ বলেছেন,

{الأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلاَّ يَعْلَمُواْ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللّهُ عَلَى رَسُولِهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ}

(٩٧) سورة التوبة

অর্থাৎ, মরুবাসী (বেদুঈন) লোকেরা কুফরী ও কপটতায় অতি কঠোরতম। আর তারা এই কথারই বেশী উপযুক্ত যে, আল্লাহ তাঁর রসূলের প্রতি যা অবতীর্ণ করেছেন তাদের ঐসব বিধি-সীমার জ্ঞান হয় না। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (তাওবাহ ঃ ৯৭)

প্রকাশ থাকে যে, 'আ'রাব' মানে 'গেঁয়ো লোক' নয়। এর মানে মরুবাসী বেদুঈন। গ্রামে স্থায়ী ঘর-বাড়ি থাকে, সমাজ থাকে, প্রয়োজনীয় বাজার থাকে, মসজিদ থাকে, জামাআত থাকে, জুমআহ হয় ইত্যাদি। মরুভূমিতে তা থাকে না, জুমআহও হয় না। বেদুঈনরা তাঁবুতে বসবাস করে। তারা আসলে যাযাবর। নিজেদের ঘর সঙ্গে বয়ে নিয়ে ফেরে। যেখানে ঘাস-পানি পায়, সেখানে জায়গা দখল ক'রে পশুপালন করে। সুতরাং শহরের তুলনায় গ্রামের লোক অসভ্য হলেও, গ্রামের লোকের তুলনায় বেদুঈনরা অনেক বেশি অসভ্য। তবুও তাদের সবাই যে খারাপ, তা নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ مَغْرَمًا وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٩٨) وَمِنَ الأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَتَّخِذُ مَا يُنفِقُ قُرُبَاتٍ عِندَ اللّهِ وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ أَلا إِنَّهَا قُرْبَةٌ لَّهُمْ سَيُدْخِلُهُمُ اللّهُ فِي رَحْمَتِهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (٩٩) سورة التوبة

অর্থাৎ, আর মরুবাসীদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যে, তারা যা কিছু ব্যয় করে, তা জরিমানা মনে করে এবং তোমাদের প্রতি (কালের) আবর্তন (দুঃসময়)এর প্রতীক্ষায় থাকে; (বস্তুতঃ) অশুভ আবর্তন তাদের উপরই পতিত হোক। আর আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞাতা। আর মরুবাসীদের মধ্যে কতিপয় লোক এমনও আছে, যারা আল্লাহর প্রতি এবং কিয়ামত দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে, আর যা কিছু ব্যয় করে, তাকে আল্লাহর সান্নিধ্য লাভের উপকরণ ও রসূলের দুআ লাভের উপকরণরূপে মনে করে। স্মরণ রাখ, তাদের এই ব্যয়কার্য নিঃসন্দেহে তাদের জন্য (আল্লাহ) নৈকট্য লাভের কারণ। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে নিজ করুণায় প্রবেশ করাবেন; নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়। *(তাওবাহ ঃ ৯৮-৯৯)*

{وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُواْ عَلَى النِّفَاقِ لاَ تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ثُمَّ يُرَدُّونَ إِلَى عَذَابٍ عَظِيمٍ} (١٠١) سورة التوبة

মরুবাসীদের মধ্যে যারা তোমাদের আশেপাশে আছে তাদের মধ্য হতে কতিপয় এবং মদীনাবাসীদের মধ্যে হতেও কতিপয় লোক এমন মুনাফিক্ব রয়েছে; যারা মুনাফিক্বীতে অটল। তুমি তাদেরকে জান না, আমি তাদেরকে জানি। আমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি প্রদান করব, অতঃপর (পরকালেও) তারা মহা শাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। *(তাওবাহ ঃ ১০১)*

সুতরাং বলা যায় যে, শহরবাসীদের অধিকাংশ সভ্য হলেও সবাই সভ্য নয়। গ্রামবাসীরা

শ্বশুরেদের মতো সভ্য না হলেও অনেকে সভ্য। আর মরুবাসী বেদুঈনদের অধিকাংশ অসভ্য হলেও সবাই অসভ্য নয়।

অতি মহাপাপ

পাপ সাধারণতঃ তিন প্রকারের ঃ অতি মহাপাপ বা সবচেয়ে বড় পাপ, মহাপাপ বা বড় পাপ (কাবীরা গোনাহ) এবং উপপাপ, লঘু পাপ বা (সাগীরা গোনাহ)।

অতি মহাপাপ বা সবচেয়ে বড় পাপ হল শির্ক। যেহেতু অন্য পাপ ইচ্ছা করলে মহান আল্লাহ ক্ষমা করতে পারেন, কিন্তু শির্কের পাপ তিনি বিনা তওবায় ক্ষমা করবেন না। তিনি বলেছেন,

{وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ} (١٣) لقمان

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যখন লুক্বমান উপদেশচ্ছলে তার পুত্রকে বলেছিল, 'হে বৎস! আল্লাহর কোন অংশী করো না। আল্লাহর অংশী করা তো চরম অন্যায়।' (লুক্বমান ঃ ১৩)

{إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاء وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْمًا عَظِيمًا } (٤٨) سورة النساء

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী (শির্ক) করার অপরাধ ক্ষমা করেন না। এ ছাড়া অন্যান্য অপরাধ যার জন্য ইচ্ছা ক্ষমা করে দেন। আর যে কেউ আল্লাহর সাথে অংশী স্থাপন (শির্ক) করে, সে এক মহাপাপ করে। (নিসা ঃ ৪৮)

{إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ وَمَأْوَاهُ النَّارُ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ} (٧٢)

অর্থাৎ, অবশ্যই যে কেউ আল্লাহর অংশী করবে, নিশ্চয় আল্লাহ তার জন্য বেহেশ্ত্ নিষিদ্ধ করবেন ও দোযখ তার বাসস্থান হবে। আর অত্যাচারীদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই।' (মায়িদাহ ঃ ৭২)

(একদিন) রাসূলুল্লাহ ﷺ তিনবার বললেন,

((أَلا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الكَبَائِرِ؟))

"আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় কাবীরাহ গোনাহগুলো সম্পর্কে জ্ঞাত করবো না?" সবাই বললেন, 'অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "(সেগুলো হচ্ছে) আল্লাহর সাথে শির্ক করা এবং পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া।" এতক্ষণ তিনি হেলান দিয়ে বসেছিলেন, এবার সোজা হয়ে বসে বললেন, "শুনে রাখ, আর মিথ্যা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া।" এ কথাটি তিনি পুনঃ পুনঃ বলতে থাকলেন। এমনকি আমরা বলতে লাগলাম, 'এবার যদি তিনি চুপ হতেন!' *(বুখারী ও মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন,

((إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الكَبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ !))

"সবচেয়ে বড় গুনাহসমূহের একটি হল নিজের পিতা-মাতাকে অভিশাপ করা।"

জিজ্ঞেস করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! মানুষ নিজের পিতা-মাতাকে কিভাবে অভিশাপ করে?' তিনি বললেন, "সে অপরের পিতাকে গালি-গালাজ করে, তখন সেও তার পিতাকে গালি-গালাজ ক'রে থাকে। আর সে অন্যের মা-কে গালি দেয়, বিনিময়ে সেও তার মা-কে গালি দেয়।" (বুখারী ৫৯৭৩নং)

মদ্যপানও একটি সব চাইতে বড় পাপ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(الْخَمْرُ أُمُّ الْفَوَاحِشِ وَأَكْبَرُ الْكَبَائِرِ، مَنْ شَرِبَهَا وَقَعَ عَلَى أُمِّهِ وَخَالَتِهِ وَعَمَّتِهِ)

অর্থাৎ, মদ হল যাবতীয় অশ্লীলতার প্রধান এবং সবচেয়ে বড় পাপ। যে ব্যক্তি তা পান করল, সে যেন নিজ মা, খালা ও ফুফুর সাথে ব্যভিচার করল! (ত্বাবারানী, সঃ জামে' ৩৩৪৫নং)

যেমন মিথ্যা কসম খাওয়াও একটি অতি মহাপাপ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرِ الشِّرْكَ بِاللَّهِ وَالْيَمِينَ الْغَمُوسَ).

অর্থাৎ, সবচেয়ে বড় গোনাহসমূহের অন্যতম হল আল্লাহর সঙ্গে অংশী স্থাপন করা এবং মিথ্যা কসম খাওয়া। (ত্বাবারানী, সঃ জামে' ৫৯০০নং)

তবে সকল মহাপাপের অতি বড় মহাপাপ হল শির্ক বা আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করা, যেমন পূর্বেই বলা হয়েছে।

সবচেয়ে বড় গোনাহ

আমরা জানি, গোনাহ সাধারণতঃ তিন প্রকার ঃ-

১। অতি মহাপাপ বা আকবারুল কাবায়ের।

২। মহাপাপ বা কাবীরা গোনাহ।

উক্ত দুই প্রকার পাপ তওবা ছাড়া মাফ হয় না।

৩। ছোট পাপ, লঘু পাপ, উপপাপ বা সাগীরা গোনাহ।

এ পাপ বিভিন্ন নেক আমল করার ফলে মোচন হয়ে যায়।

সবচেয়ে বড় পাপ শির্ককে জানা হয়। কিন্তু হাদীসে আরও তিনটি পাপকে সবচেয়ে বড় পাপ বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« إِنَّ أَعْظَمَ الذُّنُوبِ عِنْدَ اللَّهِ رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا قَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا طَلَّقَهَا وَذَهَبَ بِمَهْرِهَا وَرَجُلٌ اسْتَعْمَلَ رَجُلاً فَذَهَبَ بِأُجْرَتِهِ وَآخَرُ يَقْتُلُ دَابَّةً عَبَثًا ».

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট সবচাইতে বড় পাপী সেই ব্যক্তি, যে এক মহিলাকে বিবাহ করার পর তার নিকট থেকে তার প্রয়োজন মিটিয়ে নিয়ে তাকে তালাক দেয় এবং তার মোহর আত্মসাৎ ক'রে নেয়। দ্বিতীয় হল সেই ব্যক্তি, যে একটি লোককে কাজে খাটিয়ে তার মজুরী আত্মসাৎ করে নেয়। আর তৃতীয় সেই ব্যক্তি যে খামোখা প্রাণী হত্যা করে।" *(হাকেম, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ১৫৬৭ নং)*

বলা বাহুল্য, প্রথম সবচেয়ে বড় পাপী হল সেই পুরুষ, যে এক মহিলাকে বিবাহ করার

পর তার নিকট থেকে তার প্রয়োজন মিটিয়ে নিয়ে তাকে তালাক দেয় এবং তার মোহর আত্মসাৎ ক'রে নেয়।

অবোলা নারীকে নিজের কামনার নিশানা বানিয়ে তার যৌবন নষ্ট ক'রে বর্জন করে। ঠিক ওয়ান-টাইম মাটি বা প্লাস্টিকের পাত্রের মতো 'ইউজ এ্যান্ড থ্রো' নীতি ব্যবহার করে এমন 'মজা বদলকারী' স্বামী। ইচ্ছামতো বিবাহ করে এবং ইচ্ছামতো বর্জন করে। ফুল তুলে তার সৌন্দর্য ও সৌরভ উপভোগ ক'রে ডাস্‌বিনে ছুঁড়ে ফেলে দেয় এমন পুরুষ। তার উপর তার মোহরও কুক্ষিগত করে। তার মানে তার 'হাড় খায় মাস খায়, চাম দিয়ে ডুগডুগি বাজায়!'

সেই মহিলার যৌবন ও জীবন বরবাদ ক'রে তাকে অসহায় অবস্থায় অবলম্বনহীনা রূপে পরিত্যাগ করে। তার পাপ কি আর কেবল মহাপাপ? বরং সবচেয়ে বড় পাপ।

এ তো গেল সেই পুরুষের কথা, যে মোহর দিয়ে ছলে-বলে-কলে-কৌশলে তা নিজেই আত্মসাৎ করে। কিন্তু যে পুরুষ স্ত্রীর কাছ থেকে মোহর নেয়। মোটা টাকার বরপণ বা যৌতুক নেয়, অতঃপর নিজ স্ত্রীর সাথে অনুরূপ আচরণ করে, সেই মহাপুরুষের পাপ কি ঐ পুরুষের মহাপাপ থেকেও আরো বড় মহাপাপ নয়?

দ্বিতীয় সবচেয়ে বড় পাপী সেই ব্যক্তি, যে একটি লোককে কাজে খাটিয়ে তার মজুরী আত্মসাৎ করে নেয়। চুক্তি ক'রে কাজ করিয়ে নিয়ে তার পারিশ্রমিক দেয় না। 'শ্রমিকের ঘাম শুকাবার পূর্বে তার পারিশ্রমিক মিটিয়ে দাও'---এ নির্দেশ তো মানেই না, বরং ঘাম শুকানোর পরেও তা আদায় করতে উদ্বুদ্ধ হয় না। শ্রমিকের সেই পারিশ্রমিক কুক্ষিগত করে। তার পাপও কেবল মহাপাপ নয়, বরং সবচেয়ে বড় পাপ।

আর তৃতীয় সবচেয়ে বড় পাপী সেই ব্যক্তি, যে খামোখা প্রাণী হত্যা করে। মানুষ না, বরং পশু-পাখি।

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "এক মহিলাকে একটি বিড়ালের জন্য শাস্তি দেওয়া হয়েছে। সে তাকে বেঁধে রেখেছিল এবং অবশেষে সে মারা গিয়েছিল, পরিণতিতে মহিলা তারই কারণে জাহান্নামে প্রবেশ করল। সে যখন তাকে বেঁধে রেখেছিল, তখন তাকে আহার ও পানি দিত না এবং তাকে ছেড়েও দিত না যে, সে কীট-পতঙ্গ ধরে খাবে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

একদা ইবনে উমার ﷺ কুরাইশ বংশের কতিপয় নবযুবকের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় লক্ষ্য করলেন যে, তারা একটি পাখীকে বেঁধে (হাতের নিশানা ঠিক করার মানসে তার উপর নির্দয়ভাবে) তীর মারছে। তারা পাখীর মালিকের সাথে এই চুক্তি করেছিল যে, প্রতিটি লক্ষ্যভ্রষ্ট তীর তার হয়ে যাবে। সুতরাং যখন তারা ইবনে উমার ﷺ-কে দেখতে পেল, তখন ছত্রভঙ্গ হয়ে পালিয়ে গেল। ইবনে উমার ﷺ বললেন, 'এ কাজ কে করেছে? যে এ কাজ করেছে তার উপর আল্লাহর অভিশাপ। নিঃসন্দেহে রাসূলুল্লাহ ﷺ সেই ব্যক্তির উপর অভিশাপ করেছেন, যে কোন এমন জিনিসকে (তার তীর-খেলার) লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত করে, যার মধ্যে প্রাণ আছে।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

আনাস ﷺ বলেন, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ জীব-জন্তুদের বেঁধে রেখে (তীর বা বন্দুকের নিশানা ঠিক করার ইচ্ছায়) হত্যা করতে নিষেধ করেছেন।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

সুতরাং যে ব্যক্তি খামোখা মানুষ হত্যা করে, তার পাপ কত বড়?

সর্বশ্রেষ্ঠ পাপী

নবীগণ ব্যতীত প্রত্যেক আদম-সন্তান পাপ করে। কিন্তু পাপীও আবার শ্রেষ্ঠ হয় নাকি? অবশ্যই। যে পাপী পাপ বর্জন করতে পারে, সে পাপী অবশ্যই পাপীদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ। পাপীদের ঠাঁই জাহান্নামে। কিন্তু যে পাপী নিজের ঠিকানা জান্নাতে বানিয়ে নিতে পারে, সে নিশ্চয় সর্বশ্রেষ্ঠ পাপী।

যেহেতু তওবা করলে পাপী নিষ্পাপ হয়ে যায়। তওবার ৬টি শর্ত পালন ক'রে তওবা করলে পাপীর আর কোন পাপ অবশিষ্ট থাকে না। যেমন কোন অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করলে তার পূর্বেকার সমস্ত পাপ মাফ হয়ে যায়। অনুরূপ তওবাকারীর পূর্বকৃত সকল পাপ পুণ্যে পরিবর্তিত হয়ে যায়!

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُوْلَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا} (٧٠) سورة الفرقان

অর্থাৎ, তবে যারা তওবা করে, বিশ্বাস ও সৎকাজ করে, আল্লাহ তাদের পাপকর্মগুলিকে পুণ্য দ্বারা পরিবর্তন ক'রে দেবেন। আর আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। *(ফুরক্বান ঃ ৭০)*

আর এই জন্যই মহানবী ﷺ বলেছেন,

(كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَّاءٌ وَخَيْرُ الخَطَّائِينَ التَوَّابُونَ).

অর্থাৎ, প্রত্যেক আদম-সন্তান পাপ করে। আর পাপীদের মধ্যে সর্বোত্তম হল তওবাকারিগণ। *(আহমাদ ১৩০৪৯, তিরমিযী ২৪৯৯, ইবনে মাজাহ ৪২৫১, হাকেম ৭৬১৭নং)*

যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ اللّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ} (٢٢٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, নিশ্চয় আল্লাহ তওবাকারিগণকে এবং যারা পবিত্র থাকে, তাদেরকে ভালোবাসেন। (বাক্বারাহ ঃ ২২২)

সবচেয়ে নোংরা আঙিনা

পবিত্রতা হল মুসলিমদের অর্ধেক ঈমান। (মুসলিম ৫৫৬নং) মহান সৃষ্টিকর্তা সুন্দর, তিনি সৌন্দর্য পছন্দ করেন। (ঐ ২৭৫নং) তাই প্রকৃত মুসলিমরা সদা-সর্বদা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র থাকে। তাদের ঘর-বাড়ির ভিতর-বাহির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকে। যেহেতু বাড়ির বাইরের অংশ বাড়ির লোকেদের ভালো-মন্দের শিরোনাম।

পক্ষান্তরে নববী যুগে সবচেয়ে বেশি নোংরা ছিল ইয়াহুদীদের আঙিনা। তাই মুসলিমদেরকে সতর্ক ক'রে মহানবী ﷺ বলেছেন,

(طَيِّبُوا سَاحاتِكُمْ فَإِنَّ أَنْتَنَ السَّاحَاتِ سَاحَاتُ الْيَهُودِ).

"তোমরা তোমাদের গৃহের আঙ্গিনা (সম্মুখভাগকে) পরিচ্ছন্ন রাখ। কারণ, সবচেয়ে নোংরা আঙিনা হল ইয়াহুদীদের আঙিনা।" *(সঃ জামে' ৩৯৪১নং)*

অন্যদিকে মহানবী ﷺ আমাদেরকে অনেক বিষয়ে বিজাতির অনুকরণ তথা সাদৃশ্য অবলম্বন করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, "সে ব্যক্তি আমার দলভুক্ত নয়, যে ব্যক্তি আমাদেরকে ছেড়ে অন্য কারো সাদৃশ্য অবলম্বন করে। তোমরা ইয়াহুদীদের সাদৃশ্য অবলম্বন করো না, আর খ্রিস্টানদেরও সাদৃশ্য অবলম্বন করো না।" *(তিরমিযী ২৬৯৫নং, ত্বাবারানী, সিলসিলাহ সহীহাহ ২১৯৪নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি যে জাতির সাদৃশ্য অবলম্বন করে, সে ব্যক্তি সেই জাতিরই দলভুক্ত।" *(আবূ দাউদ, ত্বাবারানীর আউসাত্ব, সহীহুল জামে' ৬১৪৯নং)*

মুসলিমদের পৃথক স্বাতন্ত্র্য ও স্বকীয়তা আছে। তাতেই তারা সমৃদ্ধ ও উন্নত। কিন্তু ইসলামকে পরিপূর্ণরূপে মানলে তবেই তো!

সর্বপ্রথম সৃষ্টি

আল্লাহ জাল্লা শানুহ ছিলেন, যখন কিছুই ছিল না। তাঁর আরশ ছিল পানির উপর। *(বুখারী ৩১৯১নং)* তিনি সর্বপ্রথম কলম সৃষ্টি করে সৃষ্টির ভাগ্যবিধান লিখতে আদেশ করেন। সৃষ্টির নিয়তি লিপিবদ্ধ হয়। এর পঞ্চাশ হাজার বছর পর বিশ্ব-জাহান সৃষ্ট হয় ছয় দিনে। *(মুসলিম ২৬৫৩, কুরআন ৭/৫৪, ১০/৩, ১১/৭)* (সপ্ত) পৃথিবী সৃষ্ট হয় দুই দিনে। *(কুরআন ৪৮/৯)* এরপর সপ্তাকাশ সৃষ্টি হয় দুই দিনে। *(কুরআন ৪৯/১২, ২/২৯)*

সুতরাং মহান আল্লাহর সৃষ্টি-বৈচিত্রের সর্বপ্রথম সৃষ্টি হল কলম। মহানবী ﷺ বলেছেন,

« إِنَّ أَوَّلَ مَا خَلَقَ اللَّهُ الْقَلَمَ، فَقَالَ لَهُ: اكْتُبْ، قَالَ: رَبِّ وَمَاذَا أَكْتُبُ؟ قَالَ: اكْتُبْ مَقَادِيرَ كُلِّ شَىْءٍ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ ».

অর্থাৎ, সর্বপ্রথম আল্লাহ যা সৃষ্টি করেন, তা হল কলম। অতঃপর তাকে বলেন, 'তুমি লিখো।' সে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! কী লিখব?' তিনি বললেন, 'কিয়ামত পর্যন্ত প্রত্যেক জিনিসের তকদীর লিখো।' (আহমাদ ২২৭০৫, আবূ দাউদ ৪৭০২, তিরমিযী ২১৫৫নং)

সুতরাং বুঝা যায় যে, সর্বপ্রথম সৃষ্টি আরশ নয়। যেমন সর্বপ্রথম সৃষ্টি নূরে মুহাম্মাদীও নয়।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য যে, মানুষের জীবনেও একবার তকদীর লেখা হয়, যখন মাতৃজঠরে ভ্রূণ অবস্থায় তার বয়স চার মাস হয়। অনুরূপ বৎসরান্তে একবার বিস্তারিত তকদীর লেখা হয় শবেকদর রাতে।

পৃথিবীর সর্বপ্রথম গৃহ

পৃথিবীর সর্বপ্রথম গৃহ হল কা'বাগৃহ। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى لِّلْعَالَمِينَ (٩٦) فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللّه غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ } (٩٧) سورة آل عمران

অর্থাৎ, নিশ্চয় মানবজাতির জন্য সর্বপ্রথম যে গৃহ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা বক্কায় (মক্কায়) অবস্থিত। তা বর্কতময় ও বিশ্বজগতের জন্য পথের দিশারী। (আলে ইমরান ঃ ৯৬)

ওতে বহু সুস্পষ্ট নিদর্শন রয়েছে, (যেমন) মাক্বামে ইব্রাহীম (পাথরের উপর ইব্রাহীমের পদচিহ্ন)। যে কেউ সেখানে প্রবেশ করে, সে নিরাপত্তা লাভ করে। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশ্যে ঐ গৃহের হজ্জ করা তার (পক্ষে) অবশ্য কর্তব্য। আর যে অস্বীকার করবে (সে জেনে রাখুক যে), আল্লাহ জগতের প্রতি অমুখাপেক্ষী। *(আলে ইমরান ঃ ৯৭)*

আবূ যার্র رضي الله عنه বলেন, আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলাম, 'পৃথিবীর সর্বপ্রথম মসজিদ কোনটি?' উত্তরে তিনি বললেন, "মাসজিদুল হারাম।" আমি বললাম, 'তারপর কোনটি?' তিনি বললেন, "মাসজিদুল আক্বসা।' আমি বললাম, 'উভয়ের মধ্যে সময় ব্যবধান কত?' তিনি বললেন, "চল্লিশ বছর।" *(বুখারী ৩৪২৫, মুসলিম ৫২০নং)*

কা'বাগৃহ সর্বপ্রথম ফিরিশ্তা নির্মাণ করেন। অতঃপর ইব্রাহীম عليه السلام স্বপুত্র ইসমাঈল عليه السلام-কে নিয়ে তা পুনর্নির্মিত করেন।

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম খুন ও খুনী

সৃষ্টির ইতিহাসে সর্বপ্রথম হিংসা করে ইবলীস এবং সর্বপ্রথম অহংকার প্রদর্শন করে সে-ই। যার ফলে সে অভিশপ্ত হয়।

আর হিংসাবশতঃ পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম খুন করার ঘটনা ঘটে আদম عليه السلام-এর যুগেই। তাঁর দুই সন্তান হাবীল ও কাবীলের মাঝে এই দুর্ঘটনা ঘটে। কাবীল হত্যা করে হাবীলকে। মহান আল্লাহ আল-কুরআনে সেই দুর্ঘটনার কথা উল্লেখ ক'রে তাঁর নবী ﷺ-কে বলেছেন,

{وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَاناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الآخَرِ قَالَ لأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ (٢٧) لَئِنْ بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ (٢٨) إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (٢٩) فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنْ الْخَاسِرِينَ (٣٠) فَبَعَثَ اللّهُ غُرَاباً يَبْحَثُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْأَةَ أَخِيهِ قَالَ يَا وَيْلَتَا أَعَجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَذَا

الْغُرَابِ فَأُوَارِيَ سَوْأَةَ أَخِي فَأَصْبَحَ مِنْ النَّادِمِينَ} (٣١)

অর্থাৎ, আদমের দুই পুত্রের (হাবীল ও কাবীলের) বৃত্তান্ত তুমি তাদেরকে যথাযথভাবে শুনিয়ে দাও, যখন তারা উভয়ে কুরবানী করেছিল, তখন একজনের কুরবানী কবুল হল এবং অন্য জনের কুরবানী কবুল হল না। তাদের একজন বলল, আমি তোমাকে অবশ্যই হত্যা করব। অপরজন বলল, আল্লাহ তো সংযমীদের কুরবানীই কবুল করে থাকেন। আমাকে হত্যা করার জন্য তুমি আমার প্রতি হাত তুললেও তোমাকে হত্যা করার জন্য আমি তোমার প্রতি হাত তুলব না, আমি তো বিশ্বজগতের প্রতিপালককে ভয় করি। তুমি আমার ও তোমার পাপের ভার বহন কর এবং দোযখবাসী হও এই তো আমি চাই এবং এ হল যালেম (অনাচারী)দের কর্মফল। অতঃপর তার চিত্ত ভ্রাতৃ-হত্যায় তাকে উত্তেজিত করল, সুতরাং সে (কাবীল) তাকে (হাবীলকে) হত্যা করল, ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হল। অতঃপর আল্লাহ এক কাক পাঠালেন, যে তার ভায়ের শবদেহ কিভাবে গোপন করা যায় তা দেখাবার উদ্দেশ্যে মাটি খনন করতে লাগল। সে বলল, হায়! আমি কি এ কাকের মতোও হতে পারলাম না, যাতে আমার ভায়ের শবদেহ গোপন করতে পারি? অতঃপর সে অনুতপ্ত হল। (মায়িদাহ ঃ ২৭-৩১)

তাদের নযর বা কুরবানী কী উদ্দেশ্যে পেশ করা হয়েছিল? এ ব্যাপারে বিশুদ্ধভাবে কিছু বর্ণিত হয়নি। তবে এটা প্রসিদ্ধ আছে যে, (দুনিয়ার) প্রাথমিক অবস্থায় আদম ও হাওয়া (আলাইহিমাস সালাম)এর মিলনের ফলে একই সময় (যমজ) একটি ছেলে ও একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করত। দ্বিতীয় গর্ভেও অনুরূপ একটি ছেলে ও একটি মেয়ে জন্মগ্রহণ করত। তখন একটি গর্ভের ছেলে-মেয়ের সাথে আর একটি গর্ভের ছেলে-মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেওয়া হত। হাবীলের যমজ বোন সুন্দরী ছিল না। কিন্তু ক্বাবীলের যমজ বোনটি সুন্দরী ছিল। আর তখনকার রীতি-নীতি অনুসারে হাবীলের বিবাহ ক্বাবীলের যমজ বোনের সাথে আর ক্বাবীলের বিবাহ হাবীলের যমজ বোনের সাথে হওয়ার কথা। কিন্তু ক্বাবীল হাবীলের বোনের পরিবর্তে নিজের যমজ বোনকে বিবাহ করতে চাইল; কারণ সে সুন্দরী ছিল। তখন আদম ﷵ ক্বাবীলকে বুঝালেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত সে বুঝল না। পরিশেষে আদম ﷵ উভয়কেই আল্লাহর নামে কুরবানী পেশ করার নির্দেশ দিলেন এবং বললেন যে, যার কুরবানী কবুল হবে, ক্বাবীলের যমজ বোনের সাথে তার বিবাহ দিয়ে দেওয়া হবে। কুরবানী পেশ করা হলে হাবীলের কুরবানী কবুল হল; অর্থাৎ আসমান থেকে আগুন এসে (হাবীলের) কুরবানীকে জ্বালিয়ে ফেলল; যা ছিল (সে যুগের) কুরবানী কবুল হওয়ার নিদর্শন। কিছু মুফাসসিরগণের মতে তারা উভয়েই নিজ নিজ নযর আল্লাহর দরবারে পেশ করল। হাবীল একটি মোটাতাজা দুম্বা বা মেষ কুরবানী করল। আর ক্বাবীল গমের কিছু শিষ কুরবানীর জন্য পেশ করল। ফলে হাবীলের কুরবানী কবুল হল। আর তা দেখে ক্বাবীল হিংসায় ফেটে পড়ল। অতঃপর ঘটল ঐ খুনের ঘটনা।

মহানবী ﷺ বলেন, "যে কোন প্রাণকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে, তার পাপের একটা অংশ আদমের প্রথম সন্তান (কাবীল)এর উপর বর্তাবে। কেননা, সে হত্যার রীতি সর্বপ্রথম চালু করেছে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ আরো বলেন, "যে ব্যক্তি ইসলামে ভাল রীতি চালু করবে, সে তার নিজের এবং ঐ সমস্ত লোকের সওয়াব পাবে, যারা তার (মৃত্যুর) পর তার উপর আমল করবে। তাদের সওয়াবের কিছু পরিমাণও কম করা হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ রীতির প্রচলন করবে, তার উপর তার নিজের এবং ঐ লোকদের গোনাহ বর্তাবে, যারা তার (মৃত্যুর) পর তার উপর আমল করবে। তাদের গোনাহর কিছু পরিমাণও কম করা হবে না।" *(মুসলিম)*

প্রাণ হত্যা মহাপাপ। এই জন্য মহান আল্লাহ উক্ত ঘটনার বর্ণনা করার পর বলেছেন,

{مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاء تْهُمْ رُسُلُنَا بِالبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُم بَعْدَ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ} (٣٢) سورة المائدة

অর্থাৎ, এ কারণেই বনী ইস্রাঈলের প্রতি এ বিধান দিলাম যে, যে ব্যক্তি নরহত্যা অথবা পৃথিবীতে ধ্বংসাত্মক কাজ করার দন্ডদান উদ্দেশ্য ছাড়া কাউকে হত্যা করল, সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষকেই হত্যা করল। আর কেউ কারো প্রাণরক্ষা করলে সে যেন পৃথিবীর সকল মানুষের প্রাণ রক্ষা করল। তাদের নিকট তো আমার রসূলগণ স্পষ্ট প্রমাণ এনেছিল, কিন্তু এর পরও অনেকে পৃথিবীতে সীমালংঘনকারীই রয়ে গেল। (মায়িদাহ ঃ ৩২)

মানুষের প্রাণের মূল্য যে কত বেশী ও তার মর্যাদা যে কত বড়, তা পরিষ্কারভাবে আল্লাহ বানী ইস্রাঈলের উপরে এই নির্দেশ অবতীর্ণ ক'রে বলে দিয়েছেন। যার দ্বারা এ কথা অনুমান করা যায় যে, আল্লাহর নিকট মানুষের রক্তের গুরুত্ব ও মর্যাদা কত! আর এই নীতি শুধু বানী ইস্রাঈলদের জন্য ছিল না; বরং ইসলামী মূলনীতি মোতাবেক এই নীতি চিরস্থায়ী সকলের জন্য। সুলাইমান বিন রাবী' বলেন, আমি হাসান বাসরী (রঃ)কে জিজ্ঞাসা করলাম যে, 'বানী ইস্রাঈল যেমন এ হুকুমের আওতাভুক্ত ছিল, তেমনি আমরাও কি এই আয়াতের হুকুমের আওতাভুক্ত?' তিনি উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! বানী ইস্রাঈলের রক্ত আল্লাহর নিকট আমাদের রক্ত অপেক্ষা কোনক্রমেই অধিক মর্যাদাপূর্ণ নয়।' (তাফসীর ইবনে কাসীর, আহসানুল বায়ান)

হিংসায় দগ্ধীভূত হয়ে ভাই আপন ভাইকে খুন করে। কেউ তার দেহ খুন না করতে পারলে তার মান-ইজ্জত খুন করে। অহংকারে অন্ধ হয়ে আপন গুরুরও প্রতিদ্বন্দ্বী হয়। মাৎসর্য ও পরশ্রীকাতরতার বশবর্তী হয়ে নির্দয় পাযন্ডের মতো ব্যবহার প্রদর্শন করে!

যে গুরু হয়ে শিষ্যকে তীর চালানো শেখায়, সেই গুরুকেই শিষ্য তীর মারতে উদ্যত হয়!

যে অভাবের আস্তাকুঁড়ে থেকে তুলে এনে টাকা-পয়সা দিয়ে সহযোগিতা ক'রে একজন নিঃস্বকে শিক্ষিত বানিয়ে চাকরিযোগ্য ক'রে তোলে, তাকেই সেই শিক্ষিত সময়ে লাথি মারে! তার অভাবে যে সহযোগিতা করেছিল, হিংসায় তার কথা বিস্মৃত হয়। প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে তার টেক্কা দিতে চায়। যে সূর্যের আলো নিয়ে চাঁদ পূর্ণিমার শোভা লাভ করে, সেই চাঁদ এক সময় নিজেকে সূর্য ভেবে তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু ক'রে দেয়। সংসারের এমন প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্যই বড় বিস্ময়কর! অতীব দুঃখজনক!

সর্বপ্রথম মূর্তিপ্রজা

পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা শুরু হয় নূহ ﷺ-এর যুগে। তাঁর জাতির মধ্যে অদ্দ, সুয়া, ইয়াগুস, ইয়াউক ও নাস্র নামক পাঁচজন নেক ও সালেহ লোক ছিলেন। *(নূহঃ ২৩)* তাঁদের ইবাদত ও নেক আমলের কথা মানুষের মাঝে প্রসিদ্ধ ছিল। তাঁদের গত হওয়ার পরও সেই প্রসিদ্ধি মানুষের মাঝে স্মরণীয় ছিল। কোন ইবাদত করার সময় লোকে তাঁদের ইবাদত স্মরণ করত। তাঁদের কথা মনে হলে যেন ইবাদতে অধিক মন বসত। তাই তারা তাঁদের কবর যিয়ারত করত। কিছুদিন পর তাঁদের কবরের ধারে-পাশে ইবাদত শুরু করল লোকে। সুযোগ পেয়ে শয়তান ওদের মনে আর এক নতুন কুমন্ত্রণা দিল যে, তাঁদের মূর্তি বানিয়ে যদি তারা তাদের মজলিসে (বৈঠকখানায়) স্থাপন করে, তাহলে তাঁদেরকে প্রায় সর্বক্ষণ নিকটে দেখে তাঁদের ইবাদতের কথা সর্বদা মনে পড়বে, ফলে তাদের ইবাদতে মনোযোগ বাড়বে। কিন্তু তারা এর পরিণাম বুঝতে পারল না। শয়তান কৃতার্থ হল। প্রতিমা বানিয়ে তাদের মজলিসে প্রতিষ্ঠিত হল। কিন্তু তখন তাঁদের পূজা হত না। সে যুগের মানুষের মৃত্যুর পর পরবর্তী বংশধরদের মনে শয়তানী কুমন্ত্রণা পড়ল যে, এঁদেরকেই সম্মুখে রেখে তাদের পিতা-পিতামহরা ইবাদত করত; বরং এঁদেরই পূজা করত। তারা তাই সত্য ভেবে শুরু করল মূর্তিপূজা। আর তখন থেকেই সূচনা হল মূর্তিপূজার। *(বুখারী ৪৯২০নং)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{مَا جَعَلَ اللّهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلاَ سَآئِبَةٍ وَلاَ وَصِيلَةٍ وَلاَ حَامٍ وَلَكِنَّ الَّذِينَ كَفَرُواْ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ وَأَكْثَرُهُمْ لاَ يَعْقِلُونَ} (١٠٣) سورة المائدة

অর্থাৎ, আল্লাহ বাহীরা, সায়েবা, অস্বীলা ও হাম বিধিবদ্ধ করেননি। কিন্তু যারা অবিশ্বাস করে, তারা আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করে থাকে। বস্তুতঃ তাদের অধিকাংশ উপলব্ধি করে না। (মায়িদাহ ঃ ১০৩)

এগুলি ঐ সকল পশুর বিভিন্ন নাম, যা আরবের বাসিন্দাগণ তাদের প্রতিমার নামে উৎসর্গ করত। এগুলির বিভিন্ন ব্যাখ্যা বর্ণনা করা হয়েছে। সহীহ বুখারীতে সাঈদ বিন মুসাইয়েব কর্তৃক এইরূপ ব্যাখ্যা উল্লেখ হয়েছে, 'বাহীরা' ঐ জন্তুকে বলা হত, যার দুধ দোহন করা হত না এবং বলত যে, এ দুধ প্রতিমার জন্য। সুতরাং কোন লোকই তার ওলানে (দুধের বাঁটে) হাত লাগাত না। 'সায়েবা' ঐ জন্তুকে বলা হয়, যাকে মূর্তির নামে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হত; না তার উপর আরোহণ করা হত আর না তার উপর কোন বোঝা বহন করা হত। 'অস্বীলা' ঐ উটনীকে বলা হত, যা প্রথমবার একটা মাদী বাচ্চা প্রসব করার পর দ্বিতীয় বারেও মাদী বাচ্চা প্রসব করত। (অর্থাৎ প্রথম মাদী বাচ্চার সাথে দ্বিতীয় মাদী বাচ্চা মিলিত হত এবং উভয়ের মাঝে নর বাচ্চা পার্থক্য সৃষ্টি করত না) তাহলে ঐ ধরনের উটনীকে মূর্তির নামে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হত। 'হাম' ঐ ষাঁড় উটকে বলা হত, যার বীর্যে বহু বাচ্চা জন্মলাভ করত (এবং তার বংশ যথেষ্ট বৃদ্ধি পেত), তখন তার দ্বারা বোঝা

বহনের কাজ নেওয়া হত না এবং তার উপর আরোহণ করাও হত না। তাকে মূর্তির নামে স্বাধীন ছেড়ে দেওয়া হত। আর তাকে 'হামী' বলা হত।

এই বর্ণনায় এ হাদীসও উল্লেখ করা হয়েছে যে, আম্র বিন আমের খুযাঈ (আরবে) সর্বপ্রথম মূর্তিপূজা ও মূর্তির নামে জন্তু উৎসর্গ করার প্রথা চালু করেছিল। নবী করীম ﷺ বলেন, "আমি তাকে জাহান্নামে নিজ নাড়ীভুঁড়ি নিয়ে টানাটানি করতে দেখেছি।" *(আহমাদ, বুখারী ৪৬২৩নং)* আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, মহান আল্লাহ এই জন্তুগুলোকে ঐভাবে শরীয়তরূপে নির্ধারণ করেননি। কেননা তিনি নযর-নিয়ায শুধু নিজের জন্যই নির্দিষ্ট করেছেন। মূর্তির নামে নযর-নিয়াযের পদ্ধতি মুশরিকদের চালু করা জঘন্য প্রথা। বলা বাহুল্য, মূর্তি ও বাতেল উপাস্যদের নামে জন্তু উৎসর্গ করা এবং নযর-নিয়ায পেশ করার ধারা আজও মুশরিকদের মাঝে বিদ্যমান। এমনকি কিছু নামধারী মুসলিমদের মাঝেও এই শির্কী কাজ প্রচলিত। কোন বাবা বা মাযারের নামে মানসিক মেনে খাসি বা হাঁস-মুরগী পৃথক যত্নের সাথে লালন ক'রে উৎসর্গ ক'রে থাকে। পূজারীর কাছাকাছি মাযারীও আপন শির্কে বড় সাফল্য লাভ ক'রে চলেছে। সরকারী সমর্থন ও সহযোগিতা পেয়ে তাদের শির্ক পরিণত হয়েছে দীনে ইসলামে।

মানুষের পাওয়া পূর্ববর্তী নবুঅতের সর্বশেষ বাণী

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(آخِرُ ما أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلامِ النُّبُوَّةِ الأولَى إذا لَم تَسْتَحِ فاصْنَعْ ما شِئْتَ).

অর্থাৎ, মানুষের পাওয়া পূর্ববর্তী নবুঅতের সর্বশেষ বাণী হল, 'লজ্জা না থাকলে যাচ্ছেতাই কর।' *(ইবনে আবী শাইবা ২৫৩৪৮, ইবনে আসাকির, সঃ জামে' ২নং)*

অর্থাৎ, এ কথা মানুষের মাঝে প্রচলিত আরবে। কিন্তু তা আরবের কোন দার্শনিক বা পন্ডিতের কথা নয়। মহানবী ﷺ স্পষ্ট করলেন যে, এ কথা পূববর্তী সকল নবীর কথা। আদম থেকে ঈসা পর্যন্ত সকল নবীর বাণী ছিল, 'লজ্জা না থাকলে যাচ্ছেতাই কর।'

অর্থাৎ, যুগে যুগে প্রত্যেক শরীয়তের নির্দেশ ছিল, হে মানুষ! লজ্জাশীল হও।

মানুষের লজ্জা না থাকলে সে যা মন তাই করতে পারে।

মানুষের লজ্জা থাকলে পাপ করতে পারে না।

লজ্জাশীল মানুষ পাপী হয় না।

দ্বীনদার মানুষ লজ্জাশীল হয়।

পাপীরা নির্লজ্জ ও ধৃষ্ট হয়।

হায়া-শরম থাকলে কেউ অশ্লীলতায় লিপ্ত হতে পারে না।

নির্লজ্জ ও বেহায়া মানুষ চরিত্রহীন হয়।

ইসলামও তাই বলে। ইসলাম বলে, "লজ্জা হল ঈমানের অঙ্গ।" *(বুখারী, মুসলিম)*

"ঈমান সত্তরাধিক অথবা ষাঠাধিক শাখাবিশিষ্ট। তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ শাখা (কান্ড) হল 'লা ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ' বলা এবং সবচেয়ে ছোট শাখা হল পথ হতে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা। আর

লজ্জাশীলতা ঈমানের একটি শাখাবিশেষ।” *(বুখারী ৯, মুসলিম ৩৫ নং)*

“অবশ্যই লজ্জাশীলতা ও ঈমান একই সূত্রে গাঁথা। একটি চলে গেলে অপরটিও চলে যায়।” *(হাকেম, মিশকাত ৫০৯৪, সহীহুল জামে ১৬০৩নং)*

“প্রত্যেক ধর্মে সচ্চরিত্রতা আছে, ইসলামের সচ্চরিত্রতা হল লজ্জাশীলতা।” *(ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে ২১৪৯নং)*

“লজ্জার সবটুকুই মঙ্গলময়।” “লজ্জা কেবল মঙ্গলই আনয়ন করে।” *(বুখারী, মুসলিম, সহীহুল জামে' ৩১৯৬, ৩২০২নং)*

“অশ্লীলতা (নির্লজ্জতা) যে বিষয়ে থাকে সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যহীন (ম্লান) করে ফেলে। আর লজ্জাশীলতা যে বিষয়ে থাকে সে বিষয়কে তা সৌন্দর্যময় (মনোহর) করে তোলে।” *(সহীহ তিরমিযী ১৬০৭ নং, ইবনে মাজাহ)*

“লজ্জাশীলতা ঈমানের অন্তর্ভুক্ত এবং ঈমান হবে জান্নাতে। আর অশ্লীলতা রূঢ়তার অন্তর্ভুক্ত এবং রূঢ়তা হবে জাহান্নামে।” *(আহমদ ২/৫০১, তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, হাকেম ১/৫২, সহীহুল জামে' ৩১৯৯নং)*

সুতরাং কোন কাজ করা বা না করার উপরে যে তিরস্কার আসে এবং তা শুনে বা জেনে মানুষের মনে-মুখে-চোখে যে পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়, তাই হল লজ্জা।

যে মানুষ প্রত্যেক নোংরামি থেকে দূরে থাকে এবং প্রত্যেক অধিকারীর অধিকার আদায়ে আদৌ ত্রুটি প্রদর্শন করে না, সেই হল লজ্জাশীল মানুষ।

প্রত্যেক মন্দ ও অশোভন কাজ ত্যাগ এবং প্রত্যেক ভালো ও শোভনীয় কাজ করতে যে উদ্বুদ্ধ হয়, সেই হল লজ্জাশীল মানুষ।

এই লজ্জা কখনো আল্লাহকে করা হয়। আর তখন লজ্জাশীল ব্যক্তি আল্লাহর পরিপূর্ণ আনুগত্য করতে এবং তাঁর অবাধ্যাচরণ থেকে দূরে থাকতে অনুপ্রাণিত হয়।

আর লজ্জা না থাকলে মানুষ বল্কলহীন বৃক্ষের মতো হয়ে যায়। আরবী কবি বলেছেন,

يعيش المرء ما استحيا بخير   ويبقى العود ما بقي اللحاء

فلا والله ما في العيش خير   ولا الدنيا إذا ذهب الحياء

إذا لم تخش عاقبة الليالي   ولم تستحي فاصنع ما تشاء

অর্থাৎ, মানুষ যতদিন লজ্জাশীল থাকে, ততদিন সকুশল জীবনধারণ করে। (যেমন) কাঠ (গাছ) অবশিষ্ট থাকে, যতদিন তার ছাল অবশিষ্ট থাকে।

আল্লাহর কসম! সে জীবন ও সংসারে কোন মঙ্গল নেই, যদি লজ্জাশীলতা চলে যায়।

যদি তুমি যুগের পরিণামকে ভয় না কর এবং লজ্জা-শরম না কর, তাহলে তোমার যা ইচ্ছা তাই কর।

হ্যাঁ, আর মহিলা? মহিলার রূপের দেহে লজ্জাশীলতার পোশাক না পরে থাকলে রূপের মহিমা প্রকাশ পায় না। লজ্জা চলে যায় বলেই ছেলেরা যেমন লম্পট হয়, তেমনি মেয়েরা হয় ঢেমন। কথায় বলে, 'ও ঢেমন, তোর লাজ কেমন? লাজ থাকলে আবার হই ঢেমন?'

দ্বীনের সর্বপ্রথম যে জিনিস উঠে যাবে

দ্বীনের বহু কিছু আছে, বহু কিছু কিয়ামতের কাছাকাছি সময় পর্যন্ত থাকবে। আবার অনেক কিছু ধীরে ধীরে বিলীন হয়ে যাবে। এমনকি কুরআনের পাতা থেকে কুরআনী আয়াত পর্যন্ত অদৃশ্য হয়ে যাবে।

কিন্তু সর্বপ্রথম কোন্ জিনিস উম্মাহ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে?

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَوَّلُ مَا تَفْقِدُونَ مِنْ دِينِكُمُ الأَمَانَةُ).

অর্থাৎ, “তোমাদের দ্বীনের মধ্য হতে প্রথম যে জিনিস তোমরা হারাবে, তা হল আমানত।” *(সিলসিলাহ সহীহাহ ১৭৩৯নং)*

আমানত খুবই ভারী জিনিস, তাই তা সর্বপ্রথম মানুষ হারিয়ে ফেলবে। ক্রমশঃ আমানতদার বিলোপ পাবে। হুযাইফাহ ؓ বলেন, রাসূলুল্লাহ ﷺ আমাদের নিকট দু'টি হাদীস বর্ণনা করেছেন। একটি তো আমি প্রত্যক্ষ করেছি এবং দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষায় রয়েছি। তিনি আমাদের কাছে বর্ণনা করেছেন যে, আমানত মানুষের হৃদয়মূলে অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তারপর তারা কুরআন থেকে জ্ঞানার্জন করেছে। তারপর তারা নবীর হাদীস থেকেও জ্ঞানার্জন করেছে। এরপর আমাদেরকে আমানত তুলে নেওয়া সম্পর্কে বর্ণনা করেছেন, “মানুষ এক ঘুম ঘুমানোর পর তার অন্তর থেকে আমানত তুলে নেওয়া হবে। তখন একটি বিন্দুর মত তার চিহ্ন অবশিষ্ট থাকবে। পুনরায় মানুষ এক ঘুম ঘুমাবে। আবারো তার অন্তর থেকে আমানত উঠিয়ে নেওয়া হবে। তখন জ্বলন্ত আগুন গড়িয়ে তোমার পায়ে পড়লে যেমন একটা ফোস্কা পড়ে কালো দাগ দেখতে পাওয়া যায় তার মত চিহ্ন থাকবে। তুমি তাকে ফোলা দেখবে; কিন্তু বাস্তবে তাতে কিছুই থাকবে না।” অতঃপর (উদাহরণ স্বরূপ) তিনি একটি কাঁকর নিয়ে নিজ পায়ে গড়িয়ে দিলেন। (তারপর বলতে লাগলেন,) “সে সময় লোকেরা বেচা-কেনা করবে কিন্তু প্রায় কেউই আমানত আদায় করবে না। এমনকি লোকে বলাবলি করবে যে, অমুক বংশে একজন আমানতদার লোক আছে। এমনকি (দুনিয়াদার) ব্যক্তি সম্পর্কে মন্তব্য করা হবে, সে কতই না অদম্য! সে কতই না বিচক্ষণ! সে কতই না বুদ্ধিমান! অথচ তার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণও ঈমান থাকবে না।” (হুযাইফা বলেন,) ইতিপূর্বে আমার উপর এমন যুগ অতিবাহিত হয়ে গেছে, যখন কারো সাথে বেচাকেনা করতে কোন পরোয়া করতাম না। কারণ সে মুসলিম হলে তার দ্বীন তাকে আমার (খিয়ানত থেকে) বিরত রাখত। আর খ্রিস্টান অথবা ইয়াহুদী হলে তার শাসকই আমার হক ফিরিয়ে দিত। কিন্তু বর্তমানের অবস্থা হচ্ছে এই যে, আমি অমুক অমুক ব্যক্তি ছাড়া বেচা-কেনা করতে প্রস্তুত নই। *(বুখারী ও মুসলিম)*

আমানত বড় ভারী ও কঠিন জিনিস বলেই, তা অজ্ঞ মানুষ ছাড়া অন্য কেউ বহন করতে চায়নি। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا} (٧٢) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, নিশ্চয়ই আমি আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতমালার প্রতি এ আমানত অর্পণ করতে চেয়েছিলাম। ওরা ভয়ে বহন করতে অস্বীকার করল; কিন্তু মানুষ তা বহন করল। নিশ্চয় সে অতিশয় যালেম ও অতিশয় অজ্ঞ। *(সূরা আহযাব ৭২ আয়াত)*

প্রকৃতপক্ষে সেই মানুষ যালেম ও অতিশয় অজ্ঞ, যে আমানতের খিয়ানত করে। বোঝা বহনের দায়িত্ব নিয়ে তাতে উন্নাসিকতা ও অবহেলা প্রদর্শন করে, আমানত আদায়ে গড়িমসি করে ও ফাঁকি দেয়।

দ্বীন সম্বন্ধে অজ্ঞতা অথবা বিচার সম্বন্ধে অবিশ্বাসই আমানতের ভারী বোঝা বহন করতে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করবে না। তাই সর্বপ্রথম সেই জিনিস মানুষের হৃদয় থেকে বিলীন হয়ে যাবে।

মহানবী ﷺ আরো বলেছেন,

(أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الأَمَانَةُ ، وَآخِرُ مَا يَبْقَى الصَّلاةُ).

অর্থাৎ, মানুষের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম যে জিনিস উঠিয়ে নেওয়া হবে, তা হল আমানত। আর সর্বশেষ যা অবশিষ্ট থাকবে, তা হল নামায।" *(সঃ জামে' ২৫৭৫নং, এর কাছাকাছি অর্থে সিঃ সহীহাহ ১৭৩৯নং)*

কিন্তু নামায সর্বশেষ পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকলেও নামাযের মাঝে বিনয়-নম্রতা সবার আগেই বিলীন হয়ে যাবে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَوَّلُ شَيْءٍ يُرْفَعُ مِنْ هذِهِ الأُمَّةِ الخشوع حَتَّى لاَ تَرَى فِيها خاشِعاً).

অর্থাৎ, এই উম্মত থেকে সর্বপ্রথম যে জিনিস তুলে নেওয়া হবে, তা হবে বিনয়-নম্রতা। পরিশেষে তুমি তাদের মধ্যে কোন একজনকেও বিনয়ী দেখবে না। (ত্বাবারানী, সঃ জামে' ২৫৬৯নং)

অথচ বিনয়-নম্রতা নামাযের প্রাণ, নামাযের একাগ্রতা, আল্লাহ-ভীতির শিরোনাম। বিনতি ও মিনতি নামাযের সজীবতা। সেই নামাযী সফল হয়, যে তার নামাযে বিনয়-নম্র থাকে। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ (١) الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ} (٢) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, অবশ্যই বিশ্বাসিগণ সফলকাম হয়েছে। যারা নিজেদের নামাযে বিনয়-নম্র। (মু'মিনূন ঃ ১-২)

নামায খুবই ভারী জিনিস, তবে বিনয়ীদের জন্য নয়। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَاسْتَعِينُواْ بِالصَّبْرِ وَالصَّلاَةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلاَّ عَلَى الْخَاشِعِينَ } (٤٥) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে সাহায্য প্রার্থনা কর এবং বিনীতগণ ব্যতীত আর সকলের নিকট নিশ্চিতভাবে এ কঠিন। (বাক্বারাহ ঃ ৪৫)

মহানবী ﷺ ছিলেন বিশেষ ক'রে নামাযে একান্ত বিনয়ী। তিনি নামাযের রুকূতে বলতেন,

اَللّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ وَ بِكَ آمَنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ، أَنْتَ رَبِّيْ خَشَعَ سَمْعِيْ وَبَصَرِيْ وَدَمِيْ وَلَحْمِيْ وَعَظْمِيْ وَ عَصَبِيْ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ.

অর্থঃ- হে আল্লাহ! আমি তোমারই জন্য রুকু করলাম, তোমারই প্রতি বিশ্বাস রেখেছি, তোমারই নিকট আত্মসমর্পণ করেছি, তোমারই উপর ভরসা করেছি, তুমি আমার প্রভু। আমার কর্ণ, চক্ষু, রক্ত, মাংস, অস্থি ও ধমনী বিশ্বজাহানের প্রতিপালক আল্লাহর জন্য বিনয়াবনত হল। *(মুসলিম, সঃ নাসাঈ ১০০৬নং)*

কোথায় সে নামাযী, যে হয় এমন বিনয়ী? কোথায় সে নামাযী, যে নামাযে অযথা হেল-দোল করে না, নিজের লেবাস, দাড়ি বা অন্য কিছু নিয়ে খেলা করে না। উদাসীন থেকে এমন আচরণ তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দ্বারা প্রদর্শন করে না, যা দেখে মনে হয় তার হৃদয়ে বিনতি নেই, মহান আল্লাহর প্রতি তা'যীম, ভয় ও ভক্তি নেই।

দ্বীনের সর্বশেষ অবশিষ্টাংশ কী?

যত দিন যাবে, ধীরে ধীরে দ্বীনের অংশ তত লোপ পেতে থাকবে। মানুষের মাঝে দ্বীনের চিহ্ন বলতে সবশেষে কেবল নামাযটাই অবশিষ্ট থাকবে। তাছাড়া যাকাত, রোযা, হজ্জ প্রভৃতি তারও আগে মানুষ ত্যাগ ক'রে বসবে। দ্বীনদার বলে যারা বাকী থাকবে, তারা নামায পড়বে। তবে নিশ্চয় বর্তমান অপেক্ষা উত্তমরূপে নয়। বর্তমানেই তো জুমআর নামাযী বেশি। পাঁচ অক্তের নামাযী কোথায়? মসজিদ সুসজ্জিত, কিন্তু মুসল্লী নেই। মসজিদের সংখ্যা বাড়ছে, কিন্তু নামাযীর সংখ্যা বাড়ছে না।

একদিন এক তবলীগী ভাই আমাকে বললেন, 'মসজিদ বাড়িয়ে কী হবে? মুসল্লী বাড়ান।'

আমি বললাম, 'মুসল্লী বাড়াবার চেষ্টায় তো আছি, তাছাড়া আপনারা মুসল্লী বাড়ান। আর আমরা মসজিদ বাড়াই। সব কাজ তো একা কারো দ্বারা নাও হতে পারে।'

শেষ যামানায় তো দুরবস্থা আরো সঙ্গিন হবে। তবুও নামায অনেকের মাঝে থেকে যাবে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَوَّلُ مَا يُرْفَعُ مِنَ النَّاسِ الأَمَانَةُ ، وَآخِرُ مَا يَبْقَى الصَّلاةُ).

অর্থাৎ, মানুষের মধ্য থেকে সর্বপ্রথম যে জিনিস উঠিয়ে নেওয়া হবে, তা হল আমানত। আর সর্বশেষ যা অবশিষ্ট থাকবে, তা হল নামায।" *(সঃ জামে' ২৫৭৫নং, এর কাছাকাছি অর্থে সিঃ সহীহাহ ১৭৩৯নং)*

কিন্তু শির্কী ও কুফরী আক্বীদা মনে পোষণ ক'রে নামায কোন্ কাজে দেবে?

সবচেয়ে বেশি কুলক্ষণ ও সুলক্ষণ দেহাঙ্গ

দেহের মধ্যে এমন একটি অঙ্গ আছে, যা সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। আবার সেটাই সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। আর সেটা হল জিভ। জিভ দ্বারা দংশন করা যায়, জিভ দ্বারাই ঝাড়া যায়। জিভে আছে আঘাত, জিভেই আছে প্রলেপ। জিভ দ্বারা ঘৃণা সৃষ্টি করা যায়,

আবার জিভ দ্বারা ভালোবাসাও সৃষ্টি করা যায়। জিভ দ্বারা শত্রুতা করা যায়, জিভ দ্বারা বন্ধুত্বও করা যায়। জিভে বিষ আছে, জিভে মধুও আছে। জিভ দ্বারা যেমন পাপ করা যায়, তেমনি জিভ দ্বারা আল্লাহর যিক্র, কুরআন তেলাঅত, সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধা-সহ আরো অনেক পুণ্যও করা যায়। এই জন্য জিভ হল অস্ত্রের মতো, তা দিয়ে শত্রুও দমন করা যায়, আবার মানুষও খুন করা যায়। এই জন্যই মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَيْمَنُ امْرِئٍ وَأَشْأَمُهُ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ).

অর্থাৎ, মানুষের সবচেয়ে বেশি শুভ এবং সবচেয়ে বেশি অশুভ অঙ্গ হল তার দুই চোয়ালের মাঝে (জিভ)। *(ত্বাবারানীর কাবীর ১৩৬৫৬, ইবনে হিব্বান ৫৭১৭, সিঃ সহীহাহ ১২৮৬নং)*

সবচেয়ে বেশি পাপী দেহাঙ্গ

মানুষের দেহের মধ্যে বিভিন্ন অঙ্গ দ্বারা পাপ সংঘটিত হয়। কিন্তু যে অঙ্গ দ্বারা পাপ বেশি করা হয়, সেটা কী?

সেটা হল মানুষের জিভ! মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَكْثَرُ خَطَايَا ابنِ آدَمَ فِي لِسَانِه).

অর্থাৎ, আদম-সন্তানের অধিকাংশ পাপ তার জিভে। *(ত্বাবারানীর কাবীর ১০৪৪৬, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান ৪৯৩৩, সঃ জামে' ১২০১নং)*

জিভ দ্বারা বড় বিপদ হয়, বড় সর্বনাশ ঘটে। সে কথাও প্রকাশ করা হয়েছে ইসলামে।

সুফয়ান ইবনে আব্দুল্লাহ ﷺ বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন কথা বাত্লে দিন, যা মজবুতভাবে ধরে রাখব।' তিনি বললেন, "তুমি বল, আমার রব আল্লাহ, অতঃপর তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাক।" আমি পুনরায় নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমার জন্য আপনি কোন্ জিনিসকে সব চাইতে বেশি ভয় করেন?' তিনি স্বীয় জিহ্বাকে (স্বহস্তে) ধারণপূর্বক বললেন, "এটাকে।" *(তিরমিযী ২৪১০, ইবনে মাজাহ ৩৯৭২নং)*

জিভের আপদ থেকে রক্ষা পেলে অনেক বিপদ ও পাপ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া সম্ভব। উক্ববাহ ইবনে আমের ﷺ বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! কিসে পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভব?' তিনি বললেন,

((أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ ، وَلْيَسَعْكَ بَيْتُكَ ، وابْكِ عَلَى خَطِيئَتِكَ)) .

"তুমি নিজ রসনাকে নিয়ন্ত্রণে রাখ। তোমার ঘর তোমার জন্য প্রশস্ত হোক। (অর্থাৎ, অবসর সময়ে নিজ গৃহে অবস্থান কর।) আর নিজ পাপের জন্য ক্রন্দন কর।" *(তিরমিযী ২৪০৬নং)*

মানুষের ভাল-মন্দের ব্যাপারে জিভ এত বড় ভূমিকা রাখে যে, দেহের অন্যান্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তার প্রসঙ্গে আশঙ্কা প্রকাশ করে এবং তাকে ভাল থাকার উপদেশ দেয়। নবী ﷺ বলেছেন,

((إذَا أَصْبَحَ ابْنُ آدَمَ ، فَإنَّ الأَعْضَاءَ كُلَّهَا تَكْفُرُ اللِّسانَ ، تَقُولُ : اتَّقِ اللهَ فِينَا ، فَإنَّما نَحنُ بِكَ ؛ فَإن اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا ، وَإنِ اعْوَجَجْتَ اعْوَجَجْنَا)) .

"আদম সন্তান যখন সকালে উপনীত হয়, তখন তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জিভকে অত্যন্ত বিনীতভাবে নিবেদন করে যে, 'তুমি আমাদের ব্যাপারে আল্লাহকে ভয় কর। কারণ, আমাদের ব্যাপারসমূহ তোমার সাথেই সম্পৃক্ত। যদি তুমি সোজা সরল থাক, তাহলে আমরাও সোজা-সরল থাকব। আর যদি তুমি বক্রতা অবলম্বন কর, তাহলে আমরাও বেঁকে বসব।" *(তিরমিযী ২৪০৭নং)*

মুআয ﷺ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি নিবেদন করলাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমাকে এমন আমল বাতলে দেন, যা আমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে।' তিনি বললেন, "তুমি বিরাট (কঠিন) কাজ সম্পর্কে প্রশ্ন করলে। তবে এটা তার পক্ষে সহজ হবে, যার পক্ষে মহান আল্লাহ সহজ ক'রে দেবেন। (আর তা হচ্ছে এই যে,) তুমি আল্লাহর ইবাদত করবে এবং তার কোন অংশী স্থাপন করবে না। নামায প্রতিষ্ঠা করবে, যাকাত দেবে, মাহে রমযানের রোযা পালন করবে এবং কাবা গৃহের হজ্জ পালন করবে।" পুনরায় তিনি বললেন, "তোমাকে কল্যাণের দ্বারসমূহ বাতলে দেব না কি? রোযা ঢালস্বরূপ, সাদকাহ গুনাহ নিশ্চিহ্ন করে; যেমন পানি আগুনকে নিশ্চিহ্ন ক'রে দেয়। আর মধ্য রাত্রিতে মানুষের নামায।" অতঃপর তিনি এই আয়াত দু'টি পড়লেন---যার অর্থ, "তারা শয্যা ত্যাগ করে, আশায় বুক বেঁধে এবং আশংকায় ভীতি-বিহ্বল হয়ে তাদের প্রতিপালককে আহ্বান করে এবং আমি তাদেরকে যে সব জীবিকা দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় ক'রে থাকে। তাদের সৎকর্মের পুরস্কারস্বরূপ তাদের জন্য নয়ন-প্রীতিকর যা কিছু লুক্কায়িত রাখা হয়েছে, কেউ তা অবগত নয়।" *(সূরা সাজদাহ ১৬-১৭ আয়াত)* তারপর বললেন, "আমি তোমাকে সব বিষয়ের (দ্বীনের) মস্তক, তার খুঁটি, তার উচ্চতম চূড়া বাতলে দেব না কি?" আমি বললাম, 'অবশ্যই বাতলে দিন, হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "বিষয়ের মস্তক হচ্ছে ইসলাম, তার স্তম্ভ হচ্ছে নামায এবং তার উচ্চতম চূড়া হচ্ছে জিহাদ।" পুনরায় তিনি প্রশ্ন করলেন, "আমি তোমাকে সে সবের মূল সম্বন্ধে বলে দেব না কি?" আমি বললাম, 'অবশ্যই বলে দিন, হে আল্লাহর রসূল!' তখন তিনি নিজ জিভটিকে ধরে বললেন, "তোমার মধ্যে এটিকে সংযত রাখ।" মুআয বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা যে কথা বলি তাতেও কি আমাদেরকে হিসাব দিতে হবে?' তিনি বললেন,

((ثَكِلَتْكَ أُمُّكَ! وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ إلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ ؟)).

"তোমার মা তোমাকে হারিয়ে ফেলুক হে মুআয! মানুষকে তাদের নিজেদের জিভ-ঘটিত পাপ ছাড়া অন্য কিছু কি তাদের মুখ থুবড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে?" *(তিরমিযী ২৬১৬, ইবনে মাজাহ ৩৯৭৩নং)*

জিভ দ্বারা পাপ বেশি হয়, তাই তাকে নিয়ন্ত্রণে রাখা সর্বশ্রেষ্ঠ কর্মসমূহের অন্যতম। ইবনে মাসউদ ﷺ একদা মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করলেন,'হে আল্লাহর রসূল! সর্বশ্রেষ্ঠ

আমল কী?' তিনি উত্তরে বললেন, "যথা সময়ে নামায পড়া।" অতঃপর জিজ্ঞাসা করেন যে, 'তারপর কী হে আল্লাহর রসূল! তিনি বললেন, "তোমার জিহ্বা হতে লোককে নিরাপদে রাখা।" *(ত্বাবারানী)*

এই জন্য আব্দুল্লাহ বিন মাসউদ ﷺ একদা সাফার উপর চড়ে বললেন, 'রে জিভ! ভালো কথা বল; সফলতা পাবি। চুপ থাক; লাঞ্ছিত হওয়ার পূর্বে নিরাপত্তা পাবি।' লোকেরা বলল, 'হে আবু আব্দুর রহমান! একথা আপনি নিজে বলছেন, নাকি কারো নিকট শুনেছেন?' তিনি বললেন, 'না, বরং আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি, তিনি বলেছেন, "আদম সন্তানের অধিকতর পাপ তার জিহ্বা থেকেই সংঘটিত হয়।" *(সিঃ সহীহাহ ৫৩৪নং)*

ইবনে মাসউদ ﷺ জিবের সর্বনাশিতা অনুধাবন ক'রে বলেছেন, 'তাঁর কসম যিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই! জিব ছাড়া ভূপৃষ্ঠে আর এমন কোন বস্তু নেই, যাকে দীর্ঘ কারাবদ্ধ (সংযত) রাখার প্রয়োজন হয়।' *(ইবনে আবী শাইবাহ ২৬৪৯০নং)*

ইবনে উমার ﷺ বলেছেন, 'মুসলিমের সবচেয়ে পবিত্র ও সংশোধনযোগ্য অঙ্গ হল তার জিভ।' *(ঐ ২৬৪৯৩নং)*

একদা কুস বিন সায়েদাহ এবং আকসাম বিন সাইফী একে অপরকে বললেন, 'আদম সন্তানের ভিতরে কতগুলো ত্রুটি পেয়েছেন আপনি?' বললেন, 'অগণিত ত্রুটি; তবে আমি যা গণনা করেছি তা হল আট হাজার। আর ওরই মধ্যে একটি গুণ এমন পেয়েছি; তা যদি সে ব্যবহার করে তাহলে তার সমস্ত ত্রুটি গোপন করে নিতে পারে।' অপর জন বললেন, 'তা কী?' বললেন, 'বাক্সংযম।'

অনেকে বলেছেন, 'তোমার জিহ্বাকে সংযত রাখ হে মানুষ! তা যেন তোমাকে দংশন না করে ফেলে। কারণ জিহ্বা এক প্রকার অজগর। কবরস্থানে কত জিহ্বাদষ্ট হত মানুষ পড়ে রয়েছে দেখ; যাদেরকে বীর্যবান পুরুষরাও দেখে ভয় করত।' *(আযকার, নওবী ২৯৭-২৯৮পৃঃ)*

উমার বিন আব্দুল আযীয বলেন, 'হৃদয় রহস্যের সিন্দুক, ওষ্ঠাধর তার তালা এবং রসনা তার চাবি। অতএব প্রত্যেকের উচিত, নিজের গুপ্ত রহস্যের চাবি হেফাযতে রাখা।'

আসলেই জিহ্বা দেখতে ছোট ও নরম, কিন্তু তার আঘাত বড় শক্ত। তরবারির আঘাতে ক্ষতের জন্য ব্যান্ডেজ আছে, কিন্তু জিহ্বার আঘাতে ক্ষতের জন্য কোন ব্যান্ডেজ নেই।

'করাতের কঠোরতা দেখেছে সকল নর কাঠের উপরে
তার চেয়ে বেশী বাজে কঠোর কর্কশ স্বর মনের ভিতরে।'

কত মানুষ অনেকের জিভ দ্বারা কৃতপাপ ঃ মিথ্যা, গীবত, চুগলি, গালাগালি, অপবাদ, মিথ্যা দোষারোপ, অভিশাপ, মিথ্যা সাক্ষি, ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ ইত্যাদির আঘাতে ধরাশায়ী হয়ে যায়। অথচ এমন সকল কাজ মুসলিমের হওয়া উচিত নয়।

আল্লাহর রসূল ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! সর্বোত্তম মুসলমান কে?' তিনি বললেন,

((مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ)).

"যার জিহ্বা ও হাত থেকে মুসলিমরা নিরাপদ থাকে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

সবচেয়ে অপ্রীতিকর শব্দ

পৃথিবীর বুকে সবচেয়ে বেশি অপ্রীতিকর ও শ্রুতিকটু শব্দ হল গাধার। তারই মতো সেই মানুষ, যে ভীষণ কর্কশভাষী। মহান আল্লাহ আল-কুরআনে লুকমান হাকীমের নিজ পুত্রকে দেওয়া উপদেশ উদ্ধৃত ক'রে বলেছেন,

{وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِن صَوْتِكَ إِنَّ أَنكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ} (١٩) لقمان

অর্থাৎ, তোমার চলনে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং তোমার কণ্ঠস্বর নীচু কর; স্বরের মধ্যে গাধার স্বরই সর্বাপেক্ষা অপ্রীতিকর। (লুক্বমান ঃ ১৯)

সুতরাং মুসলিমের উচিত মধুরভাষী হওয়া। মানুষের সাথে কথা বলার সময় নিম্ন, মৃদু ও আদবের স্বরে কথা বলা, বিশেষ ক'রে বড়দের সাথে।

সবচেয়ে উত্তম নাম

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(خَيْرُ أَسْمَائِكُمْ عَبْدُ اللَّهِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَن، وَالْحَارِثُ).

অর্থাৎ, তোমাদের সবচেয়ে উত্তম নাম হল ঃ আব্দুল্লাহ, আব্দুর রহমান ও হারেষ। (ত্বাবারানী, সঃ জামে' ৩২৬৯নং)

সবচেয়ে উত্তম নাম সেই নাম, যাতে মহান সত্ত্বার দাসত্বের অর্থ পাওয়া যায়। আর তা হবে আল্লাহর নামের সাথে 'আব্দ' শব্দ যোগ ক'রে। অবশ্য মহান আল্লাহর সুন্দরতম নামাবলীর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নাম হল 'আল্লাহ'। সুতরাং মানুষের সবচেয়ে উত্তম নাম হল 'আব্দুল্লাহ'। অতঃপর শ্রেষ্ঠ নাম হল 'আর-রাহমান'। অতএব পরবর্তী উত্তম নাম হল 'আব্দুর রাহমান'। এই দুই নামের সাথে যুক্ত ক'রে নবী ও নেক লোকেদের কথা কুরআনে উল্লেখ হয়েছে। মহান আল্লাহর অন্য নামের সাথে যুক্ত ক'রে তা হয়নি।

'হারেষ' নামও ভাল নাম। কারণ তা মানুষের সার্থক নাম। যেহেতু 'হারেষ' অর্থ কৃষক। আর প্রত্যেক মানুষের কৃষিকার্যের সাথে কোন না কোন সম্পর্ক আছেই আছে।

সবচেয়ে বেশি অপছন্দনীয় নাম বা খেতাব

মহান আল্লাহ নিকট সবচেয়ে বেশি অপছন্দনীয় নাম হল 'শাহানশাহ'। সবচেয়ে বেশি নিকৃষ্ট উপাধি বা খেতাব হল 'রাজাধিরাজ'। যেহেতু এ খেতাবে রয়েছে অহংকার। এ খেতাবে রয়েছে আসল রাজার সাথে সমকক্ষতা। যিনি আসল রাজা। যিনি বিশ্বজাহানের মালিক ও অধিপতি। তিনি বলেন,

{لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الأُمُورُ } (٥) سورة الحديد

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব তাঁরই, আর আল্লাহরই দিকে সব বিষয়

প্রত্যাবর্তিত হবে। (হাদীদ ঃ ৫)

{إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ} (٤٠) سورة مريم

অর্থাৎ, নিশ্চয় পৃথিবী ও তাতে যা কিছু আছে তার চূড়ান্ত মালিকানার অধিকারী আমিই এবং তারা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। (মারয়্যাম ঃ৪০)

{وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ} (٦٧) سورة الزمر

অর্থাৎ, ওরা আল্লাহর যথোচিত কদর করেনি। কিয়ামতের দিন সমস্ত পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে এবং আকাশমন্ডলী থাকবে তাঁর ডান হাতে গুটানো। পবিত্র ও মহান তিনি, ওরা যাকে অংশী করে তিনি তার উর্ধ্বে। (যুমার ঃ ৬৭)

বিচার দিবসের মালিক তিনি। যে ময়দানে সারা পৃথিবীর পূর্ববর্তী-পরবর্তী সকল মানুষ সমবেত হবে, সেই ময়দানের অধিপতি তিনি। মহানবী ﷺ বলেন, "কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ পৃথিবীকে নিজের মুঠোয় নেবেন এবং নিজ ডান হাত দ্বারা আসমানকে গুটিয়ে নেবেন, অতঃপর বলবেন, 'আমিই রাজা। কোথায় পৃথিবীর রাজাগণ?" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫৫২২নং)*

সুতরাং প্রকৃত রাজাধিরাজ তিনিই। তাই অন্য কেউ সে খেতাব গ্রহণ করলে তিনি রাগান্বিত হন। এমন খেতাবের মানুষও তাঁর নিকট সবার চেয়ে বেশি ক্রোধভাজন হয়। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَغْيَظُ رَجُلٍ عَلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَخْبَثُهُ وَأَغْيَظُهُ عَلَيْهِ رَجُلٌ كَانَ يُسَمَّى مَلِكَ الأَمْلاَكِ لاَ مَلِكَ إِلاَّ اللَّهُ).

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশি ক্রোধভাজন ও নিকৃষ্ট ব্যক্তি সে, যাকে (পৃথিবীতে) 'রাজাধিরাজ' বলা হতো। অথচ তিনি ছাড়া (প্রকৃত) রাজা অন্য কেউ নয়। (মুসলিম ৫৭৩৫নং)

সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গী, সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবেশী

ভাল মানুষের কাছে যে ভাল, আল্লাহর কাছেও সে ভাল। ভাল স্ত্রীর কাছে যে ভাল, সে আল্লাহর কাছেও ভাল। অনুরূপ আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বেশি ভাল সাথী, সঙ্গী বা বন্ধু হল সেই ব্যক্তি, যে তার বন্ধুর কাছে ভাল। আর সবচেয়ে বেশি ভাল প্রতিবেশী হল সেই ব্যক্তি, যে তার প্রতিবেশীর কাছে ভাল। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(خَيْرُ الْأَصْحَابِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيرَانِ عِنْدَ اللَّهِ خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ).

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্গী হল সেই ব্যক্তি, যে তার সঙ্গীদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ। আর সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিবেশী হল সেই ব্যক্তি, যে তার প্রতিবেশীদের কাছে সর্বশ্রেষ্ঠ। *(আহমাদ ৬৫৬৬, তিরমিযী, ইবনে খুযাইমা, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ১০৩নং)*

সর্বশ্রেষ্ঠ সুর্মা

সুর্মা হল চোখের কাজল ও প্রসাধন। চোখে সুর্মা নিলে মহিলা সুরমা হয়ে যায়। আব্দুল্লাহ বিন জা'ফর বিন আবী তালেব তাঁর কন্যাকে দেওয়া উপদেশে বলেছিলেন, 'সতীনের প্রতি ঈর্ষা থেকে দূরে থেকো, কারণ তা হল তালাকের চাবিকাঠি, বেশী কথা কাটাকাটি করা থেকে দূরে থেকো, কারণ তা স্বামীর মনে ঘৃণা সৃষ্টি করে। সুর্মা ব্যবহার করো, কারণ তা সবচেয়ে বেশী সুন্দর প্রসাধন। আর (আতর না পেলে) পানি হল সবচেয়ে উত্তম সুগন্ধি।'

অবশ্য পুরুষেরা চোখের উপকারের জন্য রাত্রে শোবার সময় সুর্মা ব্যবহার করতে পারে। বরং তা হল সুন্নত। তবে সর্বশ্রেষ্ঠ সুর্মার ব্যাপারে মহানবী ﷺ বলেছেন,

(خَيْرُ أَكْحَالِكُمُ الإِثْمِدُ ، يُنْبِتُ الشَّعْرَ وَيَجْلُو الْبَصَرَ).

অর্থাৎ, তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সুর্মা হল ইসমিদ। তা চোখের পাতায় লোম উদ্‌গত করে এবং দৃষ্টিশক্তি উজ্জ্বল করে। (বাযযার, সঃ তারগীব ২ ১০৫নং)

'ইসমিদ' নামক সুর্মা বর্তমানেও সঊদী আরবের বাজারে পাওয়া যায়। সুতরাং পরীক্ষা প্রার্থনীয়।

সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান

যেহেতু মহান আল্লাহ সবার চেয়ে বড়। তাই পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান হল তাঁর ঘরসমূহ। ভূপৃষ্ঠের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রিয় জায়গা হল মসজিদসমূহ। যেহেতু সে ঘরসমূহ সম্পর্কে তিনি বলেছেন,

{فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ} (٣٦) {رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ} (٣٧) سورة النـور

অর্থাৎ, সে সব গৃহে---যাকে আল্লাহ সমুন্নত করতে এবং যাতে তাঁর নাম স্মরণ করতে নির্দেশ দিয়েছেন---সকাল ও সন্ধ্যায় তাতে তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এমন সব লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং নামায কায়েম ও যাকাত প্রদান করা হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেদিনকে, যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বল হয়ে পড়বে। (নূর ঃ ৩৬-৩৭)

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((أَحَبُّ البِلادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا ، وَأَبْغَضُ البِلاَدِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا)). رواه مسلم

"আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে পছন্দনীয় স্থান হল মসজিদ। আর সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান হল বাজার।" *(মুসলিম)*

আবার মসজিদসমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মসজিদ হল কুবার মসজিদ। তাতে কোন নামায

আদায় করলে একটি উমরাহ করার সমান সওয়াব হয়। (আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ হাকেম, সঃ জামে' ৩৮৭২, ৬১৫৪, ৬২২৫নং)

তার থেকে শ্রেষ্ঠ জেরুজালেমের বায়তুল মাক্বদিস বা মাসজিদুল আক্বসা। যেহেতু সুলাইমান ﷺ যখন ঐ মসজিদ নির্মাণ শেষ করেছিলেন, তখন আল্লাহর নিকট দুআ করেছিলেন যে, যে ব্যক্তি কেবলমাত্র নামাযের উদ্দেশ্যেই ঐ মসজিদে উপস্থিত হবে, সে ব্যক্তি যেন ঐ দিনকার মত নিষ্পাপ হয়ে ফিরে আসে, যেদিন তার মা তাকে প্রসব করেছিল। *(সহীহ নাসাঈ ৬৬৯, ইবনে মাজাহ ১৪০৮ নং)*

আর এক বর্ণনামতে তাতে ২৫০ নামাযের সওয়াব আছে। মহানবী ﷺ বলেন, "বায়তুল মাক্বদিস অপেক্ষা আমার এই মসজিদে নামায চারগুণ উত্তম। আর তা হল শ্রেষ্ঠ নামাযের স্থান।" *(হাকেম ৪/৫০৯, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, ত্বাহাবী, সিঃ সহীহাহ ৬/২/৯৫৪)*

তার থেকে শ্রেষ্ঠ মদীনার মসজিদে নববী। যেহেতু সেখানকার একটি নামায এক হাজার নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

তাছাড়া মহানবী বলেছেন, "আমার গৃহ ও (আমার মসজিদের) মিম্বরের মাঝে বেহেশ্তের এক বাগান রয়েছে। আর আমার মিম্বর রয়েছে আমার হওযের উপর।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৬৯৪নং)*

তার থেকেও শ্রেষ্ঠ মক্কার কা'বা-মসজিদ। যেহেতু সেখানকার একটি নামায এক লক্ষ নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। *(আহমাদ, বাইহাক্বী, সঃ জামে' ৩৮৩৮, ৩৮৪১ নং)*

বলা বাহুল্য, বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান মক্কা মুকার্রামা। যেখানে রয়েছে পৃথিবীর প্রথম গৃহ--- কা'বাঘর ও মাসজিদুল হারাম। যেখানে রয়েছে জান্নাতের দু'টি মুক্তা; হাজারে আসওয়াদ ও মাক্বামে ইব্রাহীম। যেখানে রয়েছে বর্কতময় যমযম। যে নগরী সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বশেষ নবী ﷺ-এর জন্মভূমি।

এক সময় মক্কাকে সম্বোধন ক'রে মহানবী ﷺ বলেছিলেন, "আল্লাহর কসম! নিশ্চয়ই তুমি আল্লাহর নিকট সবার চাইতে শ্রেষ্ঠ ভূমি, সবার চাইতে প্রিয় ভূমি। আমি যদি তোমার বক্ষ থেকে বহিষ্কৃত না হতাম, তাহলে আমি বের হতাম না।" *(আহমাদ ৪/৩০৫, তিরমিযী ৩৯২৫, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ ৩১০৮-নং)*

তারপর মদীনা নববিয়্যা। অবশ্য যে স্থানে মহানবী ﷺ সমাহিত আছেন, সে স্থান মক্কা থেকেও উত্তম।

পরিশেষে জ্ঞাতব্য যে, প্রত্যেক মসজিদ হল আল্লাহর ঘর। ঈমানদাররা সেই ঘর আবাদ রাখে। সেই ঘরের সাথে যাদের হৃদয়-মন লটকে থাকে, তারা কিয়ামতের রৌদ্রতপ্ত ময়দানে আরশের ছায়া লাভ করবে। মসজিদ আবাদকারীরা আল্লাহর মেহমান। তারা হল আল্লাহর প্রতিবেশী!

মহান আল্লাহ কিয়ামতের দিন ডাক দিয়ে বলবেন, 'আমার প্রতিবেশীরা কোথায়? আমার প্রতিবেশীরা কোথায়?' ফিরিশ্তাগণ বলবেন, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আপনার প্রতিবেশী হওয়ার যোগ্য কে?' তিনি বললেবন, 'মসজিদ আবাদকারীরা কোথায়?' (সিঃ সহীহাহ ২৭২৮-নং)

পৃথিবীর সর্বনিকৃষ্ট স্থান

পৃথিবীর সর্বনিকৃষ্ট স্থান প্রস্রাব-পায়খানার জায়গা নয়, বরং তা হল বাজার। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((أَحَبُّ البِلادِ إِلَى اللهِ مَسَاجِدُهَا ، وَأَبْغَضُ البِلاَدِ إِلَى اللهِ أَسْوَاقُهَا)). رواه مسلم

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকটে সবচেয়ে পছন্দনীয় স্থান হল মসজিদ। আর সবচেয়ে ঘৃণ্য স্থান হল বাজার। *(মুসলিম)*

কিন্তু তা কেন? যেহেতু বাজার হল খাস দুনিয়াদারদের জায়গা। সেখানে সাধারণতঃ দুনিয়াদারী চলে। লোভ-লালসা ও অর্থলোলুপতার বিশেষ স্থান বাজার। খিয়ানত, ভেজাল, সূদী কারবার, মিথ্যা কথন, মিথ্যা আশ্বাস, মিথ্যা আশা ও লোভ ইত্যাদির বেসাতি বেশ জোরদার জায়গা বাজার।

ধোঁকাবাজি, ঠকবাজি, মিথ্যা হলফবাজি, অসৎ মানুষদের আড্ডাবাজি, বেপর্দা প্রসাধিকা মহিলা, বেশ্যা মহিলা, মস্তান ও লম্পটদের প্রধান জায়গা বাজার।

বাজারের চাকচিক্য, হৈচৈ, ঝামেলা-ঝঞ্ঝাট, প্রসাধিকাদের বেপর্দা হয়ে বেলেল্লাপনা চলাফেরা, গান-বাজনা ইত্যাদি আল্লাহর যিক্র থেকে বিস্মৃতি আনে, ঔদাসীন্য আনে।

সালমান ফারেসী ﷺ বলেন, 'তুমি যদি পার, তাহলে সর্বপ্রথম বাজারে প্রবেশকারী হবে না এবং সেখান থেকে সর্বশেষ প্রস্থানকারী হবে না। কারণ, বাজার শয়তানের আড্ডাস্থল; সেখানে সে আপন ঝাণ্ডা গাড়ে।' *(মুসলিম)*

বারক্বানী তাঁর 'সহীহ' গ্রন্থে সালমান ﷺ কর্তৃক বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "সর্বপ্রথম বাজারে প্রবেশকারী হয়ো না এবং সেখান থেকে সর্বশেষ প্রস্থানকারী হয়ো না। কারণ, সেখানে শয়তান ডিম পাড়ে এবং ছানা জন্ম দেয়।"

এই জন্যই বাজারে গিয়ে বিশেষ দুআ পড়লে মিলিয়ন সওয়াবের উপহার পাওয়া যায়। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি বাজারে প্রবেশ করে (নিম্নের দুআ) বলে, আল্লাহ তার জন্য দশ লক্ষ নেকী লিপিবদ্ধ করেন, দশ লক্ষ গোনাহ মোচন ক'রে দেন, তাকে দশ লক্ষ মর্যাদায় উন্নীত করেন এবং বেহেশ্তে তার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করেন।"

'লা ইলা-হা ইল্লাল্লাহু অহদাহু লা শারীকা লাহু, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু, য়্যুহয়ী অয়্যুমীতু, অহুয়া হাইয়্যুল লা য়্যামূতু, বিয়্যাদিহিল খাইরু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।'

অর্থাৎ- আল্লাহ ছাড়া কেউ সত্য উপাস্য নেই, তিনি একক তাঁর কোন অংশী নেই, তাঁরই জন্য সারা রাজত্ব ও তাঁরই নিমিত্তে সমুদয় প্রশংসা। তিনি জীবন দান করেন এবং মৃত্যু প্রদান করেন। আর তিনি চিরঞ্জীব, তাঁর মৃত্যু নেই। তাঁর হাতেই সর্বপ্রকার মঙ্গল এবং তিনি সর্ব বস্তুর উপর সর্বশক্তিমান। *(সহীহ তিরমিযী ২৭২৬ নং, সহীহ ইবনে মাজাহ ১৮১৭ নং)*

অনেকে নিজের অভিজ্ঞতায় বলেন, অধিকাংশ সময়ে বাজারে গিয়ে দুআটি পড়তে মনে থাকে না। আর তার কারণ হল মুগ্ধতা, ব্যস্ততা ও ঔদাসীন্য।

লক্ষণীয় যে, হাদীসে 'আহাব্বুল বিলাদ' বলা হয়েছে। 'বিলাদ' মানে দেশ বা শহর, কিন্তু এখানে ভূমি বা জায়গার অর্থে ব্যবহার হয়েছে। এতে যেন ইঙ্গিত রয়েছে কুরআন কারীমের এই আয়াতের প্রতি,

{وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لاَ يَخْرُجُ إِلاَّ نَكِدًا كَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَشْكُرُونَ} (৫৮) سورة الأعراف

অর্থাৎ, উৎকৃষ্ট ভূমি তার প্রতিপালকের নির্দেশে ফসল উৎপন্ন করে এবং যা নিকৃষ্ট তাতে কঠিন পরিশ্রম ব্যতীত কিছুই জন্মায় না। এভাবে কৃতজ্ঞ সম্প্রদায়ের জন্য আমি নিদর্শনসমূহ বিভিন্নভাবে বিবৃত ক'রে থাকি। (আ'রাফ ঃ ৫৮)

মসজিদ পছন্দনীয় ও প্রিয় জায়গা, যেহেতু মসজিদে আগমনকারীরা এমন লোক যাদের ব্যাপারে মহান আল্লাহ বলেছেন,

{رِجَالٌ لَّا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِيتَاء الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ} (৩৭) سورة النور

অর্থাৎ, এমন সব লোক যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং নামায কায়েম ও যাকাত প্রদান করা হতে বিরত রাখে না, তারা ভয় করে সেদিনকে, যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি ভীতি-বিহ্বল হয়ে পড়বে। (নূর ঃ ৩৭)

পক্ষান্তরে অকারণে বাজার-ভ্রমণকারীরা সাধারণতঃ জ্বিন ও মানুষরূপী শয়তান হয়। চিত্তরঞ্জন তাদের উদ্দেশ্য হয়। ফলে তারা আল্লাহ থেকে বহু দূরে সরে যায় এবং অবৈধ নজরবাজি প্রভৃতির ফলে শয়তানের নৈকট্য লাভ করে।

এতো পুরুষদের কথা, মহিলাদের কথা কী? যে মহিলারা অকারণে সামান্য প্রয়োজনে অথবা চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যে বাজারে-বাজারে ঘুরে বেড়ায়, বাজার থেকেও নোংরা জায়গা মেলায় গিয়ে উপস্থিত হয়, কখনো বা মিসকীন বাপ বা স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে অথবা একাকিনী অথবা গায়র-মাহরাম পুরুষের সাথে 'মার্কেট' ক'রে বেড়ায়, বিক্রেতার সাথে নানা ভঙ্গিমায় কথা বলে আত্মতৃপ্তি লাভ ক'রে থাকে, তারা কার নৈকট্য লাভ করে?

বোরকা পরে যায়? কিন্তু তার আকার-আকৃতি, লাস্যময়ী চলন-ভঙ্গি, আবেদনময়ী আচরণ, মিষ্টিময় কথন, ফিকফিকে হাসি, বোরকার কারুকার্যের চমৎকারিত্ব, অলংকারের ঝংকার, প্রসাধন ও পারফিউমের আকর্ষণময় সৌরভ ইত্যাদি কোথায় লুকায়?

মহানবী ﷺ বলেছেন, "মহিলা হল গোপন জিনিস। বাইরে বের হলে শয়তান তার দিকে গভীর দৃষ্টিতে নির্নিমেষ তাকিয়ে দেখতে থাকে।" *(ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযাইমা, সঃ তারগীব ৩৩৯, ৩৪১, ৩৪২নং)*

বাজারের মানুষরূপী শয়তানরা অবশ্যই সেই বাজারী মেয়েদেরকে স্বাগতম জানায়। তারাই নারী-স্বাধীনতার পতাকা উত্তোলন ক'রে তার ছায়াতলে আশ্রয় নিতে আহবান জানায়। আর এমন মেয়েরা অবলীলাক্রমে সেই পতাকাতলে সমবেত হয়।

অবশ্য যারা প্রয়োজনে বাজারে যাবে, হালাল রুযীর সন্ধানে যাবে, বৈধ ব্যবসা করবে, দায়িত্বশীল হয়ে বাজারের খোঁজ-খবর নেবে, তাদের কথা স্বতন্ত্র। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ} (১৭৩) سورة البقرة

অর্থাৎ, যে অনন্যোপায় অথচ অন্যায়কারী কিংবা সীমালংঘনকারী নয়, তার কোন পাপ হবে না। নিশ্চয় আল্লাহ চরম ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (বাক্বারাহ ঃ ১৭৩)

দ্বীনী দাওয়াত, সৎকাজের আদেশ ও মন্দকাজে বাধা দান করা ইত্যাদি নেক উদ্দেশ্যে গেলেও তা অবশ্যই উপকারী। তুফাইল ইবনে উবাই ইবনে কা'ব হতে বর্ণিত, তিনি আব্দুল্লাহ ইবনে উমার رضي الله عنه-এর কাছে আসতেন এবং সকালে তাঁর সঙ্গে বাজার যেতেন। তিনি বলেন, 'যখন আমরা সকালে বাজারে যেতাম, তখন তিনি প্রত্যেক খুচরা বিক্রেতা, স্থায়ী ব্যবসায়ী, মিসকীন, তথা অন্য কোন ব্যক্তির নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় তাকে সালাম দিতেন।' তুফাইল বলেন, সুতরাং আমি একদিন (অভ্যাসমত) আব্দুল্লাহ ইবনে উমার رضي الله عنه-এর নিকট গেলাম। তিনি আমাকে তাঁর সঙ্গে বাজারে যেতে বললেন। আমি বললাম, 'আপনি বাজার গিয়ে কী করবেন? আপনি তো বেচা-কেনার জন্য কোথাও থামেন না, কোন পণ্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করেন না, তার দর-দাম জানতে চান না এবং বাজারের কোন মজলিসে বসেনও না। আমি বলছি, এখানে আমাদের সাথে বসে যান, এখানেই কথাবার্তা বলি।' (তুফাইলের ভুঁড়ি মোটা ছিল, সেই জন্য) তিনি বললেন, 'ওহে ভুঁড়িমোটা! আমরা সকাল বেলায় বাজারে একমাত্র সালাম পেশ করার উদ্দেশ্যে যাই; যার সাথে আমাদের সাক্ষাৎ হয়, আমরা তাকে সালাম দিই।' *(মুঅত্ত্বা মালেক)*

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পানি

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ও পবিত্রতম পানি হল যমযমের পানি। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(خَيْرُ ماءٍ على وَجْهِ الأَرْضِ ماءُ زَمْزَمَ فِيهِ طَعامٌ مِنَ الطُّعْمِ وشِفاءٌ مِنَ السَّقْمِ).

অর্থাৎ, পৃথিবীর বুকে সর্বশ্রেষ্ঠ পানি হল যমযমের পানি। তাতে রয়েছে তৃপ্তির খাদ্য এবং ব্যাধির আরোগ্য। (ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান, সঃ জামে' ৩৩২২নং)

তিনি আরো বলেছেন, "যমযমের পানি যে নিয়তে পান করা হবে সে নিয়ত পূর্ণ হওয়ায় ফলপ্রসূ।" *(সহীহ ইবনে মাজাহ ২৮৮৪ নং, ইরওয়াউল গালীল ১১২৩ নং)*

অধুনা কালে ঐ পানি নিয়ে গবেষণা ক'রে দেখা গেছে যে, সত্যই তাতে দুধের মতো খাদ্য ও পানীয় উপাদান উভয়ই আছে। বর্কতের আশায় পান করলে এবং পূর্ণ ঈমানের সাথে কোন নিয়ত নিয়ে পান করলে তাতে আশা ও নিয়ত পূর্ণ হয় এবং রোগী আরোগ্য লাভ করে।

যমযম আবিষ্কার হয় জিবরীল ফিরিশ্তার ডানা বা পদাঘাতে অথবা শিশু ইসমাঈলের পদাঘাতে। ইব্রাহীম ﷺ ইসমাঈলের মা (হাজার; যা বাংলায় প্রসিদ্ধ হাজেরা) ও তাঁর দুধের শিশু ইসমাঈলকে সঙ্গে নিয়ে কা'বা ঘরের নিকট এবং যমযমের উপরে একটি বড় গাছের তলে (বর্তমান) মসজিদের সবচেয়ে উঁচু জায়গায় তাঁদেরকে রাখলেন। তখন মক্কায় না ছিল জনমানব, না ছিল কোন পানি। সুতরাং সেখানেই তাদেরকে রেখে গেলেন এবং একটি থলের মধ্যে কিছু খেজুর আর একটি মশকে স্বল্প পরিমাণ পানি দিয়ে গেলেন। তারপর

ইব্রাহীম ﷺ ফিরে যেতে লাগলেন। তখন ইসমাঈলের মা তাঁর পিছু পিছু ছুটে এসে বললেন, 'হে ইব্রাহীম! আমাদেরকে এমন এক উপত্যকায় ছেড়ে দিয়ে আপনি কোথায় যাচ্ছেন, যেখানে না আছে কোন সঙ্গী-সাথী আর না আছে অন্য কিছু (খাদ্য বা পানীয়)?'

তিনি বারংবার এ কথা বলতে থাকলেন। কিন্তু ইব্রাহীম ﷺ সেদিকে ভ্রূক্ষেপ করলেন না। তখন হাজেরা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আল্লাহ কি আপনাকে এর হুকুম দিয়েছেন?' তিনি উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ।' উত্তর শুনে হাজেরা বললেন, 'তাহলে তিনি আমাদেরকে ধ্বংস ও বরবাদ করবেন না।' অতঃপর হাজেরা (গাছের কাছে) ফিরে এলেন।

ইব্রাহীম ﷺ চলে গেলেন। পরিশেষে যখন তিনি (হাজূনের কাছে) সানিয়্যাহ নামক স্থানে এসে পৌঁছলেন, যেখানে স্ত্রী-পুত্র আর তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন না, তখন তিনি কা'বা ঘরের দিকে মুখ ক'রে দু'হাত তুলে এই দুআ করলেন,

{رَّبَّنَا إِنِّي أَسْكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي زَرْعٍ عِندَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُواْ الصَّلاَةَ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ} (٣٧) سورة إبراهيم

"হে আমাদের প্রতিপালক! আমি আমার কিছু বংশধরকে ফল-ফসলহীন উপত্যকায় তোমার পবিত্র গৃহের নিকট বসবাস করালাম; হে আমাদের প্রতিপালক! যাতে তারা নামায কায়েম করে। সুতরাং তুমি কিছু লোকের অন্তরকে ওদের প্রতি অনুরাগী ক'রে দাও এবং ফলাদি দ্বারা তাদের জীবিকার ব্যবস্থা কর; যাতে তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।" *(সূরা ইব্রাহীম ৩৭ আয়াত)*

(অতঃপর ইব্রাহীম ﷺ চলে গেলেন।) ইসমাঈলের মা শিশুকে দুধ পান করাতেন আর নিজে ঐ মশক থেকে পানি পান করতেন। পরিশেষে ঐ মশকের পানি শেষ হয়ে গেলে তিনি নিজেও পিপাসিত হলেন এবং (ঐ কারণে বুকের দুধ শুকিয়ে যাওয়ায়) তাঁর শিশুপুত্রটিও পিপাসায় কাতর হয়ে পড়ল। তিনি শিশুর প্রতি তাকিয়ে দেখলেন, (পিপাসায়) শিশু মাটির উপর ছট্‌ফট্‌ করছে। শিশু পুত্রের (এ করুণ অবস্থার) দিকে তাকানো তার পক্ষে সহ্য হচ্ছিল না। তিনি সরে পড়লেন এবং তাঁর অবস্থান ক্ষেত্রের নিকটতম পর্বত হিসাবে 'স্বাফা'কে পেলেন। তিনি তার উপর উঠে দাঁড়িয়ে উপত্যকার দিকে মুখ ক'রে এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখলেন, কাউকে দেখা যায় কি না। কিন্তু তিনি কাউকে দেখতে পেলেন না। তখন স্বাফা পর্বত থেকে নেমে আসলেন। অতঃপর যখন তিনি উপত্যকায় পৌঁছলেন, তখন আপন পিরানের (ম্যাক্সির) নিচের দিক তুলে একজন শ্রান্তক্লান্ত মানুষের মতো দৌড়ে উপত্যকা পার হলেন। অতঃপর 'মারওয়া' পাহাড়ে এসে তার উপরে উঠে দাঁড়ালেন। অতঃপর চারিদিকে দৃষ্টিপাত ক'রে কাউকে দেখার চেষ্টা করলেন। কিন্তু কাউকে দেখতে পেলেন না। (এইভাবে তিনি পাহাড়দ্বয়ের মাঝখানে) সাতবার (আসা-যাওয়া) করলেন। ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "এ কারণে (হজ্জের সময়) হাজীগণের এই পাহাড়দ্বয়ের মধ্যে সাতবার সায়ী বা দৌড়াদৌড়ি করতে হয়।"

এভাবে শেষবার যখন তিনি মারওয়া পাহাড়ের উপর উঠলেন, তখন একটি আওয়াজ শুনতে পেলেন। তখন তিনি নিজেকেই বললেন, 'চুপ!' অতঃপর তিনি কান খাড়া ক'রে

ঐ আওয়াজ শুনতে লাগলেন। আবারও সেই আওয়ায শুনতে পেলেন। তখন তিনি বললেন, 'তোমার আওয়াজ তো শুনতে পেলাম। এখন যদি তোমার কাছে সাহায্যের কিছু থাকে, তবে আমাকে সাহায্য কর।' হঠাৎ তিনি যমযম যেখানে অবস্থিত সেখানে (জিব্রীল) ফিরিশ্তাকে দেখতে পেলেন। ফিরিশ্তা তাঁর পায়ের গোড়ালি দিয়ে অথবা নিজ ডানা দিয়ে আঘাত করলেন। ফলে (আঘাতের স্থান থেকে) পানি প্রকাশ পেল। হাজেরা এর চার পাশে নিজ হাত দ্বারা বাঁধ দিয়ে তাকে হওযের রূপদান করলেন এবং অঞ্জলি ভরে তার মশকটিতে পানি ভরতে লাগলেন। হাজেরার ভরা শেষ হলেও পানি উথলে উঠতে থাকল।

ইবনে আব্বাস ﷺ বলেন, নবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহ ইসমাঈলের মায়ের উপর করুণা বর্ষণ করুন। যদি তিনি যমযমকে (বাঁধ না দিয়ে ঐভাবে) ছেড়ে দিতেন। অথবা যদি তিনি অঞ্জলি দিয়ে মশক না ভরতেন, তবে যমযম (কূপ না হয়ে) একটি প্রবহমান ঝর্ণা হত।" (বুখারী)

বর্তমানে বড় বড় পাম্পের সাহায্যে যে হারে পানি তোলা হয়, তার কথা ভাবতেই অবাক লাগে। নিশ্চয় সে পানি মহান আল্লাহর মু'জিযা এবং নিশ্চয় সে পানি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম পানি।

সর্বশ্রেষ্ঠ রঙের পোশাক

পোশাক-আশাক ব্যবহারের সময় এক এক মানুষের এক এক পছন্দ। নানা রঙের মধ্যে কোন কোন রঙ কোন কোন মানুষের কাছে প্রাধান্য পায়। অবশ্য আল্লাহর নবী ﷺ বিভিন্ন রঙ ব্যবহার করেছেন। কিন্তু তিনি বলেছেন,

(الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ ، فَإِنَّهَا خَيْرُ ثِيَابِكُمْ ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ).

"তোমরা তোমাদের সাদা রঙের কাপড় পরিধান কর। কেননা, তা তোমাদের সর্বোত্তম কাপড়। আর ওতেই তোমাদের মৃত ব্যক্তিদেরকে কাফন দাও।" *(আবূ দাউদ, তিরমিযী, সঃ জামে' ১২৩৬নং)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

(الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمْ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ).

"তোমরা সাদা রঙের কাপড় পরিধান কর। কেননা, তা সবচেয়ে পবিত্র ও উৎকৃষ্ট। আর ওতেই তোমাদের মৃতদেরকে কাফন দাও।" *(নাসাঈ, হাকেম, সঃ জামে' ১২৩৫নং)*

সাদা রঙের কাপড়কে সবচেয়ে বেশি পবিত্র এই জন্য বলা হয়েছে যে, তাতে সামান্য ময়লা লাগলে সহজে বুঝা যায়। ফলে তা ধুয়ে পরিষ্কার ক'রে নেওয়া হয়। পক্ষান্তরে রঙিন কাপড়ে ময়লা লাগলেও সহজে বুঝা যায় না। ফলে বহুদিন ব্যবহার করা হলে তাতে দুর্গন্ধ ধরে যায় এবং ময়লা বুঝা যায় না বলে পরিষ্কারও করা হয় না। আর এ কারণেই অনেকে সাবান-খরচ কম করার মানসে রঙিন পোশাক ব্যবহার করে। আসলে তা বৈধ হলেও সাদা পোশাকই সর্বশ্রেষ্ঠ।

সর্বশ্রেষ্ঠ ভ্রমণ

অনেকে পরিবহণ-যোগে দূর সফরে যায়, বেড়াতে যায় বা ভ্রমণ করতে যায়, বিলাস-বিহার করতে যায়। অবশ্য অনেক মানুষ মাযার, কবর, ঐতিহাসিক স্থান, যেমন গারে সওর, হিরা গুহা, বদর, উহুদ, তূর পাহাড় প্রভৃতি জায়গা বর্কতের উদ্দেশ্যে, সওয়াবের উদ্দেশ্যে, কিছু চাওয়ার কামনায়, কিছু পাওয়ার বাসনায় দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে। তা কিন্তু বৈধ নয়।

যদি কেউ সওয়াব ও বর্কতলাভের আশায় সফর করতে চায়, তবে তার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সফর হল দুটি জায়গার সফর। মক্কা ও মদীনা। অবশ্য উদ্দেশ্য কিন্তু মহানবী ﷺ-এর জন্মস্থান বা সমাধিক্ষেত্র হবে না। বরং উদ্দেশ্য হবে মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদে নববীতে নামায পড়ে অজস্র সওয়াবের অধিকারী হওয়া। সেই সাথে উমরাহ করলে তো অতিরিক্ত সওয়াব আছেই।

কা'বার মসজিদে একটি নামায এক লক্ষ নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

মসজিদে নববীতে একটি নামায এক হাজার নামায অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

সুতরাং সর্বশ্রেষ্ঠ ভ্রমণ হল উক্ত দুই মসজিদের যিয়ারত। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(خَيْرُ مَا رُكِبَتْ إِلَيْهِ الرَّوَاحِلُ مَسْجِدُ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَام وَمَسْجِدِي).

অর্থাৎ, যে জায়গার জন্য সওয়ারীতে সওয়ার হওয়া যায়, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জায়গা হল ইব্রাহীম ﵇-এর মসজিদ ও আমার মসজিদ। *(আহমাদ ১৪৬১২, ত্বাবারানী, ইবনে হিব্বান, সঃ তারগীব ১২০৬নং)*

বরং উক্ত দুই মসজিদ ও মাসজিদুল আক্বসা ছাড়া বর্কত ও সওয়াবের উদ্দেশ্যে অন্য কোন জায়গার যিয়ারতে যেতে মহানবী ﷺ নিষেধ ক'রে বলেছেন,

((لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِى هَذَا وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى)).

অর্থাৎ, তিনটি মসজিদ ছাড়া সফর করা যাবে না, (মক্কার) মাসজিদে হারাম, (মদীনার) আমার এই মসজিদ এবং (জেরুজালেমের) মাসজিদে আক্বসা। *(বুখারী-মুসলিম)*

সাহাবী আবূ সাঈদ খুদরী ؓ-এর সঙ্গে একদল লোকের দেখা হল। তিনি জানতে পারলেন যে, তারা তূর যাচ্ছে। সুতরাং তিনি তাদেরকে উক্ত হাদীস শুনালেন।

সাহাবী আবূ বাসরাহ ؓ-এর সঙ্গে আবূ হুরাইরা ؓ-এর দেখা হল। আবূ বাসরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোত্থেকে আসছেন?' তিনি বললেন, 'তূর থেকে, যেখানে আল্লাহ মূসার সঙ্গে কথা বলেছিলেন।' আবূ বাসরা বললেন, 'আপনার যাওয়ার পূর্বে যদি আপনার সাথে আমার সাক্ষাৎ হতো, তাহলে আমি আপনাকে খবর দিতাম। আমি আল্লাহর রসূল ﷺ-কে বলতে শুনেছি যে, "তিনটি মসজিদ ছাড়া সফর করা যাবে না, (মক্কার) মসজিদে হারাম, (মদীনার) আমার এই মসজিদ এবং (জেরুজালেমের) মসজিদে আক্বসা।" *(ত্বাহাবী ১/২৪৪)*

ক্বাযআহ বলেন, 'আমি তূর যাওয়ার সংকল্প করলাম। সুতরাং এ ব্যাপারে ইবনে উমার ؓ-কে জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি বললেন, তুমি কি জান না যে, নবী ﷺ বলেছেন, "তিনটি

মসজিদ ছাড়া সফর করা যাবে না.....।" *(আখবারু মাক্কাহ, আযরাক্বী ৩০৪পৃঃ, আহকামুল জানায়েয আলবানী ২২৬পৃঃ)*

অবশ্য ক্বুবার মসজিদে গিয়ে নামায পড়া এবং একটি উমরাহর সওয়াব লাভ করার কথা অন্য হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। (ইবনে মাজাহ, সঃ জামে' ৬১৫৪নং)

উপমহাদেশের প্রসিদ্ধ আলেম শায়খ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী বলেছেন, 'জাহেলী যুগের লোকেরা তাদের ধারণাপ্রসূত তা'যীমযোগ্য (শরীফ) স্থানগুলির সফর করত, তার যিয়ারত করত এবং তার মাধ্যমে বর্কত কামনা করত। অথচ তাতে ছিল (দ্বীন ও তাওহীদের) এমন বিকৃতি ও বিঘ্ন, যা অস্পষ্ট নয়। তাই নবী ﷺ (উক্ত হাদীস দ্বারা) বিঘ্ন (বা ফাসাদের দরজা) বন্ধ ক'রে দিলেন। যাতে প্রতীকসমূহ অপ্রতীকসমূহের সাথে মিলিত না করা হয়। যাতে গায়রুল্লাহর ইবাদতের মাধ্যম না হয়ে যায়। আর আমার নিকট সঠিক এই যে, কবর, কোন অলীর ইবাদতের স্থল ও তূর, এর প্রত্যেকটাই (যিয়ারত-সফর) নিষেধে সমান।' *(হুজ্জাতুল্লাহিল বা-লিগাহ ১/১৯২)*

সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য

অক্ষি দ্বারা দৃষ্ট জিনিস বর্ণনা করার নাম সাক্ষি দেওয়া। এই সাক্ষি দ্বারা বিচার হয়। তাই মিথ্যা সাক্ষি ও কোন অন্যায় কাজে সাক্ষি দেওয়া কাবীরা গোনাহ। বিশেষ ক'রে অর্থ লেনদেনের ক্ষেত্রে মহিলাদের দুজনের সাক্ষি একজন পুরুষ সাক্ষীর সমান। কিন্তু সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষি কোন্‌টি?

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(خَيْرُ الشَّهادَةِ ما شَهِدَ بِهِ صاحِبُها قَبْلَ أنْ يُسْأَلَها).

অর্থাৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ সাক্ষ্য হল সেটা, যা সাক্ষী তার নিকট চাওয়ার আগেই দিয়ে থাকে। *(ত্বাবারানী, সঃ জামে' ৩২৭৬নং)*

তবে এটা হল সেই সাক্ষীর সাক্ষ্যের কথা, যার ব্যাপারে কেউ জানে না যে, সে ঘটনার সাক্ষী। সাক্ষ্য না থাকার কারণে হক নষ্ট হয়ে যাওয়া দেখে সে নিজে থেকে এসে সাক্ষ্য প্রদান করে। যেহেতু সেই সাক্ষ্য তখন তার কাছে একটি আমানত।

অথবা এ সাক্ষ্য হল স্বেচ্ছাসেবীর সাক্ষ্য। যেমন বিবাহ, তালাক, ওয়াক্‌ফ, ক্রয়-বিক্রয়, ঋণ দেওয়া-নেওয়া, অসিয়ত ইত্যাদির সময় দেওয়া সাক্ষ্য। যা চাওয়ার আগে সাক্ষী স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে প্রদান ক'রে থাকে।

উক্ত শ্রেণীর সাক্ষ্য প্রদান করা ওয়াজেব। যেহেতু মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَلاَ يَأْبَ الشُّهَدَاء إِذَا مَا دُعُواْ} (٢٨٢) سورة البقرة

অর্থাৎ, যখন (সাক্ষ্য দিতে) ডাকা হয়, তখন যেন সাক্ষীরা অস্বীকার না করে। *(বাক্বারাহ ঃ ২৮২)*

{وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ} (٢٨٣) البقرة

অর্থাৎ, তোমরা সাক্ষ্য গোপন করো না, বস্তুতঃ যে তা গোপন করে, নিশ্চয় তার অন্তর

পাপময়। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা সবিশেষ অবহিত। (বাক্বারাহ ঃ ২৮৩)

{فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا} (٢) سورة الطلاق

অর্থাৎ, তাদের ইদ্দত পূরণের কাল আসন্ন হলে তোমরা হয় যথাবিধি তাদেরকে রেখে নাও, না হয় তোমরা তাদেরকে যথাবিধি পরিত্যাগ কর এবং তোমাদের মধ্য হতে দুই জন ন্যায়পরায়ণ লোককে সাক্ষী রাখ; তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দাও। এটা দ্বারা তোমাদের মধ্যে যে কেউ আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস রাখে, তাকে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর যে কেউ আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার নিষ্কৃতির পথ ক'রে দেবেন। *(ত্বালাক্ব ঃ ২)*

অথবা এ সাক্ষ্য এমন সাক্ষীর, যে সত্বর সাক্ষ্য দেয় এবং কোন প্রকার গয়ংগচ্ছ করে না। যেমন অতিশয়োক্তিতে বলা হয়, 'যে দানবীর, সে চাওয়ার আগেই দান দেয়।' অর্থাৎ, চাওয়ামাত্র সাথে সাথে দান দেয়।

চাওয়ার আগে সাক্ষ্য দিয়েছিলেন সাহাবী খুযাইমাহ ﷺ। একদা মহানবী ﷺ সাওয়া বিন কাইস মুহারেবী বেদুঈনের নিকট থেকে একটি ঘোড়া কিনলেন। কিন্তু সে ঐ বিক্রয়ের কথা অস্বীকার করল এবং বলল, 'তুমি যদি আমার কাছে ঘোড়া কিনেছ, তাহলে সাক্ষী উপস্থিত কর।' এ কথা শুনে খুযাইমাহ বিন সাবেত সাহাবী ﷺ তাঁর সপক্ষে সাক্ষি দিয়ে বললেন, 'এই ঘোড়া তোমার নিকট থেকে উনি খরীদ করেছেন।' নবী ﷺ তাঁকে বললেন, "তুমি তো আমাদের ঘোড়া ক্রয়-বিক্রয়ের সময় উপস্থিত ছিলে না, তাহলে সাক্ষি দিলে কীভাবে?" তিনি বললেন, 'আপনি যা বলেন, তাতেই আমি আপনাকে সত্যবাদী বলে জানি। আরো জানি যে আপনি কখনো মিথ্যা বলবেন না।' মহানবী ﷺ বললেন, "যে ব্যক্তির সপক্ষে অথবা বিপক্ষে খুযাইমাহ সাক্ষি দেবে, সাক্ষির জন্য সে একাই যথেষ্ট।" আর তখন থেকেই তাঁর উপাধি পড়ে গেল 'ডবল সাক্ষি-ওয়ালা' সাহাবী। *(আবূ দাউদ ৩৬০৭, নাসাঈ ৪৬৬১নং, ত্বাবারানী, হাকেম ২/২২, বাইহাকী ১০/১৪৬)*

পক্ষান্তরে চাওয়ার আগে ভিত্তিহীন সাক্ষ্য দেওয়া অথবা মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়া অথবা অপ্রয়োজনীয় সাক্ষ্য দেওয়া অথবা সাক্ষী হওয়ার অযোগ্য হয়েও সাক্ষ্য দেওয়া বৈধ নয়। এই শ্রেণীর সাক্ষীর নিন্দা করা হয়েছে হাদীসে। মহানবী ﷺ বলেছেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ শতাব্দী আমার শতাব্দী। অতঃপর তার পরবর্তী শতাব্দী। অতঃপর তার পরবর্তী শতাব্দী (এর লোকেরা)। অতঃপর এমন সম্প্রদায় আবির্ভূত হবে, যাদের দেহ মোটা হবে এবং মোটা হতে পছন্দ করবে। তারা চাওয়ার আগে সাক্ষ্য প্রদান করবে।" *(তিরমিযী, ইবনে হিব্বান, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ৬৯৯নং)*

কিন্তু কী বলবেন তাদের ব্যাপারে, যারা নিজেদের পরিবার, জ্ঞাতি, জাতি বা দেশের লোকের বিরুদ্ধে বলে সাক্ষ্য দিতে চায় না এবং সত্য সাক্ষ্য গোপন করে, ফলে অপরাধী শাস্তি থেকে বেঁচে যায়---তারা শ্রেষ্ঠ লোক, নাকি নিকৃষ্ট?

বৃহত্তম ইলাহী দান

মহান আল্লাহ মানুষকে তার নিজের মধ্যে যা কিছু দান করে থাকেন, তার কোন হিসাব নেই। তবে তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দান হল সুন্দর চরিত্র। যেহেতু সুন্দর চরিত্র মানুষকে মহান করে তোলে। সুন্দর চরিত্রের মানুষ সকলের কাছে প্রিয়পাত্র হয়।

এক ব্যক্তি মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করল, 'হে আল্লাহর রসূল! মানুষকে দেওয়া দানসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দান কী দেওয়া হয়েছে?' উত্তরে তিনি বললেন, "সুন্দর চরিত্র।" *(ইবনে হিব্বান, হাকেম, বাইহাক্বী, সঃ তারগীব ২৬৫২নং)*

আরো একটি মহাদান হল ধৈর্য। ধৈর্য হল জীবনের আলো। ধৈর্য ঈমানের অঙ্গ। মহান আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথের সাথী। আর 'যে সয়, সে রয়।'

আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ বলেন, কিছু আনসারী আল্লাহর রসূল ﷺ-এর কাছে কিছু চাইলেন। তিনি তাদেরকে দিলেন। পুনরায় তারা দাবী করল। ফলে তিনি (আবার) তাদেরকে দিলেন। এমনকি যা কিছু তাঁর কাছে ছিল তা সব নিঃশেষ হয়ে গেল। অতঃপর যখন তিনি সমস্ত জিনিস নিজ হাতে দান ক'রে দিলেন, তখন তিনি বললেন,

((مَا يَكُنْ عِنْدِي مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ أَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ ، وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللهُ ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللهُ، وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللهُ ، وَمَا أُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْراً وَأَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ)). مُتَّفَقٌ عليه

"আমার কাছে যা কিছু (মাল) আসে তা আমি তোমাদেরকে না দিয়ে কখনই জমা ক'রে রাখব না। (কিন্তু তোমরা একটি কথা মনে রাখবে,) যে ব্যক্তি চাওয়া থেকে পবিত্র থাকার চেষ্টা করবে, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখবেন। আর যে ব্যক্তি (চাওয়া থেকে) অমুখাপেক্ষিতা অবলম্বন করবে, আল্লাহ তাকে অমুখাপেক্ষী করবেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করার চেষ্টা করবে আল্লাহ, তাকে ধৈর্য ধারণের ক্ষমতা প্রদান করবেন। আর কোন ব্যক্তিকে এমন কোন দান দেওয়া হয়নি, যা ধৈর্য অপেক্ষা উত্তম ও বিস্তর হতে পারে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

বিপদের অন্ধকারে ধৈর্য হল আলো। দারিদ্র্যের সৌন্দর্য ধৈর্য। ধৈর্য ও সবর এক সম্পদ, যার দ্বারা ধনী না হলেও ধনীর মত জীবন যাপন করা যায়। সব সমস্যার প্রতিকারই হচ্ছে ধৈর্য। বৃক্ষের ছাল তিক্ত হলেও তার ফল বড় মিষ্টি। ধৈর্য ধরা খুব কঠিন হলেও তার পরিণাম বড় শুভ। নিশ্চয় ধৈর্য সৃষ্টিকর্তার মহাদান।

যালেমের অত্যাচারে ধৈর্য ধারণ করলে, মানুষের সম্মান বর্ধন হয়। মহানবী ﷺ শপথ ক'রে বলেছেন, "কোন বান্দার উপর কোন প্রকার অত্যাচার করা হলে এবং সে তার উপর ধৈর্য-ধারণ করলে আল্লাহ নিশ্চয় তার সম্মান বাড়িয়ে দেন।" (তিরমিযী ২৩২৫নং)

মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ পালন করতেও ধৈর্যের প্রয়োজন আছে। যে কোন কষ্টের অন্ধকার দূরীভূত করতে ধৈর্যের আলো ছাড়া আর কিছু নেই মানুষের কাছে। আর সেই জন্যই তো সে আলো ব্যবহার করলে মানুষ সাফল্য ও উত্তম পুরস্কার লাভ করবে।

আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{إِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغَيْرِ حِسَابٍ} (١٠) سورة الزمر
অর্থাৎ, ধৈর্যশীলদেরকে তো অপরিমিত পুরস্কার দেওয়া হবে। (যুমার ঃ ১০)

সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ

মহান আল্লাহ মানুষকে অগণিত সম্পদ দিয়ে ধন্য করেছেন। অবশ্য সকল মানুষেই যে নিজের চাহিদা অনুযায়ী সকল সম্পদ লাভ করেছে, তা নয়। নিজ নিজ ভাগ্য ও চেষ্টা অনুযায়ী সম্পদের ভাগ লাভ করেছে।

দ্বীন ও ঈমান-সম্পদ।

দেহ ও স্বাস্থ্য-সম্পদ।

পার্থিব ধন-সম্পদ।

স্ত্রী-সম্পদ।

সন্তান-সম্পদ।

মনোসুখ ও নিরাপত্তা সম্পদ ইত্যাদি।

কিন্তু এ সবের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ কী? এ প্রশ্ন সাহাবাগণ করেছিলেন নবী ﷺ-কে। সওবান رضي الله عنه বলেন,

{وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ} (٣٤)

অর্থাৎ, যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করে না, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। (তাওবাহ ঃ ৩৪)

যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল, তখন সফরে কিছু সাহাবী নবী ﷺ-কে বললেন, সোনা-চাঁদির ব্যাপারে যা অবতীর্ণ করার ছিল, তা অবতীর্ণ করা হল। আমরা যদি জানতাম, কোন্ সম্পদ সর্বশ্রেষ্ঠ, তাহলে তা আমরা গ্রহণ ও অর্জন করতাম। তিনি বললেন,

(أَفْضَلُهُ لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَزَوْجَةٌ مُؤْمِنَةٌ تُعِينُهُ عَلَى إِيمَانِهِ).

"সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হল, যিক্‌রকারী জিহ্বা, শুকরকারী হৃদয় এবং ঈমানের কাজে সহায়িকা স্ত্রী।" (আহমাদ, তিরমিযী ৩০৯৪, ইবনে মাজাহ, সঃ তারগীব ১৪৯৯নং)

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

(قَلْبٌ شَاكِرٌ وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ وَزَوجَةٌ صَالِحَةٌ تُعْنِيكَ عَلَى أَمْرِ دُنْيَاكَ وَدِينِكَ خَيْرُ مَا اكْتَنَزَ النَّاسُ).

অর্থাৎ, শুকরকারী হৃদয়, যিক্‌রকারী জিহ্বা এবং পুণ্যময়ী স্ত্রী, যে তোমাকে তোমার দুনিয়া ও দ্বীনের কাজে সহযোগিতা করে, এ সব হল মানুষের সঞ্চিত সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। (ত্বাবারানী, বাইহাক্বীর শুআবুল ঈমান, সঃ জামে' ৪৪০৯নং)

সুখে-দুঃখে যে হৃদয় মহান আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জানায়, সর্বদা তাঁর যিকরে যে জিহ্বা আর্দ্র থাকে, সে হৃদয় ও জিহ্বা মানুষের জন্য এক-একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ।

আর স্ত্রী? যে জীবন-সঙ্গিনী, দুনিয়ার কাজে শরীরার্ধ। দ্বীনের কাজেও অর্ধাঙ্গিনী। যে নিজ স্বামীর গুণগ্রাহী, যে স্বামীর প্রতিভা ও মাহাত্ম্য স্বীকার করে, স্বামীর মান ও মর্যাদার সুরক্ষা

করে, স্বামীর বৈধ ও বিধেয় কাজে তাকে আন্তরিকভাবে উৎসাহিত করে, প্রশংসার কাজে তার প্রশংসা ক'রে তাকে তাতে অনুপ্রাণিত করে, আপদে-বিপদে, দুঃখে ও শোকে সান্ত্বনা দেয়, আশঙ্কা ও ভয়ে সাহস জোগায়, উন্নতির কাজে উদ্বুদ্ধ করে, তার প্রতি ব্যবহারে কৃতজ্ঞতা জানায়, হালাল রুযী উপার্জনে উৎসাহিত করে এবং হারাম রুযী উপার্জনে বাধা দান করে, মহান আল্লাহর আনুগত্যে উদ্বুদ্ধ ও তাতে সহযোগিতা করে এবং তাঁর অবাধ্যাচরণে বাধ্য করে না এবং সম্মতিও দেয় না,---এমন স্ত্রী অবশ্যই পৃথিবীর রত্নরাজির সর্বশ্রেষ্ঠ রত্ন। বড় ভাগ্যবানেরা এমন স্ত্রীরত্ন লাভ ক'রে ধন্য হয়ে থাকেন।

দুনিয়ার শ্রেষ্ঠতম সুখের বস্তু

এ দুনিয়ায় মানুষ যা কিছু সুখসামগ্রী পায়, তা সাময়িক উপভোগ্য মাত্র। ধন-সম্পদ, স্ত্রী-সন্তান সব কিছুই সাময়িক ব্যবহারের জন্য। আসলে দুনিয়াটাই ক্ষণস্থায়ী জীবনের জন্য। চিরস্থায়ী জীবন হবে পরকালে, মরণের পর।

এ কথা মহান সৃষ্টিকর্তা বারবার বলেছেন,

{زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاء وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللّهُ عِندَهُ حُسْنُ الْمَآبِ} (١٤) آل عمران

অর্থাৎ, নারী, সন্তান-সন্ততি, জমাকৃত সোনা-রূপার ভান্ডার, পছন্দসই (চিহ্নিত) ঘোড়া, চতুষ্পদ জন্তু ও ক্ষেত-খামারের প্রতি আসক্তি মানুষের নিকট লোভনীয় করা হয়েছে। এ সব ইহজীবনের ভোগ্য বস্তু। আর আল্লাহর নিকটেই উত্তম আশ্রয়স্থল রয়েছে। *(আলে ইমরান ঃ ১৪)*

{كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَما الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلاَّ مَتَاعُ الْغُرُورِ} (١٨٥) سورة آل عمران

অর্থাৎ, জীব মাত্রই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। আর কিয়ামতের দিনই তোমাদের কর্মফল পূর্ণমাত্রায় প্রদান করা হবে। সুতরাং যাকে আগুন (দোযখ) থেকে দূরে রাখা হবে এবং (যে) বেহেশ্তে প্রবেশলাভ করবে, সেই হবে সফলকাম। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। (আলে ইমরান ঃ ১৮৫)

{أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّواْ أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُواْ رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدَّنْيَا قَلِيلٌ وَالآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَى وَلاَ تُظْلَمُونَ فَتِيلاً} (٧٧)

অর্থাৎ, তুমি কি তাদেরকে দেখনি যাদেরকে বলা হয়েছিল, 'তোমরা তোমাদের হস্ত সংবরণ কর, (যুদ্ধ বন্ধ কর,) যথাযথভাবে নামায পড় এবং যাকাত দাও।' অতঃপর যখন তাদেরকে যুদ্ধের বিধান দেওয়া হল, তখন তাদের একদল আল্লাহকে ভয় করার মত অথবা তদপেক্ষা অধিক মানুষকে ভয় করতে লাগল। আর তারা বলল, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের জন্য যুদ্ধের বিধান কেন দিলে? কেন আমাদেরকে আর কিছু কালের

অবকাশ দিলে না?' বল, 'পার্থিব ভোগ অতি সামান্য এবং যে ধর্মভীরু তার জন্য পরকালই উত্তম। আর তোমাদের প্রতি খেজুরের আঁটির ফাটলে সুতো বরাবর (সামান্য পরিমাণ)ও যুলুম করা হবে না।' (নিসা ঃ ৭৭)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ مَا لَكُمْ إِذَا قِيلَ لَكُمُ انفِرُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الأَرْضِ أَرَضِيتُم بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا مِنَ الآخِرَةِ فَمَا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ قَلِيلٌ} (٣٨) سورة التوبة

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের কী হলো যে, যখন তোমাদেরকে আল্লাহর পথে (জিহাদে) বের হতে বলা হয়, তখন তোমরা ভারাক্রান্ত হয়ে মাটিতে বসে পড়। তবে কি তোমরা পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন নিয়ে পরিতুষ্ট হয়ে গেলে? বস্তুতঃ পার্থিব জীবনের ভোগবিলাস তো পরকালের তুলনায় অতি সামান্য। (তাওবাহ ঃ ৩৮)

{اللّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاء وَيَقَدِرُ وَفَرِحُواْ بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الآخِرَةِ إِلاَّ مَتَاعٌ} (٢٦) سورة الرعد

অর্থাৎ, আল্লাহ যার জন্য ইচ্ছা করেন, তার জীবনোপকরণ বর্ধিত করেন এবং সংকুচিত করেন। কিন্তু তারা পার্থিব জীবন নিয়েই উল্লসিত; অথচ ইহজীবন তো পরজীবনের তুলনায় নগণ্য ভোগ মাত্র। (রা'দ ঃ ২৬)

{وَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَزِينَتُهَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى أَفَلَا تَعْقِلُونَ}

অর্থাৎ, তোমাদেরকে যা কিছু দেওয়া হয়েছে, তা তো পার্থিব জীবনের ভোগ ও সৌন্দর্য এবং যা আল্লাহর নিকট আছে, তা উত্তম এবং স্থায়ী । তোমরা কি অনুধাবন করবে না? (ক্বাস্বাস্ব ঃ ৬০)

{اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ} (٢٠) سورة الحديد

অর্থাৎ, তোমরা জেনে রেখো যে, পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক, জাঁকজমক, পারস্পরিক গর্ব প্রকাশ, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে প্রাচুর্য লাভের প্রতিযোগিতা ব্যতীত আর কিছুই নয়। এর উপমা বৃষ্টি; যার দ্বারা উৎপন্ন ফসল কৃষকদেরকে চমৎকৃত করে, অতঃপর তা শুকিয়ে যায়, ফলে তুমি তা পীতবর্ণ দেখতে পাও, অবশেষে তা টুকরা-টুকরা (খড়-কুটায়) পরিণত হয় এবং পরকালে রয়েছে কঠিন শাস্তি এবং আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর পার্থিব জীবন ছলনাময় ভোগ ব্যতীত কিছুই নয়। (হাদীদ ঃ ২০)

এ কথা নবী ও ঈমানদারগণও নিজ নিজ জাতিকে বুঝিয়ে গেছেন।

{يَا قَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ} (٣٩) سورة غافر

অর্থাৎ, হে আমার সম্প্রদায়! এ পার্থিব জীবন তো অস্থায়ী উপভোগের বস্তু। আর নিশ্চয় পরকাল হচ্ছে চিরস্থায়ী আবাস। (মু'মিন ঃ ৩৯)

কিন্তু দুনিয়ার সকল সুখসামগ্রীর মধ্যে সবচেয়ে বেশি সুখময় হল স্বামীর জন্য একটি

পুণ্যময়ী স্ত্রী। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّمَا الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَلَيْسَ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا شَيْءٌ أَفْضَلَ مِنْ الْمَرْأَةِ الصَّالِحَةِ).

অর্থাৎ, পৃথিবী এক উপভোগ্য সামগ্রী। আর দুনিয়ার উপভোগ্য সামগ্রীর মধ্যে পুণ্যময়ী স্ত্রী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কিছু নেই। *(নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সঃ জামে' ২০৪৯নং)*

অন্য বর্ণনায় আছে,

(الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ).

অর্থাৎ, পৃথিবী এক উপভোগ্য সামগ্রী এবং তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সামগ্রী হচ্ছে পুণ্যময়ী স্ত্রী। *(মুসলিম ৩৭১৬নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "সৌভাগ্য ও সুখের বস্তু হল তিনটি এবং দুর্ভাগ্য ও দুঃখের বস্তু হল তিনটি;

(তন্মধ্যে প্রথম হল,) সতী ও পুণ্যময়ী স্ত্রী, যাকে দেখলে (তার সুন্দর স্বভাব-চরিত্রের কারণে) তোমার মন তুষ্ট ও হর্ষোৎফুল্ল হয়। তোমার অনুপস্থিতিতে তার ব্যাপারে এবং তোমার সম্পদের বিষয়ে নিশ্চিত হতে পার।

(দ্বিতীয় হল,) তেজস্বী ও শান্ত সওয়ারী (দ্রুতগামী গাড়ি), যা তোমাকে সফরের সঙ্গীদের সাথে মিলিত করে।

আর (তৃতীয় হল,) প্রশস্ত ও বহু কক্ষবিশিষ্ট বাড়ি। এ তিনটি সৌভাগ্যের সম্পদ।

পক্ষান্তরে (দুর্ভাগ্যের প্রথম বস্তু হল,) এমন স্ত্রী; যাকে দেখলে তোমার মন তিক্ত হয়। যে তোমার উপর জিব লম্বা করে; এবং তোমার অনুপস্থিতিতে তার এবং তোমার সম্পদের বিষয়ে নিশ্চিত হতে পার না।

(দ্বিতীয় হল,) নিস্তেজ সওয়ারী (পশু বা গাড়ি) যদি তাকে চালাবার জন্য প্রহার কর, তাহলে তোমাকে কষ্ট দেয় এবং যদি উপেক্ষা কর, তাহলে সঙ্গীদের সাথে মিলিত করে না।

আর (তৃতীয় হল,) সংকীর্ণ ও অল্প কক্ষবিশিষ্ট বাড়ি। এ তিনটি দুর্ভাগ্যের আপদ।" *(সঃ জামে' ৩৫৫৬নং)*

মহানবী ﷺ বলেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী হল সে, যার দিকে তার স্বামী তাকালে তাকে খোশ ক'রে দেয়, যাকে কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং সে তার নিজের ব্যাপারে এবং স্বামীর মালের ব্যাপারে কোন অপছন্দনীয় বিরুদ্ধাচরণ করে না।" (আহমাদ, নাসাঈ)

সেই স্ত্রী, যে তার স্বামীর মনোমতো চলে। স্বামী ব্যবসায়ী হলে সৎ ব্যবসায় সহযোগিতা করে, পড়ুয়া হলে পড়াশোনায় সাহায্য করে, দ্বীনের দাঈ হলে দাওয়াতের কাজে সহযোগিতা করে, লেখক হলে লেখার কাজে সহযোগিতা করে, অন্ততপক্ষে তাকে উৎসাহ দিয়ে উৎসাহিত করে, তার প্রশংসা ক'রে তাকে অনুপ্রাণিত করে। প্রশংসা ও উৎসাহের সিঞ্চন দিয়ে তার প্রতিভার কিশলয়কে ফুলে-ফলে সুশোভিত ক'রে তোলে।

পক্ষান্তরে স্বামীর নেশা ও পেশার সাথে স্ত্রীর মনের মিল না হলে, সে স্ত্রী সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ হতে পারে না। বরং মনের গরমিল থাকলে সে হবে জীবনের সবচেয়ে ভারী বোঝা। যেহেতু যে মেয়ে নেক নয়, সে মেয়ে অনেক যন্ত্রণার। যে মেয়ে সৎশীলা ও সুশীলা নয়, সে মেয়ে

শিলামূর্তি।

প্রত্যেক লেখা ও বক্তৃতার একটা বিষয়বস্তু থাকে, স্ত্রীর জীবনের বিষয়বস্তু হল স্বামী, স্বামীই হল তার সাধনা। তা না হলে স্বামীর জীবনে সে এক বড় বেদনা, বড় যন্ত্রণা।

উল্লেখ্য যে, পুরুষের জন্য নারী উপভোগ্য নয়। বরং কেবল স্বামীর জন্য কেবল তার স্ত্রী উপভোগ্য। যেমন কেবল স্বামীও কেবল তার স্ত্রীর জন্য উপভোগ্য। নচেৎ নারী পুরুষের মা ও মেয়ে।

বলা বাহুল্য, নারী দেহকে যত্রতত্র সুলভ ক'রে যারা ঘরে-বাইরে উপভোগ করে, যারা ফ্রি-সেক্সে বিশ্বাসী, আসলে তারাই নারীকে 'ভোগ্যপণ্য' মনে করে।

আরো লক্ষণীয় যে, 'স্ত্রী' তার স্বামীর জন্য সাময়িক সর্বশ্রেষ্ঠ পার্থিব উপভোগ্য বস্তু নয়। বরং 'পুণ্যময়ী স্ত্রী' তার 'পুণ্যময়' স্বামীর জন্য সাময়িক সর্বশ্রেষ্ঠ পার্থিব উপভোগ্য বস্তু। একটা মনোমতো স্ত্রী তার স্বামীর জন্য এবং একটা মনোমতো স্বামী তার স্ত্রীর জন্য এ সংসারের সেরা উপহার। বড় সৌভাগ্যবান সে পুরুষ, যে মনোমতো একটি পুণ্যময়ী স্ত্রী পেয়ে এ দুনিয়ায় বেহেশ্তের মতো সুখী-সংসার লাভ করে। অনুরূপ বড় সৌভাগ্যবতী সে নারী, যে মনোমতো একটি পুণ্যময় স্বামী পেয়ে এ দুনিয়ায় বেহেশ্তের মতো সুখী-সংসার লাভ করে। মুবারক হোক তাদের সুখী-সংসার।

সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী

মানুষের জীবনে স্বামী-স্ত্রীর বন্ধন একটি বড় নিয়ামত। একটি ভাল স্বামী তার স্ত্রীর জন্য এবং একটি ভাল স্ত্রী তার স্বামীর জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত। স্বামী-স্ত্রীর বন্ধনে অধিকাংশ সংসার চলে টানে অথবা ঠেলায়। অনেক স্বামী আছে, যারা স্ত্রীর জন্য 'ভাল স্বামী' নয়। অনেক স্ত্রী আছে, যারা স্বামীর কাছে 'ভাল স্ত্রী' নয়। অনেক ভাল স্বামী আছে, অনেক ভাল স্ত্রীও আছে। কিন্তু সবচেয়ে ভাল স্ত্রী কে?

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(خَيْرُ نِساءٍ رَكِبْنَ الإِبِلَ صالِحُ نِساءِ قُرَيْشٍ أحْناهُ على وَلَدٍ في صِغَرِهِ وأرْعاهُ على زَوْجٍ في ذاتِ يَدِهِ).

অর্থাৎ, উট চড়েছে এমন (আরবের) মহিলা, কুরাইশের মহিলা, যে নিজ সন্তানের প্রতি তার শৈশবে সবচেয়ে বড় স্নেহময়ী এবং তার স্বামীর ধন-সম্পদে সবচেয়ে বেশি হিফাযতকারিণী। (বুখারী ৫০৮২, মুসলিম ৬৬২৩নং)

(خَيْرُ نِسائِكُمُ الوَلُودُ الوَدُودُ المُواسِيةُ المُواتِيَةُ إذا اتَّقَيْنَ اللّه).

তিনি আরো বলেন, "তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী সে, যে প্রেমময়ী, অধিক সন্তানদাত্রী, যে (স্বামীর) সহমত অবলম্বন করে, (স্বামীকে বিপদে-শোকে) সান্ত্বনা দেয় এবং আল্লাহর ভয় রাখে।" *(বাইহাক্বী)*

(خَيْرُ النِّساءِ الَّتِي تَسُرُّهُ إذَا نَظَرَ وَتُطِيعُهُ إذَا أمَرَ وَلاَ تُخالِفُهُ في نَفْسِها وَلاَ مالِها بِما يَكْرَهُ).

মহানবী ﷺ বলেন, "সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী হল সে, যার দিকে তার স্বামী তাকালে তাকে খোশ ক'রে দেয়, যাকে কোন আদেশ করলে তা পালন করে এবং সে তার নিজের ব্যাপারে এবং স্বামীর মালের ব্যাপারে কোন অপছন্দনীয় বিরুদ্ধাচরণ করে না।" *(আহমাদ, নাসাঈ, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ১৮৩৮নং)*

(خَيْرُ النِّساءِ مَنْ تُسِرُّكَ إذا أبْصَرْتَ وَتُطِيعكَ إذا أمَرْتَ وَتَحْفَظ غَيْبَتَكَ في نَفْسِها ومالِكَ).

অর্থাৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ স্ত্রী হল সে, যার দিকে তুমি তাকালে সে তোমাকে খোশ ক'রে দেয়, তাকে কোন আদেশ করলে সে তোমার আদেশ পালন করে এবং তোমার অনুপস্থিতিতে তার নিজের এবং তোমার মালের হিফাযত করে। (ত্বাবারানী, সঃ জামে' ৩২৯৯নং)

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সৌভাগ্যের স্ত্রী সেই; যাকে দেখে স্বামী মুগ্ধ হয় এবং সংসার ছেড়ে বাইরে গেলে স্ত্রী ও তার সম্পদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকে। আর দুর্ভাগার স্ত্রী হল সেই; যাকে দেখে স্বামীর মন তিক্ত হয়, যে স্বামীর উপর জিভ লম্বা করে (লানতান করে) এবং সংসার ছেড়ে বাইরে গেলে ঐ স্ত্রী ও তার সম্পদের ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না।" *(সিঃ সহীহাহ ১০৪৭নং)*

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ} (٣٤) سورة النساء

অর্থাৎ, পুণ্যময়ী নারীরা অনুগতা এবং (স্বামীর) অনুপস্থিতিতে লোক-চক্ষুর অন্তরালে (স্বামীর ধন ও নিজেদের ইজ্জত) রক্ষাকারিণী; আল্লাহর হিফাযতে (তওফীকে) তারা তা হিফাযত করে। (নিসা ঃ ৩৪)

বড় সৌভাগ্যবান সেই পুরুষ, যে এমন গুণবতী স্ত্রী পেয়ে ধন্য হয়। এমন দম্পতি পরকালের বেহেশ্তে যাওয়ার আগে ইহকালেই বেহেশ্তী সুখের সংসার লাভ ক'রে থাকে। এমন গুণবতী স্ত্রী স্বামীর অর্ধেক দ্বীনদারীতে সহযোগিতা করে। আল্লাহু আকবার!

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(مَنْ رَزَقَهُ الله امْرَأَةً صَالِحَةً فَقَدْ أَعَانَهُ عَلَى شَطْرِ دِينِهِ فَلْيَتَّقِ الله فِي الشَّطْرِ الْبَاقِي).

অর্থাৎ, আল্লাহ যাকে পুণ্যময়ী স্ত্রী দান করেছেন, তাকে তার অর্ধেক দ্বীনে সাহায্য করেছেন। সুতরাং বাকী অর্ধেকের ব্যাপারে তার আল্লাহকে ভয় করা উচিত। (ত্বাবারানীর আওসাত্ব, হাকেম, বাইহাক্বী, সঃ তারগীব ১৯১৬নং)

এমন স্ত্রী তার স্বামীর জন্য একটি বেহেশ্তী সওগাত, যে স্ত্রী মেনে ও মানিয়ে নিতে পারে। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "তোমাদের স্ত্রীরাও জান্নাতী হবে; যে স্ত্রী অধিক প্রণয়িনী, সন্তানদাত্রী, বারবার ভুল করে বারবার স্বামীর নিকট আত্মসমর্পণকারিণী, যার স্বামী রাগ করলে সে তার নিকট এসে তার হাতে হাত রেখে বলে, আপনি রাজি (ঠান্ডা) না হওয়া পর্যন্ত আমি ঘুমাবই না।" *(সিলসিলাহ সহীহাহ ২৮৭ নং)*

আন্তরিক শুভেচ্ছা ও মুবারকবাদ জানাই এমন গুণবতী স্ত্রী ও তার সৌভাগ্যবান স্বামীকে। বারাকাল্লাহু ফীকুমা।

পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নারী

এ পৃথিবীতে অগণিত মহাপুরুষের আগমন ঘটেছে। অবশ্য মহীয়সী নারীর সংখ্যা হাতে গনা কয়েকজন। মহানবী ﷺ বলেছেন, "পুরুষদের মধ্যে অনেকে কামেল (পরিপূর্ণ) হয়েছে; কিন্তু মহিলাদের মধ্যে কামেল (পরিপূর্ণ) হয়েছে কেবল মারয়্যাম বিন্তে ইমরান ও ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া।" *(বুখারী, মুসলিম)*

তিনি আরো বলেছেন,

(أَفْضَلُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ: خَدِيجَةُ بنتُ خُوَيْلِدٍ ، وَفَاطِمَةُ بنتُ مُحَمَّدٍ ، وَمَرْيَمُ بنتُ عِمْرَانَ ، وَآسِيَةُ بنتُ مُزَاحِمٍ امْرَأَةُ فِرْعَوْنَ).

অর্থাৎ, জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ মহিলা হল ঃ খাদীজা বিন্তে খুওয়াইলিদ, ফাতিমা বিন্তে মুহাম্মাদ, মারয়্যাম বিন্তে ইমরান ও ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া বিন্তে মুযাহিম। (আহমাদ, ত্বাবারানী, হাকেম, সঃ জামে' ১১৩৫নং)

(خَيْرُ نِساءِ العالَمِينَ أَرْبَعٌ مَرْيَمُ بِنْتُ عِمْرانَ وَخَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ وفاطِمَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وآسِيَةُ امْرَأةُ فِرْعَوْنَ).

অর্থাৎ, পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নারী হল চারজন ঃ মারয়্যাম বিন্তে ইমরান, খাদীজা বিন্তে খুওয়াইলিদ, ফাতিমা বিন্তে মুহাম্মাদ ও ফিরআউনের স্ত্রী আসিয়া। (আহমাদ, ত্বাবারানী, সঃ জামে' ৩৩২৮নং)

বলা বাহুল্য, পৃথিবীর ইতিহাসে সর্বশ্রেষ্ঠ নারী হলেন ঃ-

১। আসিয়া বিন্তে মুযাহিম

ইনি মিসরের জাঁদরেল বাদশা ফিরআউনের স্ত্রী ছিলেন। দুর্ধর্ষ কাফের রাজার স্ত্রী হয়েও মু'মিনা হয়েছিলেন এবং তার ফলে তাঁকে স্বামীর নানা অত্যাচার সহ্য করতে হয়েছিল। মহান আল্লাহ তাঁর কথা কুরআন কারীমে উল্লেখ ক'রে বলেছেন,

{وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِّلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَةَ فِرْعَوْنَ إِذْ قَالَتْ رَبِّ ابْنِ لِي عِندَكَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ} (١١) سورة التحريم

অর্থাৎ, আল্লাহ বিশ্বাসীদের জন্য উপস্থিত করেছেন ফিরআউন পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে (প্রার্থনা ক'রে) বলেছিল, 'হে আমার প্রতিপালক! তোমার নিকট জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ কর এবং আমাকে উদ্ধার কর ফিরআউন ও তার দুষ্কর্ম হতে এবং আমাকে উদ্ধার কর যালেম সম্প্রদায় হতে।' (তাহরীম ঃ ১১)

২। মারয়্যাম বিন্তে ইমরান।

ইনি ঈসা নবী ﷺ-এর মা ছিলেন। বিনা পিতায় মহান আল্লাহ তাঁর গর্ভে রূহ প্রক্ষিপ্ত করলে ঈসা নবীর জন্ম হয়। অনেকে তাঁর চরিত্রে সন্দেহ করলেও মহান আল্লাহ তাঁকে পৃথিবীর সকল মহিলার উপর প্রাধান্য দিয়ে মু'জিযাস্বরূপ অবিবাহিত কুমারী অবস্থায়

সন্তানের জননী বানান। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وَكُتُبِهِ وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ} (١٢) سورة التحريم

অর্থাৎ, (তিনি আরো দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন) ইমরান তনয়া মারয়্যাম, যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল, ফলে আমি তার মধ্যে আমার রূহ হতে ফুঁকে দিয়েছিলাম। সে তার প্রতিপালকের বাণী ও তাঁর কিতাবসমূহ সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল; আর সে ছিল অনুগতদের একজন। (তাহরীম ঃ ১২)

{وَإِذْ قَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاء الْعَالَمِينَ} (٤٢)

অর্থাৎ, (স্মরণ কর) যখন ফিরিশ্তাগণ বলেছিল, 'হে মারয়্যাম! আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে মনোনীত ও পবিত্র করেছেন এবং বিশ্বের নারীদের মধ্যে তোমাকে নির্বাচিত করেছেন। (আলে ইমরান ঃ ৪২)

{مَّا الْمَسِيحُ ابْنُ مَرْيَمَ إِلاَّ رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَأُمُّهُ صِدِّيقَةٌ} (٧٥) سورة المائدة

অর্থাৎ, মারয়্যাম-তনয় মসীহ তো একজন রসূল মাত্র। তার পূর্বে বহু রসূল গত হয়েছে এবং তার মাতা সত্যনিষ্ঠ ছিল। (মায়িদাহ ঃ ৭৫)

{وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ وَمَعِينٍ } (٥٠) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, এবং আমি মারয়্যাম তনয় (ঈসা) ও তার জননীকে করেছিলাম এক নিদর্শন, তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছিলাম এক নিরাপদ ও প্রস্রবণ বিশিষ্ট উচ্চ ভূমিতে। (মু'মিনূন ঃ ৫০)

যার ফলে খ্রিস্টানরা ভুল বুঝে তাঁদের ব্যাপারে অতিরঞ্জন ও বাড়াবাড়ি করে এবং নবীকে 'আল্লাহর বেটা' বলতে বলতে তাঁকেই স্বয়ং আল্লাহ বলতে শুরু করে। সেই ভুলে থেকেই আজও তারা তাঁদের পূজা করে।

৩। খাদীজা বিন্তে খুওয়াইলিদ

ইনি আমাদের শেষ নবী ﷺ-এর প্রথম স্ত্রী। তিনি ছিলেন প্রথম মুসলিম। তিনিই সর্বপ্রথম তাঁর প্রতি ঈমান আনেন। তিনিই স্বামীকে সান্ত্বনা ও সাহস দিয়ে ইসলামে প্রথম সহযোগিতা করেন। তিনি বেঁচে থাকা অবধি মহানবী ﷺ দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করেননি।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(أتانِي جِبْرِيلُ فقال يا رَسُولَ الله هذِهِ خَدِيجَةُ قَد أَتَتْكَ مَعَهَا إناءٌ فيه إِدامٌ أَوْ طَعامٌ أَوْ شَرابٌ فإذا هِيَ أَتَتْكَ فاقْرَأ عليها السَّلامَ مِنْ رَبِّها ومِنِّي وَبَشِّرْها بِبَيْتٍ في الجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ لا صَخَبَ فيها ولا نَصَبَ).

অর্থাৎ, আমার নিকট জিবরীল এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! এই যে খাদীজা আপনার নিকট আসছে, তার সাথে আছে ব্যঞ্জন বা খাদ্য বা পানীয়। সুতরাং সে এলে আপনি তাকে তার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে এবং আমার পক্ষ থেকে সালাম জানান। আর তাকে জান্নাতে (তার জন্য) ফাঁপা মুক্তা নির্মিত একটি অট্টালিকার সুসংবাদ দান করুন;

যেখানে কোন হট্টগোল ও ক্লান্তি থাকবে না। *(আহমাদ ৭১৫৬, মুসলিম ৬৪২৬নং)*

৪। ফাতিমা বিন্তে মুহাম্মাদ

ইনি আমাদের শেষ নবী ﷺ-এর অন্যতম কন্যা। তাঁর মা খাদীজা। স্বামী চতুর্থ খলীফা আলী বিন আবী তালেব ؓ। ছেলে হাসান-হুসাইন।

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, একদা নবী ﷺ-এর স্ত্রীরা সকলেই তাঁর কাছে ছিল। ইত্যবসরে ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) হেঁটে (আমাদের নিকট) এল। তার চলন এবং আল্লাহর রসূল ﷺ-এর চলনের মধ্যে কোন পার্থক্য ছিল না। অতঃপর নবী ﷺ তাকে দেখে স্বাগত জানালেন এবং বললেন, 'আমার কন্যার শুভাগমন হোক।' অতঃপর তিনি তাকে নিজের ডান অথবা বাম পাশে বসালেন। তারপর তিনি তাকে কানে কানে গোপনে কিছু বললেন। ফাতিমা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) জোরেশোরে কাঁদতে আরম্ভ করল। সুতরাং তিনি তার অস্থিরতা দেখে পুনর্বার তাকে কানে কানে কিছু বললেন। ফলে (এবার) সে হাসতে লাগল। (আয়েশা বলেন,) অতঃপর আমি ফাতিমাকে বললাম, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর স্ত্রীদের মাঝে (তাদেরকে বাদ দিয়ে) তোমাকে গোপনে কিছু বলার জন্য বেছে নেওয়া সত্ত্বেও তুমি কাঁদছ?' তারপর রাসূলুল্লাহ ﷺ যখন উঠে গেলেন, তখন আমি তাকে বললাম, 'রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কী বললেন?' সে বলল, 'আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর গোপন কথা প্রকাশ করব না।' অতঃপর রাসূলুল্লাহ ﷺ ইন্তেকাল করলে আমি ফাতিমাকে বললাম, 'তোমার প্রতি আমার অধিকার রয়েছে। তাই আমি তোমাকে কসম দিয়ে বলছি যে, তুমি আমাকে বল, রাসূলুল্লাহ ﷺ তোমাকে কী বলেছিলেন?' সে বলল, 'এখন বলতে কোন অসুবিধা নেই।' আল্লাহর রসূল ﷺ প্রথমবারে কানাকানি করার সময় আমাকে সংবাদ দিয়েছিলেন যে, "জিব্রাঈল ؑ প্রত্যেক বছর একবার (অথবা দু'বার) ক'রে কুরআন শোনান। কিন্তু এখন তিনি দু'বার শুনালেন। সুতরাং আমি বুঝতে পারছি যে, আমার মৃত্যু সন্নিকটে। সুতরাং তুমি (হে ফাতিমা!) আল্লাহকে ভয় করো এবং ধৈর্য ধারণ করো। কেননা, আমি তোমার জন্য উত্তম অগ্রগামী।" সুতরাং আমি (এ কথা শুনে) কেঁদে ফেললাম, যা তুমি দেখলে। অতঃপর তিনি আমার অস্থিরতা দেখে দ্বিতীয়বার কানে কানে বললেন, "হে ফাতিমা! তুমি কি এটা পছন্দ কর না যে, মু'মিন নারীদের তুমি সর্দার হবে অথবা এই উম্মতের নারীদের সর্দার হবে?" সুতরাং (এমন সুসংবাদ শুনে) আমি হাসলাম, যা তুমি দেখলে।' *(বুখারী, শব্দাবলী মুসলিমের)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أتانِي مَلَكٌ فَسَلَّمَ عَلَيَّ نَزَلَ مِنَ السَّماءِ لم يَنْزِلْ قَبْلَهَا فَبَشَّرَنِي أنَّ الحَسَنَ والحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ وأنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِساءِ أَهْلِ الجَنَّةِ).

অর্থাৎ, আমার নিকট এক ফিরিশ্তা আসমান থেকে অবতরণ ক'রে আমাকে সালাম দিয়েছেন, যিনি ইতিপূর্বে কোনদিন অবতরণ করেননি। তিনি আমাকে সুসংবাদ দিয়েছেন যে, হাসান ও হুসাইন জান্নাতী যুবকদের সর্দার এবং ফাতিমা জান্নাতী মহিলাদের সর্দার।

(ইবনে আসাকির, সঃ জামে' ৭৯নং)

৫। আয়েশা বিন্তে আবূ বাক্‌র

ইনি রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রিয়তমা স্ত্রী। তাঁর পিতা প্রথম খলীফা আবূ বাক্‌র সিদ্দীক। তাঁর সতীত্ব প্রমাণে আল-কুরআনের (সূরা নূরের) দশটি আয়াত অবতীর্ণ হয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إنَّ فَضْلَ عَائِشَةَ عَلَى النِّسَاءِ كَفَضْلِ الثَّرِيدِ عَلَى سَائِرِ الطَّعَامِ).

"সমস্ত মহিলাদের মধ্যে আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহার)র মর্যাদা ঐরূপ, যেমন সমস্ত খাদ্যের মধ্যে 'সারীদ' (গোশ্ত মিশ্রিত রুটির পলান্ন) সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যের দাবী রাখে।" (বুখারী, মুসলিম ৬৪২৫নং)

সবচেয়ে বেশি খারাপ মেয়ে

মেয়েদের মধ্যে অনেক সুন্দরী মেয়ে পাওয়া যায়, কিন্তু ভালো মেয়ে খুঁজে পাওয়া বড় মুশকিল। কিন্তু কোন্ শ্রেণীর মেয়েরা বেশি খারাপ? মহানবী ﷺ বলেন,

(وَشَرُّ نِسائِكُمْ المُتَبرِّجـاتُ المُتَخَـيِّلاَتُ وَهُـنَّ المُنَافِقـاتُ لا يَـدْخُلُ الجنَّـةَ مِـنْهُنَّ إلا مِثْـلُ الغُـرابِ الأَعْصَمِ).

"তোমাদের সবচেয়ে খারাপ মেয়ে তারা, যারা বেপর্দা, অহংকারী, তারা কপট নারী, তাদের মধ্যে লাল রঙের ঠোঁট ও পা-বিশিষ্ট কাকের মত (বিরল) সংখ্যক বেহেশ্তে যাবে।" *(বাইহাক্বী, সিঃ সহীহাহ ১৮৪৯নং)*

প্রিয় নবী ﷺ বলেন, "তিন ব্যক্তি সম্পর্কে কোন প্রশ্নই করো না; যে জামাআত ত্যাগ ক'রে ইমামের অবাধ্য হয়ে মারা যায়, যে ক্রীতদাস বা দাসী প্রভু থেকে পলায়ন ক'রে মারা যায়, এবং সেই নারী যার স্বামী অনুপস্থিত থাকলে---তার সাংসারিক সমস্ত প্রয়োজনীয় জিনিস বন্দোবস্ত করে দেওয়া সত্ত্বেও---তার অনুপস্থিতিতে বেপর্দায় বাইরে যায়।" *(সিঃ সহীহাহ ৫৪২নং)*

জেনে রাখা দরকার যে, পর্দা মানেই শুধু দেহের পর্দাই নয়। বরং মনের পর্দাও থাকতে হবে তার সাথে। নচেৎ ঘোমটার ভিতরেও খেমটার নাচ নাচে অনেক পর্দানশীন মেয়ে। বোরকার ভিতরেও ছলা-কলার চরকায় প্রেমের সুতো কাটে অনেক পর্দাবিবি। তাদের অধিকাংশই মুনাফিক ও কপট মেয়ে। যাদের হাতির দাঁতের মতো দুটো রূপ থাকে, একটা ভিতরে, অন্যটা লোক-দেখানির জন্য বাইরে। যারা অনেক লোকের কাছে বদনামের ভয়ে অথবা সুনামের লোভে বোরকা তো পরে, কিন্তু আসল পর্দা তারা করে না। তারা লোককে ফাঁকি দেয়, কিন্তু আল্লাহকে ফাঁকি দিতে পারে না।

মুসলিম নারী হয়েও প্রয়োজনে-অপ্রয়োজনে বেপর্দা হয়ে বাইরে যায়, হাটে যায়, বাজারে যায়, মেলায় যায়, খেলায় যায়। তারা 'অবরোধ-প্রথা' (?)তে বিশ্বাসিনী নয়। তারা হল আধুনিক যুগের আধুনিকা, প্রসাধিকা ও স্বাধীনা রমণী। যদিও তাদের প্রতিপালক তাদেরকে

বলেন,

{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} (٣٣) سورة الأحزاب

অর্থাৎ, তোমরা স্বগৃহে অবস্থান কর এবং (প্রাক্-ইসলামী) জাহেলী যুগের মতো নিজেদেরকে প্রদর্শন ক'রে বেড়িয়ো না। (আহ্যাব ঃ ৩৩)

স্ত্রী হিসাবে সেই মহিলা বড় খারাপ, এমন স্ত্রীর স্বামীর বড় দুর্ভাগ্য, যাকে দেখে স্বামীর পিত্তি জ্বলে যায়, স্বামীর মুখের উপর যে মুখ চালায়, স্বামী-সংসারের অর্থ-সম্পদে নয়ছয় করে এবং স্বামীর অধিকারেও অন্য পুরুষকে অংশী করে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "সৌভাগ্যের স্ত্রী সেই; যাকে দেখে স্বামী মুগ্ধ হয় এবং সংসার ছেড়ে বাইরে গেলে স্ত্রী ও তার সম্পদের ব্যাপারে নিশ্চিন্ত থাকে। আর দুর্ভাগার স্ত্রী হল সেই; যাকে দেখে স্বামীর মন তিক্ত হয়, যে স্বামীর উপর জিভ লম্বা করে (লানতান করে) এবং সংসার ছেড়ে বাইরে গেলে ঐ স্ত্রী ও তার সম্পদের ব্যাপারে সে নিশ্চিন্ত হতে পারে না।" *(সিঃ সহীহাহ ১০৪৭নং)*

যে স্ত্রী নিজেরটা ভাল বুঝে, স্বামীরটা বুঝে না, যে স্ত্রী বয়স হওয়ার আগেই স্বামীকে বৃদ্ধ বানিয়ে ছাড়ে। এমন স্ত্রী থেকে বিয়ের আগে পানাহ চাক অবিবাহিত তরুণ ভাইয়েরা,

اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ جَارِ السُّوءِ، وَمِنْ زَوجٍ تُشَيِّبُنِي قَبلَ الْمَشِيبِ، وَمِنْ وَلَدٍ يكُونُ عَلَيَّ رَبّاً، وَمِنْ مَالٍ يَكُونُ عَلَيَّ عَذَاباً، وَمِنْ خَلِيلٍ مَاكِرٍ عَينُهُ تَرَانِي ، وَقَلبُهُ يَرْعَانِيْ؛ إِنْ رَأَى حَسَنَةً دَفنَهَا، وَإِنْ رَأَى سَيِّئَةً أَذَاعَهَا.

অর্থাৎ, হে আল্লাহ! নিশ্চয় আমি তোমার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করছি মন্দ প্রতিবেশী থেকে, এমন স্ত্রী থেকে, যে বৃদ্ধ হওয়ার আগেই আমাকে বৃদ্ধ বানাবে, এমন সন্তান থেকে, যে আমার প্রভু হতে চাইবে, এমন মাল থেকে, যা আমার জন্য আযাব হবে, এবং এমন ধূর্ত বন্ধু থেকে, যার চোখ আমাকে দেখে এবং তার হৃদয় আমার প্রতি লক্ষ্য রাখে, অতঃপর ভাল কিছু দেখলে তা পুঁতে ফেলে এবং খারাপ কিছু দেখলে তা প্রচার করে। *(ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ৩১৩৭নং)*

সবচেয়ে বেশি বর্কতময় বিবাহ

কথায় আছে, 'বিয়ে বলে জুড়ে দেখ, আর ঘর বলে তুড়ে দেখ।' বিয়েতে খরচ অনেক। বিশেষ ক'রে আমাদের পণ ও যৌতুক লেনা-দেনার পরিবেশে খরচ অনেক বেশি।

এর বিপরীত যে দেশে কনের মোহর অনেক বেশি, সে দেশেও বিয়ের খরচ অনেক।

সে দেশে কেবল বাসর রাত্রে পরার জন্য কনের যে বিবাহ-বস্ত্র (গাউন) তৈরি করা হয়, তার দাম আমাদের টাকায় প্রায় কুড়ি-পঁচিশ হাজার টাকা।

আমাদের দেশে জামাই বা বউ দেখার খরচ।

বিবাহ-তারীখ নির্ধারণের খরচ।

লগন ও লগন-যাত্রীর খরচ।

বিয়ে-বাড়ি ভাড়া বা প্যান্ডেল ভাড়ার খরচ।

অপ্রয়োজনীয় সংখ্যক বরযাত্রী ও ডোলার-বিবির আপ্যায়ন খরচ।

অবৈধ গান-বাজনা, ভিডিও ও লাইটিং খরচ।

কনে-যাত্রীর অযথা খরচ।

আরো কত অতিরিক্ত খরচ আমাদের দেশের একটি বিবাহে। যার অধিকাংশই অপচয় ও অবৈধ খরচ।

কিন্তু খরচ যত কম হবে, বিবাহে বর্কত তত বেশি হবে। এ কথা বলেছেন মহানবী ﷺ,

(خَيْرُ النِّكَاحِ أَيْسَرُهُ).

অর্থাৎ, সর্বশ্রেষ্ঠ বিবাহ, যার খরচ সবচেয়ে কম। *(আবূ দাউদ ১৮৪২, সিঃ সহীহাহ ১৮৪২নং)*

যে মহিলার মোহর কম, সে মহিলার মাঝে বর্কত বেশি। আর সবচেয়ে কম মোহর হল, সর্বশ্রেষ্ঠ মোহর। *(হাকেম, ইবনে মাজাহ, সঃ জামে' ৩২৭৯নং)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ مِنْ يُمْنِ الْمَرْأَةِ تَيْسِيرَ خِطْبَتِهَا وَتَيْسِيرَ صَدَاقِهَا وَتَيْسِيرَ رَحِمِهَا).

অর্থাৎ, নারীর অন্যতম বর্কত এই যে, তার পয়গাম সহজ হবে, তার মোহর স্বল্প হবে এবং তার গর্ভাশয় সন্তানময় হবে। (আহমাদ, হাকেম, বাইহাক্বী, সঃ জামে' ২২৩৫নং)

কিন্তু বড় দুঃখের বিষয় যে, কর্তব্য পালনের চাইতে সুনাম নেওয়া এবং অন্য বিবাহের সাথে পাল্লা দেওয়ার ফলে খরচের মাত্রা বেড়ে চলেছে। বেড়ে চলেছে প্রদেয় মোহর আদায় ফাঁকি দিয়ে পণ বা যৌতুক নেওয়ার প্রবণতা ও রেষারেষি। মোহর পরিণত হয়েছে দেনমোহরে! আর সেই জন্যই অধিকাংশ দম্পতির সংসার তাসের ঘর। অধিকাংশ সংসার চলে টানে, না হয় ঠেলায়। ভালোবাসাকে ভিত্তি ক'রে বর্কতময় সংসার কোটির মধ্যে গুটি।

সর্বশ্রেষ্ঠ সুবাস

বাজারে নানান ধরনের প্রসাধন ও পারফিউম পাওয়া যায়। নারী-পুরুষের পৃথক-পৃথক পারফিউমও সুলভ বাজারে। কিন্তু শরীয়তে প্রসাধন ও পারফিউমের ব্যাপারে একটা বিধান আছে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ خَيْرَ طِيبِ الرَّجُلِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ وَخَيْرَ طِيبِ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ).

অর্থাৎ, পুরুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সুগন্ধি হল তাই, যার সুবাস ছড়িয়ে পড়ে এবং তা রঙহীন হয়। আর মহিলাদের সর্বশ্রেষ্ঠ সুগন্ধি তাই, যার সুবাস গুপ্ত থাকে এবং তা রঙিন হয়। *(তিরমিযী ২৭৮৭, নাসাঈ ৫১১৭নং)*

আসলে প্রসাধনে পুরুষ কোন রঙ ব্যবহার করতে পারে না। মেহেন্দিও নয়, বিয়ের সময়েও নয়। অবশ্য যে কোন ধরনের বৈধ সেন্ট, পারফিউম, আতর, সুবাস, সুগন্ধি বা খোশবু ব্যবহার করতে পারে।

পক্ষান্তরে মহিলার প্রসাধন রঙিন হবে, কিন্তু তার সুগন্ধ ছুটবে না। যেহেতু মানুষের প্রকৃতিতে এমনিই নারী বড় আকর্ষণীয়। তার উপরে যদি তার নিকট থেকে সুবাস বিতরিত

হয়, তাহলে তার প্রতি পুরুষের আকর্ষণ অধিকরূপে বৃদ্ধি পায়, আর তাতে ফিতনার আশঙ্কা থাকে।

এই জন্য আরো নির্দেশ এসেছে, আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর বান্দীদেরকে মসজিদে আসতে বারণ করো না, তবে তারা যেন খোশবূ ব্যবহার না ক'রে সাদাসিধাভাবে আসে।" *(আহমাদ, আবূ দাঊদ, সহীহুল জামে' ৭৪৫৭নং)*

তিনি আরো বলেছেন, "প্রত্যেক চক্ষুই ব্যভিচারী। আর মহিলা যদি (কোন প্রকার) সুগন্ধ ব্যবহার করে কোন (পুরুষদের) মজলিসের পাশ দিয়ে অতিক্রম করে, তাহলে সে ব্যভিচারিণী (বেশ্যা মেয়ে)।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে হিব্বান, ইবনে খুযাইমাহ, হাকেম, সহীহুল জামে' ৪৫৪০নং)*

অবশ্য সে যখন স্বামীর কাছে একাকিনী থাকে, তখন যে কোন ধরনের খোশবূ বা সেন্ট ব্যবহার করতে পারে; রঙিন অথবা রঙহীন, তার সুবাস গুপ্ত অথবা প্রকাশিত।

সর্বশ্রেষ্ঠ খেলা

সুখ-বিলাসীদের ক্রীড়াজগৎ একটা বিশাল গুরুত্বপূর্ণ জগৎ। খেলার জন্য বিশেষ নগরী, বিশেষ মন্ত্রিত্ব, বিশেষ প্রচার-মাধ্যম ইত্যাদি আধুনিক জগতের সভ্যতার আওতাভুক্ত।

কিন্তু ইসলামে সব খেলা বৈধ নয়। বরং অধিকাংশ খেলাই ইসলামে অবৈধ। অবসর-বিনোদন বলে মুসলিমের কিছু নেই। যেহেতু সে হয় দুনিয়ার কোন কাজে থাকে অথবা দ্বীনের কাজে। খেলা খেলবার সময় কোথায় তার?

অবৈধ খেলার ঘোরে কালাতিপাত মুসলিম করতে পারে না। যেহেতু মহানবী ﷺ বলেন, "আমার উম্মতের মধ্যে কিছু সম্প্রদায় এমন হবে, যারা পান-ভোজন ও খেল-তামাশার মাধ্যমে রাত্রিযাপন করবে। অতঃপর সকাল হলে তারা বানর ও শূকরদলে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।" *(ত্বাবারানী, সহীহুল জামে' ৫৩৫৪ নং)*

নবী ﷺ বলেন, "যে ব্যক্তি পাশা-জাতীয় খেলা খেলল, সে যেন নিজ হাতকে শুয়োরের রক্তে রঞ্জিত করল।" *(আহমাদ, মুসলিম ২২৬০, আবূ দাউদ ৪৯৩৯, ইবনে মাজাহ ৩৭৬৩ নং)*

তিনি আরো বলেন, "যে ব্যক্তি পাশা-জাতীয় খেলা খেলল, সে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নাফরমানী করল।" *(মালেক, আবূ দাউদ ৪৯৩৮, ইবনে মাজাহ ৩৭৭৬২, হাকেম ১/৫০, সহীহুল জামে' ৬৫২৯ নং)*

কিছু বৈধ খেলা অবশ্যই আছে। তার মধ্যে যে খেলায় জিহাদী, শারীরিক বা দাম্পত্য সুখের উপকার আছে, সে খেলা বৈধ। মহানবী ﷺ বলেন, "প্রত্যেক সেই কর্ম (খেলা) যা আল্লাহর স্মরণের পর্যায়ভুক্ত নয়, তা অসার ভ্রান্তি ও বাতিল। অবশ্য চারটি কর্ম এরূপ নয়; হাতের নিশানা ঠিক করার উদ্দেশ্যে তীর খেলা, ঘোড়াকে প্রশিক্ষণ দেওয়া, নিজ স্ত্রীর সাথে প্রেমকেলি করা এবং সাঁতার শিক্ষা করা।" *(নাসাঈ, ত্বাবারানীর কাবীর, সিলসিলাহ সহীহাহ ৩১৫নং)*

আর এর মধ্যে একটি শ্রেষ্ঠ খেলা হল তীর নিক্ষেপ। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(عَلَيْكُمْ بِالرَّمْيِ فَإِنَّهُ خَيْرٌ أَوْ مِنْ خَيْرِ لَهْوِكُمْ).

অর্থাৎ, তোমরা নিক্ষেপ-খেলা করতে থাকো। যেহেতু তা তোমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ খেলা। অথবা তা সর্বশ্রেষ্ঠ খেলাসমূহের অন্যতম। *(বাযযার, ত্বাবারানীর আওসাত্ব, সঃ তারগীব ১২৮১নং)*

নিক্ষেপ-খেলার গুরুত্ব বর্ণনা ক'রে আল্লাহর রসূল ﷺ একদা মিম্বরের উপর খুৎবা দেওয়ার সময় এ কথা বলেছেন, (মহান আল্লাহ বলেছেন,)

{وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ}

অর্থাৎ, তোমরা শত্রুদের বিরুদ্ধে যথাসাধ্য শক্তি সঞ্চয় কর। (সূরা আনফাল ৬০) "জেনে রাখ, ক্ষেপণই হল শক্তি। জেনে রাখ, ক্ষেপণই হল শক্তি। জেনে রাখ, ক্ষেপণই হল শক্তি।" (মুসলিম)

তীর-নিক্ষেপের গুরুত্ব আরোপ ক'রে তিনি আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তিকে তীরন্দাজির বিদ্যা শিক্ষা দেওয়া হল, তারপর সে তা পরিত্যাগ করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয় অথবা সে অবাধ্যতা করল।" (মুসলিম)

তার সওয়াব বর্ণনা ক'রে তিনি বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর রাস্তায় একটি তীর নিক্ষেপ করে, তার জন্য একটি গোলাম আযাদ করার সমান নেকী হয়।" *(আবূ দাঊদ)*

এই জাতীয় খেলা দেখাও বৈধ। মা-আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, হাবশীরা বর্শা-বল্লম নিয়ে মসজিদে খেলা করছিল। রাসূলুল্লাহ ﷺ তখন জিজ্ঞাসা করলেন যে, 'হে হুমাইরা! তুমি কি চাও তাদের খেলা দেখতে?' বললাম, 'হ্যাঁ।' তখন তিনি ﷺ দরজায় দাঁড়িয়ে গেলেন। আমি আমার থুত্নিকে তাঁর কাঁধের উপর রাখলাম এবং আমার চেহারাকে তাঁর গালের সাথে লাগিয়ে দাঁড়িয়ে গেলাম। (বেশ কিছুক্ষণ দেখার পর) তিনি ﷺ বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে, চল এবারে।' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াতাড়ি করবেন না।' তাই তিনি আমার জন্য আবারও দাঁড়িয়ে গেলেন। অতঃপর আবার বললেন, 'যথেষ্ট হয়েছে, চল এবারে।' আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রাসূল! তাড়াতাড়ি করবেন না।' আমার যে তাদের খেলা দেখার খুব শখ ছিল তা নয়, বরং আমি কেবল মহিলাদেরকে এ কথাটা জানিয়ে দিতে চাইছিলাম যে, আমার কাছে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর মর্যাদা কতটা ছিল এবং তাঁর কাছে আমার কদর কতটা ছিল। (নাসায়ী, হাদীসের মূলাংশ বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে। আল্লামা আলবানী তাঁর 'আ-দাবুয যিফাফ' নামক কিতাবে এই হাদীসকে সহীহ বলেছেন।)

সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যক্ত-সম্পদ

মানুষ সারা জীবন উপার্জন ক'রে মরণের সময় অনেক কিছু রেখে যায়। সে সব কিছু তখন তার মীরাস বা ত্যক্ত-সম্পদ রূপে পরিগণিত হয় এবং ওয়ারেসগণ ভাগ-বন্টন ক'রে নেয়। এতদিন যা জমা ক'রে রেখেছিল, তা এখন তার নয়। তা এখন উত্তরাধিকারীদের। আর আগামী কালের জন্য যা জমা করেছে, কেবল তাই হল তার। যা সে আল্লাহর পথে ব্যয় করেছে এবং সঠিক অর্থে পরকালের জন্য জমা রেখেছে।

কিন্তু বিদায় কালে মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ ত্যক্ত-সম্পদ কী?

মহানবী ﷺ এর উত্তরে বলেছেন,

(خَيْرُ ما يُخَلِّفُ الإِنْسانُ بَعْدَهُ ثَلاثٌ: وَلَدٌ صالِحٌ يَدْعُو لَهُ، وَصَدَقَةٌ تَجْرِي يَبْلُغُهُ أَجْرُها، وَعِلْمٌ يُنْتَفَعُ بِهِ مِنْ بَعْدِهِ).

অর্থাৎ, মানুষ মরণের পর যে সকল জিনিস ছেড়ে যায়, তার মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ হল তিনটি ঃ নেক সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে। সাদকায়ে জারিয়াহ, যার সওয়াব তার নিকট পৌঁছতে থাকে। আর এমন ইল্‌ম, যার দ্বারা তার গত হওয়ার পরেও উপকৃত হওয়া যায়। (ইবনে মাজাহ ২৪১, ইবনে হিব্বান ৮৪, ত্বাবারানী, সঃ জামে' ৩৩২৬নং)

প্রিয় নবী ﷺ আরো বলেন, "মানুষ মারা গেলে তিনটি জিনিস ছাড়া তার আমল বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়; সদকাহ জারিয়াহ, ফলপ্রসূ ইল্‌ম (শিক্ষা) এবং নেক সন্তান; যে তার জন্য দুআ করে।" *(মুসলিম ১৬৩১, আবূ দাউদ ২৮৮০, নাসাঈ ৩৬৫৩নং প্রমুখ)*

তিনি আরো বলেন, "মরণের পরেও মু'মিনের যে আমল ও নেকী তার সাথে মিলিত হয় তা হল; এমন ইল্‌ম যা সে শিক্ষা করেছে এবং প্রচার করেছে, তার ছেড়ে যাওয়া নেক সন্তান ও মুসহাফ (কুরআন শরীফ), তার নির্মিত মসজিদ ও মুসাফির খানা, তার খননকৃত নালা বা ক্যানেল এবং তার মালের সদকাহ, যা সে তার সুস্থ ও জীবিত থাকা অবস্থায় দান ক'রে গেছে।" *(ইবনে মাজাহ ২৪২নং)*

পরপাড়ের যাত্রীদেরকে এ সম্পদসমূহ অবশ্যই সংগ্রহ ক'রে রাখা দরকার। যাতে মরণের পরে, তার দ্বারা উপকৃত হতে পারে।

ফিতনার সময় সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে?

বিশেষ অর্থে ফিতনা মুসলিমদের আপোসের সেই দ্বন্দ্ব বা কলহ-বিবাদ ও যুদ্ধবিগ্রহকে বলে, যা নিছক পার্থিব কোন স্বার্থকে কেন্দ্র ক'রে ঘটে থাকে; যাতে কোন্ পক্ষ ন্যায় ও সত্যের অনুসারী, তা সঠিকভাবে বুঝা যায় না।

আব্দুল্লাহ ইবনে আম্র ؓ বলেন আমরা আল্লাহর রসূলের সাথে এক সফরে ছিলাম। অতঃপর (বিশ্রামের জন্য) এক স্থানে অবতরণ করলাম। তারপর আমাদের কিছু লোক তাঁবু ঠিক করছিল এবং কতক লোক তীরন্দাজিতে প্রতিযোগিতা করছিল ও কতক লোক জন্তুদের ব্যবস্থাপনায় ব্যস্ত ছিল। হঠাৎ আল্লাহর রসূল ﷺ-এর ঘোষণাকারী ঘোষণা করল যে, "নামাযের জন্য জমায়েত হও।" সুতরাং আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট একত্রিত হলাম। তারপর তিনি বললেন, "আমার পূর্বে প্রত্যেক নবীর জন্য জরুরী ছিল, তাঁর উম্মতকে এমন কর্মসমূহের নির্দেশ দেওয়া, যা তিনি তাদের জন্য ভালো মনে করেন এবং এমন কর্মসমূহ থেকে ভীতি-প্রদর্শন করা, যা তিনি তাদের জন্য মন্দ মনে করেন। আর তোমাদের এই উম্মত এমন, যাদের প্রথমাংশে নিরাপত্তা রাখা হয়েছে এবং তাদের শেষাংশে রয়েছে পরীক্ষা (ফিতনা-ফাসাদ) এবং এমন ব্যাপার সকল, যা তোমরা পছন্দ করবে না। এমন ফিতনা প্রকাশ পাবে যে, একটি অন্যটিকে হাল্কা ক'রে দেবে (অর্থাৎ পরের ফিতনাটি আগের ফিতনা অপেক্ষা গুরুতর হবে)। ফিতনা এসে গেলে মু'মিন ব্যক্তি

বলবে, এটাই আমার ধ্বংসের কারণ হবে। অতঃপর তা দূরীভূত হবে। পুনরায় অন্য ফিতনা প্রকাশ পাবে, তখন মু'মিন বলবে, 'এটাই এটাই (আমার সবচেয়ে বড় ফিতনা)।' অতএব যে ব্যক্তি জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে থাকতে এবং জান্নাতে প্রবেশ করতে ভালবাসে, তার নিকট যেন এই অবস্থায় মৃত্যু আসুক যে, সে আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস রাখে এবং লোকদের সাথে সেই ব্যবহার প্রদর্শন করে, যা সে নিজের সাথে প্রদর্শন পছন্দ করে। আর যে ব্যক্তি রাষ্ট্রনেতার সাথে বায়আত করে, সে নিজের হাত এবং নিজ অন্তরের ফল (নিষ্ঠা) তাকে দিয়ে দেয়, সে সাধ্যমত তার আনুগত্য করুক। অতঃপর অন্য কেউ যদি তার (প্রথম ইমামের) সাথে (ক্ষমতা কাড়ার) ঝগড়া করে, তাহলে দ্বিতীয়জনের গর্দান উড়িয়ে দাও।" *(মুসলিম)*

এমন ফিতনার সময়ে উত্তম ব্যক্তি কে?

এই ফিতনার সময় উত্তম ব্যক্তি দুই শ্রেণীর। প্রথম শ্রেণীর লোক, যারা ফিতনা দূর করার ক্ষমতা রাখে, তারা তা দূর করার চেষ্টা করবে। হক-বাতিল বুঝতে পারলে বাতিলের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবে।

আর দ্বিতীয় শ্রেণীর লোক, যারা হক-বাতিল বোঝে না, তারা ফিতনাহীন স্থানে গিয়ে আশ্রয় নেবে। কোনভাবে ফিতনায় জড়িয়ে যাওয়া থেকে নিজেকে রক্ষা করবে।

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ভবিষ্যতে বহু ফিতনা দেখা দেবে। যাতে উপবেশনকারী ব্যক্তি দন্ডায়মান অপেক্ষা উত্তম হবে, দন্ডায়মান ব্যক্তি বিচরণকারী অপেক্ষা উত্তম হবে এবং বিচরণকারী ব্যক্তি ধাবমান অপেক্ষা উত্তম হবে। নিদ্রিত ব্যক্তি জাগ্রত অপেক্ষা উত্তম হবে এবং জাগ্রত ব্যক্তি দন্ডায়মান অপেক্ষা উত্তম হবে। যে ব্যক্তি তার প্রতি উঁকি দিয়ে দেখবে, সে (ফিতনা) তাকে গ্রাস করে ফেলবে। অতএব যে কেউ সে সময় কোন আশ্রয়স্থল পায়, সে যেন সেখানে গিয়ে আশ্রয় গ্রহণ করে।" *(মুসলিম ২৮৮৬, মিশকাত ৫৩৮৪নং)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "সত্বর এমন এক সময় আসবে যে, ছাগল-ভেড়াই মুসলিমের সর্বোত্তম মাল হবে; যা নিয়ে সে ফিতনা থেকে তার দ্বীনকে বাঁচানোর জন্য পাহাড়-চূড়ায় এবং বৃষ্টিবহুল (অর্থাৎ, তৃণবহুল) স্থানে পলায়ন করবে।" (বুখারী)

হুযাইফাহ বিন য়্যামান বলেন, লোকেরা আল্লাহর রসূল ﷺ-কে ইষ্ট ও মঙ্গল বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করত, আর আমি ভুক্তভোগী হওয়ার আশঙ্কায় অনিষ্ট ও অমঙ্গল বিষয়ে তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করতাম। একদা আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা মূর্খতা ও অমঙ্গলে ছিলাম। অতঃপর আল্লাহ আমাদেরকে এই মঙ্গল দান করলেন। কিন্তু এই মঙ্গলের পর আর অমঙ্গল আছে কি?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ আছে।" আমি বললাম, 'অতঃপর ঐ অমঙ্গলের পর আর মঙ্গল আছে কি?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, আর তা হবে ধোঁয়াটে।" (অর্থাৎ, বিশুদ্ধ ও খাঁটি মঙ্গল থাকবে না। বরং তার সাথে অমঙ্গল, বিঘ্ন, মতানৈক্য এবং চিত্ত-বিকৃতির ধোঁয়াটে পরিবেশ থাকবে।) আমি বললাম, 'তার মধ্যে ধোঁয়াটা কী?' তিনি বললেন, "এক সম্প্রদায় হবে, যারা আমার সুন্নাহ (তরীকা) ছাড়া অন্যের সুন্নাহ (তরীকা) অনুসরণ করবে এবং আমার হেদায়াত (পথনির্দেশ) ছাড়াই (মানুষকে) পথপ্রদর্শন করবে। যাদের কিছু কাজকে চিনতে পারবে (ও ভালো জানবে) এবং

কিছু কাজকে অদ্ভুত (ও মন্দ) জানবে।" আমি বললাম, 'ঐ মঙ্গলের পর আর অমঙ্গল আছে কি?' তিনি বললেন, "হ্যাঁ, (সে যুগে) জাহান্নামের দরজাসমূহে দন্ডায়মান আহবানকারী (আহবান করবে)। যে ব্যক্তি তাদের আহবানে সাড়া দেবে, তাকে তারা ওর মধ্যে নিক্ষিপ্ত করবে।" আমি বললাম, 'ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদেরকে তাদের পরিচয় বলে দিন।' তিনি বললেন, "তারা আমাদেরই চর্মের (স্বজাতি) হবে এবং আমাদেরই ভাষায় কথা বলবে।" আমি বললাম, 'আমাকে কী আদেশ করেন---যদি আমি সে সময় পাই?' তিনি বললেন, "মুসলিমদের জামাআত ও ইমাম (নেতা)র পক্ষাবলম্বন করবে।" আমি বললাম, 'কিন্তু যদি ওদের জামাআত ও ইমাম না থাকে?' তিনি বললেন, "ঐ সমস্ত দল থেকে দূরে থাকবে; যদিও তোমাকে কোন গাছের শিকড় কামড়ে থাকতে হয়, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমার ঐ অবস্থাতেই মৃত্যু এসে উপস্থিত হয়েছে।" *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত ৫৩৮-২নং)*

তিনি আরো বলেন, "ফিতনার সময় মানুষের নিরাপত্তার উপায় তার স্বগৃহে অবস্থান।" *(সঃ জামে' ৩৫৪৩নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ আমাকে অসিয়ত ক'রে বলেন, "ভবিষ্যতে ফিতনা ও বিচ্ছিন্নতা দেখা দেবে। সুতরাং সে সময় এলে তুমি তোমার তরবারি ভেঙ্গে ফেলো এবং কাষ্ঠের তরবারি বানিয়ে নিয়ো।" *(আহমাদ)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ফিতনার সময় যদি তুমি ভয় কর যে, তরবারির চমক তোমার চোখ ঝলসে দেবে, তাহলে তুমি তোমার চেহারা আবৃত ক'রে নাও।" *(আহমাদ, আবূ দাউদ ৪২৬১নং, ইবনে মাজাহ)* "তুমি তাতে আল্লাহর হত বান্দা হও এবং হত্যাকারী হয়ো না।" *(আহমাদ, হাকেম, ত্বাবরানী, আবূ য়্যা'লা)*

কিন্তু ফিতনায় সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কে? মহানবী ﷺ-কে এ কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বললেন,

(رَجُلٌ فِي مَاشِيَتِهِ يُؤَدِّي حَقَّهَا ، وَيَعْبُدُ رَبَّهُ ، وَرَجُل اخِذٌ بِرَاْسِ فَرَسِهِ يُخِيفُ الْعَدُوَّ وَيُخِيفُونَهُ).

অর্থাৎ, সেই ব্যক্তি, যে তার পশুর সঙ্গে (নির্জন এলাকায়) বসবাস ক'রে তার হক (যাকাত) আদায় করে, নিজ প্রতিপালকের ইবাদত করে। আর সেই ব্যক্তি, যে নিজ ঘোড়ার লাগাম ধরে শত্রুকে ভয় দেখায় এবং শত্রুও তাকে ভয় দেখায়। *(আহমাদ, তিরমিযী, সঃ তারগীব ১২২৭নং)*

অন্য এক বর্ণনায় তিনি বলেছেন,

(خَيْرُ النَّاسِ فِي الفِتَنِ رَجُلٌ آخِذٌ بِعِنانِ فَرَسِهِ خَلْفَ أَعْداءِ اللهِ يُخِيفُهُمْ وَيُخِيفُونَهُ أَوْ رَجُلٌ مُعْتَزِلٌ فِي بادِيَةٍ يُؤَدِّي حَقَّ اللهِ الَّذِي عَلَيهِ).

অর্থাৎ, ফিতনায় সর্বোত্তম ব্যক্তি সে, যে তার ঘোড়ার লাগাম ধরে আল্লাহর দুশমনদের পিছনে ধাওয়া করে, তাদেরকে ভয় দেখায় এবং তারা তাকে ভয় দেখায়। আর সেই ব্যক্তি, যে কোন বেদুঈন (জনহীন) এলাকায় পৃথক বসবাস ক'রে তার উপর আল্লাহর (নির্ধারিত) হক আদায় করে। *(হাকেম ৪/৪৪৬, সিঃ সহীহাহ ৬৯৮-নং)*

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "ফিতনা-ফাসাদের সময় ইবাদত-বন্দেগী করা, আমার দিকে 'হিজরত' করার সমতুল্য।" *(মুসলিম)*

সর্বশ্রেষ্ঠ ও সর্বনিকৃষ্ট রাষ্ট্রনেতা

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ ، وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ . وشِرَارُ أئِمَّتِكُم الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ ، وَتلعَنُونَهُمْ وَيلْعَنُونَكُمْ !)) ، قَالَ : قُلْنَا : يَا رَسُولَ اللهِ ، أفَلاَ نُنَابِـذُهُم ؟ قَالَ : ((لاَ، مَا أقَامُوا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ . لاَ ، مَا أقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ)). رواه مسلم

"তোমাদের সর্বোৎকৃষ্ট শাসকবৃন্দ তারা, যাদেরকে তোমরা ভালবাস এবং তারাও তোমাদেরকে ভালবাসে, তোমরা তাদের জন্য দুআ কর এবং তারাও তোমাদের জন্য দুআ করে। আর তোমাদের নিকৃষ্টতম শাসকবৃন্দ তারা, যাদেরকে তোমরা ঘৃণা কর এবং তারাও তোমাদেরকে ঘৃণা করে, তোমরা তাদেরকে অভিশাপ কর এবং তারাও তোমাদেরকে অভিশাপ করে।" (হাদীসের বর্ণনাকারী) বলেন, আমরা বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! আমরা কি তাদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করব না?' তিনি বললেন, "না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামায প্রতিষ্ঠা করবে। না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাদের মধ্যে নামায প্রতিষ্ঠা করবে।" *(মুসলিম)*

আয়েয ইবনে আম্র ﷺ উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের নিকট গেলেন। অতঃপর তিনি তাকে বললেন, 'হে বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

((إنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الحُطَمَةُ)).

"নিশ্চয় নিকৃষ্টতম শাসক সে, যে প্রজাদের ব্যাপারে কঠোরতা অবলম্বন করে।"

সুতরাং তুমি তাদের দলভুক্ত হওয়া থেকে দূরে থাকো।' *(বুখারী ও মুসলিম)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "কোন বান্দাকে আল্লাহ কোন প্রজার উপর শাসক বানালে, যেদিন সে মরবে সেদিন যদি সে প্রজার প্রতি ধোঁকাবাজি ক'রে মরে, তাহলে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম ক'রে দেবেন।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "অতঃপর সে (শাসক) তার হিতাকাঙ্ক্ষিতার সাথে তাদের অধিকারসমূহ রক্ষা করল না, সে জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাবে না।"

মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, "যে কোন আমীর মুসলমানদের দেখাশোনার দায়িত্ব নিল, অতঃপর সে তাদের (সমস্যা দূর করার) চেষ্টা করল না এবং তাদের হিতাকাঙ্ক্ষী হল না, সে তাদের সঙ্গে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।"

এমন রাজা, রাষ্ট্রনেতা ও শাসকদের জন্য মহানবী ﷺ-এর দুআ ও বদ্দুআ রয়েছে, "হে আল্লাহ! যে কেউ আমার উম্মতের কোন কাজের কিছু দায়িত্ব নিয়ে তাদেরকে কষ্টে ফেলবে, তুমি তাকে কষ্টে ফেলো। আর যে কেউ আমার উম্মতের কোন কাজের কিছু দায়িত্ব নিয়ে তাদের সাথে নম্রতা করবে, তুমি তার সাথে নম্রতা করো।" *(মুসলিম)*

দুনিয়া ও তার সকল সম্পদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ

কিছু জিনিস আছে, যা শুধু শ্রেষ্ঠতম নয়; বরং তা পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকল জিনিস থেকে শ্রেষ্ঠ। সেই রকম জিনিস কিছু নিম্নরূপ ঃ-

১। শহীদের বেহেশ্তী মুকুটের একটি মুক্তা

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(للشَّهيدِ عِنْدَ الله سَبْعُ خِصَال يُغْفَرُ لَهُ فِي أَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ وَيَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُحَلَّى حُلَّةَ الإِيمَانِ وَيُزَوَّجُ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ زَوْجَةً مِنَ الْحُورِ الْعِينِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الأَكْبَرِ وَيُوضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوَقَارِ الْيَاقُوتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَيَشْفَعُ فِي سَبْعِينَ إِنْسَاناً مِنْ أَهْلِ بَيْتِهِ).

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট শহীদের জন্য রয়েছে সাতটি মর্যাদা; রক্তক্ষরণের শুরুতেই তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হয়, বেহেশ্তে সে তার নিজ স্থান দেখতে পায়, তাকে ঈমানের জুব্বা পরিধান করানো হয়, (বেহেশ্তে) ৭২টি সুনয়না হুরীর সাথে তার বিবাহ হবে, কবরের আযাব থেকে নিরাপত্তা লাভ করবে, (কিয়ামতে দিন) মহাত্রাস থেকে নিরাপদে থাকবে, তার মস্তকে গৌরবের মুকুট পরানো হবে, যার একটি মাত্র মণি (চুনি) পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, আর নিজ পরিবারের ৭০ জন লোকের জন্য (আল্লাহর দরবারে) তার সুপারিশ মঞ্জুর করা হবে। *(আহমাদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, বাইহাকী, সহীহুল জামে' ৫১৮২ নং)*

২। আল্লাহর পথে (জিহাদে) একটি সকাল অথবা সন্ধ্যা

৩। জান্নাতে একটি ধনুক অথবা চাবুক বরাবর স্থান

৪। জান্নাতী হুরীর ওড়না ও তাজ

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(لَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ غَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا وَلَقَابُ قَوْسِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ أَوْ مَوْضِعُ قِيدٍ يَعْنِي سَوْطَهُ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا، وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَى أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا وَلَمَلَأَتْهُ رِيحاً وَلَنَصِيفُهَا عَلَى رَأْسِهَا خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا).

অর্থাৎ, আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের) একটি সকাল অথবা সন্ধ্যা পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত বস্তু অপেক্ষা উত্তম। তোমাদের এক ধনুক অথবা এক চাবুক পরিমাণ জান্নাতের জায়গা দুনিয়া ও তন্মধ্যস্থিত সবকিছু থেকে শ্রেষ্ঠ। যদি জান্নাতী কোন মহিলা পৃথিবীবাসীর দিকে উঁকি মারে, তাহলে আকাশ-পৃথিবীর মধ্যবর্তী সকল স্থান উজ্জ্বল ক'রে দেবে! উভয়ের মধ্যবর্তী স্থান সৌরভে পরিপূর্ণ ক'রে দেবে! আর তার মাথার ওড়নাখানি পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু হতে শ্রেষ্ঠ। *(বুখারী, মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তার মাথার তাজখানি পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু হতে শ্রেষ্ঠ।" (ত্বাবারানীর আওসাত্ব ৩১৪৮নং)

তিনি আরো বলেছেন,

(غَدْوَةٌ فِى سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ).

অর্থাৎ, আল্লাহর রাস্তায় (জিহাদের) একটি সকাল অথবা সন্ধ্যা সেই (বিশ্বজাহান) অপেক্ষা উত্তম যার উপর সূর্য উদিত ও অস্তমিত হয়েছে। (মুসলিম ৪৯৮৫নং, নাসাঈ)

৫। একদিন জিহাদে প্রতিরক্ষা বাহিনীর কাজ করা।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(رِبَاطُ يَوْمٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَمَوْضِعُ سَوْطِ أَحَدِكُمْ مِنْ الْجَنَّةِ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا وَالرَّوْحَةُ يَرُوحُهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ الْغَدْوَةُ خَيْرٌ مِنْ الدُّنْيَا وَمَا عَلَيْهَا).

অর্থাৎ, আল্লাহর রাস্তায় একটা দিন প্রতিরক্ষার কাজ করা পৃথিবী ও তদুপরিস্থ সকল বস্তু হতে শ্রেষ্ঠ। পৃথিবী ও তদুপরিস্থ সকল বস্তু হতে শ্রেষ্ঠ। তোমাদের এক চাবুক পরিমাণ জান্নাতের জায়গা পৃথিবী ও তদুপরিস্থ সকল বস্তু হতে শ্রেষ্ঠ। আল্লাহর পথে (জিহাদে) বান্দার যাওয়া একটি সন্ধ্যা অথবা সকাল পৃথিবী ও তদুপরিস্থ সকল বস্তু হতে শ্রেষ্ঠ। *(বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী)*

৬। ফজরের ফরয নামাযের পূর্বে দু'রাকআত সুন্নত

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا).

অর্থাৎ, ফজরের দু'রাকআত (সুন্নত) পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু হতে শ্রেষ্ঠ। (মুসলিম ১৭২১নং, তিরমিযী)

অন্য এক বর্ণনায় আছে,

(لَهُمَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الدُّنْيَا جَمِيعًا).

অর্থাৎ, নিশ্চয় ঐ দু'রাকআত (সুন্নত) আমার কাছে দুনিয়ার সকল বস্তু অপেক্ষা উত্তম। *(মুসলিম ১৭২২নং)*

৭। তাসবীহ, তাহমীদ, তাহলীল ও তাকবীর

মহানবী ﷺ বলেছেন,

((لأَنْ أَقُولَ : سُبْحَانَ اللهِ ، وَالحَمْدُ للهِ ، وَلاَ إلهَ إلاَّ اللهُ ، وَاللهُ أكْبَرُ ، أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ)) .

"আমার এই বাক্যমালা (সুবহানাল্লাহি অলহামদুলিল্লাহি অলা ইলাহা ইল্লাল্লাহু অল্লাহু আকবার। (অর্থাৎ, আল্লাহর পবিত্রতা ঘোষণা করছি, আল্লাহর যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ ছাড়া (সত্যিকার) কোন ইলাহ নেই এবং আল্লাহ সব চাইতে মহান) পাঠ করা সেই সমস্ত বস্তু অপেক্ষা অধিক প্রিয়, যার উপর সূর্যোদয় হয়েছে।" *(মুসলিম ৭০২২নং)*

৮। রাত্রে দশটি আয়াত পাঠ করা।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(مَنْ قَرَأَ عَشْرَ آيَاتٍ فِي لَيْلَةٍ ، كُتِبَ لَهُ قِنْطَارٌ ، وَالْقِنْطَارُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا).

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি রাত্রে দশটি আয়াত পাঠ করবে, তার জন্য 'ক্বিন্তার' পরিমাণ সওয়াব লেখা হবে। 'ক্বিন্তার' পৃথিবী ও তন্মধ্যস্থিত সকল বস্তু হতে শ্রেষ্ঠ। (ত্বাবারানীর কাবীর ১২৩৯নং, আওসাত্ব, সঃ তারগীব ৬৩৮নং)

যে কারণে অধিকাংশ কবরের আযাব হয়

কুফ্র, শির্ক ও সাধারণভাবে সর্বপ্রকার কাবীরা গোনাহ ছাড়া হাদীসের বর্ণনা অনুযায়ী কিছু কিছু পাপের কারণে কবরের আযাব হয়ে থাকে। যেমন ঃ

১। মৃত ব্যক্তির জন্য মাতম ক'রে কান্না করা।

মহানবী ﷺ বলেছেন, "মৃত ব্যক্তিকে তার কবরের মধ্যে তার জন্য মাতম ক'রে কান্না করার দরুন শাস্তি দেওয়া হয়।" *(বুখারী ও মুসলিম)* অন্য এক বর্ণনায় আছে, যতক্ষণ তার জন্য মাতম ক'রে কান্না করা হয়, (ততক্ষণ মৃতব্যক্তির আযাব হয়।)

২। প্রস্রাবের ছিটা থেকে সাবধান না হওয়া।

৩। চুগলি করা, কথা লাগালাগি করা।

৪। গীবত বা পরচর্চা করা।

একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ দুটো কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করার সময় বললেন, "ঐ দুই কবরবাসীর আযাব হচ্ছে। অবশ্য ওদেরকে কোন বড় ধরনের অপরাধ (বা কোন কঠিন কাজের) জন্য আযাব দেওয়া হচ্ছে না।" (তারপর বললেন,) "হ্যাঁ, অপরাধ তো বড়ই ছিল। ওদের একজন (লোকের) চুগলী ক'রে বেড়াত। আর অপরজন পেশাবের ছিটা থেকে বাঁচত না।" *(বুখারী)*

কোন কোন বর্ণনায়, গীবত করার কথা বর্ণিত আছে।

৫। কুরআন জেনেও তার নির্দেশানুযায়ী আমল না করা।

৬। ফরয নামায ত্যাগ ক'রে ঘুমিয়ে থাকা।

৭। ব্যাপক মিথ্যা বলা।

৮। ব্যভিচার করা।

৯। সূদ খাওয়া।

সামুরাহ ইবনে জুনদুব ﷺ বলেন, নবী ﷺ প্রায়ই তাঁর সাহাবীদেরকে বলতেন, "তোমাদের কেউ কোন স্বপ্ন দেখেছে কি?" রাবী বলেন, যার ব্যাপারে আল্লাহর ইচ্ছা সে তাঁর কাছে স্বপ্ন বর্ণনা করত। তিনি একদিন সকালে বললেন, "গতরাত্রে আমার কাছে দুজন আগন্তুক এল। তারা আমাকে উঠাল, আর বলল, 'চলুন।' আমি তাদের সাথে চলতে লাগলাম। অতঃপর আমরা কাত হয়ে শোয়া এক ব্যক্তির নিকট পৌঁছলাম। দেখলাম, অপর এক ব্যক্তি তার নিকট পাথর নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার মাথায় পাথর নিক্ষেপ করছে। ফলে তার মাথা ফাটিয়ে ফেলছে। আর পাথর গড়িয়ে সরে পড়ছে। তারপর আবার সে পাথরটির অনুসরণ ক'রে তা পুনরায় নিয়ে আসছে। ফিরে আসতে না আসতেই লোকটির

মাথা আগের মত পুনরায় ভাল হয়ে যাচ্ছে। ফিরে এসে আবার একই আচরণ করছে; যা প্রথমবার করেছিল। (তিনি বলেন,) আমি সাথীদ্বয়কে বললাম, 'সুবহানাল্লাহ! এটা কী?' তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম, তারপর চিৎ হয়ে শোয়া এক ব্যক্তির কাছে পৌঁছলাম। এখানেও দেখলাম, তার নিকট এক ব্যক্তি লোহার আঁকড়া নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর সে তার চেহারার একদিকে এসে এর দ্বারা তার কশ থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং একইভাবে নাকের ছিদ্র থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে চোখ থেকে মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলছে। তারপর ঐ লোকটি শোয়া ব্যক্তির অপরদিকে যাচ্ছে এবং প্রথম দিকের সাথে যেরূপ আচরণ করেছে অনুরূপ আচরণই অপর দিকের সাথেও করছে। ঐ দিক হতে অবসর হতে না হতেই প্রথম দিকটি আগের মত ভাল হয়ে যাচ্ছে। তারপর আবার প্রথম বারের মত আচরণ করছে। (তিনি বলেন,) আমি বললাম, 'সুবহানাল্লাহ! এরা কারা?' তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং (তন্দুর) চুলার মত একটি গর্তের কাছে পৌঁছলাম। আর সেখানে শোরগোল ও নানা শব্দ ছিল। আমরা তাতে উঁকি মেরে দেখলাম, তাতে বেশ কিছু উলঙ্গ নারী-পুরুষ রয়েছে। আর নীচ থেকে নির্গত আগুনের লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে। যখনই লেলিহান শিখা তাদেরকে স্পর্শ করছে, তখনই তারা উচ্চরবে চিৎকার ক'রে উঠছে। আমি বললাম, 'এরা কারা?' তারা আমাকে বলল, 'চলুন, চলুন।'

সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং একটি নদীর কাছে গিয়ে পৌঁছলাম। (বর্ণনাকারী বলেন, আমার যতদূর মনে পড়ে, তিনি বললেন,) নদীটি ছিল রক্তের মত লাল। আর দেখলাম, সেই নদীতে এক ব্যক্তি সাঁতার কাটছে। আর নদীর তীরে অপর এক ব্যক্তি রয়েছে এবং সে তার কাছে অনেকগুলো পাথর একত্রিত ক'রে রেখেছে। আর ঐ সাঁতার-রত ব্যক্তি বেশ কিছুক্ষণ সাঁতার কাটার পর সেই ব্যক্তির কাছে ফিরে আসছে, যে তার নিকট পাথর একত্রিত ক'রে রেখেছে। সেখানে এসে সে তার সামনে মুখ খুলে দিচ্ছে এবং ঐ ব্যক্তি তার মুখে একটি পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তারপর সে চলে গিয়ে আবার সাঁতার কাটছে এবং আবার তার কাছে ফিরে আসছে। আর যখনই ফিরে আসছে তখনই ঐ ব্যক্তি তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দিচ্ছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, 'এরা কারা?' তারা বলল, 'চলুন, চলুন।'

.......আমি বললাম, 'আমি রাতে অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার দেখতে পেলাম, এগুলোর তাৎপর্য কী?' তারা আমাকে বলল, 'আচ্ছা আমরা আপনাকে বলে দিচ্ছি। ঐ যে প্রথম ব্যক্তিকে যার কাছে আপনি পৌঁছলেন, যার মাথা পাথর দিয়ে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হচ্ছিল, সে হল ঐ ব্যক্তি যে কুরআন গ্রহণ ক'রে---তা বর্জন করে। আর ফরয নামায ছেড়ে ঘুমিয়ে থাকে।

আর ঐ ব্যক্তি যার কাছে গিয়ে দেখলেন যে, তার কশ থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং একইভাবে নাকের ছিদ্র থেকে মাথার পিছনের দিক পর্যন্ত এবং অনুরূপভাবে চোখ থেকে মাথার পিছন দিক পর্যন্ত চিরে ফেলা হচ্ছিল। সে হল ঐ ব্যক্তি যে সকালে আপন ঘর থেকে বের হয়ে এমন মিথ্যা বলে, যা চতুর্দিক ছড়িয়ে পড়ে।

আর যে সকল উলঙ্গ নারী-পুরুষ যারা (তন্দুর) চুলা সদৃশ গর্তের অভ্যন্তরে রয়েছে,

তারা হল ব্যভিচারী-ব্যভিচারিণীর দল।

আর ঐ ব্যক্তি যার কাছে পৌঁছে দেখলেন যে, সে নদীতে সাঁতার কাটছে ও তার মুখে পাথর ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে সে হল সূদখোর।

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "সুতরাং আমরা চলতে লাগলাম এবং (তন্দুর) চুলার মত একটি গর্তের কাছে পৌঁছলাম; যার উপর দিকটা সংকীর্ণ ছিল এবং নিচের দিকটা প্রশস্ত। তার নিচে আগুন জ্বলছিল। তার মধ্যে উলঙ্গ বহু নারী-পুরুষ ছিল। আগুন যখন উপর দিকে উঠছিল, তখন তারাও (আগুনের সাথে) উপরে উঠছিল। এমনকি প্রায় তারা (চুলা) থেকে বের হওয়ার উপক্রম হচ্ছিল। আর যখন আগুন স্তিমিত হয়ে নেমে যাচ্ছিল, তখন (তার সাথে) তারাও নিচে ফিরে যাচ্ছিল।"

এই বর্ণনায় আছে, "একটি রক্তের নদীর কাছে এলাম। সেই নদীর মাঝখানে একটি লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। আর নদীর তীরে একটি লোক রয়েছে, যার সামনে পাথর রয়েছে। অতঃপর নদীর মাঝের লোকটি যখন উঠে আসতে চাচ্ছে, তখন তীরের লোকটি তাকে পাথর ছুঁড়ে মেরে সেই দিকে ফিরিয়ে দিচ্ছে, যেখানে সে ছিল। এইভাবে যখনই সে নদী থেকে বের হয়ে আসতে চাচ্ছে, তখনই ঐ লোকটি তার মুখে পাথর ছুঁড়ে মারছে। ফলে সে যেখানে ছিল, সেখানে ফিরে যাচ্ছে।"

এই বর্ণনায় আরো আছে, "আর যাকে আপনি তার নিজ কশ চিরতে দেখলেন, সে হল বড় মিথ্যুক; যে মিথ্যা কথা বলত, অতঃপর তা তার নিকট থেকে বর্ণনা করা হত। ফলে তা দিকচক্রবালে পৌঁছে যেত। অতএব এই আচরণ তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত করা হবে।"

এই বর্ণনায় আরো আছে, "যার মাথা চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে দেখলেন, সে ছিল এমন ব্যক্তি, যাকে আল্লাহ কুরআন শিখিয়েছিলেন। কিন্তু সে (তা ভুলে) রাতে ঘুমিয়ে থাকত এবং দিনে তার উপর আমল করত না। অতএব এই আচরণ তার সাথে কিয়ামত পর্যন্ত করা হবে।"

বলা বাহুল্য, জিব্রাঈল ও মীকাঈলের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তাঁর নবী ﷺ-কে মধ্যজগতের ঐ আযাব স্বপ্নযোগে প্রদর্শন করেছিলেন।

কিন্তু অধিকাংশ কবরের আযাব কোন অপরাধে হয়? মহানবী ﷺ তার উত্তরে বলেছেন,

(أَكْثَرُ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنَ الْبَولِ).

অর্থাৎ, অধিকাংশ কবরের আযাব প্রস্রাবের কারণে হয়। (আহমাদ, ইবনে মাজাহ ৩৪৮, হাকেম, সঃ জামে' ১২০২নং)

তা কেন?

যেহেতু অধিকাংশ মানুষ প্রস্রাব করার সময় পূর্ণ সাবধানতা অবলম্বন করে না। ফলে প্রস্রাবের ছিটা তাদের দেহে অথবা কাপড়ে এসে লাগে। অতঃপর নামায পড়লে তাদের নামায কবুল হয় না; যে নামায দ্বীনের স্তম্ভ, সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদত, কিয়ামতে সর্বপ্রথম যার হিসাব নেওয়া হবে।

অনেকে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে অথবা বিপরীতমুখী হাওয়ার সামনে বসে প্রস্রাব করলে অথবা শক্ত মাটিতে বা পাথরের উপর প্রস্রাব করলে তার ছিটা ঘুরে এসে দেহে অথবা কাপড়ে লাগে। ফলে তারা নাপাকি নিয়ে নামায পড়ে। কিন্তু তাদের নামায হয় না।

পক্ষান্তরে অধিকাংশ মুসলিম বেনামাযী। আর যারা বেনামাযী, তারা প্রস্রাবের পর পানি খরচ করে না অথবা ঢেলা বা টিসু ব্যবহার করে না। সুতরাং নামায ত্যাগের সাথে সাথে প্রস্রাব থেকে পবিত্র না হওয়ার অপরাধে অধিকাংশ আযাব হবে তাদের।

কিয়ামতে সর্বপ্রথম কাপড় পরিধানকারী কে?

ইবনে আব্বাস رضي الله عنه বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ নসীহত করার জন্য আমাদের মাঝে দাঁড়ালেন। অতঃপর তিনি বললেন,

((يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّكُمْ مَحْشُورونَ إِلَى اللهِ تَعَالَى حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً {كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ} [الأنبياء: ١٠٤] ألا وَإنَّ أَوَّلَ الخَلاَئِقِ يُكْسى يَومَ القِيَامَةِ إبـراهيمُ ﷺ ..... مُتَّفَقٌ عَلَيهِ

"হে লোক সকল! তোমাদেরকে আল্লাহর নিকট উলঙ্গ পা, উলঙ্গ দেহ ও খতনাবিহীন অবস্থায় একত্রিত করা হবে। (আল্লাহ বলেন,) 'যেমন আমি প্রথম সৃষ্টি করেছি আমি পুনর্বার তাকে সেই অবস্থায় ফিরাবো। এটা আমার প্রতিজ্ঞা, যা আমি পুরা করব।' *(সূরা আম্বিয়া ১০৪ আয়াত)*

জেনে রাখো! কিয়ামতের দিন সৃষ্টির মধ্যে সর্বপ্রথম ইব্রাহীম ﷺ-কে বস্ত্র পরিধান করানো হবে।...... *(বুখারী ও মুসলিম)*

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, "মানুষকে হাশরের ময়দানে উঠানো হবে খালি পা, উলঙ্গ ও খাতনাবিহীন অবস্থায়।" আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আনহা) বলেন, আমি বললাম, 'হে আল্লাহর রসূল! পুরুষ ও মহিলারা একে অপরের প্রতি দৃষ্টিপাত করবে?' তিনি বললেন, "হে আয়েশা! তাদের এরূপ ইচ্ছা করার চাইতেও কঠিন হবে তখনকার অবস্থা।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

অন্য এক বর্ণনায় আছে, "তাদের একে অন্যের দিকে তাকাতাকি করা অপেক্ষা ব্যাপার আরো গুরুতর হবে।"

অর্থাৎ, তাদের যে দুরবস্থা হবে, তা নিয়েই ব্যস্ত থাকবে। অন্যের গোপনাঙ্গের দিকে তাকিয়ে দেখতে ফুরসতও হবে না কারো। কষ্ট ও আতঙ্কের কারণে সে খেয়ালও হবে না কারো।

আল্লাহুম্মা ক্বিনা আযাবাক, য়্যাউমা তাজমাউ ইবাদাক।

কিয়ামতে সর্বপ্রথম বাদী-প্রতিবাদীর বিচার

কিয়ামত-কোর্টে সকল অপরাধের বিচার হবে। আল্লাহর হক সংক্রান্ত সর্বপ্রথম বিচার হবে বেনামাযীর। বান্দার হক সংক্রান্ত সর্বপ্রথম বিচার হবে খুনীর। আল্লাহর নিয়ামত সংক্রান্ত সর্বপ্রথম হিসাব হবে পানির। আর দুই বাদী-প্রতিবাদীর অপরাধ-বিষয়ক বিচার হবে দুই প্রতিবেশীর। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَوَّلُ خَصْمَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جَارَانِ).

অর্থাৎ, সর্বপ্রথম বাদী-প্রতিবাদী হবে দুই প্রতিবেশী। *(আহমাদ ১৭৩৭২, ত্বাবারানী, সঃ জামে' ২৫৬৩নং)*

সেই দুই প্রতিবেশী, যারা একে অন্যের হক আদায় করেনি। একে অপরকে সৎকাজের আদেশ ও মন্দ কাজে বাধা দান করেনি। একে অন্যকে নানাভাবে কষ্ট দিয়েছে। একে অন্যের ক্ষতি করেছে।

সুতরাং তাদের বিচার আগে হবে। রক্ষক হয়ে ভক্ষকের কাজ করার ফলে তাদের ফায়সালা আগে হবে।

সৎ প্রতিবেশী হওয়া মানুষের পার্থিব সুখের একটি কারণ। প্রতিবেশী ভালো না হলে পাড়ায় বসবাস করার আনন্দ বিষময় হয়ে ওঠে। সুতরাং প্রতিবেশীর প্রতি প্রতিবেশীর বহু দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। তা পালন না করলে পার্থিব সুখ তো দূরের কথা প্রকৃত ঈমানদার হওয়াও যাবে না। বরং পরকালে বেহেশ্ত পাওয়াও যাবে না। মহানবী ﷺ বলেছেন, "আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়। আল্লাহর কসম! সে ব্যক্তি মু'মিন নয়।" জিজ্ঞেস করা হল, 'কোন্ ব্যক্তি? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "যে ব্যক্তির প্রতিবেশী তার অনিষ্ট থেকে নিরাপদে থাকে না।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে, "ঐ ব্যক্তি জান্নাতে প্রবেশ করবে না, যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদে থাকে না।"

কিয়ামতে সর্বপ্রথম বিচার হবে কার?

কিয়ামতে সর্বপ্রথম বিচার হবে ধর্মীয় ভন্ডদের। সর্বপ্রথম জাহান্নামে যাবে তারা, যারা আসলে ধার্মিক নয়, ধার্মিকতা প্রদর্শন করে। ধর্মের ধার ধারে না অথচ ধার্মিকতার ভান করে। যারা পার্থিব কোন স্বার্থে দ্বীনের কাজ করে। যারা যশ, খ্যাতি ও সুনাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে ধর্মের পিরহান পরে বেড়ায়।

তাদের মধ্যে একজন হল নামধারী 'শহীদ'। যে 'বীর' নাম নেওয়ার জন্য জিহাদে লড়ে হত হয়েছে।

অন্য একজন হল আলেম, ক্বারী। যে নাম নেওয়ার উদ্দেশ্যে অথবা দুনিয়ার অর্থ-সম্পদ লাভের উদ্দেশ্যে কুরআন শিখেছে ও পড়েছে।

আর অন্য একজন হল দানী। যে লোকের কাছে সুনাম তথা 'দানবীর' খেতাব পাওয়ার উদ্দেশ্যে দান করেছে।

মহানবী ﷺ বলেন,

((إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يومَ القِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ ، فَأُتِيَ بِهِ ، فَعَرَّفَهُ نِعمَهُ ، فعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ . قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ : جَرِيءٌ ! فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ. وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ العِلْمَ

وَعلَّمَهُ ، وَقَرَأَ القُرْآنَ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا . قَالَ: فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ : تَعَلَّمْتُ العِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ ، وَقَرَأتُ فِيكَ القُرْآنَ ، قَالَ : كَذَبْتَ، وَلكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ : عَالِمٌ ! وَقَرَأْتَ القُرْآنَ لِيُقَالَ : هُوَ قَارِئٌ ؛ فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ . وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ ، وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ المَالِ ، فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ ، فَعَرَفَهَا . قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا ؟ قَالَ: مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبيلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيهَا لَكَ. قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلَكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ : جَوَادٌ ! فَقَدْ قِيلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِي النَّارِ)) . مسلم

"কিয়ামতের দিন অন্যান্য লোকেদের পূর্বে যে ব্যক্তির প্রথম বিচার হবে সে হচ্ছে একজন শহীদ। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া সকল নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সুতরাং সে তা স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'ঐ নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী আমল ক'রে এসেছ?' সে বলবে 'আমি তোমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য জিহাদ করেছি এবং অবশেষে শহীদ হয়ে গেছি।' আল্লাহ বলবেন, 'তুমি মিথ্যা বলছ। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে জিহাদ করেছ, যাতে লোকেরা তোমাকে বলে, অমুক একজন বীর পুরুষ। সুতরাং তা-ই বলা হয়েছে।' অতঃপর (ফিরিশ্তাদেরকে) আদেশ করা হবে এবং তাকে উবুড় ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

দ্বিতীয় হচ্ছে এমন ব্যক্তি, যে ইল্ম শিক্ষা করেছে, অপরকে শিক্ষা দিয়েছে এবং কুরআন পাঠ করেছে। তাকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে। আল্লাহ তাকে (পৃথিবীতে প্রদত্ত) তাঁর সকল নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ বলবেন, 'এই সকল নেয়ামতের বিনিময়ে তুমি কী আমল ক'রে এসেছ?' সে বলবে, 'আমি ইল্ম শিখেছি, অপরকে শিখিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টিলাভের জন্য কুরআন পাঠ করেছি।' আল্লাহ বলবেন, 'মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে ইল্ম শিখেছ, যাতে লোকেরা তোমাকে আলেম বলে এবং এই উদ্দেশ্যে কুরআন পড়েছ, যাতে লোকেরা তোমাকে ক্বারী বলে। আর (দুনিয়াতে) তা বলা হয়েছে।' অতঃপর (ফিরিশ্তাদেরকে) নির্দেশ দেওয়া হবে এবং তাকে উবুড় ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

তৃতীয় হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যার রুযীকে আল্লাহ প্রশস্ত করেছিলেন এবং সকল প্রকার ধন-দৌলত যাকে প্রদান করেছিলেন। তাকে আল্লাহর দরবারে হাজির করা হবে। আল্লাহ তাকে তাঁর দেওয়া সমস্ত নেয়ামতের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন। সেও সব কিছু স্মরণ করবে। অতঃপর আল্লাহ প্রশ্ন করবেন, 'তুমি ঐ সকল নেয়ামতের বিনিময়ে কী আমল ক'রে এসেছ?' সে বলবে, 'যে সকল রাস্তায় দান করলে তুমি খুশী হও সে সকল রাস্তার মধ্যে কোনটিতেও তোমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে খরচ করতে ছাড়িনি।' তখন আল্লাহ বলবেন, 'মিথ্যা বলছ তুমি। বরং তুমি এ জন্যই দান করেছিলে; যাতে লোকে তোমাকে দানবীর বলে। আর তা বলা হয়েছে।' অতঃপর (ফিরিশ্তাবর্গকে) হুকুম করা হবে এবং তাকে উবুড় ক'রে টেনে নিয়ে গিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। *(মুসলিম ১৯০৫ নং)*

দ্বীনের কোন কাজ ক'রে যে প্রসিদ্ধি কামনা ক'রে, সেই প্রসিদ্ধি কিয়ামতেও ঘোষণা করা

হবে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

((مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ ، وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللّٰهُ بِهِ)) . متفق عَلَيْهِ

“যে ব্যক্তি শোনাবে, আল্লাহ তা শুনিয়ে দিবেন। আর যে ব্যক্তি দেখাবে, আল্লাহ তা দেখিয়ে দেবেন।” *(বুখারী ও মুসলিম)*

‘যে ব্যক্তি শোনাবে’ অর্থাৎ, যে তার আমলকে মানুষের সামনে প্রদর্শনের জন্য প্রকাশ করবে। ‘আল্লাহ তা শুনিয়ে দিবেন’ অর্থাৎ, কিয়ামতের দিনে (সৃষ্টির সামনে সে কথা জানিয়ে) তাকে লাঞ্ছিত করবেন। ‘যে ব্যক্তি দেখাবে’ অর্থাৎ, যে ব্যক্তি মানুষের সামনে স্বকৃত নেক আমল প্রকাশ করবে, যাতে সে তাদের নিকট সম্মানার্হ হয়। ‘আল্লাহ তা দেখিয়ে দেবেন’ অর্থাৎ, সৃষ্টির সম্মুখে তার গুপ্ত উদ্দেশ্যের কথা ব্যক্ত (করে তাকে অপমানিত) করবেন।

যে ব্যক্তি দুনিয়া লাভের উদ্দেশ্যে দ্বীন শিক্ষা করবে, সে আখেরাতে জান্নাত পাবে না। বরং তার সুগন্ধও পাবে না। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ تَعَلَّمَ عِلْماً مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللهِ – عَزَّ وَجَلَّ – لاَ يَتَعَلَّمُهُ إلاَّ لِيُصِيبَ بِهِ عَرَضاً مِنَ الدُّنْيَا ، لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الجَنَّةِ يَوْمَ القِيَامَةِ)) يَعْنِي : رِيحَهَا. رواه أَبُو داود

“যে বিদ্যা দ্বারা মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ করা যায়, তা যদি একমাত্র সামান্য পার্থিব স্বার্থ লাভের উদ্দেশ্যে কেউ শিক্ষা করে, তাহলে সে কিয়ামতের দিনে জান্নাতের সুগন্ধটুকুও পাবে না।” *(আবূ দাঊদ)*

লোক-দেখানির এমন কাজ এক প্রকার শির্ক। যে শির্ক আমলকেই সমূলে নষ্ট ক’রে দেয়। মহানবী ﷺ বলেন,

((قَالَ اللّٰه تَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيهِ مَعِي غَيْـرِي تَرَكْتُـهُ وَشِرْكَهُ)) . رواه مسلم

মহান আল্লাহ বলেন, “আমি সমস্ত অংশীদারদের চাইতে অংশীদারি (শির্ক) থেকে অধিক অমুখাপেক্ষী। কেউ যদি এমন কাজ করে, যাতে সে আমার সঙ্গে অন্য কাউকে অংশীদার স্থাপন করে, তাহলে আমি তাকে তার অংশীদারি (শির্ক) সহ বর্জন করি।” (অর্থাৎ তার আমলই নষ্ট ক’রে দিই।) *(মুসলিম)*

সুতরাং নির্ঘাত জাহান্নাম ছাড়া আর কী? তাও আবার সকল অপরাধীদের আগে!

কিয়ামতে সর্বপ্রথম হিসাব

কিয়ামতে হিসাব হবে সকল অপরাধের। কোন কোন অপরাধ থাকবে মহান আল্লাহর হক বিষয়ক। আর সে বিষয়ের সর্বপ্রথম হিসাব হবে নামাযের।

বান্দা পাঁচ অক্তের নামায পড়েছিল কি না?

সঠিকভাবে পড়েছিল কি না?

সঠিক সময়ে পড়েছিল কি না?

আন্তরিকতা ও একাগ্রতার সাথে পড়েছিল কি না?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ العَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلاَتُهُ ، فَإنْ صَلَحَتْ ، فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ ، وَإنْ فَسَدَتْ ، فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ، قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : اُنْظُرُوا هَلْ لِعَبدِي مِن تَطَوُّعٍ، فَيُكَمَّلُ مِنْهَا مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ تَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَا)).

“নিশ্চয় কিয়ামতের দিন বান্দার যে কাজের হিসাব সর্বপ্রথম নেওয়া হবে তা হচ্ছে তার নামায। সুতরাং যদি তা সঠিক হয়, তাহলে সে পরিত্রাণ পাবে। আর যদি (নামায) পণ্ড ও খারাপ হয়, তাহলে সে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যদি তার ফরয (ইবাদতের) মধ্যে কিছু কম পড়ে যায়, তাহলে প্রভু বলবেন, ‘দেখ তো! আমার বান্দার কিছু নফল (ইবাদত) আছে কি না, যা দিয়ে ফরযের ঘাটতি পূরণ ক’রে দেওয়া হবে?’ অতঃপর তার অবশিষ্ট সমস্ত আমলের হিসাব ঐভাবে গৃহীত হবে। *(আবূ দাঊদ ৮৬৪, তিরমিযী ৪১৩, নাসাঈ ৪৬৫, ইবনে মাজাহ ১৪২৫নং)*

আর কোন কোন অপরাধ থাকবে বান্দার হক বিষয়ক। আর সে বিষয়ের সর্বপ্রথম হিসাব হবে খুনের। কেন সে মানুষ খুন করেছিল? কোন্ অপরাধে প্রাণহত্যা করেছিল?

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন,

(إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحْكَمُ بَينَ الْعِبَادِ فِي الدِّمَاء).

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন মানুষের যে বিষয়ে সর্বপ্রথম বিচার-নিষ্পত্তি হবে তা হল খুন। *(বুখারী ৬৫৩৩নং, মুসলিম ১৬৭৮, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ)*

হত ব্যক্তি কাল কিয়ামতে খুনীর বিচার চাইবে আল্লাহর কাছে। নবী ﷺ বলেন, “কিয়ামতের দিন খুন হয়ে নিহত ব্যক্তি তার খুনীকে তার মাথা ও কপালের চুল ধরে উপস্থিত করবে। আর সে সময় তার শিরাগুলো থেকে রক্তের ফিনকি ছুটবে। সে বলবে, ‘হে আমার প্রতিপালক! আপনি একে জিজ্ঞাসা করুন, ও কেন আমাকে খুন করেছে?’ পরিশেষে সে তাকে আরশের নিকটবর্তী করবে।” *(তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনে মাজাহ, সহীহুল জামে’ ৮০৩১নং)*

কোন কোন অপরাধ থাকবে আল্লাহর নিয়ামত বিষয়ক। আর সে বিষয়ক সর্বপ্রথম হিসাব নেওয়া হবে সুস্বাস্থ্য ও ঠান্ডা পানির।

(إِنَّ أَوَّلَ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ الْعَبْدَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ النَّعِيمِ أَنْ يُقَالَ لَهُ أَلَمْ نُصِحَّ لَكَ جِسْمَكَ وَنُرْوِيَـكَ مِـنْ الْمَاءِ الْبَارِدِ).

অর্থাৎ, কিয়ামতে বান্দাকে নিয়ামত সম্পর্কে সর্বপ্রথম যে প্রশ্ন করা হবে, তা হল এই যে, আমি কি তোমার শরীরকে সুস্থ রাখিনি এবং ঠান্ডা পানি দিয়ে পিপাসামুক্ত করিনি? (তিরমিযী ৩৩৫৮, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ৫৩৯নং)

সুতরাং মানুষের কাছে আছে তো সে সব প্রশ্নের সদুত্তর?

কিয়ামতে সুপারিশ লাভের সবচেয়ে বেশি হকদার কে?

গোনাহগার মুসলিমদের জন্য কিয়ামতের ভীষণ মাঠে সুপারিশ হবে। তবে ৪টি শর্তে ঃ-

১। সুপারিশকারীর সুপারিশ করার ক্ষমতা থাকতে হবে।

২। যার জন্য সুপারিশ করা হবে, তাকে তাওহীদবাদী মুসলিম হতে হবে।

৩। যার জন্য সুপারিশ করা হবে, তার প্রতি আল্লাহর সন্তুষ্টি থাকতে হবে।

৪। সুপারিশ করার জন্য আল্লাহর অনুমতি হতে হবে।

বলা বাহুল্য, আমাদের নবী ﷺ উম্মতের জন্য সুপারিশ করবেন। তিনিই তার যোগ্য অধিকারী?

কিন্তু সেই সুপারিশ পাওয়ার সবচেয়ে বড় হকদার কে? সেই সুপারিশ লাভের বড় সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে?

একদা মহানবী ﷺ-কে জিজ্ঞাসা করা হল, 'আপনার শাফাআত-লাভের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যবান ব্যক্তি কে?' উত্তরে তিনি বললেন,

((أَسْعَدُ النَّاسِ بِشَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَالَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ خَالِصًا مِنْ قَلْبِهِ أَوْ نَفْسِهِ)).

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন আমার শাফাআত-লাভের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্যবান ব্যক্তি সেই হবে, যে নিজ অন্তর বা মন থেকে বিশুদ্ধভাবে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলেছে। *(বুখারী ৯৯নং)*

অর্থাৎ, যথার্থভাবে কালেমা পাঠ করেছে। তার সঠিক অর্থ জেনেছে। তার অর্থে পরিপূর্ণ একীন ও প্রত্যয় রেখেছে। বিশুদ্ধচিত্তে (ইখলাসের সাথে) তা পাঠ করেছে। তার অর্থ-বিশ্বাসে সত্যনিষ্ঠা ও অকপটতা বজায় রেখেছে। তার নির্দেশের প্রতি প্রেম ও ভক্তি রেখেছে। তার নির্দেশ, দাবী ও অধিকারের অনুবর্তী হয়েছে। প্রত্যাখ্যানহীনভাবে সাদরে গ্রহণ করেছে। অর্থাৎ, সে শির্কমুক্ত হয়ে তাওহীদবাদী মুসলিম থেকে যথাসাধ্য আমল করেছে।

উযূ করার পর পায়খানা-দ্বার হতে হাওয়া খারিজ হলে যেমন উযূর কোন দাম থাকে না, তেমনি কালেমা পড়ার পর শির্ক করলে কালেমা পড়ার কোন মূল্য থাকে না।

কালেমার শ্লোগানদাতা মুশরিকরা কিয়ামতে নবীর সুপারিশ পাবে না। মুশরিকদের জন্যই মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلاَ شَفِيعٍ يُطَاعُ}

(١٨) سورة غافر

অর্থাৎ, ওদেরকে আসন্ন দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও, যখন দুঃখে-কষ্টে ওদের হৃদয় কণ্ঠাগত হবে। সীমালংঘনকারীদের জন্য অন্তরঙ্গ কোন বন্ধু নেই এবং এমন কোন সুপারিশকারীও নেই, যার সুপারিশ গ্রাহ্য করা হবে। *(মু'মিন ঃ ১৮)*

পরকালে সবচেয়ে দীর্ঘকাল ক্ষুধার্ত কে?

মহান আল্লাহর একটি সাধারণ বিধান এই যে, দুনিয়াতে যে অবৈধ সুখ উপভোগ করবে, পরকালে সে সেই সুখ থেকে বঞ্চিত হবে। যেমন দুনিয়াতে যে মদপান করবে, আখেরাতে সে মদপান থেকে বঞ্চিত হবে। যে পুরুষ দুনিয়াতে রেশমবস্ত্র পরবে, আখেরাতে সে পরতে পাবে না। যে ব্যক্তি সোনা-রূপার পাত্রে পানাহার করবে, সে ব্যক্তি আখেরাতে তা পাবে না। তেমনি দুনিয়াতে যারা অতিরিক্তভাবে পানভোজনে পরিতৃপ্ত হবে, আখেরাতে তারা অতি ক্ষুধায় কাতর হবে। *(ত্বাবারানী, সঃ তারগীব ২ ১৩৮-নং)*

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ شِبَعًا فِي الدُّنْيَا ، أَطْوَلُهُمْ جُوعًا فِي الآخِرَةِ).

অর্থাৎ, দুনিয়াতে সবচেয়ে বেশি পরিতৃপ্ত যে ব্যক্তি, সে আখেরাতে সবচেয়ে বেশি ক্ষুধাগ্রস্ত হবে। *(ইবনে মাজাহ ৩৩৫১, সিঃ সহীহাহ ৩৪৩নং)*

আবূ জুহাইফা ؓ বলেন, একদা গোশ্‌ত-রুটির সারীদ খেয়ে নবী ﷺ-এর কাছে এসে ঢেকুর তুললে তিনি তাঁকে বললেন, "ওহে! আমাদের নিকট তোমার ঢেকুর তোলা বন্ধ কর। কারণ, দুনিয়ায় যে অধিক পরিতৃপ্ত হয়, কিয়ামতে সে অধিক ক্ষুধার্ত হবে।" *(তিরমিযী ২৪৭৮, ইবনে মাজাহ ৩৩৫০নং)*

এ হাদীস শোনার পর তিনি মরণকাল পর্যন্ত কোনদিন পেট পুরে খানা খাননি। তিনি রাতের খাবার খেলে, দুপুরের খাবার খেতেন না এবং দুপুরের খাবার খেলে আর রাতের খাবার খেতেন না। *(আল-ইস্তিআব ৪/ ১৬২০, উসুদুল গাবাহ ৪/৪০০)*

যেহেতু অতিরিক্ত পানাহার করলে মানুষের শরীর মোটা হয়, দেহ ভারী হয়, ঘুম বেশি হয়, আলস্য বেশি হয়, আয়ুর বর্কত কমে যায়, আল্লাহর ইবাদতে গাফলতি ও শৈথিল্য আসে, সেহেতু শাস্তি স্বরূপ পরকালে তাকে খিদে দিয়ে ভোগানো হবে।

তাছাড়া অতিরিক্ত পান-ভোজন শরীয়তে নিন্দিত, চিকিৎসা-বিজ্ঞানেও নিন্দিত। মহানবী ﷺ বলেছেন, "কোন মানুষ এমন কোন পাত্র পূর্ণ করেনি, যা পেটের চাইতে মন্দ। মানুষের জন্য তার মেরুদন্ড সোজা (শক্ত) রাখার উদ্দেশ্যে কয়েক গ্রাসই যথেষ্ট। যদি অধিক খেতেই হয়, তাহলে পেটের এক তৃতীয়াংশ খাবারের জন্য, এক তৃতীয়াংশ পানীয়র জন্য এবং এক তৃতীয়াংশ শ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য হওয়া উচিত।" *(তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হিব্বান, সঃ তারগীব ২ ১৩৫নং)*

মীযানে সবচেয়ে বেশি ভারী

কিয়ামতের দিন বিচারের জন্য মীযান বা দাঁড়িপাল্লা থাকবে। যাতে তিনটি জিনিস ওজন করা হবে ঃ আমল, আমলকারী ও আমলনামা। সেদিন "যার (নেকীর) পাল্লা ভারী হবে, সে তো সন্তোষময় জীবনে (সুখে) থাকবে। কিন্তু যার পাল্লা হাল্‌কা হবে, তার স্থান হবে হাবিয়াহ (দোযখ)।" (ক্বা-রিআহ ঃ ৬-৯)

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٨) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُم بِمَا كَانُواْ بِآيَاتِنَا يظْلِمُونَ} (٩) سورة الأعراف

অর্থাৎ, সেদিন ওজন ঠিকভাবেই করা হবে, সুতরাং যাদের ওজন ভারী হবে, তারাই সফলকাম হবে। আর যাদের ওজন হালকা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, যেহেতু তারা আমার নিদর্শনাবলীকে প্রত্যাখ্যান করত। (আ'রাফ ঃ ৮-৯)

{فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (١٠٢) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ} (١٠٣) سورة المؤمنون

অর্থাৎ, সুতরাং যাদের পাল্লা ভারী হবে, তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে, তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে। *(মু'মিনূন ঃ ১০২-১০৩)*

পাল্লা ভারী করার জন্য ভারী কিছু চাই। যে জিনিস সবচাইতে ভারী, সেই জিনিস সংগ্রহ করা চাই। জানা চাই, কোন্ জিনিস নেকীর পাল্লায় সবচেয়ে বেশি ভারী। মহানবী ﷺ আমাদেরকে জানিয়েছেন,

((مَا مِنْ شَيْءٍ أَثْقَلُ فِي مِيزَانِ العَبدِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ حُسْنِ الخُلُقِ، وَإِنَّ اللّه يُبْغِضُ الفَاحِشَ البَذِيَّ)). رواه الترمذي

"কিয়ামতের দিন (নেকী) ওজন করার দাঁড়ি-পাল্লায় সচ্চরিত্রতার চেয়ে কোন বস্তুই অধিক ভারী হবে না। আর আল্লাহ তাআলা অশ্লীল ও চোয়াড়কে ঘৃণা করেন।" *(তিরমিযী ২০০২নং)*

অন্য বর্ণনায় আছে,

(مَا مِنْ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي الْمِيزَانِ أَثْقَلُ مِنْ حُسْنِ الْخُلُقِ وَإِنَّ صَاحِبَ حُسْنِ الْخُلُقِ لَيَبْلُغُ بِهِ دَرَجَةَ صَاحِبِ الصَّوْمِ وَالصَّلَاةِ).

অর্থাৎ, এমন কোন জিনিস নেই, যা সুন্দর চরিত্রের চাইতে মীযানে বেশি ভারী হতে পারে। আর সুন্দর চরিত্রের অধিকারী নিজ চরিত্রের মাধ্যমে (নফল) নামায-রোযা-ওয়ালার মর্যাদায় পৌঁছতে পারে। (ঐ ২০০৩নং)

একদা তিনি আবূ যার্র ﵁-কে বললেন, "হে আবূ যার্র! আমি কি তোমাকে দু'টি জিনিসের কথা বলে দেব না, যা পিঠে বহন করতে (আমল করতে) খুব সহজ এবং মীযানে অন্যান্যের তুলনায় সব চাইতে বেশি ভারী?" আবূ যার্র বললেন, 'অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন,

«عَلَيْكَ بِحُسْنِ الْخُلُقِ، وَطُولِ الصَّمْتِ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا عَمِلَ الخَلَائِقُ بِمِثْلِهِمَا».

"তুমি সুন্দর চরিত্র ও দীর্ঘ নীরবতা অবলম্বন কর। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ আছে, সারা সৃষ্টি উক্ত দুই (আমলের) মতো অন্য কিছু আমল করতে পারে না।" *(আবূ য়্যা'লা, বাইহাক্বী, ত্বাবারানী, বায্যার, সিঃ সহীহাহ ১৯৩৮)*

অবশ্যই, সুন্দর চরিত্র দিয়ে মানুষ পৃথিবী জয় করতে পারে। মানুষের মাঝে সবার শীর্ষে নিজের স্থান ক'রে নিতে পারে। সুতরাং সুন্দর চরিত্র পরকালের সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয় হবে না কেন?

সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কারা?

মহান আল্লাহ কুরআন মাজীদে অনেক প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত লোকের কথা বলেছেন। যেমন--

{الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (٢٧) سورة البقرة

অর্থাৎ, যারা আল্লাহর সাথে দৃঢ় অঙ্গীকারে আবদ্ধ হওয়ার পর তা ভঙ্গ করে, যে সম্পর্ক অক্ষুন্ন রাখতে আল্লাহ আদেশ করেছেন, তা ছিন্ন করে এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়ায়, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (বাক্বারাহ ঃ ২৭)

{الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلاَوَتِهِ أُوْلَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمن يَكْفُرْ بِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (١٢١) سورة البقرة

অর্থাৎ, আমি যাদেরকে কিতাব (ধর্মগ্রন্থ) দান করেছি, তারা যথাযথভাবে তা (ধর্মগ্রন্থ) পাঠ করে থাকে। তারাই তাতে (ধর্মগ্রন্থ) বিশ্বাস করে। আর যারা তা অমান্য করে, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্ত। (বাক্বারাহ ঃ ১২১)

{مَن يَهْدِ اللّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (١٧٨) سورة الأعراف

অর্থাৎ, আল্লাহ যাকে পথ দেখান, সেই পথ পায় এবং যাদেরকে তিনি বিপথগামী করেন, তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। (আ'রাফ ঃ ১৭৮)

{لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ اللَّهِ أُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (٦٣) الزمر

অর্থাৎ, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর চাবিসমূহ তাঁরই নিকট। যারা আল্লাহর আয়াতকে (বাক্যকে) অস্বীকার করে, তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত। (যুমার ঃ ৬৩)

{اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّيْطَانُ فَأَنسَاهُمْ ذِكْرَ اللَّهِ أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ } (١٩) سورة المجادلة

অর্থাৎ, শয়তান তাদের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করেছে, ফলে তাদেরকে ভুলিয়ে দিয়েছে আল্লাহর স্মরণ। তারা হল শয়তানের দল। জেনে রেখো যে, নিশ্চয় শয়তানের দলই ক্ষতিগ্রস্ত। (মুজাদালাহ্ ঃ ১৯)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ} (٩) سورة المنافقون

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ হতে উদাসীন না করে, যারা উদাসীন হবে তারাই তো ক্ষতিগ্রস্ত।

(মুনাফিক্বুন ঃ ৯)

{وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٨٥) آل عمران

অর্থাৎ, যে কেউ ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম অন্বেষণ করবে, তার পক্ষ হতে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না। আর সে হবে পরলোকে ক্ষতিগ্রস্তদের দলভুক্ত। (আলে ইমরান ঃ ৮৫)

{وَلاَ تَكُونَنَّ مِنَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ بِآيَاتِ اللّهِ فَتَكُونَ مِنَ الْخَاسِرِينَ } (٩٥) سورة يونس

অর্থাৎ, আর অবশ্যই ঐসব লোকদেরও অন্তর্ভুক্ত হয়ো না, যারা আল্লাহর আয়াতগুলোকে মিথ্যা মনে করেছে, নচেৎ তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। (ইউনুস ঃ ৯৫)

{وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ} (٦٥) سورة الزمر

অর্থাৎ, তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী (প্রত্যাদেশ) করা হয়েছে যে, যদি তুমি আল্লাহর অংশী স্থির কর, তাহলে অবশ্যই তোমার কর্ম নিষ্ফল হবে এবং তুমি হবে ক্ষতিগ্রস্তদের শ্রেণীভুক্ত। (যুমার ঃ ৬৫)

কিন্তু সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত কারা?

মহান আল্লাহ বলেছেন,

{قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا (١٠٣) الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا} (١٠٤) سورة الكهف

অর্থাৎ, তুমি বল, 'আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দেব তাদের, যারা কর্মে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত ?' ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পন্ড হয়, যদিও তারা মনে ক'রে যে, তারা সৎকর্ম করছে। (কাহফ ঃ ১০৩-১০৪)

আর এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্ত তারাই, যারা চিরস্থায়ী জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত।

{أُوْلَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُواْ أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُواْ يَفْتَرُونَ (٢١) لاَ جَرَمَ أَنَّهُمْ فِي الآخِرَةِ هُمُ الأَخْسَرُونَ} (٢٢) سورة هود

অর্থাৎ, এ (কাফের)রা সেই লোক, যারা নিজেরা নিজেদেরকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। আর যেসব (উপাস্য) তারা মিথ্যা কল্পনা ক'রে রেখেছিল, তাদের থেকে তারা সবাই উধাও হয়ে গেছে। এটা সুনিশ্চিত যে, পরকালে তারাই হবে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (হূদ ঃ ২১-২২)

{أُوْلَئِكَ الَّذِينَ لَهُمْ سُوءُ الْعَذَابِ وَهُمْ فِي الْآخِرَةِ هُمُ الْأَخْسَرُونَ} (٥) سورة النمل

অর্থাৎ, এদের জন্য আছে নিকৃষ্ট শাস্তি এবং এরাই পরকালে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত। (নামল ঃ ৫)

{فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ قُلْ إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا ذَلِكَ

هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ} (١٥) سورة الزمر

অর্থাৎ, অতএব তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যার ইচ্ছা তার ইবাদত (দাসত্ব) কর।' বল, 'আসল ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই; যারা কিয়ামতের দিন নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিজনবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জেনে রাখ, এটিই সুস্পষ্ট ক্ষতি।' (যুমার ঃ ১৫)

{وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُّقِيمٍ} (٤٥)

অর্থাৎ, জাহান্নামের নিকট উপস্থিত করা হলে তুমি ওদেরকে দেখতে পাবে অপমানে অবনত হয়ে ওরা চোরা দৃষ্টিতে তাকাচ্ছে। আর যারা বিশ্বাস করেছে তারা বলবে, 'আসল ক্ষতিগ্রস্ত তো তারাই; যারা কিয়ামতের দিন নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিজনবর্গকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে। জেনে রেখো, সীমালংঘনকারীরা অবশ্যই স্থায়ী শাস্তি ভোগ করবে।' (শূরা ঃ ৪৫)

কিয়ামতে সবচেয়ে লম্বা গর্দান কার?

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((المُؤَذِّنُونَ أَطْوَلُ النَّاسِ أَعْنَاقاً يَوْمَ القِيَامَةِ)). رواه مسلم

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিনে সমস্ত লোকের চাইতে মুআয্যিনদের গর্দান লম্বা হবে।" *(মুসলিম)*

এর অর্থ, বাস্তবেই তাদের ঘাড় লম্বা ও উঁচু হবে। আর তা হবে তাদের ঘাড় উঁচু ক'রে আযান দেওয়ার জন্য।

অথবা প্রচুর সওয়াব ও আল্লাহর রহমত দেখে তারা সে সবের প্রতি অধীর আগ্রহে গর্দান লম্বা ক'রে উৎকণ্ঠিত হবে।

অথবা সূর্য নিকটবর্তী হওয়ার ফলে মানুষের প্রচুর ঘাম ও তার পুকুর তৈরি হবে। ফলে অনেকের নাক-বরাবর ঘাম পৌঁছে যাবে। কিন্তু মুআয্যিনদের গর্দান উঁচু করা হবে, যাতে তারা ঘামে কষ্ট না পায়।

অথবা তারা সেদিন লোকেদের সর্দার হবে। যেহেতু আরবের লোকে সর্দারদেরকে 'দীর্ঘ-গ্রীবা' বলে আখ্যায়ন ক'রে থাকে।

অথবা সেদিন প্রতিদান দেখে তাদের এত খুশি ও আনন্দ হবে যে, গর্বে তাদের গর্দান সুউন্নত হবে।

অথবা তাদেরকে কোন প্রকার লজ্জা ও লাঞ্ছনা গ্রাস করবে না, তাই তাদের গর্দান ঝুঁকে নিচু থাকবে না, উঁচু থাকবে।

অথবা পিপাসার ফলে তাদের গর্দান অবনত হবে না। যেহেতু তারা পিপাসিত হবে না এবং তার ফলে গর্দান খাড়া ক'রে অবস্থান করবে।

অথবা তাদের অনুসারী ও অনুগামী অনেক হবে। দুনিয়াতে যেমন তাদের আহবানে

সাড়া দিয়ে বহু লোক মসজিদে এসেছিল, তেমনি কিয়ামতেও তাদের অনুসারী হবে।

অথবা তারা আমলের দিক থেকে সবার সেরা হবে।

অথবা দুনিয়াতে যেমন তারা আযান দিয়ে লোক মাঝে প্রসিদ্ধ ছিল, তেমনি কিয়ামতে প্রসিদ্ধ হবে। দুনিয়াতে সম্মান ও শ্রদ্ধার ফলে তাদের গর্দান ও মাথা যেমন উন্নত ছিল, কিয়ামতেও উন্নত থাকবে।

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্দুর রহমান ইবনে স্বা'স্বাআহ হতে বর্ণিত, একদা আবূ সাঈদ খুদরী ﷺ তাঁকে বললেন, 'আমি তোমাকে দেখছি যে, তুমি ছাগল ও মরুভূমি ভালবাসো। সুতরাং তুমি যখন তোমার ছাগলে বা মরুভূমিতে থাকবে আর নামাযের জন্য আযান দেবে, তখন উচ্চ স্বরে আযান দিয়ো। কারণ মুআয্যিনের আযান ধ্বনি যতদূর পর্যন্ত মানব-দানব ও অন্যান্য বস্তু শুনতে পাবে, কিয়ামতের দিন তারা তার জন্য সাক্ষ্য দেবে।' আবূ সাঈদ ﷺ বলেন, 'আমি এটি আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট শুনেছি।' *(বুখারী)*

মহানবী ﷺ বলেছেন, "লোকেরা যদি জানত যে, আযান দেওয়া ও নামাযের প্রথম সারিতে দাঁড়াবার কী মাহাত্ম্য আছে, অতঃপর (তাতে অংশগ্রহণের জন্য) যদি লটারি ব্যতিরেকে অন্য কোন উপায় না পেত, তবে তারা অবশ্যই সে ক্ষেত্রে লটারির সাহায্য নিত। (অনুরূপ) তারা যদি জানত যে, আগে আগে মসজিদে আসার কী ফযীলত, তাহলে তারা সে ব্যাপারে প্রতিযোগিতা করত। আর তারা যদি জানত যে, এশা ও ফজরের নামায (জামাতে) পড়ার ফযীলত কত বেশি, তাহলে মাটিতে হামাগুড়ি দিয়ে বা পাছা ছেঁচড়ে আসতে হলেও তারা অবশ্যই আসত।" *(বুখারী-মুসলিম)*

মুআয্যিন এক হিসাবে আল্লাহর দিকে আহবানকারী। যেহেতু সে এক মহান ইবাদতের দিকে মানুষকে প্রত্যহ পাঁচবার আহবান করে। আর সে জন্য তার কথাও সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ ও সুন্দর কথা। আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّن دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ} (٣٣) فصلت

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মানুষকে আহবান করে, সৎকাজ করে এবং বলে, 'আমি তো আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম)' তার অপেক্ষা কথায় উত্তম আর কোন্ ব্যক্তি? (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩৩)

পরকালের পথে সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয়

আমরা সবাই এক-একজন পথিক। পরকালের দিকে এক-পা এক-পা ক'রে অগ্রসর হচ্ছি। ইহকালের জীবনে পরকালের জন্য প্রস্তুতি নিতে হবে, পথের পাথেয় ও সাথের সম্বল সঙ্গে নিতে হবে। নচেৎ শূন্য হাতে গেলে বড় বিপদে পড়তে হবে।

আমরা সঊদী আরবে বসবাস করি, সঙ্গে 'ইক্বামা' আছে তাই ভয় নেই। তা না থাকলে আমাদেরকে এ দেশ থেকে বহিষ্কৃত হতে হবে। ট্রেনে সফর করলে টিকিট কেটে ট্রেন চড়তে হবে, নচেৎ চেকারের হাতে ধরা খেয়ে কারাগারে যেতে হবে।

বলা বাহুল্য, জ্ঞানিগণ সফরের পূর্বে প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, পথিক হওয়ার পূর্বে অজানা-

অচেনা পথের জন্য পাথেয় সঙ্গে বেঁধে নেন।

বারা' বিন আযেব ﷺ বলেন, একদা আমরা আল্লাহর রসূল ﷺ-এর সাথে ছিলাম। হঠাৎ তিনি একদল লোক দেখতে পেয়ে বললেন, "কী ব্যাপারে ওরা জমায়েত হয়েছে?" কেউ বলল, 'একজনের কবর খোঁড়ার জন্য জমায়েত হয়েছে।' এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ ঘাবড়ে উঠলেন। তিনি তড়িঘড়ি সঙ্গীদের ত্যাগ করে কবরের নিকট পৌঁছে হাঁটু গেড়ে বসে গেলেন। তিনি কী করছেন তা দেখার জন্য আমি তাঁর সামনে খাড়া হলাম। দেখলাম, তিনি কাঁদছেন। পরিশেষে তিনি এত কাঁদলেন যে, তার চোখের পানিতে মাটি পর্যন্ত ভিজে গেল। অতঃপর তিনি আমাদের দিকে মুখ তুলে বললেন, হে আমার ভাই সকল! এমন দিনের জন্য তোমরা প্রস্তুতি নাও।" *(বুখারী, তারীখ, ইবনে মাজাহ ৪১৯৫, আহমাদ ৪/৩৯৪, সিলসিলাহ সহীহাহ ১৭৫১ নং)*

প্রস্তুতি কীভাবে নিতে হবে?

ঈমানের সাথে নেক আমলের পুঁজি সংগ্রহ করতে হবে।

মহানবী ﷺ বলেন, "তিনটি জিনিস মরণ-পথের পথিকের অনুগমন করে; তার পরিজন, আমল এবং ধন-সম্পদ। কিন্তু দু'টি জিনিস (মধ্যপথ হতে) ফিরে আসে এবং অবশিষ্ট একটি তার সঙ্গ দেয়; তার পরিজন ও ধন-সম্পদ ফিরে আসে এবং তার আমল (কৃতকর্ম) তার সাথী হয়।" *(বুখারী ৬৫১৪, মুসলিম ২৯৬০নং)*

কিন্তু সে পথের সর্বশ্রেষ্ঠ পাথেয় কী?

ইবনে শিমাসাহ হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, আম্র ইবনে আ'স ﷺ-এর মরণোন্মুখ সময়ে আমরা তাঁর নিকটে উপস্থিত হলাম। তিনি অনেক ক্ষণ ধরে কাঁদতে থাকলেন এবং দেওয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিলেন। এরূপ অবস্থা দেখে তাঁর এক ছেলে বলল, 'আব্বাজান! আপনাকে কি রাসূলুল্লাহ ﷺ অমুক জিনিসের সুসংবাদ দেননি? আপনাকে কি রাসূলুল্লাহ ﷺ অমুক জিনিসের সুসংবাদ দেননি?' এ কথা শুনে তিনি তাঁর চেহারা সামনের দিকে ক'রে বললেন,

(إِنَّ أَفْضَلَ مَا نُعِدُّ شَهَادَةُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ ، وَأَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ).

আমাদের সর্বোত্তম পুঁজি হল, এই সাক্ষ্য প্রদান করা যে, আল্লাহ ছাড়া কোন সত্য উপাস্য নেই এবং মুহাম্মাদ ﷺ আল্লাহর রসূল। আমি তিনটি স্তর অতিক্রম করেছি।

(এক) আমার চেয়ে রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর প্রতি বড় বিদ্বেষী আর কেউ ছিল না। তাঁকে হত্যা করার ক্ষমতা অর্জন করাই ছিল আমার তৎকালীন সর্বাধিক প্রিয় বাসনা। যদি (দুর্ভাগ্যক্রমে) তখন মারা যেতাম, তাহলে নিঃসন্দেহে আমি জাহান্নামী হতাম।

(দুই) তারপর যখন আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে ইসলাম প্রক্ষিপ্ত করলেন, তখন নবী ﷺ-এর নিকট হাযির হয়ে নিবেদন করলাম, 'আপনার ডান হাত প্রসারিত করুন। আমি আপনার হাতে বায়আত করতে চাই।' বস্তুতঃ তিনি ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু আমি আমার হাত টেনে নিলাম। তিনি বললেন, "আমর! কী ব্যাপার?" আমি নিবেদন করলাম, 'একটি শর্ত আরোপ করতে চাই।' তিনি বললেন, "শর্তটি কী?" আমি বললাম, 'আমাকে

ক্ষমা করা হোক---শুধু এতটুকুই।’ তিনি বললেন, “তুমি কি জানো না যে, ইসলাম পূর্বের সমস্ত পাপরাশিকে মিটিয়ে দেয়, হিজরত পূর্বের সমস্ত পাপরাশিকে নিশ্চিহ্ন ক’রে ফেলে এবং হজ্জ্বও পূর্বের পাপসমূহ ধ্বংস ক’রে দেয়?”

তখন থেকে রাসূলুল্লাহ ﷺ অপেক্ষা অধিক প্রিয় মানুষ আর কেউ নেই। আর আমার দৃষ্টিতে তাঁর চেয়ে সম্মানীয় ব্যক্তি আর কেউ নেই। তাঁকে সম্মান ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করার অবস্থা এরূপ ছিল যে, তাঁর দিকে নয়নভরে তাকাতে পারতাম না। যার ফলে আমাকে কেউ যদি প্রশ্ন করে যে, ‘আল্লাহর রসূল ﷺ-এর গঠনাকৃতি কিরূপ ছিল?’ তাহলে আমি তা বলতে পারব না। এ অবস্থায় যদি আমার মৃত্যু হয়ে যেত, তাহলে আশা ছিল যে, আমি জান্নাতবাসীদের অন্তর্ভুক্ত হতাম।

(তিন) তারপর বহু দায়িত্বপূর্ণ বিষয়াদির খপ্পরে পড়লাম। জানি না, তাতে আমার অবস্থা কী? সুতরাং আমি মারা গেলে কোন মাতমকারিণী অথবা আগুন যেন অবশ্যই আমার (জানাযার) সাথে না থাকে। তারপর যখন আমাকে দাফন করবে, তখন যেন তোমরা আমার কবরে অল্প অল্প ক’রে মাটি দেবে। অতঃপর একটি উট যবেহ ক’রে তার মাংস বন্টন করার সময় পরিমাণ আমার কবরের পাশে অপেক্ষা করবে। যাতে আমি তোমাদের সাহায্যে নিঃসঙ্গতা দূর করতে পারি এবং আমার প্রভুর প্রেরিত ফিরিশ্তাদের সঙ্গে কীরূপ বাক্-বিনিময় করি, তা দেখে নিই। *(মুসলিম)*

আনাস ইবনে মালেক ؓ বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে জিজ্ঞেস করল, ‘হে আল্লাহর রসূল! কিয়ামত কবে ঘটবে?’ তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, “তুমি এর জন্য কী প্রস্তুতি নিয়েছ?” সে বলল, ‘আল্লাহ ও তাঁর রসূলের ভালবাসা।’ তিনি বললেন, “তুমি যাকে ভালবাস, তারই সাথী হবে।” (বুখারী ও মুসলিম)

উভয়ের অন্য এক বর্ণনায় আছে, “আমি বেশি নামায-রোযা ও সাদকাহর মাধ্যমে প্রস্তুতি নিতে পারিনি। কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে ভালবাসি। (তিনি বললেন, তুমি যাকে ভালবাস, তারই সাথী হবে।)”

আর মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَتَزَوَّدُواْ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى وَاتَّقُونِ يَا أُوْلِي الأَلْبَابِ} (١٩٧) سورة البقرة

অর্থাৎ, তোমরা (পরকালের) পাথেয় সংগ্রহ কর এবং আত্মসংযমই শ্রেষ্ঠ পাথেয়। হে জ্ঞানিগণ! তোমরা আমাকেই ভয় কর। *(সূরা বাক্বারাহ ১৯৭ আয়াত)*

কিয়ামতে আনীত সর্বশ্রেষ্ঠ আমল

কিয়ামতের মাঠে, হাশরের ময়দানে মানুষের ঈমান-সহ আমল দেখা হবে। আমল ওজন করা হবে। যার আমল বেশি হবে এবং নেকির পাল্লা ভারী হবে, সে পরিত্রাণ পাবে এবং চিরসুখময় জান্নাত পাবে।

অবশ্য আমলের পরিমাণ উদ্দিষ্ট নয়। বরং আমলের উৎকৃষ্টতাই উদ্দিষ্ট। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَهُوَ الَّذِي خَلَق السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاء لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلاً} (٧) سورة هود

অর্থাৎ, আর তিনিই সেই মহান সত্তা যিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীকে ছ দিনে সৃষ্টি করেছেন এবং সেই সময় তাঁর আরশ পানির উপরে ছিল; যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা ক’রে নেন, তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম কে? (হূদ ঃ ৭)

{إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَّهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا } (٧) سورة الكهف

অর্থাৎ, পৃথিবীর উপর যা কিছু আছে আমি সেগুলিকে ওর শোভা করেছি মানুষকে এই পরীক্ষা করবার জন্য যে, তাদের মধ্যে কর্মে কে উত্তম। (কাহফ ঃ ৭)

{الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ} (٢) سورة الملك

অর্থাৎ, যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করবার জন্য; কে তোমাদের মধ্যে কর্মে সর্বোত্তম? আর তিনি পরাক্রমশালী, বড় ক্ষমাশীল। (মুল্‌ক ঃ ২)

পরন্তু সকল ইবাদতই উৎকৃষ্ট আমল। কিন্তু কিছু আমল আছে, যা উৎকৃষ্টতম। তা কী?

১। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

((مَنْ قَالَ حِيْنَ يُصْبِحُ وَحينَ يُمْسِي : سُبْحَانَ اللهِ وَبِحَمْدِهِ ، مِئَةَ مَرَّةٍ ، لَمْ يَأَتِ أَحَدُ يَوْمَ القِيَامَةِ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ ، إِلاَّ أَحَدٌ قَالَ مِثْلَ مَا قَالَ أَوْ زَادَ)) . رواه مسلم

“যে ব্যক্তি সকাল-সন্ধ্যায় ‘সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ’ একশতবার পাঠ করবে, কিয়ামতের দিনে ওর চাইতে উত্তম আমল কেউ আনতে পারবে না। কিন্তু যদি কেউ তার সমান বা তার থেকে বেশি সংখ্যায় ঐ তাসবীহ পাঠ ক’রে থাকে (তাহলে ভিন্ন কথা)।” *(মুসলিম)*

২। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((مَنْ قَالَ لاَ إلهَ إلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ ؛ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ، فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ كَانَتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرِ رِقَابٍ وكُتِبَتْ لَهُ مِئَةُ حَسَنَةٍ ، وَمُحِيَتْ عَنْهُ مِئَةُ سَيِّئَةٍ ، وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمَهُ ذَلِكَ حَتَّى يُمْسِي ، وَلَمْ يَأتِ أَحَدٌ بِأَفْضَلَ مِمَّا جَاءَ بِهِ إلاَّ رَجُلٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْهُ)) . وَقَالَ : ((مَنْ قَالَ سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ ، فِي يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ ، حُطَّتْ خَطَايَاهُ ، وَإنْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ البَحْرِ)) . متفقٌ عَلَيْهِ

“লা ইলাহা ইল্লাল্লা-হু অহদাহু লা শারীকা লাহ, লাহুল মুলকু অলাহুল হামদু অহুয়া আলা কুল্লি শাইয়িন ক্বাদীর।’

অর্থাৎ, এক অদ্বিতীয় আল্লাহ ব্যতীত আর কোন সত্য উপাস্য নেই। তাঁর কোন শরীক নেই। (বিশাল) রাজ্যের তিনিই সার্বভৌম অধিপতি। তাঁরই যাবতীয় স্তুতিমালা এবং সমস্ত বস্তুর উপর তিনি ক্ষমতাবান।

যে ব্যক্তি এই দুআটি দিনে একশবার পড়বে, তার দশটি গোলাম আযাদ করার সমান

নেকী অর্জিত হবে, একশ'টি নেকী লিপিবদ্ধ করা হবে, তার একশ'টি গুনাহ মোচন করা হবে, উক্ত দিনের সন্ধ্যা অবধি তা তার জন্য শয়তান থেকে বাঁচার রক্ষামন্ত্র হবে এবং তার চেয়ে সেদিন কেউ উত্তম কাজ করতে পারবে না। কিন্তু যদি কেউ তার চেয়ে বেশী আমল করে তবে।"

তিনি আরো বলেছেন, "যে ব্যক্তি দিনে একশবার *'সুবহানাল্লাহি অবিহামদিহ'* পড়বে তার গুনাহসমূহ মোচন করা হবে; যদিও তা সমুদ্রের ফেনা বরাবর হয়।" *(বুখারী-মুসলিম)*

৩। আবূ হুরাইরাহ ﷺ থেকে বর্ণিত, একদা গরীব মুহাজির (সাহাবাগণ) নবী ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'হে আল্লাহর রসূল! ধনীরাই তো উঁচু উঁচু মর্যাদা ও চিরস্থায়ী সম্পদের অধিকারী হয়ে গেল।' তিনি বললেন, "তা কীভাবে?" তাঁরা বললেন, 'তারা নামায পড়ছে যেমন আমরা নামায পড়ছি, তারা রোযা রাখছে যেমন আমরা রাখছি। কিন্তু তারা সাদকাহ করছে, আর আমরা করতে পারছি না। তারা দাস মুক্ত করছে, আর আমরা পারছি না।' এ কথা শুনে আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "আমি কি তোমাদেরকে এমন জিনিস শিখিয়ে দেব না, যার দ্বারা তোমরা তোমাদের অগ্রবর্তীদের মর্যাদা লাভ করবে, তোমাদের পরবর্তীদের থেকে অগ্রবর্তী থাকবে এবং তোমাদের মত কাজ যে করবে, সে ছাড়া অন্য কেউ তোমাদের চাইতে শ্রেষ্ঠতর হতে পারবে না?" তাঁরা বললেন, 'অবশ্যই হে আল্লাহর রসূল! (আমাদেরকে তা শিখিয়ে দিন।)' তিনি বললেন, "প্রত্যেক (ফরয) নামাযের পরে ৩৩ বার ক'রে 'সুবহানাল্লাহ', 'আল্লাহু আকবার' ও 'আল-হামদু লিল্লাহ' বলবে।" অতঃপর গরীব মুহাজিরগণ পুনরায় আল্লাহর রসূল ﷺ-এর নিকট এসে বললেন, 'আমরা যে আমল করছি, সে আমল আমাদের ধনী ভাইয়েরা শোনার পর তারাও আমল শুরু ক'রে দিয়েছে? (এখন তো তারা আবার আমাদের চেয়ে অগ্রবর্তী হয়ে যাবে।)' আল্লাহর রসূল ﷺ বললেন, "এ হল আল্লাহর অনুগ্রহ; তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন।" (বুখারী, মুসলিম)

সর্বোৎকৃষ্ট পরিণাম

ঈমানদারদের জন্য রয়েছে শুভ পরিণাম। পরহেযগারদের জন্য রয়েছে সুন্দর পরিণাম। ধৈর্যশীলদের জন্য রয়েছে প্রকৃষ্ট পরিণাম। এ পৃথিবীতে পরিণাম কারো মন্দ হলেও পরকালে রয়েছে উৎকৃষ্ট পরিণাম। আর শেষ ভালো যার, সব ভালো তার। মূসা ﵇ তাঁর সম্প্রদায়কে বলেছিলেন,

{اسْتَعِينُوا بِاللّهِ وَاصْبِرُواْ إِنَّ الأَرْضَ لِلّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاء مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ} (١٢٨)

অর্থাৎ, আল্লাহর নিকট সাহায্য প্রার্থনা কর এবং ধৈর্য ধারণ কর, রাজ্য তো আল্লাহরই! তিনি তাঁর দাসদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা তার উত্তরাধিকারী করেন এবং সাবধানীদের জন্যই তো শুভ পরিণাম! (আ'রাফ ঃ ১২৮)

মহান আল্লাহ তাঁর শেষ নবীকে বলেছেন,

{تِلْكَ مِنْ أَنبَاء الْغَيْبِ نُوحِيهَا إِلَيْكَ مَا كُنتَ تَعْلَمُهَا أَنتَ وَلاَ قَوْمُكَ مِن قَبْلِ هَـذَا فَاصْبِرْ إِنَّ

الْعَاقِبَةَ لِلْمُتَّقِينَ} (٤٩) سورة هود

অর্থাৎ, এটা হচ্ছে অদৃশ্য সংবাদসমূহের অন্তর্ভুক্ত, যা আমি তোমার কাছে অহী (প্রত্যাদেশ) মারফত পৌঁছিয়ে দিচ্ছি, ইতিপূর্বে এটা না তুমি জানতে, আর না তোমার সম্প্রদায় জানত। সুতরাং তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয় শুভ পরিণাম সংযমশীলদের জন্যই। (হূদ ঃ ৪৯)

{وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَّحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى } (١٣٢)

অর্থাৎ, তুমি তোমার পরিবারবর্গকে নামাযের আদেশ দাও এবং ওতে অবিচলিত থাক। আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাই না। আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দিয়ে থাকি। আর সংযমীদের জন্য শুভ পরিণাম। (ত্বা-হা ঃ ১৩২)

পরকালের সুখলাভই উৎকৃষ্ট পরিণাম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ}

অর্থাৎ,এ পরলোকের আবাস; যা আমি নির্ধারিত করি তাদেরই জন্য যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। সাবধানীদের জন্য শুভ পরিণাম। (ক্বাসাস্ব ঃ ৮৩)

{وَالَّذِينَ صَبَرُواْ ابْتِغَاء وَجْهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ الصَّلاَةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلاَنِيَةً وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةَ أُوْلَئِكَ لَهُمْ عُقْبَى الدَّارِ} (٢٢) سورة الرعد

অর্থাৎ, আর যারা তাদের প্রতিপালকের মুখমণ্ডল (দর্শন বা সন্তুষ্টি) লাভের জন্য ধৈর্য ধারণ করে, নামায সুপ্রতিষ্ঠিত করে, আমি তাদেরকে যে জীবনোপকরণ দিয়েছি, তা হতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে এবং যারা ভাল দ্বারা মন্দকে প্রতিহত করে, তাদের জন্য শুভ পরিণাম (পরকালের গৃহ); (রা'দ ঃ ২২)

জান্নাতের প্রবেশাধিকার লাভই সুন্দর পরিণাম। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{مَّثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ أُكُلُهَا دَآئِمٌ وِظِلُّهَا تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَواْ وَّعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ} (٣٥) سورة الرعد

অর্থাৎ, সাবধানীদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তার বিবরণ এইরূপ ঃ ওর পাদদেশে নদী প্রবাহিত, ওর ফলমূলসমূহ ও ছায়া চিরস্থায়ী; যারা সাবধানী এটা তাদের পরিণাম। আর অবিশ্বাসীদের পরিণাম হল জাহান্নাম। (রা'দ ঃ ৩৫)

কিন্তু কিছু কাজকে মহান আল্লাহ শুভ পরিণামের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট বলেছেন। আর তার একটি হল, কোন বিষয়ে মতভেদ হলে তা কিতাব ও সুন্নাহর দিকে ফিরিয়ে দেওয়া, সে বিষয়ে সঠিক ফায়সালা পাওয়ার জন্য কিতাব ও সুন্নাহর দিকে রুজু করা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (٥٩)

অর্থাৎ, হে বিশ্বাসিগণ! যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালে বিশ্বাস কর, তাহলে তোমরা আল্লাহর অনুগত হও, রসূল ও তোমাদের নেতৃবর্গ (ও উলামা)দের অনুগত হও। আর যদি কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটে, তাহলে সে বিষয়কে আল্লাহ ও রসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও। এটিই হল উত্তম এবং পরিণামে প্রকৃষ্টতর। (নিসা ঃ ৫৯)

অন্য একটি কাজ হল, সঠিক মাপ বা ওজন দেওয়া। ওজনে কম না দেওয়া, দাঁড়ি না মারা। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَأَوْفُوا الْكَيْلَ إِذا كِلْتُمْ وَزِنُواْ بِالقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً} (٣٥) الإسراء

অর্থাৎ, মেপে দেয়ার সময় পূর্ণরূপে মাপো এবং সঠিক দাঁড়ি-পাল্লায় ওজন কর, এটাই উত্তম ও পরিণামে উৎকৃষ্টতম। (বানী ইস্রাঈল ঃ ৩৫)

সর্বশ্রেষ্ঠ বাসস্থান ও সর্বোৎকৃষ্ট বিশ্রামাগার

সর্বশ্রেষ্ঠ বাসস্থান ও সর্বোৎকৃষ্ট বিশ্রামাগার হবে বেহেশ্‌তে মু'মিনদের। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا} (٢٤) سورة الفرقان

অর্থাৎ, সেদিন জান্নাতবাসীদের বাসস্থান হবে উৎকৃষ্ট এবং বিশ্রামস্থল হবে মনোরম। (ফুরক্বান ঃ ২৪)

অবশ্যই জান্নাত চিরসুখের বাসস্থান। সে সুখের কথা মহান আল্লাহ এক স্থানে বলেছেন, "বন্ধুরা সেদিন একে অপরের শত্রু হয়ে পড়বে, তবে সাবধানীরা নয়। হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবে না। যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিলে এবং আত্মসমর্পণকারী (মুসলিম) ছিলে। তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। স্বর্ণের থালা ও পান পাত্র নিয়ে ওদের মাঝে ফিরানো হবে, সেখানে রয়েছে এমন সমস্ত কিছু, যা মন চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। এটিই জান্নাত, তোমরা তোমাদের কর্মের ফলস্বরূপ যার অধিকারী হয়েছ। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তা থেকে তোমরা আহার করবে। (যুখরুফ ঃ ৬৭-৭৩)

{فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاء بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ} (١٧) سورة السجدة

কেউই জানে না তার জন্য তার কৃতকর্মের বিনিময় স্বরূপ নয়ন-প্রীতিকর কী পুরস্কার লুকিয়ে রাখা হয়েছে। (সাজদাহ ঃ ১৭)

জান্নাতের কম-সংখ্যক বাসিন্দা

নারী-পুরুষ উভয় জাতির মধ্য থেকে জান্নাতের বাসিন্দা নারীদের সংখ্যা নেহাতই কম হবে। এমনিতে জাহান্নামীদের তুলনায় জান্নাতীদের সার্বিক সংখ্যা নিতান্ত কম।

(কিয়ামতে ফিরিশ্তাদেরকে হুকুম করা হবে যে,) 'তোমরা ওদেরকে থামাও। তাদেরকে

জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।' তারপর বলা হবে, 'ওদের মধ্য থেকে জাহান্নামে প্রেরিতব্য দল বের ক'রে নাও।' জিজ্ঞাসা করা হবে, 'কত থেকে কত?' বলা হবে, 'প্রতি হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জন।' বস্তুতঃ এ দিনটি এত ভয়ংকর হবে যে, শিশুকে বৃদ্ধ বানিয়ে দেবে এবং এ দিনেই (মহান আল্লাহ নিজ) পায়ের গোছা অনাবৃত করবেন। *(মুসলিম)*

কেবল এই উম্মতের জান্নাতীর হার হবে তিয়াত্তরের একটি। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ইয়াহুদী একাত্তর দলে এবং খ্রিষ্টান বাহাত্তর দলে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। আর এই উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। যার মধ্যে একটি ছাড়া বাকী সব ক'টি জাহান্নামে যাবে।" অতঃপর ঐ একটি দল প্রসঙ্গে জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "তারা হল জামাআত। যে জামাআত আমি ও আমার সাহাবা যে মতাদর্শের উপর আছি, তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে।" *(সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১৭১-১৭২, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০৩, ১৪৯২নং)*

সুতরাং এর মধ্য থেকে মহিলাদের হার যে কত হতে পারে, তা অনুমেয়।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ أَقَلَّ سَاكِنِي الْجَنَّةِ النِّسَاءُ).

অর্থাৎ, নিশ্চয় জান্নাতের বাসিন্দাদের সবচেয়ে কম সংখ্যা হবে মহিলাদের। *(আহমাদ, মুসলিম ৭১১৮নং)*

নবী ﷺ বলেছেন, "আমি বেহেশ্তের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই গরীবদের দল। আর দোযখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই মহিলা।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

কেন জান্নাতবাসী মহিলাদের সংখ্যা কম হবে?

একদা নবী ﷺ (মহিলাদেরকে সম্বোধন করে) বললেন, "হে মহিলা সকল! তোমরা সাদকাহ-খয়রাত করতে থাক ও অধিকমাত্রায় ইস্তিগফার কর। কারণ আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীরূপে দেখলাম।" একজন মহিলা নিবেদন করল, 'আমাদের অধিকাংশ জাহান্নামী হওয়ার কারণ কী? হে আল্লাহর রসূল!' তিনি বললেন, "তোমরা অভিশাপ বেশি কর এবং নিজ স্বামীর অকৃতজ্ঞতা কর। বুদ্ধি ও ধর্মে অপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও বিচক্ষণ ব্যক্তির উপর তোমাদের চাইতে আর কাউকে বেশি প্রভাব খাটাতে দেখিনি।" মহিলাটি আবার নিবেদন করল, 'বুদ্ধি ও ধর্মের ক্ষেত্রে অপূর্ণতা কী?' তিনি বললেন, "দু'জন নারীর সাক্ষ্য একটি পুরুষের সাক্ষ্য সমতুল্য। আর (প্রসবোত্তর খুন ও মাসিক আসার) দিনগুলিতে মহিলা নামায পড়া বন্ধ রাখে।" *(মুসলিম)*

মহানবী ﷺ বলেন, "আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হল মহিলা।" সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন, 'তা কী জন্য হে আল্লাহর রসূল?' তিনি বললেন, "তাদের কুফরীর জন্য।" তাঁরা বললেন, 'আল্লাহর সাথে কুফরী?' তিনি বললেন, "(না, তারা স্বামীর কুফরী (অকৃতজ্ঞতা) ও নিমকহারামি করে। তাদের কারো প্রতি যদি সারা জীবন এহসানী কর, অতঃপর সে যদি তোমার নিকট সামান্য ত্রুটি লক্ষ্য করে, তাহলে ব'লে বসে, 'তোমার নিকট কোন মঙ্গল দেখলাম না আমি!" *(বুখারী, মুসলিম)*

মহানবী ﷺ বলেন, "তোমাদের সবচেয়ে খারাপ মেয়ে তারা, যারা বেপর্দা, অহংকারী,

তারা কপট নারী, তাদের মধ্যে লাল রঙের ঠোঁট ও পা-বিশিষ্ট কাকের মত (বিরল) সংখ্যক বেহেশ্তে যাবে।" *(বাইহাক্বী)*

এ হল আদম-কন্যাদের সংখ্যার কথা। নচেৎ বেহেশ্তী হূরীদের নিয়ে মহিলাদের সংখ্যাই বেশি হবে জান্নাতে।

জান্নাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী

জান্নাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী হবে পুরুষের দল।

একদা নবী ﷺ (মহিলাদেরকে সম্বোধন ক'রে) বললেন, "হে মহিলা সকল! তোমরা সাদকাহ-খয়রাত করতে থাক ও অধিকমাত্রায় ইস্তিগফার কর। কারণ আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীরূপে দেখলাম।" *(মুসলিম)*

মহানবী ﷺ বলেন, "আমি দেখলাম, জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসী হল মহিলা।" *(বুখারী, মুসলিম)*

জান্নাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী হবে দুর্বল ও দরিদ্র লোকেরা।

নবী ﷺ বলেছেন, "আমি বেহেশ্তের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই গরীবদের দল। আর দোযখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই মহিলা।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

"আমি তোমাদেরকে জান্নাতীদের সম্পর্কে অবহিত করব না কি? (তারা হল) প্রত্যেক দুর্বল ব্যক্তি এবং এমন ব্যক্তি যাকে দুর্বল মনে করা হয়। সে যদি আল্লাহর নামে কসম খায়, তাহলে তা তিনি নিশ্চয়ই পুরা ক'রে দেন। আমি তোমাদেরকে জাহান্নামীদের সম্পর্কে অবহিত করব না কি? (তারা হল) প্রত্যেক রূঢ় স্বভাব, কঠিন হৃদয় দাম্ভিক ব্যক্তি।" *(বুখারী, মুসলিম)*

"একদা জান্নাত ও জাহান্নামের বিবাদ হল। জাহান্নাম বলল, 'আমার মধ্যে উদ্ধত ও অহংকারী লোকেরা থাকবে।' আর জান্নাত বলল, 'দুর্বল ও দরিদ্র ব্যক্তিরা আমার ভিতরে বসবাস করবে।' অতঃপর আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে ফায়সালা করলেন যে, 'তুমি জান্নাত আমার রহমত, তোমার দ্বারা আমি যার প্রতি ইচ্ছা অনুগ্রহ করব। এবং তুমি জাহান্নাম আমার শাস্তি, তোমার দ্বারা আমি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেব। আর তোমাদের উভয়কেই পরিপূর্ণ করা আমার দায়িত্ব।" *(মুসলিম)*

"জান্নাতে এমন লোক প্রবেশ করবে যাদের অন্তর হবে পাখীর অন্তরের মত।" *(মুসলিম)*

জান্নাতের সংখ্যাগরিষ্ঠ অধিবাসী হবে উম্মতে মুহাম্মাদী।

ইবনে মাসউদ ﷺ বলেন, আমরা প্রায় চল্লিশ জন মানুষ রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে একটি তাঁবুতে ছিলাম। অতঃপর তিনি বললেন, তোমরা কি পছন্দ কর যে, তোমরা জান্নাতবাসীদের এক চতুর্থাংশ হবে? আমরা বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তোমরা কি জান্নাতবাসীদের এক তৃতীয়াংশ হতে পছন্দ কর? আমরা বললাম, জী হ্যাঁ। তিনি বললেন, তাঁর শপথ, যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ আছে, আমি দৃঢ়ভাবে প্রত্যাশী যে, জান্নাতবাসীদের

অর্ধেক তোমরাই হবে। এটা এ জন্য যে, শুধুমাত্র মুসলিম প্রাণ ছাড়া অন্য কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না। আর মুশরিকদের তুলনায় তোমরা এরূপ, যেরূপ কালো বলদের গায়ে (একটি) সাদা লোম অথবা লাল বলদের গায়ে (একটি) কালো লোম। *(বুখারী ও মুসলিম)*

এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, জান্নাতীদের ১২০ কাতার হবে, তার মধ্যে ৮০ কাতার মুহাম্মাদী উম্মাতের এবং বাকী ৪০ অন্যান্য উম্মতদের। *(তিরমিযী, দারেমী, বাইহাক্বী)* সুতরাং জান্নাতীদের দুই-তৃতীয়াংশ এই উম্মতের লোক হবে।

জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ দুয়ার

জান্নাতের বিভিন্ন স্তর আছে। আট প্রকার জান্নাতের বিভিন্ন দুয়ার বা দরজা আছে। কিছু দরজা আছে ডান দিকে, কিছু আছে বাম দিকে এবং কিছু দরজা আছে মাঝে। মা-বাপকে খুশী করতে পারলে মাঝের দরজা দিয়ে জান্নাতে যাওয়া যাবে।

জান্নাতে বিভিন্ন মানের দরজা আছে, মা-বাপকে সন্তুষ্ট ক'রে মৃত্যু-বরণ করতে পারলে সর্বশ্রেষ্ঠ দুআর লাভ হবে।

পক্ষান্তরে মা-বাপের অবাধ্যতা করার মাধ্যমে, তাদেরকে দুঃখ-কষ্ট দেওয়ার মাধ্যমে সে দরজা ভেঙ্গে ফেললে জান্নাতে যাওয়া বড় দুরূহ কর্ম হয়ে দাঁড়াবে।

আবূ দারদা ﷺ বলেন, এক ব্যক্তি তাঁর নিকট এসে বলল, 'আমার এক স্ত্রী আছে। আমার মা তাকে ত্বালাক দেওয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন।' আবূ দার্দা বললেন, আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে বলতে শুনেছি,

(الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ ، فَإِنْ شِئْتَ ، فَأَضِعْ ذَلِكَ البَابَ ، أَو احْفَظْهُ).

"পিতা-মাতা জান্নাতের দুয়ারসমূহের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ দুয়ার। সুতরাং তুমি যদি চাও, তাহলে এ দুয়ারকে নষ্ট কর অথবা তার রক্ষণাবেক্ষণ কর।" *(তিরমিযী, ১৯০০, ইবনে মাজাহ ২০৮৯নং)*

বলা বাহুল্য, মা-বাপের আনুগত্য সর্বশ্রেষ্ঠ দরজা দিয়ে বেহেশ্তে প্রবেশাধিকার লাভের একটি কারণ। অবশ্য সে আনুগত্য হবে বৈধ বিষয়ে। অবৈধ বিষয়ে আনুগত্য করা বৈধ নয়। যেমন মা-বাপ অকারণে খেয়াল-খুশিবশতঃ বউকে তালাক দিতে আদেশ করলে সে আদেশ পালন করা বৈধ নয়। অবশ্য কারণ যথার্থ হলে তাদের আদেশ পালন ক'রে বউকে তালাক দেওয়া জরুরী।

উক্ত হাদীস থেকে এ কথাও বুঝা যায় যে, পিতা-মাতার খিদমত করা এবং তাদেরকে সুখে রাখা সর্বশ্রেষ্ঠ আমল, যার দ্বারা চিরসুখময় বেহেশ্ত লাভ করা যায়।

জান্নাতীদের সর্বপ্রথম আপ্যায়ন

মেহমান প্রথম পৌঁছলে প্রাথমিক আপ্যায়ন হয় বিভিন্ন পরিবেশের মানুষদের বিভিন্ন খাদ্য ও পানীয় দিয়ে। মহান আল্লাহ জান্নাতী মেহমানদের প্রাথমিক আপ্যায়নের ব্যবস্থা রেখেছেন

বিশেষ এক খাদ্য দ্বারা। জান্নাতের সর্বপ্রথম আতিথ্য হবে তিমি মাছের কলিজার অতিরিক্ত অংশ দ্বারা। *(বুখারী ৩৩২৯, মুসলিম ৩১৫নং)*

আল্লাহর রসূল ﷺ বলেছেন,

(أَوَّلُ شَيْءٍ يأْكلهُ أهْلُ الجنَةِ زِيادَة كَبِدِ الحوتِ).

অর্থাৎ, জান্নাতীরা প্রথম যে জিনিস আহার করবে, তা হল তিমি মাছের অতিরিক্ত কলিজা। (ত্বায়ালিসী, সঃ জামে' ২৫৬৭নং)

সর্বোচ্চ মর্যাদা

সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তিনি, যিনি কুরআন শিখে অপরকে শিক্ষা দেন। কুরআন তিলাঅত করেন এবং কুরআনের নির্দেশানুযায়ী আমল করেন। নিশ্চয় তিনি বড় মর্যাদার অধিকারী।

কত উঁচু মর্যাদা পাবেন তিনি?

পরকালে যত আয়াত পড়তে পারবেন, গণনায় তত বেশি বেহেশ্তী মর্যাদায় উন্নীত হতে থাকবেন তিনি!

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((يُقَالُ لِصَاحِبِ الْقُرْآنِ : اِقْرَأْ وَارْتَقِ وَرَتِّلْ كَمَا كُنْتَ تُرَتِّلُ فِي الدُّنْيَا ، فَإِنَّ مَنْزِلَتَكَ عِنْدَ آخِرِ آيَةٍ تَقْرَؤُهَا)). رواه أَبُو داود والترمذي

"পবিত্র কুরআনের পাঠক, হাফেয ও তার উপর আমলকারীকে (কিয়ামতের দিন) বলা হবে, 'তুমি (কুরআন কারীম) পড়তে থাক ও চড়তে থাক। আর ঠিক সেইভাবে স্পষ্ট ও ধীরে ধীরে পড়তে থাক, যেভাবে দুনিয়াতে পড়তে। কেননা, (জান্নাতের ভিতর) তোমার স্থান ঠিক সেখানে হবে, যেখানে তোমার শেষ আয়াতটি খতম হবে।" *(আবূ দাঊদ, তিরমিযী)*

সবচেয়ে সুন্দর সুর

গান-বাজনার সুর সবচেয়ে বেশি সুন্দর, সবচেয়ে বেশি মধুর, সবচেয়ে বেশি মনোমুগ্ধকর, আল্লাহর স্মরণ থেকে সবচেয়ে বেশি উদাসকারী বলেই তা শরীয়তে হারাম করা হয়েছে। তবে গান যদি অসার বা অশ্লীল না হয়, সুপ্ত যৌন-কামনার উদ্রেককারী না হয়, বাজনাযুক্ত না হয়, ফিতনা সৃষ্টিকারী না হয়, শির্কী বা বিদআতী না হয়, তাহলে তা হারাম নয়।

যেমন প্রেম-ভালোবাসামূলক তথা সুপ্ত যৌন-কামনা উদ্রেককারী গান স্ত্রী কেবল তার স্বামীর নিকট গাইতে পারে। স্বামী-স্ত্রীর মাঝে প্রেমের মেঘমালা ঘনঘটা হবে, তাতে ঝড়-তুফান আসবে, ভালোবাসার বন্যায় তাদের যৌন-জীবন ভাসমান হবে, এটাই তো শরীয়তের কাম্য।

পরলোকেও সুখময় জান্নাতে জান্নাতী স্ত্রীরা তাদের স্বামীর কাছে গান গাইবে। খুব মিষ্টি সুরে, প্রেম-ভেজা মোহন সুরে, চিত্তাকর্ষক শব্দছন্দে গান গাইবে, এমন সুন্দর সুর ও গান

কোন সৃষ্টি কোনদিন শোনেনি।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ أَزْوَاجَ أَهْلِ الْجَنَّةِ لَيُغَنِّينَ أَزْوَاجَهُنَّ بِأَحْسَنِ أَصْوَاتٍ سَمِعَهَا أَحَدٌ قَطٌّ).

অর্থাৎ, নিশ্চয় জান্নাতীদের স্ত্রীরা নিজ নিজ স্বামীর কাছে সবচেয়ে বেশি সুন্দর সুরে এমন গান গাইবে, যা কেউ কোনদিন কানে শোনেনি। (ত্বাবারানী, সিঃ সহীহাহ ৩০০২নং)

তারা যে সব গান গাইবে, তাদের মধ্যে কিছু নিম্নরূপ ঃ-

نَحْنُ الْخَيِّرَاتُ الْحِسَانُ

أَزْوَاجُ قَوْمٍ كِرَامٍ

يَنْظُرْنَ بِقُرَّةِ أَعْيَانٍ

অর্থাৎ, আমরা সুচরিত্রবতী সুন্দরী, সম্মানিত সম্প্রদায়ের পত্নীদল, যে স্ত্রীরা শীতল নজরে দৃষ্টিপাত করে।

আরো একটি গান নিম্নরূপ ঃ-

نَحْنُ الْخَالِدَاتُ فَلا يَمُتْنَهْ

نَحْنُ الآمِنَاتُ فَلا يَخَفْنَهْ

نَحْنُ الْمُقِيمَاتُ فَلا يَظْعَنَّهْ

অর্থাৎ, আমরা সেই চিরস্থায়ী রমণী, যারা কখনই মারা যাবে না, আমরা সেই নিরাপদ রমণী, যারা কখনই ভয় পাবে না, আমরা সেই স্থায়ী বসবাসকারিণী, যারা কখনই চলে যাবে না।

সবার শেষে জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি

সবার শেষে জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি অথবা জান্নাতের সবচেয়ে নিম্নমানের ব্যক্তি কে?

মহানবী ﷺ বলেছেন, "সর্বশেষে যে ব্যক্তি জাহান্নাম থেকে বের হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে, তার সম্পর্কে অবশ্যই আমার জানা আছে। এক ব্যক্তি হামাগুড়ি দিয়ে (বা বুকে ভর দিয়ে) চলে জাহান্নাম থেকে বের হবে। তখন আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলবেন, 'যাও জান্নাতে প্রবেশ কর।' সুতরাং সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত পরিপূর্ণ হয়ে গেছে। ফলে সে ফিরে এসে বলবে, 'হে প্রভু! জান্নাত তো পরিপূর্ণ দেখলাম।' আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলবেন, 'যাও, জান্নাতে প্রবেশ কর।' তখন সে জান্নাতের কাছে এলে তার ধারণা হবে যে, জান্নাত তো ভরে গেছে। তাই সে আবার ফিরে এসে বলবে, 'হে প্রভু! জান্নাত তো ভরতি দেখলাম।' তখন আল্লাহ আয্যা অজাল্ল্ বলবেন, 'যাও জান্নাতে প্রবেশ কর। তোমার জন্য থাকল পৃথিবীর সমতুল্য এবং তার দশগুণ (পরিমাণ বিশাল জান্নাত)! অথবা তোমার জন্য পৃথিবীর দশগুণ (পরিমাণ বিশাল জান্নাত রইল)!' তখন সে বলবে, 'হে প্রভু! তুমি কি আমার সাথে ঠাট্টা করছ? অথবা আমার সাথে হাসি-মজাক করছ অথচ

তুমি বাদশাহ (হাসি-ঠাট্টা তোমাকে শোভা দেয় না)।” বর্ণনাকারী বলেন, তখন আমি রাসূলুল্লাহ ﷺ-কে এমনভাবে হাসতে দেখলাম যে, তাঁর চোয়ালের দাঁতগুলি প্রকাশিত হয়ে গেল। তিনি বললেন, “এ হল সর্বনিম্ন মানের জান্নাতী।” *(বুখারী-মুসলিম)*

সবার শেষে জান্নাতে প্রবেশকারী ব্যক্তি পুল-সিরাতে উঠে-পড়ে চলতে থাকবে। জাহান্নামের আগুন তাকে ঝলসে দেবে। অতঃপর পুল পার হয়ে গেলে জাহান্নামকে সে সম্বোধন ক'রে বলবে, 'বর্কতময় সেই সত্তা, যিনি আমাকে তোমার কবল থেকে মুক্তি দিয়েছেন এবং এমন কিছু দান করেছেন, যা পূর্বাপর কাউকেই দান করেননি। ইতিমধ্যে তাকে একটি গাছ দেখানো হবে। তখন সে বলবে, 'হে প্রভু! আমাকে ঐ গাছের নিকটবর্তী ক'রে দাও। আমি ওর ছায়া গ্রহণ করব এবং ওর (নিকটবর্তী) পানি পান করব।' আল্লাহ বলবেন, 'হে আদম-সন্তান! আমি তোমাকে তা দান করলে সম্ভবতঃ আবার অন্য কিছু চেয়ে বসবে।' সে বলবে, 'না, হে আমার প্রতিপালক! (আমি অন্য কিছু চাইব না।)' সুতরাং সে তাঁর কাছে অঙ্গীকার করবে যে, সে আর অন্য কিছু চাইবে না। আর তার প্রতিপালক ওযর পেশ করবেন। কারণ তিনি জানেন যে, তার পরেও সে যা দেখবে, তা না চেয়ে ধৈর্য ধরতে পারবে না। সুতরাং তিনি তাকে সেই গাছের নিকটে পৌঁছে দেবেন। সে তার ছায়া গ্রহণ করবে এবং তার পানি পান করবে।

অতঃপর তাকে আরো একটি গাছ দেখানো হবে, যা আগের চাইতে আরো সুন্দর। তখন সে বলবে, 'হে প্রভু! আমাকে ঐ গাছের নিকটবর্তী ক'রে দাও। আমি ওর ছায়া গ্রহণ করব এবং ওর (নিকটবর্তী) পানি পান করব। আর তোমার কাছে অন্য কিছু চাইব না।' আল্লাহ বলবেন, 'হে আদম-সন্তান! তুমি কি আমার নিকট এই অঙ্গীকার করনি যে, তুমি অন্য কিছু চাইবে না?' সে বলবে, 'অবশ্যই। তবে হে প্রভু! আমাকে ঐ গাছের নিকটবর্তী ক'রে দাও। আমি আর অন্য কিছু চাইব না।' আল্লাহ বলবেন, 'আমি তোমাকে ওর নিকটে পৌঁছে দিলে সম্ভবতঃ আবার অন্য কিছু চেয়ে বসবে।' সুতরাং সে তাঁর কাছে অঙ্গীকার করবে যে, সে আর অন্য কিছু চাইবে না। আর তার প্রতিপালক আপত্তি পেশ করবেন। কারণ তিনি জানেন যে, তার পরেও সে যা দেখবে, তা না চেয়ে ধৈর্য ধরতে পারবে না। সুতরাং তিনি তাকে সেই গাছের নিকটে পৌঁছে দেবেন। সে তার ছায়া গ্রহণ করবে এবং তার পানি পান করবে।

অতঃপর তাকে আরো একটি গাছ দেখানো হবে, যা আগের দুই গাছের চাইতে বেশি সুন্দর। তখন সে বলবে, 'হে প্রভু! আমাকে ঐ গাছের নিকটবর্তী ক'রে দাও। আমি ওর ছায়া গ্রহণ করব এবং ওর (নিকটবর্তী) পানি পান করব। আর তোমার কাছে অন্য কিছু চাইব না।' আল্লাহ বলবেন, 'হে আদম-সন্তান! তুমি কি আমার নিকট এই অঙ্গীকার করনি যে, তুমি অন্য কিছু চাইবে না?' সে বলবে, 'অবশ্যই। তবে হে প্রভু! আমাকে ঐ গাছের নিকটবর্তী ক'রে দাও। আমি আর অন্য কিছু চাইব না।' আর তার প্রতিপালক আপত্তি পেশ করবেন। কারণ তিনি জানেন যে, তার পরেও সে যা দেখবে, তা না চেয়ে ধৈর্য ধরতে পারবে না। সুতরাং তিনি তাকে সেই গাছের নিকটে পৌঁছে দেবেন। সেখানে সে জান্নাতীদের কথাবার্তার শব্দ শুনতে পাবে। তখন সে বলবে, 'হে প্রভু! আমাকে জান্নাতে প্রবেশ

করাও!' আল্লাহ বলবেন, 'হে আদম-সন্তান! কিসে তোমার চাহিদা পূরণ করবে? তুমি কি এতে খুশি হবে যে, আমি তোমাকে দুনিয়া ও তার সাথে তার সমপরিমাণ জায়গা দেব?' সে বলবে, 'হে প্রভু! তুমি সারা জাহানের প্রতিপালক হয়ে আমার সাথে ঠাট্টা করছ?' আল্লাহ বলবেন, 'আমি তোমার সাথে ঠাট্টা করিনি। বরং আমি যা চাই, তাতে ক্ষমতাবান।' *(আহমাদ ৩৭১৪, মুসলিম ৪৮১নং)*

জান্নাতের সর্বশ্রেষ্ঠ নিয়ামত

জান্নাতের নিয়ামত তথা সুখের কথা অবর্ণনীয়। মহান আল্লাহ এক কথায় সে ইচ্ছাসুখের বর্ণনা দিয়েছেন,

{نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ (٣١) نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ} (٣٢) سورة فصلت

অর্থাৎ, ইহকালে আমরা তোমাদের বন্ধু এবং পরকালেও; সেখানে তোমাদের জন্য সমস্ত কিছু রয়েছে যা তোমাদের মন চায়, যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর। চরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে এ হবে আপ্যায়ন।' (হা-মীম সাজদাহ ঃ ৩১-৩২)

{يُطَافُ عَلَيْهِم بِصِحَافٍ مِّن ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ} (٧١) سورة الزخرف

অর্থাৎ, স্বর্ণের থালা ও পান পাত্র নিয়ে ওদের মাঝে ফিরানো হবে, সেখানে রয়েছে এমন সমস্ত কিছু, যা মন চায় এবং যাতে নয়ন তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। (যুখরুফ ঃ ৭১)

{لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاؤُونَ خَالِدِينَ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعْدًا مَسْؤُولًا} (١٦) سورة الفرقان

অর্থাৎ, সেখানে তারা স্থায়ী হয়ে যা কামনা করবে তাই পাবে; এ প্রতিশ্রুতি পূরণ তোমার প্রতিপালকেরই দায়িত্ব। (ফুরক্বান ঃ ১৬)

কিন্তু মহান আল্লাহর কাছে তা অপেক্ষা আরো বেশি কিছু আছে। রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন,

((إِذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : تُرِيدُونَ شَيئاً أَزِيدُكُمْ ؟ فَيَقُولُونَ : أَلَمْ تُبَيِّضْ وُجُوهَنَا ؟ أَلَمْ تُدْخِلْنَا الجَنَّةَ وَتُنَجِّنَا مِنَ النَّارِ ؟ فَيَكْشِفُ الحِجَابَ ، فَمَا أُعْطُوا شَيْئاً أَحَبَّ إِلَيْهِمْ مِنَ النَّظَرِ إِلَى رَبِّهِمْ)).رواه مسلم .

"জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ ক'রে যাবে, তখন মহান বর্কতময় আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা কি চাও যে, আমি তোমাদের জন্য আরো কিছু বেশি দিই?' তারা বলবে, 'তুমি কি আমাদের মুখমন্ডল উজ্জ্বল ক'রে দাওনি? আমাদেরকে তুমি জান্নাতে প্রবিষ্ট করনি এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি দাওনি?' অতঃপর আল্লাহ (হঠাৎ) পর্দা সরিয়ে দেবেন (এবং তারা তাঁর চেহারা দর্শন লাভ করবে)। সুতরাং জান্নাতের লব্ধ যাবতীয় সুখ-সামগ্রীর মধ্যে

জান্নাতীদের নিকট তাদের প্রভুর দর্শন (দীদার)ই হবে সবচেয়ে বেশী প্রিয়।” *(মুসলিম)*

মহান আল্লাহ বলেন,

{لَهُم مَّا يَشَاؤُونَ فِيهَا وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ} (٣٥) سورة ق

অর্থাৎ, সেখানে তারা যা কামনা করবে তাই পাবে এবং আমার নিকট রয়েছে তারও অধিক (আল্লাহর দর্শন)। (ক্বাফ ঃ ৩৫)

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন, “মহান প্রভু জান্নাতীদেরকে সম্বোধন ক'রে বলবেন, 'হে জান্নাতের অধিবাসিগণ!' তারা উত্তরে বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! আমরা হাযির আছি, যাবতীয় সুখ ও কল্যাণ তোমার হাতে আছে।' তখন আল্লাহ তাআলা বললেন, 'তোমরা কি সন্তুষ্ট হয়েছ?' তারা বলবে, 'আমাদের কী হয়েছে যে, সন্তুষ্ট হব না? হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তো আমাদেরকে সেই জিনিস দান করেছ, যা তোমার কোন সৃষ্টিকে দান করনি।' তখন তিনি বলবেন, 'এর চেয়েও উত্তম কিছু তোমাদেরকে দান করব না কি?' তারা বলবে, 'এর চেয়েও উত্তম বস্তু আর কী হতে পারে?' মহান প্রভু জবাবে বলবেন, 'তোমাদের উপর আমার সন্তুষ্টি অনিবার্য করব। অতঃপর আমি তোমাদের প্রতি কখনো অসন্তুষ্ট হব না।” *(বুখারী-মুসলিম)*

মহানবী ﷺ আরো বলেন, “জান্নাতীরা যখন জান্নাতে প্রবেশ করবে, তখন মহান আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা কি আরও কিছু চাও, যা আমি তোমাদেরকে অতিরিক্ত দান করব?' তারা বলবে, 'হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা দিয়েছ, তার থেকে বেশি বড় আর কী আছে?' আল্লাহ বলবেন, 'আমার সন্তুষ্টি সবচেয়ে বড়।'

{وَعَدَ اللّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ} (٧٢) سورة التوبة

অর্থাৎ, আল্লাহ বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদেরকে এমন উদ্যানসমূহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন, যেগুলোর নিম্নদেশে বইতে থাকবে নদীমালা, সেখানে তারা অনন্তকাল থাকবে। আরও (প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন) চিরস্থায়ী উদ্যানসমূহে (জান্নাতে আদনে) পবিত্র বাসস্থানসমূহের। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড় (নিয়ামত)। এটাই হচ্ছে অতি বড় সফলতা। *(তাওবাহ ঃ ৭২, হাকেম, সিঃ সহীহাহ ১৩৩৬নং)*

অধিকাংশ কোন্ আমল জান্নাতে নিয়ে যাবে?

ঈমান ও তাওহীদের পর সকল ইখলাসপূর্ণ ও সুন্নাহভিত্তিক আমলই জান্নাতে নিয়ে যাবে মানুষকে। একদা এক ব্যক্তি নবী ﷺ-কে বলল, 'আমাকে এমন একটি আমল বলুন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে।' তিনি বললেন, “আল্লাহর বন্দেগী করবে, আর তাঁর সাথে কোন কিছুকে অংশীদার স্থির করবে না। নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখবে।” *(বুখারী, মুসলিম)*

কিন্তু কোন্ আমল অধিকরূপে মানুষকে জান্নাতে প্রবেশাধিকার দান করবে? আবূ হুরাইরা

رضي الله عنه বলেন,

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ الْجَنَّةَ؟ فَقَالَ: « تَقْوَى اللَّهِ، وَحُسْنُ الْخُلُقِ».

অর্থাৎ, অধিকাংশ কোন্ আমল মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এ প্রসঙ্গে আল্লাহর রসূল ﷺ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, “আল্লাহ তাআলার ভয় (পরহেযগারী বা তাক্বওয়া) এবং সচ্চরিত্রতা।” (তিরমিযী ২০০৪নং ,ইবনে হিব্বান ৪৭৬নং, বুখারীর আদব ২৮৯ ও ২৯৪নং, ইবনে মাজাহ ৪২৪৬নং, আহমাদ ২/৩৯২, হাকেম ৪/২৩৪)

পরহেযগারী ও সচ্চরিত্রতার মধ্যে জড়িয়ে আছে সুন্দর সুন্দর যাবতীয় আমল। ঈমান ও ইখলাসের সাথে আমল, পরহেযগারী তথা আল্লাহ-ভীতি এবং সেই সাথে সুচরিত্রের অধিকারী মানুষ আল্লাহর রহমতে অবশ্যই জান্নাতের অধিকারী হবে।

বেহেশ্তী যুবকদের সর্দার

বেহেশ্তী যুবকদের সর্দার হবেন হাসান ও হুসাইন (রাযিয়াল্লাহু আনহুমা)। দুনিয়াতেও তাঁরা সর্বশ্রেষ্ঠ নবীর নাতি, আলী-ফাতেমার ছেলে। বংশ-মর্যাদায় তাঁরা বহু উচ্চে। জান্নাতেও তাঁরা সব যুবকদের শীর্ষে। অর্থাৎ, যে সকল জান্নাতী যুবক অবস্থায় মারা গেছে, তাদের সর্দার হবেন তাঁরা, যদিও তাঁরা যুবক অবস্থায় মারা যাননি। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(اِبْنَايَ هَذَانِ: الحَسَنُ والحُسَيْنُ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الجَنَّةِ، وَأَبُوْهُمَا خَيْرٌ مِنْهُمَا).

অর্থাৎ, আমার এই পুত্রদ্বয় ঃ হাসান ও হুসাইন বেহেশ্তী যুবকদের সর্দার। আর তাদের পিতা তাদের থেকে শ্রেষ্ঠ। (ইবনে আসাকির, সঃ জামে' ৪৭নং)

মহান আল্লাহর নিকট থেকে তাঁকে এ সংবাদ দিয়েছিলেন জিবরীল عليه السلام।

লক্ষণীয় যে, নবী ﷺ হাসান-হুসাইনকে 'পুত্রদ্বয়' বা 'ছেলে দুটি' বলেছেন। বলা বাহুল্য, নাতি বা পোতা নানা-নানী বা দাদা-দাদীর পুত্র বা ছেলে স্বরূপ এবং নাতনী বা পুতিন নানা-নানী বা দাদা-দাদীর মেয়ে স্বরূপ। তাদের সাথে ভাই-বোনের সম্পর্ক ধরে সম্বোধন বা উপহাসের পাত্র ধারণা ক'রে 'বিয়ে করব' বলা ইসলামী পরিবেশে বড়ই লজ্জাকর। কোন পুরুষ কি নিজের মেয়েকে 'বিয়ে করব' বলতে পারে? কোন মহিলা কি নিজের ছেলেকে 'বিয়ে করব' বলতে পারে? তাহলে ছেলের বা মেয়ের ছেলেকে অথবা ছেলে বা মেয়ের মেয়েকে কীভাবে 'বিয়ে করব' বলা যেতে পারে? বিজাতীয় পরিবেশের এমন 'মনগড়া' সম্পর্ক সত্যই বড় আফসোসের।

সংখ্যাগরিষ্ঠ জাহান্নামী

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মানবকুলের অধিকাংশই জাহান্নামবাসী হবে।

'প্রতি হাজারে নয়শ' নিরানব্বই জন।' *(মুসলিম)*

মুশরিকদের তুলনায় মুসলিমরা এরূপ, যেরূপ কালো বলদের গায়ে (একটি) সাদা লোম অথবা লাল বলদের গায়ে (একটি) কালো লোম। *(বুখারী ও মুসলিম)*

কেবল এই উম্মতের জান্নাতীর হার হবে তিয়াত্তরের একটি। আল্লাহর রসূল ﷺ বলেন, "ইয়াহুদী একাত্তর দলে এবং খ্রিষ্টান বাহাত্তর দলে দ্বিধাবিভক্ত হয়েছে। আর এই উম্মত তিয়াত্তর দলে বিভক্ত হবে। যার মধ্যে একটি ছাড়া বাকী সব ক'টি জাহান্নামে যাবে।" *(সুনান আরবাআহ, মিশকাত ১৭১-১৭২, সিলসিলাহ সহীহাহ ২০৩, ১৪৯২নং)*

কুফরী ও শির্ক ছাড়াও এই সংখ্যাগরিষ্ঠতার আরো অন্য কারণ বিশ্লেষণ করা হয়েছে হাদীসে।

জাহান্নামীদের সংখ্যাগরিষ্ঠ হবে মহিলাদের।

একদা নবী ﷺ (মহিলাদেরকে সম্বোধন করে) বললেন, "হে মহিলা সকল! তোমরা সাদকাহ-খয়রাত করতে থাক ও অধিকমাত্রায় ইস্তিগফার কর। কারণ আমি তোমাদেরকে জাহান্নামের অধিকাংশ অধিবাসীরূপে দেখলাম।" *(মুসলিম)*

নবী ﷺ বলেছেন, "আমি বেহেশ্তের মধ্যে তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই গরীবদের দল। আর দোযখের দিকে তাকিয়ে দেখলাম, তার অধিকাংশ অধিবাসীই মহিলা।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

সবচেয়ে বেশি গরম জাহান্নামের আগুন

দুনিয়ার যত আগুন আছে, যত তাপ আছে, সবার চাইতে তাপ বেশি জাহান্নামের আগুনের। মহান আল্লাহ সে কথার ইঙ্গিত দিয়েছেন কুরআনে,

{فَرِحَ الْمُخَلَّفُونَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلاَفَ رَسُولِ اللّهِ وَكَرِهُواْ أَن يُجَاهِدُواْ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللّهِ وَقَالُواْ لاَ تَنفِرُواْ فِي الْحَرِّ قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا لَّوْ كَانُوا يَفْقَهُونَ} (٨١) سورة التوبة

অর্থাৎ, যারা (তাবুক অভিযানে) পশ্চাতে রয়ে গেল, তারা রসূলের বিরুদ্ধাচরণ ক'রে বসে থাকতে আনন্দবোধ করল এবং তারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন ও প্রাণ দিয়ে জিহাদ করাকে অপছন্দ করলো। অধিকন্তু বলতে লাগল, 'তোমরা গরমে (জিহাদে) বের হয়ো না।' তুমি বলে দাও, 'জাহান্নামের আগুন (এর চেয়ে) অধিকতর গরম'; যদি তারা বুঝতে পারত! (তাওবাহ ঃ ৮১)

মহানবী ﷺ বলেন, "আমাদের এই আগুন জাহান্নামের সত্তর অংশের এক অংশ।" বলা হল, 'হে আল্লাহর রসূল! (দুনিয়ার আগুনই) তো যথেষ্ট ছিল!' তিনি বললেন, "তাতে উনসত্তর অংশ বৃদ্ধি করা হয়েছে। প্রত্যেক অংশের উত্তাপ এই আগুনের মতো।" (বুখারী-মুসলিম)

মহানবী ﷺ বলেন, "একদা জাহান্নাম তার প্রতিপালকের কাছে অভিযোগ জানিয়ে বলল, 'হে আমার প্রতিপালক! আমার এক অংশ অপর অংশকে খেয়ে ফেলছে!' সুতরাং তিনি তাকে দু'টি শ্বাস নেওয়ার অনুমতি দিলেন; একটি শীতকালে ও অপরটি গ্রীষ্মকালে। তোমরা তারই কারণে প্রখর গ্রীষ্ম ও প্রচণ্ড শীত অনুভব ক'রে থাক।" *(বুখারী-মুসলিম)*

জাহান্নামের আগুনের প্রচন্ড তাপ হওয়ার কারণে তার রঙ হবে কালো।

সবচেয়ে কঠিন আযাব কার?

এ কথা স্পষ্ট যে, যার পাপ ও অপরাধ যত গুরুতর, তার আযাব ও শাস্তি তত কঠিন থেকে কঠিনতর। আর দুনিয়ার আযাব অপেক্ষা আখেরাতের আযাব অনেক অনেক বেশি কঠিনতর। মহান আল্লাহ বলেছেন,

{وَكَذَلِكَ نَجْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِن بِآيَاتِ رَبِّهِ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَى} (١٢٧)

অর্থাৎ, আর এইভাবেই আমি তাকে প্রতিফল দেব, যে সীমালংঘন করেছে ও তার প্রতিপালকের নিদর্শনে বিশ্বাস স্থাপন করেনি। আর পরকালের শাস্তি অবশ্যই কঠোরতর ও চিরস্থায়ী।' (ত্বা-হা ঃ ১২৭)

অবশ্য হাদীসের উল্লেখ অনুযায়ী কিছু লোকের আযাবকে সবচেয়ে কঠিন বলা হয়েছে। তারা নিম্নরূপ ঃ-

১। যে কোন নবীকে শহীদ করেছে।

২। যাকে কোন নবী হত্যা করেছেন।

৩। বিনা ইল্‌মে মানুষকে ভ্রষ্টকারী মুফতী বা ধর্ম-প্রচারক।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ قَتَلَ نَبِيًّا، أَوْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، أَوْ رَجُلٌ يُضِلُّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، أَوْ مُصَوِّرٌ يُصَوِّرُ التَّمَاثِيلَ).

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন সবচেয়ে বেশি আযাব হবে সেই ব্যক্তির, যে কোন নবীকে হত্যা করেছে অথবা যাকে কোন নবী হত্যা করেছেন। অথবা সেই বক্তি, যে বিনা ইলমে মানুষকে ভ্রষ্ট করে। অথবা সেই নির্মাতা, যে মূর্তি নির্মাণ করে। (আহমাদ, সঃ জামে' ১০০০নং)

৪। যালেম রাজা বা রাষ্ট্রনেতা।

৫। মূর্তিনির্মাতা।

মহানবী ﷺ বলেছেন,

(إِنَّ أَشَدَّ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ قَتَلَ نَبِيًّا، أَوْ قَتَلَهُ نَبِيٌّ، وَإِمَامٌ جَائِرٌ، وَهَؤُلاَءِ الْمُصَوِّرُونَ).

অর্থাৎ, কিয়ামতের দিন জাহান্নামীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি আযাব হবে সেই ব্যক্তির, যে কোন নবীকে হত্যা করেছে অথবা যাকে কোন নবী হত্যা করেছেন। যালেম রাষ্ট্রনেতা এবং ঐ মূর্তিনির্মাতার দল। (ত্বাবারানী, সঃ তারগীব ২১৮৫নং)

অন্য বর্ণনায় আছে,

« إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُونَ ».

"কিয়ামতের দিনে ছবি বা মূর্তি নির্মাতাদের সর্বাধিক কঠিন শাস্তি হবে।" *(বুখারী-মুসলিম)*

আয়েশা (রাযিয়াল্লাহু আন্হা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ ﷺ কোন এক সফর থেকে (বাড়ী) ফিরলেন। সে সময় আমি ঘরের সামনে তাকে একটি পর্দা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম, যাতে অনেক ছবি ছিল। অতঃপর যখন রাসূলুল্লাহ ﷺ তা দেখলেন তখন ছিঁড়ে ফেলে দিলেন। (রাগে) তাঁর চেহারা (লাল)বর্ণ হয়ে গেল। অতঃপর তিনি বললেন, "হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহর নিকট সর্বাধিক কঠিন শাস্তি তাদের হবে, যারা আল্লাহর সৃষ্ট জীবের মত আকৃতি (অঙ্কন বা নির্মাণ) করে।" *(বুখারী ও মুসলিম)*

৬। দুনিয়ায় যে ব্যক্তি মানুষকে সবচেয়ে বেশি কষ্ট দেয়।

যে যালেম যত কষ্ট দেবে, সে যালেম পরকালে তত বেশি শাস্তি ও আযাব ভোগ করবে। মহানবী ﷺ বলেছেন,

(أشَدُّ النَّاسِ عَذاباً لِلنَّاسِ فِي الدُّنْيا أشَدُّ الناسِ عَذاباً عندَ اللَّهِ يَوْمَ القِيامَةِ).

অর্থাৎ, যে ব্যক্তি দুনিয়াতে মানুষকে সবচেয়ে বেশি শাস্তি বা কষ্ট দেয়, কিয়ামতের দিন সে সবচেয়ে বেশি আযাব ভোগ করবে। (আহমাদ, হাকেম, সঃ জামে' ৯৯৮নং)

জাহান্নামের সবচেয়ে হাল্কা আযাব

জাহান্নামে জাহান্নামীকে আগুনের তৈরী একজোড়া জুতা পরানো হবে, যার তাপে মাথার মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে। এই আযাব নবী ﷺ-এর পিতৃব্য আবু তালেবকে দেওয়া হবে। (মুসলিম ৫৩৭, মিশকাত ৫৬৬৭)

মহানবী ﷺ বলেছেন,

« إِنَّ أَهْوَنَ أَهْلِ النَّارِ عَذَابًا مَنْ لَهُ نَعْلاَنِ وَشِرَاكَانِ مِنْ نَارٍ يَغْلِى مِنْهُمَا دِمَاغُهُ كَمَا يَغْلِى الْمِرْجَلُ، مَا يَرَى أَنَّ أَحَدًا أَشَدُّ مِنْهُ عَذَابًا، وَإِنَّهُ لأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا ».

অর্থাৎ, সবচেয়ে কম আযাবের জাহান্নামী ব্যক্তি সেই হবে, যার ফিতা-সহ একজোড়া জুতা হবে। তারই তাপে তার মাথার মগজ হাঁড়ি ফোটার মতো ফুটতে থাকবে। সে ধারণা করবে, তার থেকে বেশি আযাব অন্য কারো হয় না। অথচ তারই আযাব সবার চাইতে হাল্কা! (মুসলিম ৫৩৯নং)

বলা বাহুল্য, যাদের বিছানা হবে আগুনের এবং ঢাকা হবে আগুনের, তাদের অবস্থা কী হবে? আল্লাহ আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

অধিকাংশ কোন্ আমল জাহান্নামে নিয়ে যাবে?

ঈমান ও তাওহীদ-পরিপন্থী যত আমল ও পাপ আছে, সবই জাহান্নামে যাওয়ার কারণ। তওবা না ক'রে মারা গেলে প্রত্যেক অতি মহাপাপ জাহান্নামে নিয়ে যাবে। অনুরূপ মহাপাপ যদি মহান আল্লাহ বান্দার তওহীদের গুণে কিয়ামতে ক্ষমা না করেন, তাহলে তার কারণেও জাহান্নামে যেতে হবে।

কিন্তু কোন্ আমল অধিকরূপে মানুষকে জাহান্নামে প্রবিষ্ট করবে? আবূ হুরাইরা ﷺ

বলেন,

وسُئِلَ (رَسُولُ اللَّهِ ﷺ) عَنْ أَكْثَرِ مَا يُدْخِلُ النَّاسَ النَّارَ؟ فَقَالَ: « الْفَمُ وَالْفَرْجُ ».

অর্থাৎ, অধিকাংশ কোন অঙ্গ মানুষকে দোযখে প্রবেশ করাবে সে বিষয়ে (আল্লাহর রসূল ﷺ) জিজ্ঞাসিত হলে তিনি বললেন, "মুখ এবং যৌনাঙ্গ।" (তিরমিযী ২০০৪নং ,ইবনে হিব্বান ৪৭৬নং, বুখারীর আদব ২৮৯ ও ২৯৪নং, ইবনে মাজাহ ৪২৪৬নং, আহমাদ ২/৩৯২, হাকেম ৪/২৩৪)

যেহেতু মানুষের মুখেই আছে শতাধিক পাপ। আর বেশি পাপ হয় যৌবনকালে যৌনাঙ্গ দ্বারা। এমনকি স্বামী-স্ত্রীর মাঝে যৌন-ক্ষুধা নিবারণেও বহু পাপ হয়ে থাকে।

আরো অনেক কিছুর সবচেয়ে বেশি

১। সবচেয়ে কঠিন অবস্থা তখন সৃষ্টি হয়, যখন আরাম ও স্বস্তির কোন উপায় থাকে না। সবচেয়ে কঠিন পরিস্থিতি তখন সৃষ্টি হয়, যখন কেউ দলীল ও প্রমাণ অগ্রাহ্য করে এবং কোন ওযর-অজুহাত মানতে চায় না।

২। সবচেয়ে ভালো জিনিসই সবচেয়ে বেশি কঠিন।

৩। সবচেয়ে কঠিন কাজ হল, চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

৪। ইমাম শাফেয়ী বলেন, 'সবচেয়ে কঠিন কাজ হল ৩টি; অভাবের সময় দান করা, নির্জনে পরহেযগার হওয়া এবং যার কাছে কোন ভয় বা আশা থাকে, তার নিকট হক কথা বলা।'

৫। একদা আলী ﷺ পুত্র হাসানকে এই বলে উপদেশ দেন, 'বৎস্য আমার ৪টি কথা মনে রেখো ঃ সবচেয়ে বড় ধনবত্তা হল বুদ্ধিমত্তা, সবচেয়ে বড় নিঃস্বতা হল মূর্খতা, সবচেয়ে বড় বাতুলতা হল অহংকার এবং সবচেয়ে উচ্চ বংশ হল সচ্চরিত্রতা।'

৬। রাগের সবচেয়ে বড় প্রতিকার হল, বিলম্ব করা।

৭। ছোটদের প্রতি যে জুলুম করে, সে সবচেয়ে বড় নির্বোধ।

৮। জীবনের সবচেয়ে বড় দুঃখ হল, দুঃখের কথা বলবার বা শুনবার কেউ না থাকা।

৯। সবচেয়ে বড় সুখভোগ মানুষের খোঁজা উচিত নয়, উচিত হল সবচেয়ে পবিত্র সুখভোগ খোঁজা।

১০। একজন নাবিককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, তার জীবনে সবচেয়ে কোন্ সমুদ্র বড় সমুদ্র বলে মনে হয়েছে? প্রত্যুত্তরে নাবিক বলেছিল, 'চোখের পানি।'

১১। সবচেয়ে বড় সুখ অনুভূতি হয় তখন, যখন কোন ভালো কাজ গোপনে করি, অতঃপর তা অকস্মাৎ প্রকাশ পায়।

১২। সবচেয়ে বড় মসীবত হল, মসীবতের সময় ধৈর্য না রাখতে পারা।

১৩। পদ মানুষের যা ক্ষতি করে, সবচেয়ে বড় ক্ষতি করে তার চরিত্র পরিবর্তন ক'রে।

১৪। যেখানে ভালোবাসা, সেখানেই সবচেয়ে বেশি ভয়।

১৫। ভালোবাসাই জীবনে সবচেয়ে বড় ভুল।

১৬। সবচেয়ে বড় ভুল এই যে, ভুল করেও মনে করা যে, আমি ভুল করিনি।

১৭। এ দুনিয়ায় সবচেয়ে বড় তিক্ত কাজ হল, পরের উপর ভরসা করা।

১৮। পরিবেশ ও পরিস্থিতি হল মানুষের সবচেয়ে বড় শিক্ষক।

১৯। সবচেয়ে বড় দুর্বল সে, যে নিজের ভেদ গোপন রাখতে দুর্বল। সবচেয়ে বড় শক্তিশালী সে, যে নিজের রাগ দমন করতে সক্ষম।

২০। সবচেয়ে বড় ধৈর্যশীল সে, যে নিজের অভাব গোপন করে ধৈর্যধারণ করে। আর সবচেয়ে বড় ধনী সে, যে পাওয়া জিনিস নিয়ে সন্তুষ্ট।

২১। যে নিজেকে বেশী জ্ঞানী ও বিজ্ঞ মনে করে, আল্লাহর দোহাই, সে সবচেয়ে বড় বোকা।

২২। গান্ধিজি বলেছেন, 'আপোসের মতভেদ থাকতে পারে। তা বলে তা শত্রুতার পর্যায়ে পৌঁছে দেওয়া উচিত নয়। নচেৎ আমার স্ত্রী আমার সবচেয়ে বড় শত্রুরূপে পরিগণিত হত।'

২৩। মানুষের নিজের মনও কখনো কখনো নিজের বিরুদ্ধে শত্রুতা ক'রে থাকে। মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু তার নিজের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে।

২৪। মানুষ সবচেয়ে বেশি ঝগড়া করে নিজের সাথে।

২৫। রাজনীতি সবচেয়ে বড় জুয়া খেলা।

২৬। একদা মনসূর তাঁর জেলে বন্দী বনী উমাইয়ার কয়দীদেরকে প্রশ্ন করলেন, এই জেলে বন্দী থাকা অবস্থায় তোমাদের সবচেয়ে বড় ক্ষতি কী হবে? বলল, আমাদের ছেলে-মেয়েদের তরবিয়ত। *(উলুউবুল হিম্মাহ ৩৬৭পৃঃ)*

২৭। মানুষের সবচেয়ে বড় আনন্দময় যন্ত্রণা তখন হয়, যখন সে খারাপ থেকে ভাল হয়। যখন সে আগুনের তাপে খাদ ছেড়ে খাঁটি সোনা হয়ে বেরিয়ে আসে। এক দিকে পুরনো খাদের টান ছেঁড়ার যন্ত্রণা, আর অন্য দিকে খাঁটি সোনা হওয়ার আনন্দ তার মনকে সন্তপ্ত ও পুলকিত করে।

২৮। আধুনিক প্রগতিশীল যুগে যে মহিলা দেহে সূর্যের আলো পায়, সে আলোকপ্রাপ্তা। যে মহিলার দেহের যত বেশী অংশে আলো পৌঁছে, সে তত বড় আলোকপ্রাপ্তা। যার দেহ সম্পূর্ণ নগ্ন, সে সবচেয়ে বড় আলোকপ্রাপ্তা!

২৯। সবচেয়ে অক্ষম ব্যক্তি হল সেই, যে বন্ধুত্ব করতে অক্ষম। আর তার চেয়েও অক্ষম হল সেই ব্যক্তি, যে বন্ধুত্ব করে তা হারিয়ে ফেলে।

৩০। একটি ভাল বই হল বর্তমান ও চিরদিনের জন্য সবচেয়ে উৎকৃষ্ট বন্ধু।

৩১। একজন ছাত্রের সবচেয়ে উত্তম সঙ্গী হল কিতাব।

৩২। কর্ম-দক্ষতাই মানুষের সর্বাপেক্ষা বড় বন্ধু।

৩৩। একজন বিজ্ঞ বন্ধু হল সবচেয়ে বড় আশীর্বাদ।

৩৪। এক দার্শনিককে জিজ্ঞাসা করা হল, 'সবচেয়ে লম্বা সফর কার?' বললেন, 'যে একটি বন্ধুর খোঁজে সফর করে।'

৩৫। সবচেয়ে নিকৃষ্ট হল সেই বন্ধু, যে কপটতার সাথে পথ চলে; যে অত্যাচারিতের কাছে কাঁদে এবং অত্যাচারীর কাছে হাসে।

৩৬। ইবনে আব্বাস বলেন, 'আমার কাছে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ বন্ধু সেই ব্যক্তি, যে লোকের

ভিঁড় ঠেলে এসে আমার কাছে বসে। আল্লাহর কসম! তার দেহে মাছি বসলেও আমার মনে বড় কষ্ট হয়।'

৩৭। তোমার স্বপ্ন বাস্তবায়নের সবচেয়ে সুন্দর উপায় হল, ঘুম ছেড়ে জেগে ওঠা।

৩৮। সবচেয়ে বেশী নিঃস্ব সেই, যার কোন আশা নেই।

৩৯। সেই সবচেয়ে বেশী ধনী, যার নিজস্ব বলতে কিছু নেই।

৪০। যার সব আছে কিন্তু ধন নেই, সে দরিদ্র। কিন্তু তার থেকে বেশী দরিদ্র সেই ব্যক্তি, যার ধন ছাড়া অন্য কিছুই নেই।

৪১। মনের দারিদ্র্য বা দীনতা সবচেয়ে বড় বালাই।

৪২। সেই ব্যক্তি সবচেয়ে দুর্বল, যে নিজের ভেদ গোপন রাখতে অক্ষম। সেই ব্যক্তি সবচেয়ে শক্তি মান, যে নিজের রাগ দমন করতে সক্ষম। সেই ব্যক্তি সবচেয়ে ধৈর্যশীল, যে নিজের অভাবের সময় ধৈর্য ধরে। আর সেই ব্যক্তি সবচেয়ে ধনী, যে যা পেয়েছে, তাতেই সন্তুষ্ট আছে।

৪৩। সবচেয়ে দুর্বল ব্যক্তি সেই, যে তার গুপ্ত ভেদ গোপন রাখতে অক্ষম। আর সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি হল সেই, যে তার ক্রোধ দমন করতে পারে।

৪৪। কী খেতে সব থেকে বেশী মজাদার? বলা ভারি শক্ত, সবচেয়ে খেতে মজা গরীবের রক্ত। (হারাম সূদ)

৪৫। শক্তির চেয়ে ধৈর্যই মানুষের জীবনে সবচেয়ে বেশী সফলতা আনতে পারে।

৪৬। মহিলার মত পরিবর্তন করার সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ পদ্ধতি হল, তার মতে মত দেওয়া।

৪৭। নিয়তি তোমাকে যা দান করে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় দান তোমার (পুণ্যময়ী) স্ত্রী।

৪৮। পৃথিবীতে যত কিছু আশ্চর্য জিনিস আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে আশ্চর্য মেয়ে মানুষের মন। তারা কী চায়, আর কী না চায়, অতি বড় পন্ডিতরাও বলতে পারেন না।

৪৯। ফুযাইল বিন ইয়াযকে জিজ্ঞাসা করা হল, 'সবচেয়ে আশ্চর্য জিনিস কী?' বললেন, 'এমন হৃদয়, যা আল্লাহকে চেনার পর তাঁর অবাধ্য হয়।'

৫০। এক ব্যক্তি আফলাতুনকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি অনেক দিন যাবৎ সমুদ্র সফরে ছিলেন। এই সফরে সবচেয়ে আশ্চর্যের কী ছিল?' বললেন, 'নিরাপদে স্থলে ফেরা।'

৫১। আবূ হাতেম বলেন, 'সবচেয়ে লাভবান ব্যবসা আল্লাহর যিক্র এবং সবচেয়ে ক্ষতিকর ব্যবসা মানুষের যিক্র।'

৫২। সবাইকে খুশী রাখা পৃথিবীতে সবচেয়ে দুরূহ কাজ।

৫৩। দুরন্ত ছেলেকে মা যখন কোলে টেনে নিয়ে জোর করে ধরে রাখেন, তখন বাইরে থেকে হয়তো সেটাকে একটুখানি অত্যাচারের মতোও দেখায়। কিন্তু সে অত্যাচারের মধ্যে শিশুর ঘুমিয়ে পড়তে বাধে না। বাইরের লোক যাই বলুক, শিশু বোঝে, ওইটাই তার সবচেয়ে নিরাপদ স্থান।

৫৪। সবচেয়ে ভাল হৃদয় সেটা, যাতে ভাল স্থান পায়।

৫৫। ইবনুল মুবারক বলে, সব চাইতে শ্রেষ্ঠ 'যুহদ' (বিষয়-বিতৃষ্ণা) হল, 'যুহদ' (বিষয়-বিতৃষ্ণা) গোপন ক'রে সংসার করা।

৫৬। সব চাইতে শ্রেষ্ঠ মীরাস হল সম্ভ্রম।

৫৭। যে ব্যক্তি নিজের সমালোচনা করতে পারে, সেই সর্বাপেক্ষা বেশী বুদ্ধিমান।

৫৮। সর্বশ্রেষ্ঠ নেতা হলেন তিনি, যাঁর মেজাজ বড় ঠান্ডা।

৫৯। সর্বশ্রেষ্ঠ ইল্‌ম, যা আমল সত্যায়ন করে।

৬০। নারীর জীবনে সবচেয়ে বড় শত্রু হল তার রূপ-যৌবন।

৬১। নারীর জীবনে নিরাপত্তার সর্বশ্রেষ্ঠ প্রহরী হল তার কুৎসিত চেহারা।

৬২। অর্থ ৪ প্রকার। (১) যা আল্লাহর অনুগত থেকে উপার্জন করা হয় এবং তাঁরই সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করা হয়। আর এটা হল সর্বোত্তম অর্থ। (২) যা আল্লাহর অবাধ্য হয়ে কামানো হয় এবং পাপের পথে ব্যয় করা হয়। আর এ হল নিকৃষ্টতম অর্থ। (৩) যা কোন মুসলিমকে কষ্ট দিয়ে কামানো হয় এবং কোন মুসলিমকে কষ্ট দেওয়ার পথে ব্যয় করা হয়। আর তাও নিকৃষ্ট অর্থ। (৪) যা বৈধ পথে অর্জন করা হয় এবং বৈধ প্রবৃত্তির পথে ব্যয় করা হয়। যাতে আসলে কোন উপকার বা অপকার নেই।

৬৩। বান্দার পক্ষে আল্লাহর সর্বোত্তম দান হল, জ্ঞান। তা না থাকলে, আদব। তা না থাকলে, মাল; যা উক্ত সব কিছুকে গুপ্ত করে। তা না থাকলে, বজ্র; যা তাকে ধ্বংস করে ফেলে। আর তার ক্ষতি থেকে দেশ ও দশ নিরাপদে থাকে।

৬৪। ভগ্ন হৃদয়ের সর্বোত্তম চিকিৎসা হল, তা পুনর্বার ভেঙ্গে ফেলা।

৬৫। আমরা যখন অপরের নিকট ভালো হই, তখন আমরা নিজেদের কাছে সর্বোত্তম। (বেঞ্জামিন ফ্রাঙ্কলিন)

৬৬। সকল সুস্বাদু জিনিসের আস্বাদ গ্রহণ করেছি, কিন্তু অধিক সুস্বাদুরূপে নিরাপত্তার মত কোন অন্য জিনিস পাইনি। সমস্ত রকম তিক্ত বস্তুর স্বাদ গ্রহণ করেছি, কিন্তু অভাব ও পরমুখাপেক্ষিতার মত অধিক তিক্ত বস্তু আর অন্য কিছু পাইনি। আর আমি লোহা ও পাথর বহনও করেছি, কিন্তু ঋণকে তা থেকেও বেশী ভারী অনুভব করেছি।

৬৭। নিমফল খেয়েছি এবং মাকালফলও চেখেছি, কিন্তু দারিদ্র্যের চেয়ে অধিক তিক্ত জিনিস অন্য কিছু চাখিনি। যদি তুমি গরীব হয়ে যাও, তাহলে সে কথা যেন কাউকে বলো না, নচেৎ তারা তোমাকে ছোট ভাবতে শুরু করবে। পক্ষান্তরে তোমার ধন আছে এমন ভাবও প্রকাশ করো না। গুপ্ত থেকো, গোপনে সুখ আছে। অতি সংগোপনে মনের কথা কেবল মহান আল্লাহকে জানায়ো।

৬৮। নিরাপত্তার দশটি অংশ। এর মধ্যে নয়টি আছে (আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া) নীরবতায়। আর বাকী একটি আছে বেওকুফদের সংসর্গ থেকে দূরে থাকায়। দারিদ্র্যের সৌন্দর্য ধৈর্য। ধনবত্তার সৌন্দর্য কৃতজ্ঞতা। ইসলামের চেয়ে অধিক গৌরব কোন বংশে নেই। তাকওয়ার চেয়ে অধিক সুন্দর শিষ্টাচারিতা অন্য কিছু নেই। তওবার চেয়ে অধিক সফল সুপারিশকারী অন্য কেউ নেই। নিরাপত্তার চেয়ে সুন্দর পরিচ্ছদ অন্য কিছু নেই।

৬৯। পাপ যত ছোটই হোক তা খারাপ। আলেমের পক্ষে পাপ অধিক অশোভনীয় এবং অধিক সম্ভাব্যও। কারণ, ইল্‌ম শয়তানের বিরুদ্ধে লড়বার হাতিয়ার। তাই শয়তান চেষ্টা করে, যার হাতে হাতিয়ার তাকেই প্রথমে প্রতিহত করা। (সা'দী)

৭০। সৎ পরামর্শের চেয়ে কোন উপহার অধিক মূল্যবান নয়।

৭১। প্রয়োজনে একটি সুপরামর্শ অনেক জিনিসের চেয়ে মূল্যবান।

৭২। একজন লোককে জিজ্ঞাসা করা হল, 'কোন ছেলেটি তোমার কাছে বেশী ভাল?' বলল, 'সাবালক না হওয়া পর্যন্ত ছোট ছেলে, সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত অসুস্থ ছেলে এবং ফিরে না আসা পর্যন্ত প্রবাসী ছেলে।'

৭৩। কিছু না করলে সমালোচনার পাত্র হতে হয় না। যত বেশি লক্ষ্য সিদ্ধির পথে এগোবেন, ততই সমালোচিত হওয়ার ঝুঁকি বাড়বে। মনে হয় সাফল্য ও সমালোচনার মাঝে একটি যোগসূত্র আছে। সাফল্য যত বেশি, সমালোচনাও তত বেশি।

৭৪। তোমার হিংসুক বেশী হওয়া, তোমার সফলতারই দলীল।

৭৫। একজন দরিদ্র লোক যত বেশী নিশ্চিন্ত, একজন রাজা তত বেশী উদ্বিগ্ন।

৭৬। 'এ জগতে হায়, সেই বেশী চায়, আছে যার ভূরি ভূরি,
রাজার হস্ত করে সমস্ত কাঙ্গালের ধন চুরি।'

৭৭। জগতের সবচেয়ে সুন্দর ও মূল্যবান জিনিসগুলি সবচেয়ে বেশী অকেজো।

৭৮। দিনের সবচেয়ে মধুরতম সময় হচ্ছে ভোর বেলা।

৭৯। দেহের মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী অঙ্গ হল চোয়াল।

৮০। মানুষের সবচেয়ে ছোট অঙ্গ হল কানের হাড়।

৮১। মানুষের দেহে সবচেয়ে বেশী অনুভূতিশীল অঙ্গ হল ঠোঁট।

৮২। প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে বেশী ছুটতে পারে চিতাবাঘ; ঘন্টায় প্রায় ১০০ থেকে ১৪৫ কিমি।

৮৩। বাজ পাখীর দৃষ্টিশক্তি সবার চেয়ে বেশী তীক্ষ্ম। এ পাখী প্রায় ৮ কিমি দূর থেকে পায়রা বা ঘুঘু দেখতে পায়।

৮৪। পশুর মধ্যে সব থেকে বেশী স্মৃতিশক্তি রাখে উট।

৮৫। নীল তিমি এ প্রাণী জগতের সবচেয়ে বড় সৃষ্টি। জন্মের সময় এর ছানার ওজন হয় ছয় হাজার কেজি!

৮৬। এ পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা নদী হল নীল-নদ। এটি প্রায় ৬৬০৭ (মতান্তরে ৬৬৭২) কিমি লম্বা। অতঃপর দক্ষিণ আমেরিকার আমাজোন নদী। এটি প্রায় ৬২৭৫ কিমি।

৮৭। পৃথিবীর সবচেয়ে ছোট নদী আমেরিকায় আরিজুন নদী, ১৪৩মি।

৮৮। এ পৃথিবীতে আমেরিকায় সব থেকে বেশী রেডিও-স্টুডিও আছে। এ দেশে ৯৫১২টি অনুমোদিত স্টুডিও আছে।

৮৯। পৃথিবীর সব চাইতে বড় লাইব্রেরী হল আমেরিকার কংগ্রেসের লাইব্রেরী। এর ভিতরে বই রাখার যে আলমারিগুলো আছে সেগুলোর দৈর্ঘ্য হবে ৫২৬ কিমি।

৯০। আমেরিকার ক্যালিফর্নিয়ার ইন্টারন্যাশনাল পার্কে জেনেরাল চেয়ারম্যান নামক বৃক্ষ এ পৃথিবীর সবচেয়ে বড় বৃক্ষ। এটির উচ্চতা প্রায় ৮৫ মিটার এবং এর গুঁড়ি প্রায় সাড়ে ২৪ মিটার মোটা।

সমাপ্ত